জুল ভের্ন রচনাবলী

সম্পাদনায় ও ভাষান্তরে : অদ্রিশ বর্ধন

দ্বিতীয় খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

॥ জুল ভের্ন ॥

জন্ম নানতেস-এ ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সয়ে ; ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।

প্রথম রচনাবলী প্রকাশ, আষাঢ়—১৩৮১
দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ—১৩৮২
তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ—১৩৮৬

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

ভূমিকা

গল্পের ভূমিকায় গল্প থাকলেই যেন মানায় ভাল এবং সে ভূমিকা যেন দীর্ঘ না হয়। তা সত্ত্বেও প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দীর্ঘ হয়েছে। নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়। জুল ভের্ণ অসামান্য লেখক ছিলেন। একটানা চল্লিশ বছর সমানে কলম চালিয়ে গিয়েছেন। চল্লিশ বছরের সাধনার ফল এক জায়গায় জড়ো করতে গেলে গৌরচন্দ্রিকা একটু লম্বা হবে বইকি। যা বলবার প্রায় সবই বলা হয়েছে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। আরও কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হল বর্তমান খণ্ডে—অতি সংক্ষেপে।

জুল ভের্ণ ছ'মাসে একটি করে উপন্যাস লিখে গেছেন বিশেষ একটি চুক্তি অনুসারে। চল্লিশ বছরের হিসেবে তাই প্রায় আশিটি কাহিনীর স্রষ্টা তিনি।

ভের্ণের লেখার জায়গাটি কিন্তু বড় মজার। ছাদের ওপর লাল ইটের চিলেকোঠা। কিন্তু আজব চিলেকোঠা। ঠিক যেন একটা জাহাজি-ক্যাপ্টেনের কেবিন ঘর।

এই ঘরে বসেই এ-কালের অনেক বিস্ময় তিনি মানসচক্ষে দেখেছিলেন সেকালে। আজ যা নেহাৎ মামুলী, সেকালে ছিল তা কল্পনারও বাইরে। কিন্তু শক্তিমান কল্পলেখক তা কল্পনা করেছিলেন এবং সুন্দর গল্পের ডালি সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেন।

এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সায়ান্স-ফিকশন কাহিনীকার আর্থার সি ক্লার্ক কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৭২ সালে। মার্কিন দূতাবাসে একটি খানাপিনার আসরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'সায়ান্স-ফিকশন যাঁরা লেখেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আপনার ভক্ত। কিন্তু যাঁরা লেখেন না? আপনার সম্বন্ধে তাঁদের মত কী?'

উনি তখন J. B. Priestley-র নাম করলেন। ইনি মিস্টার ক্লার্কের একটি গল্প গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন—কল্পনা যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী না হয়, সে লেখা মার খাবেই। কল্পনাকে মনে হবে স্রেফ আজগুবী, অবাস্তব, ছেলেভুলোনো রূপকথা। আর্থার সি ক্লার্ক ভাবীকালের কথাই লিখেছেন। কিন্তু কখনো তা গাঁজাখুরী মনে হয়নি। বরং একে-একে সত্যি হচ্ছে।

জুল ভের্ণের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। রেডিও আবিষ্কারের আগেই উনি কল্পনা করেছিলেন। টেলিভিশনের নাম দিয়েছিলেন ফোনো-টেলিফটো। হেলিকপটারকে মনের চোখে দেখেছিলেন রাইট ভ্রাদার্স আকাশে ওড়ার পঞ্চাশ বছর আগে। সাবমেরিন, এরোপ্লেন, নিয়ন আলো, চলন্ত সিঁড়ি,

এয়ার কণ্ডিশনিং, বহুতল সৌধ ,ক্ষেপনাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি বহুবিধ যান্ত্রিক বিস্ময় তিনি মনে মনে উদ্ভাবন করেছিলেন এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন, মনে হয়েছে সব সত্যি, সব সত্যি, মিথ্যে কিছু নয় !

সায়ান্স-ফিকশ্যন পথ দেখায়। ভের্ণও পথ দেখিয়েছিলেন ভাবীকালের মানুষকে। মার্কনি (বেতার আবিষ্কার করেন), অগাস্টে পিকার্ড (বেলুনবাজ এবং দুর্গম সমুদ্রেও অকুতোভয়), সাইমন লেক (নাম করা জাহাজ ইঞ্জিনীয়ার), অ্যাডমিরাল বাইড (সুমেরুর ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন)—এঁরা প্রত্যেকেই উপকৃত ভের্ণের কাহিনী পড়ে। ঠিক এই রকম কথাই প্রেমেন্দ্র মিত্রও শুনেছিলেন নিউইয়র্কে পৌঁছে। তরুণ বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরে বলেছিলেন, ঘনাদার কাহিনী পড়ে তাঁরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বই কি।

ভের্ণ নিজেও বলতেন, একজন যা ভাবতে পারে, অপরজন তা করতে পারবে না কেন ? উত্তরকালের মানুষ হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন মণীষী ভের্ণের এই আপ্তবাক্য।

অথচ উনি যখন পৃথিবীর আলো দেখালেন, যন্ত্রসভ্যতা তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে বললেই চলে। নেপোলিয়ন সবে মারা গিয়েছেন। রেলগাড়ীর বয়স মোটে পাঁচ বছর। আটলান্টিকে ষ্টীম জাহাজ বুক ঠুকে যাচ্ছে বটে, পাল-মাস্তুলের পাট পুরোপুরি চুকোতে পারেনি।

এ-হেন যুগসন্ধিক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন আধুনিক সায়ান্স-ফিকশ্যনের জনক জুল ভের্ণ। বড় হতেই বাবা ঘাড় ধরে পাঠালেন আইন পড়তে। কিন্তু একদিন এক পার্টি থেকে ফেরবার সময়ে সিঁড়িতে ধাক্কা লাগল সাহিত্যিক আলেকজাণ্ডার ডুমারের সঙ্গে। জীবনের মোড় ঘুরে গেল ভের্ণের।

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে সারা পৃথিবীতে নাম ছড়িয়ে গেল আশ্চর্য গল্পের লেখক জুল ভের্ণের। চুক্তিবদ্ধ হলেন বছরে দুটি উপন্যাস লিখতে হবে। লিখলেন। একটানা চল্লিশ বছর ধরে আনন্দ দিলেন পৃথিবীবাসীকে। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও চোখ কানের শক্তি হারিয়েও মুখে মুখে বলে গেলেন গল্পের বয়ান (দি ইটারন্যাল অ্যাডাম)।

শেষ জীবনে তাঁকে 'লিজিয়ন অফ অনার' সম্মান দেওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছিলেন যিনি এক ডাকেই তাঁকে পৃথিবীর মানুষ চিনবে। ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্স—সুয়েজ খালের স্রষ্টা।

ভের্ণের এক-একটা উপন্যাস এক-একরকম সাড়া এনেছে পাঠক মহলে। 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' উপন্যাসটি প্যারিসের 'লে টেম্পস' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছেপে বেরোনার সময়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল গল্প-

রসিকদের মধ্যে। ফিলিয়াস ফগকে হারাতেই হবে। তাই নিউইয়র্কের একটি খবরের কাগজ থেকে 'নেলি ব্লাই' নামে একজন মেয়ে সাংবাদিককে পাঠানো হল সারা পৃথিবী ঘুরে আসার জন্যে। নেলি ব্লাই কিন্তু মোটে ৭২ দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। পরে, ভের্ণের ভবিষ্যৎবাণী মত ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ তৈরী হতেই একজন ফরাসী ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়েন এবং মাত্র ৪৩ দিনে চক্কর দিয়ে আসেন পৃথিবীকে।

কল্পনা কতখানি জীবন্ত এবং মন ছোঁয়া হলে এমনি উদ্দীপনা সঞ্চার করা যায়? 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আনডার দি সী' উপন্যাসে নোটিলসকে দিয়ে সমুদ্রের জল থেকেই ইলেকট্রিসিটি তৈরী করেছিলেন ভের্ণ। কিন্তু হালে দু'জন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক নাকি এই অসম্ভব সম্ভব করেছেন।

*

'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস'য়ের অনুবাদ ষাট হাজার মাইল হওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। বৃটিশ আমেরিকানরা অবশ্য বলবেন এক লীগ মানে তিন মাইল, ফরাসীরা তা বলবেন না। ওয়েবস্টার ইণ্টারন্যাশনাল ডিক্সনারীও বলছে, দেশ কাল অনুযায়ী এক লীগ-য়ের পরিমাপ এক-একরকম। এমন কি এক লীগ ৪-৬ মাইল পর্যন্তও হতে পারে। ভের্ণ কিন্তু ফরাসী ছিলেন, আলোচ্য কাহিনীর লেখক যাঁকে সাজিয়েছিলেন, সেই প্রফেসর আরোনাও ফরাসী ছিলেন। দুজনেই নিশ্চয় ফরাসী লীগকেই বুঝিয়েছিলেন—যার মাপ তিন মাইলের অনেক কম। অর্থাৎ ২০,০০০ লীগ মানে ৬০,০০০ মাইল নয়।

*

এ খণ্ডে দুটি সুবৃহৎ কাহিনী প্রকাশিত হল। 'মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড'য়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। 'ক্লিপার অফ দি ক্লাউডস' তাঁর প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস সারির মধ্যে পড়ে।

ভের্ণ সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর দিয়ে সাহায্য করার জন্যে ঋণী রইলাম লেখক-বন্ধু বীরু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

অদ্রীশ বর্ধন

সূচীপত্র

রহস্য দ্বীপ

দি মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে

বালক বয়সে রবিনসন ক্রুশো, দি সুইশ ফ্যামিলি রবিনসন আর ফেনিমোর কুপার বিরচিত মরুভূমি দ্বীপের কাহিনী পড়তে বড্ড ভালবাসতেন জুল ভের্ণ। এই সব গল্পের প্রভাব তাঁর স্কুলজীবনের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল। বিজন দ্বীপে নির্বাসিত মানুষদের বিবিধ সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার অংকুর তখনি দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে।

এই জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে অনেক কাহিনী রচনা করেছেন ভের্ণ। মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন দি মিষ্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড নামক পরস্পর সম্বন্ধ-সাপেক্ষ উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে। এ কাহিনীর আমেরিকান নায়করা বুদ্ধির জোরে রবিনসন ক্রুশো আর তাঁর সুইশ জ্ঞাতিভাইদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। শেষোক্ত নায়করা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে পেয়েছিলেন জলে ভাসা ও ডোবা জিনিসপত্র। ভের্ণের নায়করা বেলুন থেকে দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছেন এবং পরণের বস্ত্র ছাড়া কিছু কাছে রাখতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও বিজন দ্বীপে উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছেন তাঁরা। সগবে ম্যাপ বহির্ভূত দ্বীপটিকে আমেরিকার ৩৮তম রাষ্ট্র রূপে গণ্য করেছেন। এ গল্প লেখবার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট রাষ্ট্র সংখ্যা ছিল ৩৭।

যত জব্বর কাহিনীই হোক না কেন, এ ধরনের গল্পকে নিছক বোম্বেটে উপাখ্যান আর পোষা বাঁদর দিয়ে জমানো যায় না। ভের্ণ তা বুঝেছিলেন বলেই সুবিশাল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন এমন একটা রহস্যের জাল যার পূর্বাভাষ দিলেও গল্পের রস নষ্ট হবে। পাঠকপাঠিকারা নিজেরাই দেখুন রহস্য জালের ঊর্ণনাভটি আদতে কে।

টেকনিক্যাল ব্যাপারে ভের্ণ খুঁটিয়ে লিখলেও বর্তমান অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত করা হল গল্পপাঠের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যে।

সুইশ ফ্যামিলি রবিনসন এবং পো-য়ের ন্যারেটিভ অফ আর্থার গর্ডন পিম-এর উপসংহার অসম্পূর্ণ থাকায় ভের্ণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই বর্তমান কাহিনীতে তিনি তাঁর দুটি পূর্বতন উপন্যাসের উপসংহার টেনে এনে সম্পূর্ণ করেছেন। একটি ক্যাপ্টেন গ্রান্টের কাহিনীত্রয়—এ ভয়েজ অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড—যার

একটি খণ্ড হল অ্যামঙ্গ দি ক্যানিবালস। অপর কাহিনীটি এত বিখ্যাত যে পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই তা আবিষ্কার করে নেবেন।

দি মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড প্রকৃত পক্ষে তিনটি ধারাবাহিক উপন্যাসের সমষ্টি—ড্রপড ফ্রম দি ক্লাউডস, ম্যারুনড্ এবং দি সিক্রেট অফ দি আয়ল্যাণ্ড।

ঝড়ে ফেঁসে যাওয়া বেলুন থেকে বিজন দ্বীপে অবতরণ করেছেন পাঁচজন আমেরিকান। সঙ্গে আছে শুধু একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দুটো ঘড়ি, কুকুরের গ্লিস বকলস আর এক দানা গম। এই নিয়ে তাঁরা সুখে শান্তিতে ঘরকন্না শুরু করে দিলেন জনহীন দ্বীপে। বাসন তৈরীর কারখানা, লোহার কারখানা, গোলা-বারুদের কারখানা আর বিরাট শস্যক্ষেত্র বানিয়ে নিলেন। হাতে তৈরী বারুদ দিয়ে গ্র্যানাইট পাথর উড়িয়ে দূর্গের মত সুরক্ষিত বাসস্থান বানালেন। গরু ছাগলের খোঁয়াড় পর্যন্ত তৈরী হয়ে গেল। লম্বা তার পেতে টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন নিজেদের হাতে। রহস্যদ্বীপের রহস্যটি কিন্তু অন্তরালেই রয়ে গেল।

দ্বীপে পরিত্যক্ত অনেকেই হয়, কিন্তু এমন অদৃশ্য সহায় কেউ পায় কি? আড়ালে থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি দ্বীপবাসীদের সাহায্য করে চলেছেন, কে তিনি? মানুষ, না, দ্বীপের অধিদেবতা?

জুল ভের্ণের ভাইপো মরিস বলতেন—তিনটে ব্যাপারে অদম্য স্পৃহা ছিল কাকামনির: স্বাধীনতা, সঙ্গীত আর সমুদ্র। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের মূর্চ্ছনা ছাড়া আর কোনো সঙ্গীত এ কাহিনীতে নেই। কিন্তু আছে বিজন দ্বীপে স্বাধীন বিহারের দুরন্ত কল্পনা।

কারও যদি সাধ যায় জাহাজ ডুবির পর বিজন দ্বীপে উঠবেন, তাহলে তিনি এই বইখানি সঙ্গে নিতে পারেন। শুধু অ্যাডভেঞ্চার নয়, বিজন দ্বীপে নির্বাসিতদের পক্ষে এমন গাইড-বুক আর দ্বিতীয় নেই।

মেঘলোক থেকে মর্ত্যে

ড্রপড ফ্রম দি ক্লাউডস

১

'আমরা কি ওপরে উঠছি?'

'মোটেই না।'

'তবে কি নামছি?'

'তার চাইতেও ভয়ানক ব্যাপার, ক্যাপ্টেন। আমরা পড়ছি।'

'বেলুনের বোঝা হাল্কা করো।'

'অনেক আগেই তা করা হয়েছে।'

'তাহলে কেন বেলুন ওপরে উঠবে না?'

জবাব নেই!

আবার প্রশ্ন শোনা গেল পবনদেবের হুহুংকার ছাপিয়ে—

'এবার কি বেলুন অল্প অল্প করে ওপরে উঠছে?'

'একেবারেই না। নীচে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সাগর-গর্জন।'

আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ—'গেল! গেল! সমুদ্র তো আর পাঁচশ ফুটও নীচে নয়।'

'ফেলে দাও, ফেলে দাও। বেলুনে যা কিছু বোঝা আছে, সব ফেলে দাও। গোলাবারুদ, বন্দুক, বালির বস্তা, খাবার-দাবার সব ফেলো।'

১৮৬৫ সালের তেইশে মার্চ বিকাল চারটায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্ত বিস্তৃত জলময় মরুদেশের ওপরে ধ্বনিত হল নির্ভীক এই কটি কণ্ঠ!

ভয়ংকর সেই ঝড়ের বর্ণনা শেষকালে নাকি কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল। ১৮ই থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। অনেক গাছ উপড়ে গিয়েছিল, শ'খানেক জাহাজ তীরে আছড়ে চুরমার হয়েছিল। মারা গিয়েছিল যে কত লোক, তার হিসেব রাখা যায় নি।

প্রলয়কাণ্ড শুধু জলে-স্থলেই দেখা গিয়েছে, তা নয়। অন্তরীক্ষেও পবনদেব যে নাটক দেখিয়েছেন, তা লোমখাড়া করার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝাপটায় কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পাকসাট খেতে খেতে পড়ছিল একটা অতিকায় বেলুন। সর্বাঙ্গে দড়ির জাল দিয়ে মোড়া। তলায়

ঝুলছে দোলনা। দোলনায় পাঁচজন আরোহীর কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না কুয়াশার দাপটে—শোনা যাচ্ছিল কেবল তাদের নির্ভীক কণ্ঠ। কারণ বেলুনের আবরণে ফুটো হওয়ায় গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। ক্রমশঃ চুপসে লম্বাটে হয়ে আসছে গোল বেলুন।

পথ হারিয়েছে বিশাল বেলুন। ছুটে চলেছে অজ্ঞাত পথে। শুধু ছুটছে না, বেহুঁশ বেহেড মাতালের মতই টলেটলে ঘুরে ফিরে পাকসাট খেয়ে হু-হু করে নামছে নীচের দিকে। ঝড়ের দাপটে বরুণ দেবতাও চটেছেন বিলক্ষণ। সে কি গজরানি সমুদ্রের। বেলুন শুদ্ধ আরোহীরা উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় ঠিকরে পড়লেই যে কি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হবে ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে পাঁচজনের। ধারে কাছে ডাঙার চিহ্ন আছে বলেও তো মনে হয় না। যা কুয়াশা!

* * *

২৪শে মার্চ। সকাল। বেলুন আরো চুপসেছে। আবার নেমে চলেছে নীচের দিকে।

'এরপর কি করা উচিত?' নির্ভীক কণ্ঠস্বর শোনা গেল আকাশ পথে।

'অদরকারী জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত।'

তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে হাত লাগালে বাজে জিনিস ফেলতে। ঝপাঝপ করে ফেলে দেওয়া হল অনেক কিছুই, মায় খাবার-দাবার পর্যন্ত। কিন্তু তবুও তো ওপরে উঠল না বেলুন।

জল, জল, আর জল। যে দিকে চোখ যায়, কেবলি জল। দ্বীপের চিহ্ন নেই কোথাও। সমুদ্রও যেন অসহায় আরোহীদের নিয়ে ঢেউয়ের মাথায় ছিনিমিনি খেলার আশায় বিকট অট্টহাসি জুড়ল ঝড়ো হুহুংকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

প্রাণের দায়ে ফেলা হল আরো অনেক কিছু। বেলুন একটু ওপরে উঠল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, যেন ধুঁকতে ধুঁকতে এগোলো অনেকখানি, কিন্তু জলের শেষ দেখা গেল না অনেক দূরেও।

আবার শোনা গেল ভয় লেশহীন কণ্ঠস্বর—

'ফের পড়ে যাচ্ছি আমরা।'

'বরাতে ডুবে মরাই ছিল তাহলে।'

'সমুদ্র! সমুদ্র! গর্জন শোনা যাচ্ছে।'

'ডুববই আমরা, ডুবেই মরব।'

'দূর! এত ভেঙে পড়ার কি আছে? সব ফেলে দেওয়া হয়েছে কি?' নির্ভীক কণ্ঠ ধ্বনিত হল আবার।

'না। চার হাজার ডলার ভর্তি থলেটা এখনো ফেলা হয় নি।' বলতে না বলতে শূন্যপথে ছিটকে গেল গুরুভার টাকার থলি।

কিন্তু বেলুনের সেরকম উর্ধ্বগতি দেখা গেল না। সামান্য একটু উঠল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল, আবার শুরু হবে তার নিম্নগতি।

অথচ ফেলবার মত আর কিছুই নেই বেলুনে। কে যেন এই সময়ে বলে উঠল—'আছে বইকি! এখনো দোলনাটা ফেলা হয় নি।'

বেলুনের এ দোলনা উইলো গাছের কাঠ কেটে তৈরী। ভীষণ ভারি। জলেও ভাসে না। অভিযাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে ফেলে দিল কাঠের বাক্সটা। নিজেরা ঝুলে রইল বেলুনের গায়ে মোড়া দড়ির জালের সঙ্গে নিজেদের বেশ করে বেঁধে নিয়ে।

দোলনা ফেলতেই হাল্কা হয়ে গেল বেলুন। এক লাফে উঠে গেল হাজার খানেক ফুট ওপরে। •কিন্তু হায়রে! বিধি বাম! অতবড় ফুটো দিয়ে গ্যাস বেরোলে কাঁহাতক আর লড়াই করা যায় ক্রমাগত চুপসে আসা বেলুনের সঙ্গে? কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, ফের টলমল করতে করতে নীচে নামছে ফুটো বেলুন। বিকেল চারটে নাগাদ দেখা গেল সমুদ্র আবার এগিয়ে এসেছে, বড়জোর শ পাঁচেক ফুট নামলেই ঢেউয়ের মাথায় বেলুন ঠেকবে।

হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে বিষম হাঁকডাক করে উঠল একটা কুকুর।

'টপ বোধহয় কিছু দেখতে পেয়েছে,' বললে একজন আরোহী।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন—'ঐ তো ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে! হা ঈশ্বর! ডাঙা, ডাঙা, ডাঙা!'

সত্যিই ডাঙা দেখা গেল বেলুনের গতি পথেই। দূরত্ব মাইল তিরিশেক তো বটেই। বাতাস যদি কৃপা করে, তাহলে কতক্ষণই বা লাগবে পৌছোতে—একঘণ্টা?

একঘণ্টা! ততক্ষণে বেলুন কি আর বেলুন থাকবে? গ্যাসহীন ন্যাকড়ার পুঁটলি হয়ে দাঁড়াবে!

নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ল অভিযাত্রীরা। ডাঙা দেখা যাচ্ছে, অথচ সেখানে শেষপর্যন্ত পৌছোনো যাবে না। কিন্তু সলিল সমাধি এড়াতে হলে যে ভাবেই হোক অজ্ঞাত ঐ দ্বীপে পৌছোতেই হবে।

কিন্তু পৌছোনো যাবে কি? বেলুনের গ্যাস আরো বেরিয়ে গেল। বেলুন সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলল। জলের ঝাপটায় ভিজে গেল তলার দিক, আরোহীরাও কেউ শুকনো রইল না। নাকে মুখে জল ঢুকল যে কতবার তার

ইয়ত্তা নেই। সাঁতার কাটবার সুবিধের জন্যে ক্যাপ্টেন হুকুম দিলেন শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলা হোক।

নিঃসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কাটল আধ ঘণ্টা। ডুবুডুবু হয়েও ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে এগিয়ে চলল ফুটো বেলুন। আচমকা একটা উত্তাল ঘূর্ণি হাওয়া আছড়ে পড়ল বেলুনে—ফলে লাফিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল উড়ন্ত যান। দড়ি ধরে ঝুলে রইল আরোহীরা।

আর প্রায় আধ মাইল বাকী আছে। হাওয়ার টানে শেষ পর্যন্ত হয়তো পৌঁছোনো যাবে। আচম্বিতে বিশাল একটা তরঙ্গের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল বেলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ ভীষণ হাল্কা হয়ে গিয়ে তীব্রবেগে উঠে গেল বেশ খানিকটা ওপরে। পরক্ষণেই দুলতে দুলতে ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল অজ্ঞাত দ্বীপের বালুকাবেলায়।

ধড়ফড় করে জালের দড়ি ছেড়ে বালির ওপর লাফিয়ে পড়ল আরোহীরা। অতগুলো ওজন একসাথে কমে যেতেই প্রায়-চুপসোনো বেলুন হাওয়ায় ভর করে সাঁ-সাঁ করে উধাও হল চোখের আড়ালে। অন্ধকারে তার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

উল্লাস মিলিয়ে গেল যখন দেখা গেল অধিনায়ক সাইরাস হার্ডিং আর তাঁর প্রিয় কুকুর টপ যাত্রীদের মধ্যে নেই!

২

এ গল্প যে সময়ের তখন মার্কিন দেশ জুড়ে চলছে গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা।

১৮৬৫ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে কৃতসংকল্প হয়ে রিচমণ্ড শহর অবরোধ করেছেন জেনারেল গ্রাণ্ট। ইনি দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের দলভুক্ত। জোর লড়াই চলল। কিন্তু রিচমণ্ড দখল করা গেল না।

এদিকে শহরের মধ্যেই বন্দী রয়েছেন জেনারেল গ্রাণ্টের জনাকয়েক নামজাদা অফিসার। ঝানু ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং এঁদের অন্যতম। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। পেটাই চেহারা! ধারালো বুদ্ধি আর তীব্র মনের জোর নিয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রভূত উন্নতি করেছেন। কদমছাঁট চুল, ধূসর পুরু গোঁফ, সুগঠিত করোটি এবং অন্তর্ভেদী চোখ—এই হল সাইরাস হার্ডিং। গাঁইতি আর হাতুড়ি চালিয়ে ওঁর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় হাতে-খড়ি। দুর্জয় সাহস, অদম্য মনোবল, তীব্র ইচ্ছাশক্তি—সবই যেন মূর্ত হয়েছে তাঁর মধ্যে।

সাইরাস হার্ডিংয়ের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন নিউইয়র্ক হেরাল্ডের চীফ-রিপোর্টার গিডিয়ন স্পিলেট। ইনি ভয়ানক ডাকাবুকো টাইপের সাংবাদিক। দিব্যি দশাসই বপু। বছর চল্লিশ বয়স। ঠাণ্ডামাথা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রচণ্ড সাহস, অপরিসীম উত্তম আর উৎসাহ—এই কটি গুণ অন্য সাংবাদিকের মনে ঈর্ষা জাগিয়েছে, কিন্তু গিডিয়ন স্পিলেটকে নিয়ে গেছে যশের শিখরে। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নাকি একহাতে পিস্তল ধরতেন, অপর হাতে খবর লিখতেন। ধরা পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ডাইরীতে লিখেছেন—'আমার দিকে বন্দুক তাগ করছে একজন সেপাই, কিন্তু—'

এই হল গিডিয়ন স্পিলেট। মৃত্যু সামনে জেনেও কর্তব্যকর্মে তিনি অবিচল।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট কেউ কাউকে চিনতেন না, কিন্তু দুজনেই দুজনের নামডাকের বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। শহরের চৌহদ্দির মধ্যে কয়েদ ছিলেন দুজনে। যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতেন, শুধু শহরের বাইরে যেতে পারতেন না কড়া পাহারা পেরিয়ে। এইভাবেই একদিন আলাপ পরিচয় হল দুজনের মধ্যে এবং সেই থেকে দুজনেই মতলব আঁটতে লাগলেন কিভাবে চম্পট দেওয়া যায় রিচমণ্ড ছেড়ে।

ঠিক এই সময়ে অনেক চালাকি করে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল নেব। অর্থাৎ নেবুচাডনেজার। নেব হার্ডিংয়ের পুরোনো চাকর। বেজায় প্রভুভক্ত। হার্ডিং তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে কি হবে, প্রভু আহত অবস্থায় শত্রুদের খপ্পরে পড়েছে শুনে স্থির থাকতে পারে নি—পালিয়ে চলে এসেছে হার্ডিং-এর কাছে। সঙ্গে এসেছে টপ—হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর।

গ্রাণ্ট মরিয়া হয়ে রিচমণ্ড অবরোধ করে বসে রইলেন বটে, দখল করতে পারলেন না। নানা ধান্দা নিয়ে যারা শহরে এসেছিল, তারা শুদ্ধ আটক পড়েছিল অনেক অনেক আগে থেকেই। গ্রাণ্ট শহর দখল করলে এরা ফিরে যেতে পারত যে-যার কাজে। অবরুদ্ধ হওয়ায় পালাই-পালাই রব উঠল এইসব বহিরাগতদের মধ্যে।

মহাফাঁপরে পড়লেন জেনারেল লী। ইনি রিচমণ্ডের শাসন কর্তা। গ্রাণ্ট শহর ঘিরে বসে থাকায় খবর আনা নেওয়া শিকেয় উঠল। লড়াইয়ের হালচাল কি জানতে পারলেন না, অন্যান্য সৈন্যাধক্ষ্যদের হুকুম পাঠাতেও পারলেন না।

তাই অনেক মাথা ঘামিয়ে একটা বেলুন বানালেন জেনারেল লী। ঠিক হল, এই বেলুনে চেপে কয়েকজন বাইরে যাবে, মিলিটারী অফিসারদের খবর দেবে। বেলুনের তলায় বাঁধা মস্ত দোলনায় তারা বসবে। কিন্তু যেদিন বেরোনোর কথা, সেই দিনই মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল আকাশে।

রিচমণ্ড ছেড়ে চম্পট দেওয়ার কথা যারা ভাবছিল মনে মনে, তাদের মধ্যে ছিল পেনক্রফট নামে এক নাবিক। সে একদিন আড়ি পেতে শুনল, বেলুনের কাছে দাঁড়িয়ে জেনারেল লীকে বলছে ক্যাপ্টেন ফরেস্টার—'দামাল হাওয়া না থামলে তো বেলুনকে সামাল দেওয়া যাবে না আকাশে।'

'যা বলেছেন। এ রকম ঝড়ো হাওয়ায় বেরোনো ঠিক হবে না। কাল সকালের আগে তো নয়ই।' সায় দিলেন জেনারেল লী।

আরও দু'চার কথার পর ঠিক হল পরের দিন সকালে হাওয়ার জোর কমলে রওনা হওয়া যাবে। রাত্রে যাতে বেলুন গায়েব না হয়, সেজন্যে পাহারা থাকবে'খন। যদিও তার দরকার হবে না। এরকম তুফান মাথায় নিয়ে কে আসবে বেলুনের কাছে ?

আড়াল থেকে শুনে মনে মনে হাসল পেনক্রফট। বলল—'কাপ্টেন হার্ডিং আসবেন। তিনি অন্ততঃ এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়বেন না।' ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সাইরাস হার্ডিং-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল পেনক্রফট।

রাস্তাতেই পাওয়া গেল হার্ডিংকে। পেনক্রফট বললে 'ক্যাপ্টেন, এখান থেকে পালানোর কথা কিছু ভাবছেন কি ?'

অন্যমনস্ক ছিলেন হার্ডিং। পেনক্রফটের কথায় হুঁশ হতেই শুধোলেন—'কে তুমি ?'

নিজের পরিচয় দিল পেনক্রফট। বলল, সাইরাস হার্ডিংকে সে চেনে বইকি। কোনো কুঅভিসন্ধি তার নেই। পালাতে হলে আজ রাতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে।

'সুযোগ!' অসহিষ্ণু কণ্ঠ সাইরাস হার্ডিং-এর। পালানোর বাসনা যে তাঁর মধ্যেও বলবৎ হয়ে উঠেছিল কদিন ধরে। তাই ঝটিতি শুধোলেন-'আজ রাতেই পালানোর কি সুযোগ তুমি পেয়েছ পেনক্রফট ?'

'বেলুনের সুযোগ।'

শুনেই তো লাফিয়ে উঠলেন হার্ডিং—'উফ! কি বোকা আমি! জেনারেলের বেলুনের কথা তো আমিও শুনেছি। কিন্তু এমন একটা খাসা প্ল্যান তো আগে মাথায় আসেনি আমার!'

পেনক্রফট তখন নিজের কথা আরো কিছু বলল। কারবার নিয়ে সে রিচমণ্ডে এসেছিল। সঙ্গে এসেছে মৃত মনিবের বিশ বছরের পুত্র। ছেলেটির কপাল পুড়েছে বাবার মৃত্যুর পরেই। কু-লোক তাকে ঠকিয়ে পথে বসিয়েছে।

কথা বলতে বলতে গিডিয়ন স্পিলেটের কাছে হাজির হলেন দুজনে। তিনিও আনন্দে আটখানা হলেন মতলব শুনে। ঠিক হল দশটায় শুরু হবে

বেলুন-অভিযান। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সবশেষে শুধু একটা কথাই বললেন—'হে ভগবান, তুফান যেন না কমে।'

তারপর শুরু হল যাত্রার প্রস্তুতি। জিনিষপত্র গোছগাছ করে টপকে শুধালেন হার্ডিং—'কিরে, মেঘলোকে যেতে নিশ্চয় আপত্তি নেই তোর? বিপদ কিন্তু পদে পদে, মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়।'

এই সময়ে স্পিলেট এসে পৌছোলেন জিনিশপত্র নিয়ে। টপ-এর হয়ে জবাব দিলেন তিনিই। বললেন—'আপনার মত লীডার সঙ্গে থাকতে ভয় কিসের?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন হার্ডিং আর স্পিলেট, সঙ্গে নেব আর টপ। বেলুন-ময়দানে পৌছে দেখলেন পাহারার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কিন্তু দারুণ ঝড়ে বেলুন হেলে পড়েছে। খুঁটি উপড়ে নিয়ে উড়ে যায় আর কি। অন্ধকারে উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পেনক্রফট, সঙ্গে মনিবের ছেলে হার্বার্ট। দেরী দেখে ওর আশংকা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন বুঝি আর এলেন না। টপ-এর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে দৌড়ে এসে সে বললে, 'জলদি জলদি। আর দেরী করলে সব কেঁচে যাবে।'

অমন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বেলুন পাহারা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলেই পাহারাদারদের টিকি দেখা যাচ্ছিল না মাঠে। অন্ধকারে গা ঢেকে দোলনায় উঠে বসলে অভিযাত্রীরা। একে একে কেটে দেওয়া হল সব কটা খুঁটির দড়ি। কাৎ হয়ে পড়তে পড়তে তীব্র বেগে শূন্যে ছিটকে গেল বিশাল বেলুন।

সেদিন ছিল ২০শে মার্চ, ১৮৬৫ সাল। রাত দশটা।

৩

'গেলেন কোথায় ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং?' মিশমিশে অন্ধকারে শোনা গেল গিডিয়ন স্পিলেটের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

জলে পড়েছেন নিশ্চয়। ঐজন্যেই হঠাৎ হাল্কা হয়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠে বাকী আরোহীদের ডাঙায় পৌছে দিয়ে গেছে বেলুন। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে সাঁতরে ডাঙায় আসতে পারবেন কি তিনি? সম্ভাবনা যদিও কম, তবুও স্পিলেট বললেন—'চলো, খোঁজ করা যাক। হয়ত উনি সাঁতার কেটে ডাঙায় পৌছেছেন এতক্ষণে।'

নিরন্ধ্র অন্ধকারে চোখ চলে না, তবুও অভিযাত্রীদের হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হল। যেদিক থেকে বেলুন উড়ে পড়েছে দ্বীপে, সেইদিকেই রওনা হল সবাই। থেকে থেকে সাইরাস হার্ডিং-এর নাম ধরে হাঁক পাড়তে লাগল

প্রত্যেকেই। সবচাইতে বেশী অস্থির হতে দেখা গেল নেবকে। মনের ভয়টা শেষ পর্যন্ত মুখেই বলে ফেলল সে।

বলল—'ক্যাপ্টেনকে না হলে অজানা দ্বীপে আমরা টিকতে পারব না। কিন্তু তাঁকে জীবন্ত পাওয়া যাবে কি?'

এ দুর্ভাবনা প্রত্যেকের মনেই দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেকেই উতলা হয়েছিল শুধু এই ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা ভেবে। তার ওপর এত হাঁক-ডাকের কোনো জবাবও নেই। বিজন দ্বীপে সাইরাস হার্ডিং জীবিত অবস্থায় পৌঁছোলে কি সাড়া না দিয়ে থাকতেন?

হার্বার্ট অবশ্য বলে ফেলল—'ক্যাপ্টেন হয়ত জখম হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন কোথাও। তাই জবাব দিতে পারছেন না।'

তাই শুনে ভালো বুদ্ধি জোগালো পেনক্রফট। সে বললে যাওয়ার পথে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে গেলে পথের একটা নিশানা থেকে যাবে ক্যাপ্টেনের জন্যে। সকালবেলা আলো ফুটলে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি ঠিকই বুঝতে পারবেন কোন পথে তাঁর খোঁজ করেছি আমরা।'

প্রস্তাবটা মনে ধরল স্পিলেটের। নেবকে তিনি বললেন—'দেখো খুঁজে ধারে কাছে শুকনো কাঠ পাওয়া যায় কি না।'

'কাট তো খুঁজছেন, দেশলাই আছে তো?' শুধোলে হার্বার্ট।

'আমার কাছে আছে', বলল পেনক্রফট। 'জামাকাপড়ের মধ্যে এমন করে সেলাই করে রেখেছিলাম যে সমুদ্রের জল আমাকে ভিজিয়েছে, দেশলাইকে পারেনি।'

দেশলাই তো পাওয়া গেল, কিন্তু ফ্যাসাদ হল শুকনো কাঠ নিয়ে। নেব তন্নতন্ন করে এদিকে সেদিকে খুঁজেও ঘাসপাতা কাঠকুটো কিছু না পেয়ে ফিরে এসে বললে—'ধুত্তোর! কিসসু পেলাম না।'

স্পিলেট বললেন—'তাহলে বোধহয় পাথর ছাড়া গাছপালা কিছু নেই।'

যাই হোক, নিরেট অন্ধকারেও হাতড়ে হাতড়ে ওরা আরও এগোলো। হঠাৎ জলের ছলছলাৎ আওয়াজ পাওয়া গেল সামনে। অর্থাৎ এইখানেই থামতে হবে, আর এগোনো চলবে না।

নেব প্রভুর নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডাকল বার কয়েক। কি আশ্চর্য! তার ডাকের প্রতিধ্বনি ফিরে এল প্রতিবারেই।

পেনক্রফট বলে উঠল—'এ জল নদীর জল—সমুদ্রের নয়। নদীর ওপারে দ্বীপের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে। সমুদ্র হলে ডাক ভেসে যেত, ফিরে আসত না প্রতিধ্বনি হয়ে।'

অকাট্য যুক্তি। স্পিলেটও সায় দিলেন।

কিন্তু গাঢ় তমিস্রা ভেদ করে ওপার দেখা সম্ভব হল না। কাজেই আবার শুরু হল টহল দেওয়া। অনেক ঘোরার পর নদীর এপারের পাথুরে দ্বীপটা যে খুব একটা বড় নয়, তা বেশ বোঝা গেল। চারিদিকে টিলার মত পাহাড়। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ শ্বাপদ নামক আপদের শংকাও নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই বসল একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। তারপর মুখ খুলল পেনক্রফট।

বলল—'ক্যাপ্টেনকে বোধহয় আমরা আর ফিরে পাব না। সমুদ্র তাঁকে গ্রাস করেছে।'

স্পিলেট কিন্তু ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। ভেতরে নিরাশ হলেও বাইরে আশা দেখিয়ে বললেন—'খুঁজলে তাঁকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে পেনক্রফট। অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে কোথাও হয়ত পড়ে আছেন, তাই সাড়া দিতেও পারছেন না।'

আবার সব চুপচাপ। নেব কিন্তু পেনক্রফটের কথায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে। একধিকবার যমকে যিনি বিমুখ করছেন, সেই সাইরাস হার্ডিং সমুদ্রের জলে টুপ করে ডুবে মারা যাবেন? অসম্ভব! নিজের হাতে তাঁর হিমশীতল নিষ্প্রাণ দেহ স্পর্শ না করা পর্যন্ত নেব কারো কথা বিশ্বাস করবে না—কারো কথা না।

স্পিলেট, পেনক্রফট আর হার্বার্ট—এই তিনজনে মিলে প্ল্যান ভাঁজতে লাগল কি ভাবে রাত ভোর হলেই বেরোতে হবে ক্যাপ্টেনের সন্ধানে। নেব যোগ দিল না আলোচনাচক্রে। মুখ কালো করে বসে রইল একধারে।

ভোর হল। দ্বীপের যে অঞ্চলে নেবের হাঁকডাকের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল আগের রাতে, চার অভিযাত্রী সেখানে এসে দেখল, সত্যিই একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে ওপারে। মাঝে বইছে খরস্রোতা নদী।

সবাই চোখ কুঁচকে ওপার দেখতে যখন তন্ময়, ঠিক তখন ঝপাং করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠল অভিযাত্রীরা। দেখল, নেব জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবলীলাক্রমে সাঁতরে চলেছে ওপার অভিমুখে।

চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট—'নেব, যাচ্ছো কোথায় তুমি?'

'ওপারে। ক্যাপ্টেন হয়ত ওখানেই উঠেছেন সাঁতার কেটে,' জল কেটে এগোতে এগোতে জবাব দিল নেব।

স্পিলেটও জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন যদি না পেনক্রফট বাধা দিতেন—'করছেন কি মিঃ স্পিলেট? নেবের মত ভাল সাঁতারু আপনি নন। স্রোতের

টানে প্রাণটা খোয়াবেন না কি? ঘণ্টাখানেক সবুর করুন। নদীর জল ভাঁটার টানে কমবে। তখন আমরা তিনজনেই যাবো ওপারে।'

দুর্দান্ত নেব ততক্ষণে জল ছেড়ে উঠে পড়েছে ওদিকের দ্বীপে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এপারের এঁদের অভিনন্দন করে সে অদৃশ্য হল পাহাড়ের আড়ালে। নিগ্রো চাকরের এত প্রভুভক্তি? মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল তিন অভিযাত্রী।

তারপর শুরু হল এপারের দ্বীপ চষে ফেলা। ঘণ্টাকয়েক হন্যে হয়ে খুঁজেও পাওয়া গেল না ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে। শেষকালে খিদে তেষ্টায় বেদম হয়ে নদীর ধারেই এসে দাঁড়াল তিন জনে।

নদীর জল তখন কমতে শুরু করেছে। যে হারে জল কমছে, মনে হল বিকেল নাগাদ জল একেবারেই কমে যাবে। তখন খাবারের আর পানীয় জলের সন্ধান করা যাবে ওপারে। দানাপানি পেটে পড়েনি কাল থেকে। বেলুনে সব ছিল। কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে সব কিছুই ফেলতে হয়েছে সাগরের জলে।

৪

বিকেল নাগাদ জল এত কমে গেল যে হাঁটুজল রইল নদীর খাতে। ঠিক যেন একটা নিরীহ খাল। হেঁটেই পার হয়ে এল অভিযাত্রীরা। ওপারে উঠেই স্পিলেট অদৃশ্য হলেন নেব যে পথে গিয়েছে, সেই পথে। যাবার আগে বলে গেলেন—'আমি নেবের খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা খাবার যোগাড় করো। রাত্রে শোওয়া যায়, এমনি একটা জায়গাও খুঁজে রাখো।'

অদৃশ্য হলেন স্পিলেট। হার্বার্ট আর পেনক্রফট চারদিকের ক্ষুদে ক্ষুদে গ্র্যানাইট পাহাড়গুলোর পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়াল একটা বড় সাইজের পাহাড়ের সানুদেশে।

পেনক্রফট বলল—'খাবার খুঁজতে হলে আগে চারপাশটা দেখে নেওয়া দরকার। এসো, পাহাড়ে উঠে সে কাজটা সেরে নেওয়া যাক।'

পাহাড়ে উঠতে উঠতে কতকগুলো নির্ভীক পাখী দেখল দুজনে। নির্ভীক এই অর্থে যে মানুষ দেখে চমকায় না, উড়ে পালায় না; মানুষ কখনো দেখেনি বলেই প্রাণে ভয়ডর নেই কারো।

পেনক্রফট ভাবল, মন্দ কি। এই পাখী দিয়েই রাতের ডিনার সারা যাবে। কিন্তু পাখী মারবার সরঞ্জাম তো নেই। শুধু হাতেই পাখী ধরার চেষ্টা করল পেনক্রফট। কিন্তু পাখীগুলো আর যাই হোক, বোকা নয়। বিপদ বুঝেই ঝটপটিয়ে উড়ল আকাশে। পেনক্রফটের জ্যান্ত খাবার গেল ফসকে।

আরও কিছুদূর উঠল দুজনে। দূরে গাছের সারি দেখা গেল। হার্বার্ট তো আনন্দে আটখানা হল পাদপরাজ্য দেখে। উদ্ভিদ যেখানে, খাদ্য সেখানে। সুতরাং, অনাহারে মরতে হবে না এ দ্বীপে।

ভূখণ্ডটা দ্বীপ কি মহাদেশের অংশ, সে গবেষণা পরে করা যাবেখন, আপাততঃ চাই আহার, চাই জল, চাই বাসস্থান।

পাহাড় বেয়ে নামছে দুজনে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা মস্ত গুহা। পেনক্রফটের আনন্দ তখন দেখে কে। গুহাটার চিমনির মত গড়ন দেখে উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামকরণ হয়ে গেল বাসস্থানের। চিমনি-গুহায় রাত কাটবে ভাল।

সূর্য ডুবতে আর দেরী নেই দেখে ওরা গুহার ভেতর পা দিল থাকা যায় কিনা দেখার জন্যে। পেনক্রফট ভেবেছিল ঝটপট গুহা পর্যবেক্ষণ সাঙ্গ করে খাদ্যবস্তুর অন্বেষণে বেরোবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। গুহার মধ্যেই পাওয়া গেল খাবার।

খাবার মানে ঝিনুক। পাঁক আর জলের মধ্যে পড়েছিল কতকগুলো সাগর-ঝিনুক। পেনক্রফট নাবিক মানুষ। দেখেই বুঝল, সাগরের জল বাড়লে চিমনি গুহাতেও তার অবাধ প্রবেশ ঘটে।

হর্বার্ট তো মহাখুশী ঝিনুক দেখে। নেই মামার চাইতে কাণা মামা ভাল। খিদেয় যখন পেট জ্বলছে, তখন এই ঝিনুকগুলোই আগুনে ঝলসে নিলে অমৃত-সমান খাদ্য হবে।

এবার চাই জল। খাবার জলের সন্ধানে ওরা নীচে নামছে, এমন সময়ে পেনক্রফটের তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ল আরেক প্রস্থ খাদ্য।

পাখীর ডিম। পাহাড়ের খাঁজকাটা গায়ে জমে রয়েছে পাহাড়ি পায়রার বিস্তর ডিম। হার্বার্ট তো এই মহাভোজের আয়োজন দেখে তুরুক নাচ নেচে বললে—'আর কি, কব্জি ডুবিয়ে খ্যাঁটটা এবার মন্দ হবে না দেখছি।'

তা না হয় হল, কিন্তু জল কোথায়? জল না পেলে যে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরতে হবে অভিযাত্রীদের। কিন্তু দুঃসাহসী মানুষগুলির ওপরেও এবারও বিধাতা সদয় হলেন। নীচে নামতে নামতে ওরা দেখল নেবকে নিয়ে স্পিলেট আসছেন।

৩

এদের দেখেই হাঁক দিলেন স্পিলেট—'নেবকে তো পাওয়া গেল, ক্যাপ্টেন কোথায়?'

না, ক্যাপ্টেনকে তন্ন তন্ন করেও খুঁজেও কোথাও পাওয়া যায় নি। দুজনের কেউই পায়নি। স্পিলেট যখন নেবকে দেখেছেন, তখন সে ক্যাপ্টেনের নাম

ধরে কেঁদে কেঁদে ডাকছে আর ছুটছে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের পায়ে চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি।

হ্যাঁ, জল পাওয়া গেছে। স্পিলেট খাবার জোগাড় করতে পারেন নি বটে, তবে একটা মিষ্টি জলের সরোবর দেখেছেন। পেট পুরে সে জল খেয়েছেন। নেবকে খাইয়েছেন। দুটো রুমাল ভিজিয়ে এনেছেন পেনক্রফট আর হার্বার্টের জন্যে। নিংড়ে খেয়ে নিতে হবে।

সোল্লাসে বললে হার্বার্ট—'খাবারের কথা ভাববেন না। ভূরিভোজের ব্যবস্থা করে রেখেছি আমরা।'

শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে ডানপিটে মানুষগুলি গুহায় এলেন। পেট ভরে খাওয়া যাবে, এই আনন্দেই মশগুল সবাই।

কেবল চিন্তিত দেখা গেল পেনক্রফটকে। তামায় মোড়া তার নিজের দেশলাইয়ের বাক্সটি সে হারিয়েছে। কাঠকুটো জড়ো করে, কাঠের ভেলা বানিয়ে হার্বার্টকে নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে অনেক ঘাসপাতা সংগ্রহ করার পর পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই না পেয়ে সে খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল, বাঁচিয়েছেন স্পিলেট। পকেটে হাত দিয়ে তিনি টেনে বার করেছেন একটি মাত্র দেশলাই কাঠি। একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে বেচারী। বিজনদ্বীপে আগুন জ্বালানোর আর কোনো সরঞ্জাম যখন নেই, তখন সবেধন নীলমণি এই কাঠিটা দিয়েই একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে হবে। দিবারাত্র অনির্বাণ রাখতে হবে সেই আগুনকে অলিম্পিকের পবিত্র আগুনের মত। এ-আগুন একবার নিভলেই সর্বনাশ। মহাভোজ শিকেয় উঠবে। সব কিছুই কাঁচা খাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

স্পিলেটের নোট বই থেকে কাগজ ছিঁড়ে শংকুর মত টুপী বানিয়ে নিল পেনক্রফট। জোর হাওয়ায় এইভাবেই দেশলাই ধরায় ধূমপায়ীরা। তারপর একটা শুকনো নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দেশলাই ঘসল—জ্বলল না। ভয়ে হার্বার্টকে ডাক দিল সে। হার্বার্ট নিজেও নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। তবে তারই চেষ্টায় ঝলসে উঠল নালচে শিখা।

শুকনো ঘাসপাতায় অতি সন্তর্পনে অগ্নিসংযোগ করল পেনক্রফট। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতেই কাঠ ঠেসে ধরে তৈরী হল অগ্নিকুণ্ড।

রাত নামল। সেই সঙ্গে কনকনে শীত। আগুনের চুল্লী ঘিরে বসে নানা আলোচনায় তন্ময় হল অভিযাত্রীরা—নেব বাদে। তার বিষণ্ণ বদনে শুধু এক চিন্তা। সারাদিন আঁতি-পাতি করে খুঁজেও মনিব দর্শন ঘটেনি। আদৌ তাঁকে পাওয়া যাবে তো?

মেঘ হতে মর্ত্যে পতনের সময়ে অভিযাত্রীরা জিনিসপত্র যা কিছু সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন, এবার তার ফর্দ তৈরী হল। পরণের জামাকাপড ছাড়া অবশ্য কিছুই বাঁচানো যায়নি। গিডিয়ন স্পিলিটের নোট বুক আর ঘড়িটা ছাড়া সব কিছুই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বেলুন থেকে বেলুন হাল্কা রাখার জন্যে। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি এমন কি পকেট ছুরী পর্যন্ত—সমস্ত ছুঁড়ে ফেলতে হয়েছিল প্রাণের দায়ে। ডানিয়েল ডিফো বা হিবসয়ের কাল্পনিক হিরোরা, এমন কি জাহাজ ডুবির ফলে ভাগ্যহত সেলকার্ক বা রেনালপ এ ধরনের দুরবস্থায় পড়েননি। হয় তাঁরা জাহাজ থেকে শস্য, গরু, ছাগল, গুলি বারুদ, যন্ত্রপাতি জুটিয়ে নিয়েছিলেন, নয়তো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জলে ভেসে তীরে এসে ঠেকেছিল। কিন্তু এঁরা কিছুই পেলেন না। বাসনকোসন থেকে আরম্ভ করে গাঁইতি শাবল পর্যন্ত—কিস্সু নেই। এক কথায় শূন্য থেকে সব কিছুই বানিয়ে নিতে হবে অভিযাত্রীদের।

চিমনীতে না হয় মাথা গোঁজা যাবে। আগুন যখন জ্বলছে, তখন তাকে জিইয়ে রাখাও যাবে। পাহাড়ের খাঁজে শামুক আর ডিমের অভাব নেই। দরকার মত পায়রা বধও করা যাবে। কাছের জঙ্গলে ফলমূলও মিলতে পারে। খাবার জলেরও অভাব নেই। তারপর?

ঠিক হল অভিযানে বেরুতে হবে। সমুদ্রের তীর বরাবর অথবা পাহাড়-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে দ্বীপ দর্শনে যেতে হবে।

শামুক আর পায়রা ডিম দিয়ে প্রাতরাশ খাওয়া হল সেদিন। পাহাড়ের খাঁজ থেকে হার্বার্ট খানিকটা নুন জোগাড় করে আনায় খাওয়া মন্দ হল না।

অভিযানে বেরোনোর আগে আগুনকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। অঙ্গার বলে কিছু যখন নেই, হার্বার্ট বললে কাঠের গুঁড়ির বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করা হোক।

'কী?' জানতে চাইল পেনক্রফট।

'পোড়া কাপড়', জবাব দিল হার্বার্ট।

প্রস্তাবটা মনে ধরল সকলের। তৎক্ষণাৎ পেনক্রফটের চেক কাটা বড় রুমাল আধখানা পুড়িয়ে দাহ্য বস্তু বানিয়ে নেওয়া হল এবং চিমনীর মধ্যে একটা কোটরে সংগোপনে লুকিয়ে রাখা হল আধপোড়া রুমালটা—যাতে জল বৃষ্টি হাওয়ার দাপটে জিনিসটা নষ্ট হয়ে না যায়।

এরপর শুরু হল অভিযান। হার্বার্টকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে প্রথমেই গাছের ডাল ভেঙে বড়সড় গদা বানিয়ে নিল পেনক্রফট। ছুরী নেই, তাই পাথরে গদা ঘসে মসৃণ করল হার্বার্ট।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কিন্তু মনুষ্য বসতির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। চতুষ্পদ প্রাণীদের পদচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু দ্বিপদ জীবের চিহ্নমাত্র নেই। গাছের গায়ে কুড়ুলের কোপ পড়েনি, আগুন জ্বলার ছাইও পড়ে নেই। প্রশান্ত মহাসাগরের বিজনদ্বীপে মানুষ থাকলেও তো বিপদ।

নীরবে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলল দুজনে। এক ঘণ্টায় এক মাইল পথও পাড়ি দেওয়া গেল না। খাওয়ার মত ফলমূলও চোখে পড়ল না। ডাব বা তাল গাছ পেলে মন্দ হত না। তাও পাওয়া গেল না।

এক জায়গায় অনেকগুলো বুনো পাখী দেখা গেল। আকারে ছোট হলেও পালকের বাহার দেখবার মত। লম্বা ল্যাজ ঝুলিয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে ডালে ডালে। ঘাস জমি থেকে একটা পালক কুড়িয়ে নিয়ে হার্বার্ট বলল—'এ যে দেখছি করোকাস!'

'বন মোরগ বললেই তো হয়', বলল পেনক্রফট। 'খেতে ভাল তো?'

'খুবই সুস্বাদু এদের মাংস। তাছাড়া, এদের কাছে গিয়ে পিটিয়ে মারাও খুব সোজা।'

গুঁড়ি মেরে একটা নীচু ডালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। পোকা খাওয়ার জন্যে বন মোরগগুলো জমায়েৎ হয়েছে সে ডালে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল দুজনে! কাস্তে দিয়ে ধান কাটার মত ডালের ওপর দিয়ে রগড়ে টেনে আনল গদা—নিরীহ পাখীগুলো উড়ে পালানোর চেষ্টাও করল না। মারা পড়ল দলে দলে।

ভরতপাখীর মালা গলায় ঝুলিয়ে পাখী শিকারীরা যেভাবে বাড়ী ফেরে, ওরা দুজন বনমোরগের মালা ঝোলালো সারা গায়ে।

ফের শুরু হল অভিযান। কিন্তু শিকার পাওয়া গেল না। টপ থাকলে লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ঠিক তাড়া করত শিকারের পেছনে।

বেলা তিনটে নাগাদ নতুন ধরনের অনেকগুলো পাখী দেখা গেল বনের মধ্যে। আচম্বিতে বনভূমি কম্পিত হল তূর্যনিনাদের মত তীক্ষ্ণ শব্দে। পাখী ডাকছে।

পেনক্রফটের বড় লোভ হল অন্ততঃ একটা পাখী ও পাকড়াও করে। কিন্তু বনমোরগের মত এরা বোকা নয়। কাছে যাওয়া তো দূরের কথা—দূর থেকেই অভিযাত্রীদের দেখে চম্পট দিল বাসা ছেড়ে।

পেনক্রফট তখন অভিনব বুদ্ধি বাতলালো। লম্বা লতা জুড়ে দশ পনেরো ফুট লম্বা করে এক প্রান্তে বাবলার কাঁটা বেঁকিয়ে বাঁধল। মাটি থেকে লাল কেঁচো নিয়ে গেঁথে দিল কাঁটায়। জঙ্গলের গোটা ছয় বাসার মধ্যে রেখে এল কেঁচো গাঁথা 'বঁড়শি'। নিজেরা লুকিয়ে রইল ঝোপের আড়ালে।

পাখীগুলো উড়ে এসে ফের বাসায় বসতেই লতাগুলো ধরে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিল পেনক্রফট। তৎক্ষণাৎ কিলবিল করে উঠল কেঁচোগুলো। দেখেই কপ কপ করে গিলতে লাগল পাখীর দল।

হ্যাঁচকা টান মারল পেনক্রফট। দেখা গেল বঁড়শিতে মাছ গাঁথার মতই পাখীদের গলায় কাঁটা আটকে গিয়েছে।

দেখে, মহা ফুর্তিতে হাততালি দিয়ে উঠল হার্বার্ট। ডাঙায় বঁড়শি ফেলে মাছের বদলে পাখী শিকার! অভিনব ব্যাপার তো!

পেনক্রফট অবশ্য স্বীকার করল, কায়দাটা নতুন কিছু নয়। তার নিজের আবিষ্কারও নয়!

খাবার তৈরী হল অবশেষে। গরম গরম ঝিনুক পোড়া আর ডিমের অমলেট খেয়ে মস্ত ঢেকুর তুলে অগ্নিকুণ্ডের ধার ঘেঁসে শুয়ে পড়ল সকলে। সারাদিনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর নিদারুণ উত্তেজনার পর শুতে না শুতেই নিদ্রাদেবী এসে তাঁর শান্তির মায়াকাঠি বুলিয়ে গেলেন সবার চোখের পাতায়। খেল না কেবল নেব। মনিবকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খাওয়ার রুচি নেই।

[৭]

প্রথমটা সবাই ভেবেছিলেন, হয়ত একা-একা কোথাও গেছে নেব, ফিরে আসবে এখুনি। কিন্তু সারাদিন হা-পিত্যেশ করে থাকার পরেও যখন তার মজবুত বপুর ছায়াটুকুও দেখা গেল না, তখন খোঁজ-খোঁজ শুরু হল গুহার আশেপাশে। পণ্ডশ্রমই সার হল। পাত্তা পাওয়া গেল না নেবের।

তখন সবাই বুঝল প্রভুভক্ত নেব প্রভুর খোঁজেই বেরিয়েছে ফের। কিন্তু গেল কোথায় সে? বলে-কয়ে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত?

ঝড় উঠল বিকেল নাগাদ। তুমুল ঝড়। ফলে, আটক থাকতে হল গুহার মধ্যে ঝড়ের উৎপাতে। পাগলা হাওয়ার দামালি একটু কমেছিল। কিন্তু আবার তা বাড়তে বাড়তে এমন তুঙ্গে পৌঁছোলো যে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরোনোর সাহস হল না কারো। একে শীতের ঠাণ্ডা, তার ওপর তুফান।

লক্ষ করতালির সাথে অদ্ভুত অট্টহাসি এক হলে বুঝি কল্পনাতীত সেই হু-হুংকারের সঙ্গে তুলনা চলে। ভুক্তভোগী ছাড়া ঝড়ের সেই ভয়াল-ভয়ংকর রূপ কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গুটিসুটি মেরে অভিযাত্রীরা বসে রইলেন আগুনের ধার ঘেঁসে। শুনতে লাগলেন পাহাড়ের গা বেয়ে আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ছে গড়গড় দমাস্ দুম শব্দে। প্রাণ কি এতই সস্তা যে এই প্রলয়ের মধ্যে বাইরে বেরোতে হবে? আকাশে কালো মেঘ, দুই ভূখণ্ডের মাঝে প্রবহমান পাহাড়ি নদীটি ফুলে ফুঁসে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করেছে। এই অবস্থাতে রাত্রির আবির্ভাবের পর যে আঁধার দেখা গেল, তার বর্ণনা কলমের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কঠোর পরিশ্রমী অভিযাত্রীরা খামোকা সময় নষ্ট না করে সারাদিন ধরে গুহার ভেতরটা যতদূর সম্ভব বাসোপযোগী করার চেষ্টা করলেন।

ঝড়ের গর্জন, সমুদ্রের আস্ফালন, বনস্পতির আর্তনাদ আর পাথর-টুকরোর গড়গড়ানি শুনতে শুনতে এক সময়ে নিদ্রামগ্ন হলেন বেপরোয়া অভিযাত্রীরা।

আওয়াজটা শোনা গেল গভীর রাত্রে।

দুর্যোগের দুন্দুভি ছাপিয়ে অদ্ভুত কিছু একটা আওয়াজ ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল স্পিলেটের। ভদ্রলোকে সাত তাড়াতাড়ি ডেকে তুললেন পেনক্রফটকে।

'পেনক্রফট, কিছু বুঝতে পাচ্ছো?'

কাঁচা ঘুম ভাঙায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে রইল পেনক্রফট। কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঠোঁট উলটে বললে—'কি যে বললেন, ও তো ঝড়ের আওয়াজ।'

'পেনক্রফট, ভালো করে শোনো। টপের গলাবাজি না?'

টপের নাম শুনেই ঘুম ছুটে গেল পেনক্রফট-এর। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ঝড়-বাদলার হু-হুংকারেরও মধ্যে কিছু শোনা যায় কিনা। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে বললে—'আরে, তাই তো। এ যে টপের ঘেউ ঘেউ ডাক।'

হার্বার্টও উঠে বসল ওদের কথা শুনে। সায় দিয়ে বললে—'টপই তো।'

এবার স্পষ্ট শোনা গেল কুকুরের চীৎকার। অনেক দূরে ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে চলেছে সাইরাস হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর।

জ্যামুক্ত তীরের মত গুহামুখে ছুটে গেলেন অভিযাত্রীরা। আসছেন, আসছেন, টপ যখন আসছে, তার প্রভুও সঙ্গে আসছেন। অপরিসীম উত্তেজনায় হেঁকে উঠল হার্বার্ট—'টপ! এদিকে এসো, এদিকে।' সেই সঙ্গে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের মাঝে আলোক-সংকেতের মত। সেই সঙ্গে শিস দিয়ে উঠল মুখে আঙুল পুরে।

আশ্চর্য ! যে-ডাক এতক্ষণ এলোমেলোভাবে শোনা যাচ্ছিল, এর পরেই তা যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল গুহা অভিমুখে। যেন এ সংকেতটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল সে।

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ।'

'টপ-টপ-টপ !'

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ !'

'টপ, এদিকে, এই তো আমরা।'

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ !'

'টপ-টপ-টপ।'

পরমুহূর্তেই যেন অন্ধকারের কোল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল টপ। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর অনুরক্ত সারমেয় টপ।

কিন্তু ক্যাপ্টেন কোথায় ?

'ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ,' টপ যেন ওদের টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। অস্থির তার আচরণ, বিরাম নেই ল্যাজ নাড়ার। একবার ছুটছে গুহার বাইরে, আবার ছুটে আসছে ভেতরে।

'ক্যাপ্টেন কোথায় টপ ?'

'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।'

এই সময়ে একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে এল সবার। ঝড়বাদলা মাথায় করে এসেছে টপ, অথচ সে দিব্বি শুকনো খটখটে। কাদামাটি পর্যন্ত গায়ে লাগেনি ! এতটা পথ এসেছে, অথচ সে ক্লান্ত নয়, বেদম নয় !

আশ্চর্য !

আশ্চর্য দ্বীপের অগুন্তি রহস্যের এই হল শুরু। কিন্তু তা নিয়ে তখন মাথা ঘামানোর সময় কারো নেই। স্পিলেট বললেন—'টপ বোধহয় কিছু বলতে চাইছে আমাদের।'

'ও কোথাও নিয়ে যেতে চায় আমাদের। দেখছেন না কিরকম ছটফট করছে ?' বলল হার্বার্ট।

স্পিলেট বললেন—'কুকুর যখন মিলেছে, তার কর্তাকে পাওয়া যাবে এবার।'

পেনক্রফট সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল। অগ্নিকুণ্ডে কাঠ চাপিয়ে সঙ্গে কিছু খাবারদাবার নিয়ে তিন মূর্তি রওনা হল টপের পিছু পিছু। অন্ধকারে টপ-কে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার ডাক শোনা যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা পরস্পরের হাত ধরে সেই ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন অতিকষ্টে। ঝড় যেন পেছন থেকে ওদের ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কতক্ষণ যে এইভাবে অজানার অভিযান চলেছিল, সে হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলেন অভিযাত্রীরা। অনেকক্ষণ পরে অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করল ঊষার আভায়। দেখা গেল টপ একটা পাহাড়ে উঠছে। তখন ভোর ছটা। কনকনে ঠাণ্ডায় ওঁদের অবস্থা খুবই কাহিল। অনেক চড়াই উৎরাই কাঁকর বালি পাহাড়ি পথ পেরিয়ে এসেছে টপ। টপ বলেই পেরেছে। কেননা এ-জাতীয় কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র। প্রায় মাইল ছয়েক পথের হদিশ শুধু গন্ধ শুঁকে বার করা সোজা কথা নয়।

একটা গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়াল টপ। পরক্ষণেই খুব জোরে ঘেউ ঘেউ করে তীরবেগে ঢুকে পড়ল গহ্বরের মধ্যে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ভেতরে পা দিলেন তিন অভিযাত্রী। দেখলেন একটা ঘাসের শয্যাপাশে হেঁটে হয়ে বসে নেভ।

শয্যায় শায়িত একটা নিস্পন্দ দেহ।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর দেহ!

৮

গহ্বরে দুপদাপ করে ঢুকেও কিন্তু নেবের তন্ময়তা ভাঙাতে পারলেন না তিন অভিযাত্রী। প্রস্তর মূর্তির মত অনড় দেহে সে চেয়ে রইল লম্বমান দেহটির দিকে। পেনক্রফট জানতে চাইল, দেহে প্রাণ আছে কিনা। নিরুত্তর রইল নেব।

তবে কি দেহে প্রাণ নেই? নেই বলেই অমন অভিভূত হয়ে গিয়েছে নেব? শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকায় টের পায়নি তিন সঙ্গী এসে তাকে ডাকছেন, তার সঙ্গে কথা কইছেন?

স্পিলেট অনুমান করেন না। তিনি নতজানু হয়ে বসলেন আড়ষ্ট দেহটির পাশে। নাড়ি দেখলেন, হৃদস্পন্দন শুনলেন। তারপর ছোট্ট করে বললেন—'প্রাণপাখী এখনো খাঁচায় বন্দী।'

হুমড়ি খেয়ে পড়ল পেনক্রফট। কান পেতে শুনল হৃদপিণ্ডের অতি ক্ষীণ ধড়াশ ধড়াশ শব্দ। বেঁচে আছেন! সাইরাস হার্ডিং বেঁচে আছেন!

দৌড়ে গিয়ে কোত্থেকে রুমাল ভিজিয়ে আনল হার্বার্ট। ভিজে রুমাল দিয়ে ক্যাপ্টেনের শুকনো ঠোঁট মুছিয়ে দিলেন স্পিলেট। ফল হল চমকপ্রদ! নিঃশ্বাস ফেললেন হার্ডিং।

'ভয় নেই, নেব,' বললেন স্পিলেট। 'উনি বেঁচে যাবেন।'

'বেঁচে যাবেন?' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল নেব। 'বলুন কি করতে হবে। কি করলে ওকে চাঙা করা যায়, জ্ঞান ফেরানো যায় বলুন।'

'ধড়ফড় করো না নেব।' বলে পেনক্রফটকে নিয়ে হাত দিয়ে ঘসে ঘসে অজ্ঞান হার্ডিংয়ের হাতে পায়ে তাত দিতে লাগলেন স্পিলেট—

'নেব, কর্তাকে পেলে কি করে?' শুধোলো পেনক্রফট।

নেবের মুষড়ে পড়া ভাবটা তখন একেবারে নেই। প্রাণে বেঁচে আছেন মনিব, আর কি চাই। খুশীখুশী গলায় সে বললে—'আপনারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি তো চিমনী ছেড়ে পালিয়ে এলাম। এলোমোলোভাবে ঘুরছি, ঝোপঝাড়, পাথুরে খোঁদল-খাঁজ দেখছি আর ওঁর নাম ধরে ডাকছি। এমন সময় এইখানে দেখি ঘুরঘুর করছে টপ। আমাকে দেখেই সে কি আনন্দ টপের। চেঁচাতে চেঁচাতে ছিটকে এল আমার দিকে। আমার ট্রাউজার্স কামড়ে ধরে নিয়ে এল এই গুহায়। ক্যাপ্টেনকে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে মন ভেঙে গেল আমার। আমি ভেবেছিলাম আমাদের মায়া কাটিয়েছেন উনি। তাই মাথার কাছে একনাগাড়ে বসে ছিলাম সেই থেকে। টপকে শুধু পাঠিয়েছিলাম আপনাদের ডেকে আনার জন্যে। ওর মত উঁচু জাতের ট্রেনিং পাওয়া কুকুরের পক্ষে কাজটা কিছুই নয়। দেখলেন তো, ঠিক খুঁজে পেতে এনেছে আপনাদের।'

এই সময়ে সেই রহস্যটা আবার উঁকি দিল স্পিলিটের মনে। এতটা কাদাপথ পেরিয়ে গেছে টপ, ঝড়ো হাওয়া আর ছিটে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খুঁজে খুঁজে বার করেছে তিন অভিযাত্রীদের। কিন্তু কি আশ্চর্য! গায়ে তো তার জল লাগে নি, কাদাও লাগেনি! এতটুকু ক্লান্তও হয়নি। ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

কুসংস্কারাচ্ছন্ন নেব পাছে ভয় পায়, তাই কথাটা চেপে গেলেন স্পিলেট। ঠায় সেঁক দিয়ে চললেন ক্যাপ্টেনকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে কাজ হয়েছে বলে মনে হল। ক্যাপ্টেনের পাণ্ডুর মুখে প্রাণের লালচে আভা দেখা দিল। একটা হাত অতিকষ্টে ওপরে তোলার চেষ্টা করলেন—পারলেন না।

ঘসাঘসি চলল আরো কিছুক্ষণ। ঠোঁটে জল সিঞ্চনের পর এবং জলের সঙ্গে মুরগীর যুস মিশিয়ে গলায় ঢেলে দেওয়ার পর চোখ মেললেন হার্ডিং!

বিড়বিড় করে প্রথমেই শুধোলেন—'দ্বীপ না মহাদেশ

'সেটা পরে ভাবা যাবে'খন।' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট। 'আগে ভাল হয়ে উঠুন।'

চোখ মুদে ঘুমিয়ে পড়লেন সাইরাস হার্ডিং।

পেনক্রফট বিড়বিড় করে বললে—'কি রকম লোক ক্যাপ্টেন? মরতে মরতে বেঁচে উঠে জানতে চাইছেন দ্বীপ না মহাদেশ?'

ক্যাপ্টেনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নেব, হার্বার্ট আর পেনক্রফট পাহাড়ে

উঠল। ডাল ভেঙে ঘাস-পাতা বিছিয়ে একটা স্ট্রেচারের মত বানিয়ে নিল ক্যাপ্টেনকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

দুপুর নাগাদ হেলান দিয়ে বসলেন হার্ডিং। পাখীর মাংস খেলেন। সবাই জানতে চাইলেন বেলুন থেকে জলে ঠিকরে পড়ার পর কি-কি ঘটেছিল এবং কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি এই গুহায় এসে পৌঁছেছেন।

হার্ডিং বললেন—'ঢেউয়ের ধাক্কায় দড়ি থেকে আমার মুঠো ফস্কে যেতেই ঠিকরে পড়লাম জলে। প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলাম আমি। সেই সময়ে মনে হল, আমি একলা সাঁতার কাটছি না—আমার সামনে আরও কেউ জল কেটে এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই টপের হাঁকডাক শুনলাম। ওর অসামান্য প্রভুভক্তির আরও একটা প্রমাণ পেলাম। বুঝলাম, আমার বিপদ দেখে ও স্থির থাকতে পারেনি—নিজেও বিপদে ঝাঁপ দিয়েছে।'

একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন—'কাঁহাতক আর বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিছুক্ষণ পরেই হাতে-পায়ে খিল ধরল, বেশ বুঝলাম আমি জ্ঞান হারাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। সেই সংকট সময়ে টপ এসে আমার জামাপ্যাণ্ট কামড়ে ধরে দিব্যি টেনে নিয়ে চলল জলের ওপর দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ের তলায় মাটি পেলাম। টলতে টলতে ডাঙায় উঠলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

পেনক্রফট চোখ কপালে তুলে বললে—'তাজ্জব ব্যাপার তো! ডাঙায় উঠেই যদি আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকেন তো জল থেকে মাইল খানেক দূরের এই গুহায় এলেন কি করে? টপ নিশ্চয় আপনার অজ্ঞান দেহটাকে কামড়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসেনি।'

হার্ডিং নিজেও এবার বিস্মিত হলেন—'সেকি কথা। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরাই আমাকে তীর থেকে এখানে বয়ে নিয়ে এসেছ, জ্ঞান ফিরিয়েছ।'

'আমরা কেন, নেবও আনে নি। নেবও এসে দেখেছে আপনি গুহায় শুয়ে আছেন মড়ার মত।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি নিজে হেঁটে আসে নি? তবে এই উপকারটি করল কে? দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই তো?'

'এখনো পর্যন্ত কাউকে দেখিনি', বললেন স্পিলেট। 'কেউ আছে বলেও মনে হয় না। থাকলে মনুষ্য দেখে চমকে ওঠার অভ্যেস গড়ে উঠত পাখীদের মধ্যে।'

নিঃসীম উত্তেজনায় যেন নিমেষের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

বললেন—'পেনক্রফট, আমার জুতো নিয়ে পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো তো।'

জুতো নিয়ে পেনক্রফট এল গুহার বাইরে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! পায়ের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল ইঞ্জিনীয়ারের জুতোর ছাপ। তার মানে, সাইরাস হার্ডিং নিজেই জল থেকে হেঁটে উঠে এসেছেন!

বললেন—'ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলে বেড়ায় যারা, আমি তাহলে তাদের মতই অজ্ঞান অবস্থায় হেঁটেছি—টপ আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। টপ আয় বাবা, কাছে আয়!'

ঘেউ ঘেউ করে মনিবের কাছে দৌড়ে এল টপ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? কে জানে!

জটিল হতে লাগল কুহক দ্বীপের রহস্যজাল।

স্ট্রেচারটা নিয়ে আসা হল ক্যাপ্টেনের পাশে। আড়াআড়িভাবে ডাল বিছিয়ে তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হল পাতা আর লম্বা ঘাস। ঘাস পাতার গদীতে শুইয়ে দেওয়া হল ক্যাপ্টেনকে। পেনক্রফট আর নেব স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে এগুলো উপকূলের দিকে।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চিমনী পৌঁছোলেন অভিযাত্রীরা।

সাইরাস অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। স্ট্রেচার বালির ওপর নামিয়ে রাখার পরেও ঘুম ভাঙল না তাঁর।

ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখে অবাক হয়ে গেল পেনক্রফট। পুরো তল্লাটটার চেহারা পালটে দিয়েছে দামাল তুফান। সমুদ্রতীরে গড়াগড়ি যাচ্ছে বড়বড় পাথরের চাঁই, সামুদ্রিক গুল্মর স্তূপ জমে গেছে তার ওপর। ঢেউয়ের ধাক্কায় গুহার মুখ থেকে মাটি সরে গেছে। দেখেই আঁৎকে উঠল পেনক্রফট। তীরবেগে গলিপথে ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত। সঙ্গীদের পানে চেয়ে রইল স্তম্ভিতের মত।

আগুন নিভে গেছে! জলে-কাদায় একাকার হয়ে গিয়েছে জ্বলন্ত-অঙ্গার। আধপোড়া ন্যাকড়াটাও টেনে নিয়ে গিয়েছে সমুদ্রের ঢেউ। দুরন্ত সমুদ্র চিমনীর ভেতরে ঢুকে তছনছ করে গেছে সব কিছু!

৯

আগুন নিভে গেছে, নাবিক পেনক্রফট হতবুদ্ধি হলেও আর কেউও নিয়ে মাথা ঘামালেন না। মনিবকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে নেব তো আনন্দে আটখানা হয়ে রইল। পেনক্রফটের কোনো কথায় কান দিল না।

একমাত্র হার্বার্ট একটু ঘাবড়ে গেল পেনক্রফটের কথায়। রিপোর্টার মশায় সংক্ষেপে বললেন—'পেনক্রফট, আগুন নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার।'

'আরে মশায়, আগুন নিভে গেলে করবেনটা কি?'

'ফুঃ!'

আগুন জ্বালাবেন কি করে?'

'যত্তো সব বাজে কথা!'

'মিস্টার স্পিলেট—'

'সাইরাস তো রয়েছেন? উনি যখন বেঁচে আছেন, আগুন জ্বালানোর ভারও তাঁর।'

'বলি, আগুনটা জ্বলবে কোত্থেকে?'

'শূন্য থেকে।'

কি আর বলে পেনক্রফট! সঙ্গীদের মত তার মনেও অগাধ আস্থা রয়েছে সাইরাস হার্ডিয়ের অদ্ভুত ক্ষমতার ওপর। সাইরাস হার্ডিং নিজেই যেন একটা ছোট্ট জগৎ, যাবতীয় বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য সংমিশ্রণ; মানুষ-জাতটা আজ পর্যন্ত যা কিছু শিখেছে, জেনেছে, আয়ত্ত করেছে—একা হার্ডিং তা জানেন। সাইরাস হার্ডিং পাশে থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। কেউ যদি তখন বলত অগ্ন্যুৎপাতে দ্বীপটা তলিয়ে যেতে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে জবাব দিতেন সঙ্গীরা—

'তাতে কী! সাইরাস তো রয়েছেন!'

পথের ঝাঁকুনিতে সাইরাস কিন্তু ফের জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন। সুতরাং তাঁকে গুহার মধ্যে নিয়ে একটা শুকনো জায়গায় সামুদ্রিক গুল্মর পুরু কুশন বিছিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমে আচ্ছন্ন রইলেন ক্যাপ্টেন। বলকারক খাবারের চেয়ে এই ঘুমই তাঁর পক্ষে কল্যাণকর হবে জেনে সঙ্গীরা তাঁকে আর বিরক্ত করলেন না।

রাত নামল। ঠাণ্ডা বাড়ল। কোট আর ওয়েস্ট কোট দিয়ে ঢেকে রাখা হল ক্যাপ্টেনকে। চিমনীর পার্টিসনগুলো জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়ায় হু-হু করে কনকনে হাওয়া ঢুকছিল গুহার মধ্যে।

পেনক্রফট খুবই ভাবনায় পড়ল আগুন নিয়ে। শুকনো শ্যাওলা জড়ো করে দুটো নুড়ি ঠুকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করল নেব। ফুলকি বেরোলো বটে, আগুন ধরল না।

জংলী বর্বররা নাকি কাঠে কাঠ ঘসে আগুন জ্বালায়। পেনক্রফট এবার সেই চেষ্টাই শুরু করল প্রাণপণে। নেব আর সে দুজনে মিলে দুটো কাঠ নিয়ে ঘসতে ঘসতে ঘেমে নেয়ে গেল, আগুন কিন্তু জ্বলল না। দুজনের গা তেতে গরম হয়ে গেল, কিন্তু কাঠ দুটো তাদের চেয়েও ঠাণ্ডা রইল।

এক ঘণ্টা চেষ্টার পর গলদঘর্ম হয়ে কাঠ ছুঁড়ে ফেলে দিল পেনক্রফট।

বেচারী পেনক্রফট! বর্বররা কাঠে কাঠ ঘসে আগুন জ্বালে ঠিকই, কিন্তু তারা জানে কোন কাঠে কোন কাঠ ঘসতে হয়। সব কাঠ ঘসলেই যে আগুন ধরবে, তা তো নয়।

নিক্ষিপ্ত কাঠটা তুলে নিয়ে হার্বার্ট ঘসতে শুরু করায় বড় বড় দাঁত বার করে হেসে ফেলল পেনক্রফট।

বলল—'ঘসো, বাবা, ঘসো। যতো পারো ঘসো!'

হার্বার্টও হাসল। বলল—'আমি তো আগুন জ্বালানোর জন্যে ঘসছি না, শীত কমানোর জন্যে গা গরম করছি।'

রাত আরো গভীর হল। গিডিয়ন স্পিলেট সেই নিয়ে বিশবার বললেন, তুচ্ছ এই সমস্যার সমাধান ক্যাপ্টেনই করবেন। এই বলে বালির ওপর লম্বমান হলেন তিনি। দেখাদেখি বাকী তিন জনেও চিৎপটাং হলেন বালির শয্যায়। টপ গিয়ে শুল মনিবের পদতলে।

পরের দিন, আটাশে মার্চ, সকাল আটটায় চোখ মেললেন ইঞ্জিনীয়ার। দেখলেন, সঙ্গীরা ঘিরে বসে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

আগের দিনের মতই তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

'দ্বীপ, না মহাদেশ?'

বোঝা গেল, সব চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে এই একটি চিন্তা।

পেনক্রফট বললে—'এখনো জানি না, ক্যাপ্টেন।'

'এখনো জানোনি?'

'আপনি সেরে উঠলেই জানব'খন।

'তাহলে চেষ্টা করা যাক', বলে সামান্য চেষ্টায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন

ক্যাপ্টেন। 'ও হে, বড্ড কাহিল লাগছে যে! কিছু খাবার-দাবার দিতে পারো? আগুন নিশ্চয় আছে?'

'পেনক্রফট তখন বলল, একটি মাত্র দেশলাই কাঠি দিয়ে জ্বালানো আগুন কি ভাবে নিভে গিয়েছে।'

সাইরাস হার্ডিং সব শুনে বললেন—'তাতে কী? দেশলাই বানিয়ে নেব'খন।'

'কেমিক্যাল দেশলাই?'

'হ্যা কেমিক্যাল দেশলাই!'

'কেমন, বলেছিলাম না?' নাবিকের পিঠ চাপড়ে বললেন রিপোর্টার।

হার্বার্ট কয়েক মুঠো শামুকের শাঁস আর সামুদ্রিক গুল্ম খেতে দিল ক্যাপ্টেনকে। জল দিয়ে জঘন্য খাবারটাকে পেটে চালান করলেন সাইরাস হার্ডিং।

গুহার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সকলে। একটা বড় পাথরের ওপর বসে বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রেখে বললেন হার্ডিং:

'বন্ধুগণ, আপনারা তাহলে এখনো জানেন না নিয়তি আমাদের কোথায় এনে ফেলেছে। দ্বীপ না মহাদেশ, এখনো জানতে পারেন নি?'

'না,' বলল হার্বার্ট।

'সেটা কাল জানা যাবে'খন। বললেন হার্ডিং। 'তার আগে কিসসু করার নেই।'

'আছে,' বলল পেনক্রফট।

'কী?'

'আগুন।'

'সে ভার আমার। পেনক্রফট, কাল আসবার সময়ে পশ্চিম দিকে একটা মস্ত পাহাড় দেখেছি। কালকে পাহাড়ে চড়ে দেখব এটা কী, দ্বীপ না মহাদেশ। তার আগে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছু কবার নেই।'

'আছে বইকি। আগুন!' বলল পেনক্রফট।

'হবে, হবে পেনক্রফট,' বললেন স্পিলেট। 'ধৈর্য ধরো, আগুন পাবে।'

আগুন নিয়ে কিন্তু সাইরাস হার্ডিংয়ের কোনো ভাবনা আছে বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন:

'বন্ধুগণ, আমাদের অবস্থা কিন্তু খুবই শোচনীয়: এটা যদি মহাদেশ হয়, তাহলে বেঁচে গেলাম। লোকালয় পাবোই। আর যদি দ্বীপ হয়, যদি জাহাজ চলাচলের বাইরে অবস্থান হয় এ দ্বীপের, তাহলে বাকী জীবনটা এখানেই

থাকার জন্তে কোমর বাঁধা দরকার। পেনক্রফট, যাও। কিছু শিকার করে আনো। মাংস খেয়ে চাঙা হয়ে কাল পাহাড়ে উঠব।'

'কিন্তু আগুন? মাংস রোস্ট করব কি করে?'

'পেনক্রফট, দোহাই তোমার, আগুনের ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও, তুমি যাও মাংসের খোঁজে।' স্পিলেটও বললেন—সাইরাস যেখানে, বিজ্ঞান সেখানে। অসাধ্যসাধন করবেন তিনি! আগুন জ্বালানো তাঁর কাছে কিছুই নয়।'

পেনক্রফট কিছুতেই যাবে না, হার্ডিংও ছাড়বেন না। শেষকালে নেব বললে পেনক্রফট-এর কানে কানে—'ক্যাপ্টেন পারেন না এমন কিছু নেই। কেন খামোকা সময় নষ্ট করছেন? উনি যখন বলছেন, আগুন জ্বালাবেনই।'

গাঁইগুঁই করে অবশেষে বেরিয়ে পড়ল পেনক্রফট। সঙ্গে নেব আর হার্বার্ট। সবার পেছনে আনন্দে নাচতে নাচতে টপ।

অনেক মেহনতের পর অবশেষে টপের সাহায্যে একটা ক্যাপিবারা জাতীয় শুয়োর শিকার করল দ্বীপবাসীরা। টপ গিয়ে বেচারার কান কামড়ে টেনে এনেছিল ঝোপের ভেতর থেকে।

কান ছিঁড়ে নিয়ে আড়াই ফুট লম্বা বাদামী জানোয়ারটা গিয়ে ডুব দিয়েছিল পুকুরে। মাথা তুলতেই নেব তাকে পিটিয়ে হত্যা করল নিমেষ মধ্যে।

শিকার কাঁধে নিয়ে প্রকৃতির উদ্দাম আলয়ের মধ্যে দিয়ে ওরা ফিরে চলল চিমনী-গুহার দিকে। বাদাম জাতীয় একরকম ফল আবিষ্কার করল হার্বার্ট। বাদামের চাটনী মন্দ জমবে না রাতের আহারে। কিন্তু বিরসবদনে পেনক্রফট বারবার বলল শুধু একটা কথা—'বৃথা চেষ্টা, ক্যাপ্টেন আগুন জ্বালাতে পারবেন না।'

নেব প্রতিবারেই বলল—'পারলে উনিই পারবেন।'

সত্যিই তাই হল! দূর থেকে দেখা গেল চিমনী-গুহা দিয়ে ভলকে ভলকে উঠছে কালো ধোঁয়া!

সাইরাস হার্ডিং আগুন জ্বালিয়েছেন!!

১০

ধোঁয়া! আগুন!! সাইরাস হার্ডিং!!!

দুই চোখ ছানাবড়ার মত করে পেনক্রফট বললে—'সর্বনাশ! ক্যাপ্টেন কি মন্ত্র জানেন? উনি কি জাদুকর?'

শুনে নেব শুধু মুচকি হাসল! তিন জনেই দ্রুতপদে রওনা হল গুহার দিকে।

পেনক্রফটের তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রশান্ত

মহাসাগরের মধ্যে একফোঁটা একটা দ্বীপ···আগুন জ্বালানোর কোনো সরঞ্জাম সেখানে নেই···অথচ আগুন জ্বালিয়েছেন ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং! হয় জাদুমন্ত্র, না হয় ভূতুড়ে ব্যাপার, অথবা ক্যাপ্টেন পিশাচসিদ্ধ পুরুষ! অদৃশ্য প্রেতরা ওঁর হুকুমের দাস!

গুহার মধ্যে গিয়ে পেনক্রফট যখন এই সব কথাই বলতে গেল, হো-হো করে হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—'পেনক্রফট, ম্যাজিক-ম্যাজিক আমি শিখিনি, তবে ম্যাজিককেও টেক্কা মারতে পারে এমনি কিছু বিজ্ঞানের কেতাব পড়া আছে আমার।'

'কিন্তু আগুনটা জ্বলল কি করে? হাওয়ায়?' পেনক্রফট নাছোড়বান্দা।

'হাওয়ায় ঠিক নয়, রোদে বলতে পারো,' বললেন স্পিলেট।

'মানে?'

এই সময়ে ফস করে বলে উঠল হার্বার্ট—'স্যার, আপনার কি বার্নিংগ্লাস আছে?' হার্ডিং বললেন—না, বাবা। কিন্তু একটা বানিয়ে নিয়েছি। মিঃ স্পিলেটের হাতে কব্জি ঘড়ি আছে, আমারও আছে। ঘড়ি দুটোর কাঁচ খুলে নিলাম। কিনারায় কিনারায় মিলিয়ে কাদামাটি দিয়ে কিনারা সেঁটে দিলাম—প্রথমবারেই পুরোটা জুড়িনি—ফাঁক রেখেছিলাম এক জায়গায়। সেই ফাঁক দিয়ে জল পুরে দিলাম মুখোমুখি জোড়া কাঁচের মধ্যে। কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলাম ফাঁকটুকু। জিনিসটা কি দাঁড়াল বলো তো?

পেনক্রফট জবাব দেবে কি, ছানাবড়া চক্ষু নিয়ে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

'কনভেক্স লেন্স—যার পেটটা মোটা, কিনারা পাতলা। এ কাঁচের মধ্যে দিয়ে রোদ্দুর কেন্দ্রীভূত হয় সূচ্যগ্র বিন্দুতে—হাতের ওপর ধরলে হাতে ফোস্কা পড়ে, খড়কুটো ঘাসপাতার ওপর ধরলে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। বুঝলে কিছু?'

অতশত বোঝবার দরকার কী? লকলকে শিখা মেলে আগুন যখন জ্বলছে, তখন রান্নাবান্নার ব্যবস্থাটা আগে করা দরকার। ক্যাপিবারাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল আগুনের ওপর।

চিমনীর ভেতরটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে দেখা গেল। প্রথমতঃ আগুনের আঁচে আর শীত করছে না। দ্বিতীয়তঃ, কাঠ আর কাদামাটি দিয়ে নতুন নতুন পার্টিসন তুলে বেশ কয়েকটা ঘর বানিয়ে নিয়েছেন স্পিলেট এবং হার্ডিং।

হার্ডিং হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছেন। পাহাড়ের গা বেয়ে তিনি উঠে

গেলেন ওপরের প্লেটোয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন দূরের বড় পাহাড়টার দিকে। এই পাহাড়েই আগামীকাল উঠতে হবে তাঁকে। অবশ্য মাইল ছয় হাঁটতে হবে উত্তর পশ্চিম দিকে। যদ্দুর মনে হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাহাড়ের উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার ফুট তো বটেই! শিখরদেশে উঠলে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত অনায়াসে দেখা যাবে।

শুয়োরের রোস্ট দিয়ে রাতের খাওয়া মন্দ জমল না। আকণ্ঠ গিলে নিদ্রামগ্ন হলেন দুঃসাহসী মানুষ কজন। পাছে আগুন নিভে যায়, তাই একবোঝা কাঠ ছড়িয়ে দেওয়া হল অগ্নিকুণ্ডে ঘুমোনোর আগে।

পরদিন ২৯শে মার্চ। ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন অভিযাত্রীরা। বেলা দশটায় শুরু হল পর্বতারোহণ পর্ব।

জঙ্গলের ধারে গিয়ে পাহাড়ের চেহারাটা আরেকবার ভাল করে দেখে নেওয়া হল। দুটো শঙ্কু নিয়ে গড়ে উঠেছে সুউচ্চ পাহাড়টা। আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে একটা চূড়ো যেন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। মাঝের উপত্যকায় ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে জলধারাও দেখা যাচ্ছে। উত্তর পূব দিকে গাছপালা একটু কম।

প্রথম শঙ্কুটার ওপর খাড়া রয়েছে দ্বিতীয় চূড়োটা। ঈষৎ হেলে রয়েছে শিখরদেশ। ঠিক যেন কানের ওপর হেলানো গোল টুপী। এ-পাহাড় একদম ন্যাড়া। লাল পাথর দেখা যাচ্ছে অতদূর থেকেও।

হার্ডিং বললেন—"আমরা কি আগ্নেয়শিলার ওপর এসে পড়েছি।" কথাটা সত্য। ভূগর্ভ প্রলয় পায়ের তলায় পাথরকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছে! ব্যাসাল্ট পাথর আর পিউমিস পাথরের চাঁই পড়ে আছে চারিদিকে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হার্বার্ট কতকগুলো থাবার চিহ্ন দেখল মাটিতে! বড় জানোয়ারের পদচিহ্ন। দেখে ঘাবড়ালেন না স্পিলেট। ভারতবর্ষে বাঘ আর আফ্রিকায় সিংহ মেরে তিনি পোক্ত শিকারী। দ্বীপের শ্বাপদ তাঁর করবে কি?

চিমনী গুহার কাছেই সবচেয়ে মাথা উঁচু পাহাড়টিকে নির্বাচন করলেন সাইরাস হার্ডিং। সঙ্গে খাবারদাবার নিয়ে শুরু হল অভিযান। পথে উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটল না।

বড় পাহাড়টার সানুদেশ পর্যন্ত আসতে আসতেই চতুর্দিকে অগ্নু্যৎপাতের আরো নিদর্শন দেখা গিয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভা ভূমিকম্পের আলোড়ন ভূত্বককে তরঙ্গায়িত করেছে বহুক্ষেত্রে। এইখানে চোখে পড়ল ছটা পাহাড়ি

ভেড়া। হার্বার্ট বললে, মুশমন। অভিযাত্রীদের অবাক চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল মুশমনের দল।

বড় পাহাড়টার দুটো চুড়ো। একটা অপরটায় চাইতে ঈষৎ ছোট। শিখরদেশ কিন্তু ছুঁচোল নয়—চ্যাটালো। ছোট চূড়োটার চ্যাটালো শিখরে লম্বা গাছের জঙ্গল।

প্রথমে ছোট পাহাড়টায় উঠলেন অভিযাত্রীরা। দ্বীপের উত্তরদিকে দেখলেন কেবল জল আর জল। দক্ষিণদিকে বড় চূড়ো থাকায় দেখা গেল না সেদিকেও জল আছে না মহাদেশ আছে।

শুরু হল দ্বিতীয় চূড়োয় ওঠার অভিযান। উঠতে উঠতে জমে যাওয়া লাভাস্রোত দেখলেন হার্ডিং। গন্ধক জমে রয়েছে আনাচে-কানাচে। আগ্নেয়-গিরির বহ্ন্যুৎসবের প্রলয়-নিদর্শন দেখে বিস্মিত হলেন তিনি, কিন্তু শংকিত হলেন না। কেননা, এরা তো মৃত আগ্নেয়গিরি! আর জাগবে না!

বড় চূড়োর তলায় চ্যাটালো অংশে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই বেলা গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যে হল। সুতরাং ঐখানেই রাত কাটানো মনস্থ করলেন ক্যাপ্টেন। চকমকি পাথর ঠুকে স্ফুলিঙ্গ দিয়ে পোড়া কাপড় জ্বালানো হল। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠল মস্ত ধুনি।

স্পিলেট ডাইরী লিখতে বসলেন। হার্ডিং হার্বার্টকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওঁর মতলব ঘুমোনোর আগেই চূড়োয় উঠে আশপাশটা দেখে আসা।

খুঁজতে খুঁজতে একটা মস্ত গহ্বর দেখলেন হার্ডিং। এককালে এই গহ্বর দিয়েই তরল লাভার স্রোত নেমেছিল—এখন তা শুকনো খটখটে। এককালে প্রলয় দেবতা যেখানে লক্ষ বহ্নিশিখায় কানের পরদা ফাটানো শব্দে মেদিনী কাঁপিয়েছিল, আজ সেখানে সীমাহীন নৈঃশব্দ আর দুর্নিরীক্ষ্য তমিস্রা। গন্ধকের গন্ধই শুধু সেই ভয়াল প্রলয়লীলার একমাত্র সাক্ষী থেকে গিয়েছে।

হার্ডিং দেখলেন, গহ্বরটা অন্ধকার বটে, কিন্তু প্রকৃতি যেন নিজেই তার মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ বানিয়ে রেখেছেন।

কপাল ঠুকে ভেতরে পা দিলেন হার্ডিং, পেছনে হার্বার্ট। হাজারখানেক ফুট উঠলেন অসীম সাহসে। অবশেষে পৌঁছোলেন পাহাড় চূড়ায়।

নিভন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে দিয়ে আসার যে রোমাঞ্চ, শিহরণ আর বর্ণনাতীত উৎকণ্ঠা, তা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পর। দৃষ্টি যদিও মাইল দুয়েকের বেশী গেল না, ঘনায়মান অন্ধকারের যবনিকা ঠেলে এমন কিছু দেখা গেলনা যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় অজ্ঞাত এই ভূখণ্ড

মহাদেশ, না দ্বীপ। যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকেই যেন আকাশ এসেছে মিতালি পাতিয়েছে সাগরের সাথে।

তখন রাত আটটা। আচম্বিতে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা গেল পশ্চিমদিকে তাল তাল অন্ধকারের বুকে। আকাশ থেকে আলোক রশ্মি জলে পড়ে থির থির করে কাঁপছে।

চকিতে বুঝলেন হার্ডিং আলোটা কিসের। চাঁদ। নখের কণার মত একরত্তি বেঁকা চাঁদ। জলে দিগন্তে ডুব দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে কাঁপছে সাগর-দর্পণে।

গম্ভীর গলায় বললেন. হার্ডিং—"সমস্যার মীমাংসা হল এতক্ষণে। হার্বার্ট এটা দ্বীপ—মহাদেশ নয়!"

১১

রাত ভোর হল। সেদিন মার্চ মাসের তিরিশ তারিখ।

অভিযাত্রীরা দিবালোকে এটা সত্যিই দ্বীপ কিনা যাচাই করার জন্যে উঠতে শুরু করলেন জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে। গন্ধকের গন্ধে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। হার্ডিং গত রাতে ভুল দেখেননি তো? সত্যিই কি ছন্নছাড়া এই দ্বীপে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে?

না, হার্ডিং ভুল দেখেন নি। দিনের আলোয় নজর গেল মাইল পঞ্চাশেক পর্যন্ত। কোথাও জমির ছিটে ফোঁটাও দেখা গেল না। শুধু জল আর জল। দিগন্তবিস্তৃত থই থই জলের মধ্যে দ্বীপটা গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে অতিকায় তিমি মাছের মত।

দ্বীপটার পরিধি প্রায় একশ মাইল। বুক দমে গেল প্রত্যেকেরই। তবুও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন দ্বীপের প্রতিটি অংশ। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এ-দ্বীপে মানুষ থাকে না। থাকলে কোথাও না কোথাও মনুষ্যবসতির নিদর্শন চোখে পড়তই।

তবে হ্যাঁ, আশপাশের দ্বীপ থেকে জলযানে চেপে হানা দিতে পারে জংলীরা। যদিও পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনো ভূখণ্ডের চিহ্ন নেই। কিন্তু পঞ্চাশ মাইলের পরেও তো থাকতে পারে!

গিডিয়ন স্পিলেট সময় নষ্ট করতে রাজী নন। তিনি নোটবই বার করলেন। তিমি মাছের মত দ্বীপটাকে এঁকে ফেললেন নোট বইয়ের পাতায়। দেখা গেল, বড়জোর শ'খানেক মাইল হবে দ্বীপটার মোট পরিধি।

শুরু হল ফেরার পালা। হার্ডিং বললেন—"আমার একটা প্রস্তাব আছে।

এ-দ্বীপ যখন জাহাজ চলাচলের পথের বাইরে, তখন সভ্যজগতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ইহজীবনে না-ও আসতে পারে। সুতরাং নানান নামে নামকরণ করতে চাই এ দ্বীপের পাহাড় বন উপসাগর নদীনালা অন্তরীপের।"

সোল্লাসে রাজী হলেন সবাই।

পেনক্রফট বলল—"এ দ্বীপের প্রথম আস্তানার নাম হয়েছিল 'চিমনী'। ঐ নামই বহাল রাখতে চাই—অবশ্য কারো আপত্তি না থাকলে।"

হার্বার্ট বললে—"ক্যাপ্টেন হার্ডিং, মিস্টার স্পিলেট, নেব আর পেনক্রফট-এর নামেও নামকরণ করা যেতে পারে।"

শুনে তো কালো মুখে সাদা দাঁতের বাহার দেখিয়ে হেসে কুটিপাটি হল নেব—"সে কি কথা? আমার নামে নাম হবে?"

যাইহোক, অভিযাত্রীরা প্রত্যেকেই যখন আমেরিকান, তখন সেই মহাদেশেরই বিখ্যাত জায়গাগুলোর নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হল দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল। উপসাগর দুটোর একটার নাম হল 'ইউনিয়ন উপসাগর' অপরটা 'ওয়াশিংটন উপসাগর'। পাহাড়টার নাম রাখা হল 'ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়'। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপদ্বীপটার নাম 'সার্পেন্টাইন উপদ্বীপ'—কারণ তার গড়নটাই সাপের ল্যাজের মত। দ্বীপের আরেক প্রান্তের উপসাগরটা দেখলেই মনে হয় যেন একটা হাঙর দু'ঠোঁট ফাঁক করে হাঁ করে রয়েছে। সুতরাং তার নাম রাখা হল 'শার্ক গালফ' বা 'হাঙর উপসাগর'। শার্ক গালফের দুটি অন্তরীপ একটির নাম রাখা হল 'নর্থ ম্যাণ্ডিবল্ অন্তরীপ'। অপরটির 'সাউথ ম্যাণ্ডিবল্ অন্তরীপ'। বিশাল সরোবরের নাম হল 'লেক গ্রাণ্ট'। লেকটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শ'তিনেক ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

চিমনীর ওপর গ্র্যানাইট পাথরের সিধে পাহাড়গুলোর শিখরে খানিকটা সমতল জায়গা ছিল। জায়গাটা শুধু চ্যাটালো নয়। বেশ উঁচু। সেখানে দাঁড়ালে সবকটা উপসাগরে সহজেই নজর রাখা যায়। কাজেই সেখানকার নাম হল 'প্রসপেক্ট হাইট' অর্থাৎ দূরদৃশ্য খুঁটিয়ে দেখার জন্য উঁচু স্থান। বেলুন যে নদীর কাছে পড়েছিল এবং যে নদীর জল পান করে বেঁচে রয়েছেন যাত্রীরা, তার নাম হল 'মার্সি নদী' অর্থাৎ 'করুণা প্রবাহিণী'। দক্ষিণ-পূর্বদিকের দ্বীপের প্রান্তদেশের নাম 'ক্ল কেপ' অর্থাৎ থাবা অন্তরীপ—কেননা পাহাড়ি অঞ্চলটা যেন থাবা পেতেই বসে রয়েছে সমুদ্রের ধারে! দ্বীপের যে সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে বেলুন থেকে লাফিয়ে নেমেছিলেন অভিযাত্রীরা, তার নাম রাখা হল 'সেফটি আইল্যাণ্ড' অর্থাৎ 'নিরাপত্তা দ্বীপ'। সবশেষে গোটা দ্বীপটার নাম রাখা হল আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের নামে।

সে নাম 'লিঙ্কলন আইল্যাণ্ড'।

সেদিন ৩০শে মার্চ, ১৮৬৫। নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দেশে ষোলদিন পরেই গুডফ্রাইডের দিন ঘাতকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন আব্রাহাম লিঙ্কলন!

১২

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সাইরাস হার্ডিং বললেন—'আমরা চিমনাতে ফিরব নতুন পথে। তাহলেই দ্বীপটাকে আরো ভাল করে জানা যাবে। দ্বীপে প্রাকৃতিক সম্পদ কি কি আছে, তারও একটা ফিরিস্তি বানিয়ে নেওয়া যাবে। লিঙ্কলন আইল্যাণ্ডেই যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকতে হয়, তাহলে সেইভাবেই জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে হবে বইকি।' সূর্য তখন মধ্য গগনে। হার্ডিং তাঁর ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে রাখলেন। স্পিলেটকে কিন্তু বাধা দিলেন। বললেন—'আপনার ঘড়ি রিচমণ্ডের সময় দিচ্ছে। রিচমণ্ডের মধ্যরেখা যা ওয়াশিংটনের মধ্যরেখাও প্রায় তাই। সুতরাং রোজ ঘড়িতে দম দিয়ে রাখুন। সময়টা কাজে লাগবে।' হার্ডিংয়ের মতলব কি, তা কিন্তু কেউ বুঝলেন না।

দুপুর নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে লেকগ্রাণ্ট দর্শনে বেরোলেন দুঃসাহসীরা। সবুজ গাছের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো সরোবরের বাড়তি জলটা কোথায় গিয়ে পড়ছে এবং কোন নদীর জল এসে পড়ছে হ্রদে, হার্ডিং তা দেখতে চান। গ্রানাইট পাথরের স্তূপ ছড়ানো এদিকে-সেদিকে। একই ধরনের আগ্নেয়-পাথরের ছোটখাট পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে বনজঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে; পাদপরাজ্য মৌরসীপাট্টা গেড়েছে সেইখানেই যেখানেই আগ্নেয়শিলা নেই।

প্রকৃতির এই উদ্দামতার মাঝে মুক্ত ভ্রমণের উল্লাস পেয়ে বসেছিল অভিযাত্রীদের। স্পিলেট আর হার্ডিংকে পেছনে ফেলে বাকী তিনজন দৌড়-ঝাঁপ করতে করতে এগিয়ে ছিল অনেকটা। নেবের চীৎকারটা শোনা গেল ঠিক সেই সময়ে।

হার্ডিং আর স্পিলেট সচমকে দেখলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে হার্বার্ট। মুখ তার ফ্যাকাশে। অদূরে পাথরের আড়ালে লুকিয়েছে নেব আর পেনক্রফট।

'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! ধোঁয়া!'

'ধোঁয়া! কোথায় হার্বার্ট!'

'ঐ তো পাহাড়টার আড়ালে! কি হবে ক্যাপ্টেন? নির্ঘাৎ জংলীরা আগুন জেলেছে। নরঘাতক যদি হয় তো হয়ে গেল আমাদের।'

অসমসাহসিক সাইরাস হার্ডিং-এর মুখও শুকিয়ে গেল আগুন আর জংলী—এই দুটি শব্দ শুনে। বিজন দ্বীপে তাঁদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ঢালহীন তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মত। এ-অবস্থায় কাঠের ডাণ্ডা পিটিয়ে শ্বাপদ ঠেকানো যায়, কিন্তু দ্বিপদ··· !

বুক কেঁপে উঠলেও কথা কাঁপল না হার্ডিংয়ের। স্পিলেটকে বললেন—'ধাপটি মেরে দেখলে কেমন হয় ?'

ডানপিটের রাজা স্পিলেট তো তাই চান। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে মিলে পাহাড়ের গায়ে গা মিলিয়ে ঝোপেঝাড়ে গুটি সুটি মেরে উঠতে লাগলেন ওপর দিকে। অনেকক্ষণ ওঠার পর আগুনটার কাছাকাছি পৌঁছোলেন দুই অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট। সন্তর্পণে উঁকি মারলেন ক্যাপ্টেন।

পরক্ষণেই শোনা গেল তাঁর অট্টহাসি। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলল সেই হাসি।

অন্যান্য অভিযাত্রীরা ছিলেন ক্যাপ্টেনের পেছনে। উৎকণ্ঠা-মুহূর্তে তাঁর হাসির কারণটা তাই কেউ ধরতে পারলেন না। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন হাস্য-মুখর সাইরাস হার্ডিং-এর মুখপানে।

হাসতে হাসতে বললেন ক্যাপ্টেন—'আগুনই বটে, তবে জংলীর আগুন নয় মিস্টার স্পিলেট, গন্ধকের আগুন। হলদে ধোঁয়াও বলতে পারেন। গলায় ঘা থাকলে চটপট সারানোর মহৌষধ।'

'বলেন কি!' বলে লাফিয়ে সামনে এলেন স্পিলেট। পেছনে আর সবাই। দেখলেন সেই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য। পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে চলেছে নীল আগুনের স্রোত। পাথরের গা বেয়ে নামতে নামতে বাতাসের অক্সিজেন শুষে নিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে আশেপাশে।

হার্ডিং বললেন—'দেখছেন ? আগুনের রঙ লাল নয়, নীল। গন্ধকের আগুন হয় নীলচে।'

'অর্থাৎ জলন্ত গন্ধক।' বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন স্পিলেট। 'কিন্তু কেন ক্যাপ্টেন, কেন ? পাহাড়ের গায়ে কেনই বা গন্ধকের ধারা বয়ে চলেছে ? কেনই বা গন্ধক নীল আগুন ছড়াচ্ছে ?'

'কারণ আশেপাশের গ্রানাইট পাথর দেখলেই বোঝা যায়। এককালে এখানে বিস্তর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, আগ্নেয়গিরিরা অনেক দৌরাত্ম্য করেছে। সেই লাভা জমেই সৃষ্টি হয়েছে গ্র্যানাইট পাহাড়। হয়ত কোথাও কোনো জ্বালামুখ এখনো একেবারে নিভে যায় নি। ভূগর্ভ থেকে তরল লাভা ইত্যাদি বেরোচ্ছে অল্পমাত্রায়, জমা হচ্ছে এই গন্ধক কুণ্ডে।'

অবাক হয়ে নীল আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন সকলে। সাইরাস হার্ডিং তেলতেলে জলে আঙুল ডোবালেন। জিভে ছোঁয়ালেন—স্বাদ বেশ মিষ্টি। জলের তাপমাত্রা অনুমান করলেন ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহিট।

হার্বার্টকে বুঝিয়ে দিলেন থার্মোমিটার ছাড়া তাপমাত্রা আঁচ করলেন কি ভাবে। বললেন—'দেখো বাবা, জলটা গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। অর্থাৎ আমার দেহের তাপ যা, জলের তাপও তাই। মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহিট। সুতরাং বুঝে নাও।'

বিকেল নাগাদ ওঁরা পৌঁছোলেন মিষ্টি জলের লেকের পাশে। লেকের ধার বরাবর গাছের ভীড়। ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখীদের নাচানাচি আর কলকাকলী। নিস্তরঙ্গ জলে সব কিছুরই প্রতিবিম্ব স্বর্গের নন্দনকাননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অধিকাংশ গাছ ইউক্যালিপটাস আর ক্যাসুয়ারিনা। অস্ট্রেলিয়ান দেবদারুও রয়েছে বিস্তর। নিউজিল্যাণ্ডের টুসাক ঘাসে ছাওয়া বনভূমি। নেই শুধু ডাবগাছ।

পাখীর মেলা বসেছে যেন গাছের ডালে। ডানা মেলে ল্যাজ নাচিয়ে ছুটছে কালো, সাদা, ধূসর কাকাতুয়া, রামধনু রঙের জেল্লায় চোখ ধাঁধিয়ে উড়ছে অস্ট্রেলিয়ান শুকশারী; একসঙ্গে সবুজ আর লালের বাহার দেখিয়ে নাচছে মাছরাঙা। কানে তালা লেগে যাচ্ছে তাদের কলকাকলীতে। আচম্বিতে পাখীর ডাক চাপা পড়ে গেল তীক্ষ্ণ-তীব্র চীৎকারে। যেন চতুষ্পদ আর দ্বিপদ প্রাণীরা হেঁকে উঠল একসাথে।

তক্ষুনি ঝোপের মধ্যে দৌড়ে গেল নেব আর হার্বার্ট। গিয়ে দেখল ছটা পাহাড়ি পাখী। টিটকিরি আর গান—এদের মস্ত বিদ্যে। মাংস অতি সুস্বাদু। তৎক্ষণাৎ ডাণ্ডার ঘায়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলল নেব।

অদ্ভুত সুন্দর কতগুলো পায়রা দেখল হার্বার্ট। ডানায় যেন ব্রোঞ্জ ছড়ানো। আশ্চর্য সুন্দর পাখীগুলোকে ছররা দিয়ে মারা যেত—লাঠি দিয়ে সম্ভব হল না।

আচমকা কতগুলো চতুষ্পদ তিরিশ ফুট লম্বা লাফ মেরে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ছিটকে এল—মনে হল যেন গাছের শাখা বেয়ে বেয়ে নেমে এল কাঠবেড়ালীর দল।

'ক্যাঙারু!' সোল্লাসে বলল হার্বার্ট।

'খেতে ভাল কী?' পেনক্রফটের প্রশ্ন।

'ঝোল রাঁধলে অতিশয় উপাদেয়।' বললেন স্পিলেট।

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই নেব, হার্বার্ট আর পেনক্রফট লাঠি নিয়ে তাড়া

করল ক্যাঙারুদের। কিন্তু ঠিক যেন রবারের বলের মত লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাঙারুরা। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল শিকারীরা—এমন কি টপও।

পেনক্রফট বলে উঠল—'আমার একটা আবেদন ক্যাপ্টেন।'

'বলো।'

'গাছের ডাল দিয়ে শিকার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কালঘাম ছুটে যায়। বন্দুক-টন্দুক কিছু একটা বানিয়ে দিতে পারেন?'

'তা পারলেও পারতে পারি। আপাততঃ খান কয়েক তীর-ধনুক বানিয়ে দেব।'

'তীর-ধনুক!' চোয়াল ঝুলে পড়ল পেনক্রফটের। 'ও তো ছেলে ভুলানো অস্ত্র।'

'অত দম্ভ করোনা পেনক্রফট। একটু প্র্যাকটিস করলেই অষ্ট্রেলিয়ার ঝানু তীরন্দাজদেরও টেক্কা মারতে পারবে তুমি। তাছাড়া আগুন-হাতিয়ার কদ্দিনের হে? কিন্তু তীর-ধনুকের ব্যবহার তো সেই আদিম কাল থেকে।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা। বন-জঙ্গল ঠেঙিয়ে, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যেতে যেতে দ্বীপের অনেক কিছু নতুন জায়গা দেখলেন সবাই। হাসি-ঠাট্টায় মশগুল থাকায় সময় যেন পাখা মেলে উড়ে চলল হু-হু করে। পথিমধ্যে টপ তিনটে ক্যাপিবারা বধ করে নিজেও খাবার তালে ছিল। পেনক্রফট সময় মত গিয়ে দুটোকে দুহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ঝোপের মধ্যে থেকে। দেখে তো সবাই মহাখুশী। সবচেয়ে আনন্দ পেটুক দামোদর পেনক্রফটের। খাওয়ার ব্যবস্থাটি ভাল থাকলেই সে আনন্দে আটখানা। খেয়ে আর খাইয়ে তার যত কিছু আনন্দ।

রাস্তায় একটা লাল মাটির নদী পাওয়া গেল। জল পরিষ্কার, কিন্তু মাটি লাল। অর্থাৎ আকরিক লোহায় সমৃদ্ধ সেখানকার মাটি। নদীর নাম দেওয়া হল 'রেডক্রীক'—লাল নদী।

সারা দিন লেক গ্রান্টের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে বিকেল নাগাদ মার্সি নদীর বাঁ-তীর দিয়ে অভিযাত্রীরা যখন চিমনী পৌছালেন, তখন সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে। হার্ডিং হতাশ হলেন, এত খুঁজেও লেকের বাড়তি জল বেরোনোর পথ না পেয়ে। একটু অবাকও হলেন। জলটা তাহলে যাচ্ছে কোথায়?

খাওয়া-দাওয়ার পর অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসল সবাই। ক্যাপ্টেন হার্ডিং পকেট থেকে একে-একে বার করলেন কয়েকটা অতি মামুলী বস্তু। সারাদিন ধরে নমুনাগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং দুষ্প্রাপ্য বস্তুর মত আগলে রেখেছেন পকেটে।

জিনিসগুলি হল খনিজ লোহা, চুন, কয়লা আর কাদামাটি।

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন হার্ডিং সাহেব—'প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। কাল থেকে সেই কাজ শুরু করব আমরা।'

১৩

পরের দিন সকাল হতেই প্রশ্ন করল পেনক্রফট—'ক্যাপ্টেন, কাজ তো শুরু করব, কিন্তু আরম্ভটা হবে কোথা থেকে?'

'একেবারে গোড়া থেকে', বললেন সাইরাস হার্ডিং।

কথাটা নির্জলা সত্যি। সব কিছুই আরম্ভ করতে হবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। লোহা যে তৈরী হবে, সরঞ্জাম কোথায়? যন্ত্রপাতি কোথায়? কিছু নেই। এমন কি যে সব খনিজ পদার্থ থেকে যন্ত্রপাতি লোহা বানানো যায়, সেগুলিকে পর্যন্ত পরিশোধন করতে হবে। যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিতে হবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তার চাইতেও কঠিন মনোবল হল এই পাঁচজন পুরুষের। ইঞ্জিনীয়ার সাইরাস হার্ডিং হলেন এঁদের মধ্যমণি। সঙ্গীদের অটুট মনোবল আর নিজের উন্নত মস্তিষ্কের জোরে যে অসাধ্যসাধন করতে পারবেন তিনি, সে বিশ্বাস তাঁর ছিল।

উনি বললেন—'দ্বীপে কাঠ আছে, কয়লা আছে, নেই শুধু তুন্দুর। সেইটা বানিয়ে নিলেই আগুনে পুড়িয়ে মাটির বাসন-কোসন তৈরী করা যাবে।'

'তুন্দুর!' অবাক হল পেনক্রফট। 'কিন্তু সেটা বানাব কি করে?'

'কেন, ইঁট দিয়ে।'

'ইঁট পাব কোথায়?'

'বানিয়ে নেব কাদামাটি দিয়ে। তারপর পুড়িয়ে নেব চুল্লীতে। ইঁট যেখানে হাতে গড়ব, তুন্দুরটাও খাড়া করব ঠিক সেইখানে—তাতে ঝামেলা কমবে, সময় বাঁচবে। চিমনী থেকে খাবার-দাবার পৌঁছে দেবে নেবে।'

'কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

'হ্রদের পশ্চিমতীরে। মেলাই কাদামাটি সেখানে—কালকে আসবার সময়ে দেখে এসেছি আমি।'

স্পিলেট বললেন—'জ্বালানির অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু শিকারের হাতিয়ার তো নেই।'

'আহারে, এই সময়ে যদি একটা ছুরীও পেতাম।' আক্ষেপ করল পেনক্রফট।

'ছুরী!' যেন নিজের মনেই বললেন ইঞ্জিনীয়ার। 'ছুরী চাই, ছুরী!' বলতে বলতে তাঁর চোখ পড়ল টপের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হল মুখ।

'টপ, এদিকে আয়!' ডাক দিলেন হার্ডিং।

দৌড়ে এল প্রভুভক্ত কুকুর। হার্ডিং তার গলা থেকে খুলে নিলেন গলাবন্ধনীটা। মাঝখান থেকে দুটুকরো করে বললেন—'পেনক্রফট, এই নাও তোমার ছুরী।'

টেম্পার্ড স্টিলের পাত দিয়ে তৈরী বকলস ভাঙতে সত্যিই দুটুকরো ইস্পাতের ফলা পাওয়া গিয়েছে। বালি-পাথরে ঘসে ধার দিলেই খাসা ছুরী বানিয়ে নেওয়া যাবে ফলা দুটি থেকে। পেনক্রফট দুঘণ্টা ব্যয় করল ছুরী শানাতে। তারপর লাগিয়ে নিল দুটো কাঠের ফলায়।

মার্সি নদীর পাড় বেয়ে, প্রসপেক্ট হাইটকে পেছনে ফেলে মাইল পাঁচেক আসার পর জঙ্গলের কাছে একটা ঘাস জমিতে পৌছোলেন দ্বীপের আগন্তুকরা। লেক গ্রাণ্ট এখান থেকে দুশ ফুট দূরে।

আসবার পথে হার্বার্ট এমন একটা গাছ আবিষ্কার করল যা দিয়ে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা তীর-ধনুক বানায়। ধনুক তো হল। পাশের আর একটা গাছের ছাল দিয়ে ধনুকের ছিলেও হল। বাকী রইল শুধু তীর। সেটা বাদ যায় কেন? ঐ গাছেরই গাঁটহীন সরু-সরু ডাল চেঁচে-ছুলে খান কয়েক তীরও বানিয়ে নিল পেনক্রফট। এখন চাই তীরের ডগায় লোহার ফলক।

দোসরা এপ্রিল মৌলিক পন্থায় দ্বীপের মধ্যরেখা নির্ণয় করলেন হার্ডিং। সূর্য ঠিক কোন পয়েণ্ট থেকে উঠছে, তা চিহ্নিত করলেন। আগের দিন ঠিক কোথায় সূর্য অস্ত গিয়েছে দেখে রেখেছিলেন। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করলেন বারো ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট। অর্থাৎ ঠিক ছ ঘণ্টা বারো মিনিট পর সূর্য মধ্যরেখা পেরিয়ে যাবে।

কাদামাটি যে জায়গায়, দ্বীপবাসীরা এসে পৌছলেন সেখানে। মাটির যে ধরনের মিশেল দিয়ে ইট বানানো হয়, প্রকৃতি যেন ঠিক সেই মাটিই জমিয়ে রেখেছেন এখানে। সুতরাং ঝক্কি কমে গেল বিস্তর। সামান্য একটু বালি মিশিয়ে ছাঁচের অভাবে হাত দিয়েই একটি একটি করে ইট তৈরী করে চললেন অভিযাত্রীরা। একটু অবশ্য তেড়াবেঁকা হল, কিন্তু সৌষ্ঠব নিয়ে তো দরকার নেই, দরকার কাজ নিয়ে। সেদিক দিয়ে চমৎকার হল প্রতিটি ইটের গড়ন। দুদিনেই আনাড়ি হাতেও তিন হাজার ইট তৈরী করে ফেললেন দ্বীপবাসীরা। তিন চারদিন পরে দেখা গেল তুন্দুর খাড়া করার মত বিস্তর ইট শুকোচ্ছে রোদ্দুরে।

তন্দুর তৈরীর দুদিন আগে কেবল কাঠ জড়ো করলেন দ্বীপবাসীরা। সেই-সঙ্গে চলল শিকার পর্ব।

কাজের ফাঁকে পেনক্রফট বেশ কিছু তীর বানিয়ে নিয়েছিল বুনো জন্তুদের ঘায়েল করার জন্যে। অরণ্যে কত রকম প্রাণী থাকতে পারে। কেউ খরগোশ ক্যাপিবারা মোরগের মত নিরীহ। কেউ বাঘ ভালুকের মত হিংস্র। ভয়ের কারণও অবশ্য ছিল। দিন কয়েক আগে বনের মধ্যে এমন একটা ভয়ংকর জানোয়ার দেখেছিলেন স্পিলেট আর হার্বার্ট যাকে জাগুয়ার বলা যায় অনায়াসেই। বড় বড় নখওয়ালা থাবার ছাপও দেখা গিয়েছে বনে। এইসব দেখেশুনেই স্পিলেট পণ করলেন, হাতে এক-আধখানা বন্দুক এলেই আগে হিংস্র পশুগুলোকে বধ করবেন।

ইতিমধ্যে টপের কৃপায় পেনক্রফটের তীরের ফলক পাওয়া গেল। একটা শজারু নিধন করল টপ। শজারুর কাঁটা তীরের ডগায় বেঁধে নিতেই তৈরী হল খাসা খানকয়েক তীর।

যাইহোক, জাগুয়ার একবার দেখা দিয়ে গেছে, আক্রমণ করেনি। যদি একা পেয়ে কাউকে খাবলে দেয়, এই ভয়ে ইটের পাঁজা থেকে বেশী দূরে যাওয়া উচিত মনে করেননি কেউ।

ইট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় চিমনীর দিকে নজর ছিল না কারোরই। ক্যাপ্টেন ঠিক করলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা নতুন ঠাঁই বানিয়ে নিতে হবে। কেননা এ-গুহায় ফাঁক-ফোকর বিস্তর। সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পেলে নিশ্চয় চিমনী জলের তলায় চলে যায়।

সাংবাদিক স্পিলেট নিজের কর্তব্যটি ঠিক করে চলেছিলেন। নোট বইয়ে তিনি প্রতিদিনের হিসেব রাখছিলেন বলেই পাঁচই এপ্রিল তিনি জানালেন—দ্বীপবাসের বারো দিন পূর্ণ হল।

পরের দিন—৬ই এপ্রিল তন্দুর তৈরী হল। জ্বালানী কাঠ ঠাসা হল তার মধ্যে। সন্ধ্যের সময়ে আগুন দেওয়া হল ইটের পাঁজায়। উত্তেজনায় উদ্বেগে সে রাতে ঘুম উড়ে গেল সবারই চোখের পাতা থেকে।

ঝাড়া দুদিন ধরে পুড়ল ইটগুলো। এবার আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করতে হবে ঝামা ইটের পাঁজা। সেই ফাঁকে অপরিশুদ্ধ চুণাপাথর সংগ্রহ করা হল লেকের ধার থেকে। পুড়িয়ে নিতে বাদ গেল কার্বলিক অ্যাসিড—পাওয়া গেল কুইক-লাইম। তার সঙ্গে বালি আর পাথর মিশিয়ে তৈরী হল ইট গাঁথবার মশলা। হার্ডিং এবার ইট দিয়ে বাসন পোড়ানোর ভাটি তৈরী করলেন। পাঁচদিন পর রেডক্রীকের মুখে মাটির ওপর পড়ে থাকা কয়লা এনে ভাটিতে

ঠাসা হল। বিশ ফুট উঁচু চিমনী দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া উঠল আকাশ পানে।

এরপর কাদামাটির সঙ্গে চুণ আর বেলেপাথর মিশিয়ে বাসন তৈরীতে মন দিলেন হার্ডিং। কুমোরের চাকা বানাতে হল সবার আগে। তারপর থালা, বাটি, জলের গেলাস সবই আনাড়ি হাতে গড়ে নিলেন দ্বীপবাসীরা। দেখতে আহামরি না হলেও বাসনগুলিকে মহামূল্যবান মনে হল দ্বীপের আগন্তুকদের কাছে।

চুণ-কাদার বিশেষ এই মিশেলটির ইংরেজী নাম হল 'পাইপ ক্লে'। অর্থাৎ তামাক খাওয়ার চমৎকার পাইপ বানানো যায় এই মাটি দিয়ে। তামাকখোর পেনক্রফট তাই কয়েকটা পাইপ বানিয়ে নিলে তক্ষুনি। মজবুত হল পাইপগুলি —কিন্তু তামাক কোথায়? পেনক্রফটের তখনকার মুখের চেহারা দেখে মায়া হল বাকী সকলের।

পনেরোই এপ্রিল বাসনকোসন নিয়ে চিমনীতে ফিরে এলেন দ্বীপবাসীরা। বুনো মোরগের ঝোল আর ক্যাপিবারার রোষ্ট—এই দিয়ে সাঙ্গ হল রাতের খাওয়া।

রাত আটটা। খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে। হার্বার্টকে নিয়ে চিমনীর বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশের নক্ষত্ররাশির দিকে চেয়েছিলেন হার্ডিং।

মিনিট কয়েক পরে বললেন—'হার্বার্ট, আজতো পনেরোই এপ্রিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কাল ষোলই এপ্রিল। বছরের যে চারদিন প্রকৃত সময় গড়পড়তা সময়ের সমান হয়—কাল সেই চারদিনের একটা দিন। কাল কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময়ে সূর্য মধ্যগগনে মধ্যরেখা অতিক্রম করবে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে কালকেই দ্বীপের দ্রাঘিমা বার করে ফেলব।'

'সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ছাড়াই?' শুধোলেন স্পিলেট।

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আকাশ যখন নির্মেঘ, আজ রাতের সাদার্নক্রস তারার উচ্চতা বের করে দ্বীপের লঘিমাও নির্ণয় করব।'

এই বলে ধুনির আলোয় বসলেন ইঞ্জিনীয়ার। কাঠ কেটে দুটো চ্যাপ্টা স্কেলের মত কাঠি বানিয়ে বাবলার কাঁটা দিয়ে একদিক এঁটে দিলেন। অর্থাৎ কম্পাস তৈরী করলেন। তারপর সঙ্গীসাথী নিয়ে উঠলেন প্রসপেক্ট হাইটে। দক্ষিণ দিগন্তে তখন চাঁদ ঝিকমিক করছে।

আচমকা আবির্ভূত হল সাদার্নক্রস—তলায় অ্যালফা নক্ষত্র যার পা ঘেঁসে রয়েছে দক্ষিণমেরু।

দক্ষিণমেরু থেকে অ্যালফায় ব্যবধান সাতশ ডিগ্রী। হার্ডিং তা জানতেন। উনি কম্পাসের একটা কাঁটা ফেরালেন অ্যালফার দিকে, আর একটা সমুদ্র দিগন্তের দিকে। পাওয়া গেল দিগন্ত থেকে নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব।

দিগন্ত থেকে অ্যালফা কতখানি উঁচু—তা অংক কষলেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ল্যাটিচিউড নির্ভর করছে এই কৌণিক দূরত্বের ওপর।

হিসেবটা আগামীকালের জন্যে মুলতবী রেখে রাত দশটায় ঘুমিয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা।

পরের দিন ইস্টার সানডে। ঠিক হল, সেদিন আর কোনো কাজ নয়, শুধু বিশ্রাম।

বিকেল নাগাদ কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার হার্ডিং সাহেব একটা মনে রাখবার মত কাজ করলেন। একটা গাছ আবিষ্কার করলেন। নাম ওঅর্ম উড। এ-গাছ শুকিয়ে নিয়ে পটাসিয়াম নাইট্রেটে চুবিয়ে নিলে দেশলাইয়ের মত দাহ্য পদার্থ তৈরী সম্ভব। দ্বীপে প্রাকৃতিক সম্পদ অঢেল আছে, পটাসিয়াম নাইট্রেট অর্থাৎ সোরা-ও আছে। সুতরাং আর ভাবনা কি?

১৮

সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনত না করলেও আর একটা কাজের কাজ সারলেন সাইরাস হার্ডিং। গ্র্যানাইট পাহাড়ের উচ্চতা মাপলেন এবং তা পাহাড়ে না উঠেই! আগের রাতে ল্যাটিচিউড অর্ধেক বের করেছেন—সেদিন তা শেষ করলেন।

ক্যাপ্টেনের বিজ্ঞান-জানা উর্বর মস্তিষ্কের আর একটা নমুনা সেদিন পাওয়া গেল। উনি একটা কাঠের লাঠি নিলেন। লম্বায় তা বারো ফুট। সমুদ্রতীর থেকে বিশ ফুট দূরে, পাহাড় থেকে পাঁচশ ফুট দূরে এসে পুঁতলেন লাঠিটা। দুফুট রইল মাটির তলায়, দশ ফুট ওপরে। তারপর মাটিতে শুয়ে পিছু হটতে হটতে যেখানে দেখলেন ডাণ্ডার ডগা পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে এক দৃষ্টি রেখায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে পুঁতলেন একটা ছোট্ট কাঠি। মেপে দেখা গেল, কাঠি থেকে লাঠির দূরত্ব পনেরো ফুট, আর কাঠি থেকে পাহাড়ের দূরত্ব ৫০০ ফুট।

এরপর শুরু হল জ্যামিতির হিসেব। ছেলেমানুষ হার্বার্টকে বোঝালেন, সমকোণ ত্রিভুজ আকারে ছোট বড় হলেও অনুরূপ ভুজগুলো সমানুপাতিক হয়। এই হিসেবে তিনি তিন লাইনের অংক কষলেন ঝিনুক দিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর। পাহাড়ের উচ্চতা দেখা গেল ৩৩৩ ফুট।

এরপর আগের দিনে বানানো বদখৎ চেহারার কাঁটা-কম্পাস নিয়ে বসলেন হার্ডিং। অ্যালফা নক্ষত্র থেকে দিগন্তের কৌণিক দূরত্ব কতখানি, তা বের করলেন অভিনব উপায়ে। বালির ওপর একটা বৃত্ত আঁকলেন। বৃত্তটাকে ৩৬০ অংশে ভাগ করলেন। তখন কাঁটাকম্পাসের দুই কাঁটার মাঝখানের কৌণিক দূরত্ব পাওয়া গেল। দক্ষিণ মেরু থেকে অ্যালফার উচ্চতা ২৭ ডিগ্রী। কৌণিক দূরত্বের সঙ্গে জোড়া হল এই ২৭ ডিগ্রী। পাহাড়ের উচ্চতাকে সমুদ্র পৃষ্ঠের পর্যায়ে এনে অংক কষতে সব মিলিয়ে পাওয়া গেল ৫৩ ডিগ্রী। মেরু থেকে নিরক্ষরেখা ৯০ ডিগ্রী। সুতরাং ৯০ ডিগ্রী থেকে ৫৩ ডিগ্রী বাদ দিতে রইল ৩৭ ডিগ্রী। হার্ডিং বললেন—'লিঙ্কলন দ্বীপের সাদার্ন ল্যাটিচিউড হল কমবেশী ৩৭ ডিগ্রী। অথবা ৩৫ থেকে ৪০ যের মধ্যে।'

বাকী রইল শুধু দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পালা। হার্ডিং ঠিক করলেন ভর দুপুরে তা বের করবেন।

ইস্টার সানডেতে কেউ ঘরে বসে থাকতে চাইলেন না। হাঁটতে হাঁটতে সবাই এলেন হ্রদের উত্তর পাড় আর হাঙর উপসাগরের মাঝখানে। এখানে দেখা গেল বিস্তর সীলমাছ রোদ পোহাচ্ছে। অগুন্তি শাঁখ, ঝিনুক, শামুক ছাড়িয়ে আছে বালির ওপর। যে কোনো শঙ্খবিদ দেখলে পুলকিত হতেন। হাঁটু জলে শুক্তির বিরাট ক্ষেত আবিষ্কার করল নেব।

হার্ডিং কিন্তু মুক্তোর ক্ষেতের দিকে দৃকপাত করলেন না। সীলমাছগুলো দিকে চেয়ে শুধু বললেন, এ জায়গায় ফের আসতে হবে তাঁকে।

বার বার ঘড়ি দেখছিলেন হার্ডিং। সমুদ্রতীরে একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে পুঁতলেন ছফুট লম্বা একটা লাঠি—ঈষৎ হেলিয়ে দিলেন দক্ষিণ দিকে। এই কাঠিটাই হল সূর্য-ঘড়ির কাঁটা।

কাঠির ছায়ার দিকে নজর রাখলেন হার্ডিং। ছায়া যখন সবচাইতে ছোট হবে, বুঝতে হবে তখন ঠিক দুপুর বারোটা। ছোট ছোট কাঠি পুঁতে ছায়ার ছোট হওয়ার হিসেব রাখতে লাগলেম হার্ডিং। প্রতিবার স্পিলেট ঘড়ি দেখে হেঁকে বললেন, 'সময় কত'।

ছায়া ছোট হয়ে যেই ফের বড় হতে যাচ্ছে, হার্ডিং শুধোলেন—'কটা বাজে?'

'পাঁচটা বেজে একমিনিট,' রিচমণ্ডের সময়ের সঙ্গে মেলালো ঘড়ির সময় বললেন স্পিলেট।

হার্ডিং তখন হিসেব করতে বসলেন। ওয়াশিংটন থেকে লিঙ্কলন দ্বীপের ব্যবধান তাহলে ঘণ্টা পাঁচেকের। ঘণ্টায় পনেরো ডিগ্রী পথ অতিক্রম করছে সূর্য। তার মানে, পাঁচ ঘণ্টায় ৭৫ ডিগ্রী। ওয়াশিংটন গ্রীনউইচের ৭৭ ডিগ্রী

পশ্চিমে অবস্থিত। লিঙ্কলনদ্বীপের দ্রাঘিমা তাহলে ১৫২ ডিগ্রী (পশ্চিম)। অথবা ১৫০ থেকে ১৫৫র মধ্যে।

সোজা কথায়, লিঙ্কলন দ্বীপ পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চলে অবস্থিত। সাইরাস হার্ডিং কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না প্রশান্ত মহাসাগরের এমন জায়গায় কোনো দ্বীপের চিহ্ন ম্যাপের বুকে দেখেছেন কিনা। লিঙ্কলন দ্বীপ থেকে তাহিতি এবং প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের দূরত্ব কম করেও বারোশো মাইল, নিউজিল্যাণ্ড এখান থেকে আঠারোশো মাইলেরও বেশীদূরে এবং সাড়ে চার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিলে তবে মিলবে আমেরিকার উপকূল!

অপলকা নৌকোয় এত পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয় কোনমতেই!

পরের দিন সতেরোই এপ্রিল।

আলোচনা চক্রে বসলেন দ্বীপবাসীরা। বাসন কোসন তো তৈরী হল, এবার হাতিয়ার বানানো দরকার। বারোশো মাইল পাড়ি দিয়ে তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ যেতে হলেও মস্ত নৌকো বানানো দরকার। এতবড় নৌকা বানাতে হলে কুড়ুল করাত র্যাদা হাতুড়ি ইত্যাদি অনেক কিছু যন্ত্রপাতি দরকার। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে দ্বীপের নানা জায়গায় খনিজ পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগাতে হলে একটা লোহার কারখানা বসানো দরকার। তার আগেই একটা ভাল ডেরা খোঁজা দরকার। নইলে শীত এলে হাড়শুদ্ধ জমে বরফ হয়ে যাবে।

পেনক্রফটের আক্ষেপের অন্ত নেই বন্দুক না থাকার দরুন। স্পিলেট আশ্বাস দিয়ে বললেন—"বন্দুক বানানো কি এমন হাতী ঘোড়া ব্যাপার? দ্বীপেই তো রয়েছে সব কিছু। বন্দুকের জন্যে খনিজ লোহা, বারুদের জন্যে সোরা কয়লা, গন্ধক। কার্তুজের জন্যে সীসে।"

হেসে বলেন হার্ডিং—"অত সোজা নয় মিস্টার স্পিলেট। বন্দুক বানাতে হলে অনেক উন্নত কারিগরির দরকার। দরকার অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির। দেখা যাক কি হয়।"

ধাতু জিনিসটা সচরাচর শুদ্ধ অবস্থায় থাকেনা মাটির মধ্যে—অক্সিজেন বা গন্ধকের সাথে মিশে থাকে।

অপরিশুদ্ধ আকরিক লোহা তো হার্ডিং দেখে এসেছেন দ্বীপের উত্তর পশ্চিমভাগে। কয়লা দিয়ে দারুণ উত্তাপে আয়রন সালফাইড আর আয়রন অক্সাইড গালালেই ময়লা বাদ যাবে, খাঁটি ইস্পাত পাওয়া যাবে। কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টির কি ব্যবস্থা হবে?

হার্ডিং হুকুম দিলেন—"পেনক্রফট, সেফটি আয়ল্যাণ্ডে গিয়ে কয়েকটা সীল বধ করে আনো। লোহা সাফ করতে হবে।"

"লোহা সাফ করবেন সীল দিয়ে?" পেনক্রফট তো অবাক।

"সীলের চামড়া দিয়ে হাপর বানাবো। হাপর দিয়ে তাতাবো লোহা।"

সেফটি আয়ল্যাণ্ডের শেষপ্রান্তে দেখা গেল জলের ওপর যেন কালো পাথরের চাকা ভেসে বেড়াচ্ছে। সীলমাছ জলে ভাসছে।

সীল শিকার জলে সম্ভব নয়। দারুণ সাঁতারু ওরা। ওদের খতম করতে হলে ডাঙায় তুলতে হবে। সুতরাং পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে রইলেন অভিযাত্রীরা। ঘণ্টা খানেক পরে ছটি সীল গুটিগুটি উঠল বালির চড়ায়। তৎক্ষণাৎ হার্ডিং স্পিলেট আর নেব দৌড়ে গিয়ে ওদের ফিরে যাওয়ার রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন। পেনক্রফট আর হার্বার্ট দমাদম করে লাঠি চালিয়ে মারল দুটি সীলকে। বাকিগুলো প্রাণের ভয়ে তেড়েমেড়ে গিয়ে পড়ল জলে।

নেব আর পেনক্রফট বসে গেল চামড়া ছাড়াতে। মাংসের তো দরকার নেই। শুধু চামড়া বয়ে নিয়ে গিয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিলেই তৈরী হবে ফার্স্ট ক্লাস হাপর।

হলও তাই। চিমনীতে এসে কাঠের ফ্রেমে চামড়া আটকে রোদ্দুরে শুকনো হল বেশ করে। গাছের ছাল পাকিয়ে তৈরী হল মজবুত দড়ি। তিনদিনের মধ্যে তৈরী হয়ে গেল হার্ডিংয়ের হাপর।

পরের দিন—বিশে এপ্রিল—সকালে উঠেই হাপর কাঁধে নিয়ে দ্বীপবাসীরা রওনা হলেন রেড ক্রীক নদী অভিমুখে। জায়গাটা চিমনী থেকে মাইল ছয়েক দূরে। হার্ডিং সাহেব আকরিক লোহার সন্ধান পেয়েছিলেন এইখানেই। বনের মধ্যে যেতে যেতে ঝোপঝাড় কেটে পথ করে নিয়ে এগুলেন দ্বীপবাসীরা যাতে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝে একটা সোজা রাস্তা তৈরী হয়ে যায়। বনে জ্যাকামার পাখী বিস্তর। সেই থেকেই অরণ্যের নাম দাঁড়িয়েছে 'জ্যাকামার জঙ্গল'। সেদিন পথ চলতে চলতে তীর ধনুক দিয়ে ক্যাঙারু মারলেন হার্বার্ট আর স্পিলেট। কাঁটাচুয়া আর পিপরে-ভুক-এর মত দেখতে আরও একটা জন্তু মারা পড়ল তীরের ঘায়ে। হিংস্র জন্তুর মধ্যে দেখা গেল কেবল বুনো শূওর। পাশের গাছে ঝুলতে দেখা গেল একটা ভীষণ কুঁড়ে স্লথ-কে।

পাঁচটা নাগাদ জ্যাকামার জঙ্গল পেরিয়ে রেড ক্রীক নদী থেকে শ'খানেক গজ দূরে কুঁড়ে ঘর তৈরী করে নিলেন দ্বীপবাসীরা। আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রাত কাটানো হল সেখানে। পাহারায় রইল একজন।

পরদিন একুশে এপ্রিল।

শিরার মত সরু সরু লোহার স্তর বের করলেন হার্ডিং। মাটির উপর ছড়িয়ে থাকা কয়লাও পাওয়া গেল। মাটির চোঙা তৈরী করে লাগানো হল হাপরের গায়ে। পর-পর বিছোনো হল কয়লার আর লোহার স্তর। হাপরের হাওয়া যাবে উত্তপ্ত লোহা-কয়লার ফাঁক দিয়ে। পদ্ধতিটা প্রাচীন হলেও কার্যকরী। বিশ্বের প্রথম ধাতুবিদরা এই ভাবেই লোহা বের করেছিলেন। হাপরের হাওয়ায় কয়লা পরিণত হবে কার্বলিক অ্যাসিডে, তারপর কার্বন মনোক্সাইডে। ফলে আয়রণ অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে যাবে। থাকবে শুধু আয়রণ। তারপর তুন্দুর বানিয়ে শুরু হল অপরিষ্কার লোহা গলানোর কাজ। হাপরের হাওয়ায় গনগনে আগুন জ্বলে উঠল চুল্লীতে। সে আগুনে লোহা গলে তরল হল। তাই দিয়ে হাতুড়ি, কাঁচি, খুন্তি, কুড়ুল, কোদাল ইত্যাদি হল। এমন কি তরল লোহায় পরিমাণ মত কয়লা মিশিয়ে ইস্পাত বানিয়ে নিলেন সাইরাস হার্ডিং।

এই ভাবেই সাঙ্গ হল স্রেফ বুদ্ধি আর মেহনতের জোরে যন্ত্রপাতি নির্মাণ।

এই যে ইস্পাতের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চিমনীতে ফিরে এলেন অভিযাত্রীরা।

ওই যে। আকাশের অবস্থা দেখে ভাবনায় পড়লেন অভিযাত্রীরা। শীত আসতে আর দেরী নেই। ঝড়জলের সময়ে চিমনী মোটেই নিরাপদ নয়। তারপর হার্ডিং ভয় ধরিয়ে দিলেন, এইসব নিরালা দ্বীপে হামেশাই মালয় বোম্বেটেদের দেখা যায়। সুতরাং ঝটপট এ-গুহা ছেড়ে অন্য একটা গুহায় আস্তানা না সরালেই নয়।

কিন্তু সে রকম আস্তানা কোথায়? এ-দ্বীপে পা দেওয়ার পর থেকে ক্রমাগত চরকীপাক খেয়েছেন দ্বীপবাসীরা। পেনক্রফটের আবিষ্কার করা এই চিমনীগুহার চেয়ে বড়সড় গুহা তো আর চোখে পড়েনি? তবে উপায়?

নতুন করে পাহাড় খুঁড়ে গুহা বানানো চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও শাবল, গাঁইতি, কুড়ুল, কোদাল এখন রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির বানানো কোনো গুহা পেলে মেহনতটা বেঁচে যায়। প্রকৃতি এতভাবে সাহায্য করলেন আর একটা গুহা জুগিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয় দেবেন। খোঁজ খোঁজ পড়ল তক্ষুণি। অভিযাত্রীরা মিষ্টিজলের লেকের ধারেকাছেই খুঁজতে লাগলেন গুহা। কিন্তু পণ্ডশ্রম হ'ল। মনের মত গুহা আর পাওয়া গেল না।

গুহা খুঁজতে গিয়ে সারা লেকটা ঘুরে এসেছিলেন হার্ডিং। কিন্তু কিছুতেই কিনারা করতে পারলেন না একটা রহস্যের।

উনি দেখলেন, রেড ক্রীক-এর জল এসে পড়ছে লেকে। কিন্তু জল কোথা দিয়েও বেরিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু তাতো হতে পারে না। বাড়তি জল নিশ্চয় কোথা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়ছে সাগরের জলে।

রোখ চেপে গেল হার্ডিং-এর। স্পিলেট বললেন—"আচ্ছা পাগল তো! জল যেখান দিয়েই বেরোক না কেন, তাতে তোমার কি হে?"

"আহা, তুমি বুঝেছো না কেন", বললেন হার্ডিং। "বাড়তি জল নিশ্চয় পায়ের তলার কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। সেই সুড়ঙ্গটাকেই তো আমি বাড়ী বানাতে চাইছি!"

"কি আবোল তাবোল বকছ?" যদিও স্পিলেট জানতেন হার্ডিং কখনো আবোল তাবোল বকেন না।

হ্রদের পাড় বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মস্ত সাপ দেখে চেঁচামেচি শুরু করল টপ। সাপটা লম্বায় চোদ্দ পনেরো ফুট। নেবের লাঠির ঘায়ে পরলোক যাত্রা করল সরীসৃপ মহাপ্রভু। হার্ডিং পরীক্ষা করলেন সাপের লাস।

বললেন—"ঢোঁড়াসাপ। বিষ নেই।"

রেড ক্রীক যেখানে হ্রদে পড়েছে, সেখানে পৌঁছাতেই হঠাৎ শান্ত টপ ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠল। একবার ছুটে যায় হ্রদের পাড়ে, আবার ফিরে আসে মনিবের কাছে। কখনো থমকে দাঁড়ায় জলের কিনারায়, জলের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে কি যেন দেখাতে চায় মনিবকে। জলের তলায় চোখের আড়ালে যেন এক মজার খেলার অস্তিত্ব টের পেয়েছে সে তার সারমেয় ইন্দ্রিয় দিয়ে। কখনো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, কখনো একদম চুপ মেরে যায়।

টপের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে অবাক হলেন ইঞ্জিনীয়ার।

এমন সময়ে দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল টপ।

"টপ! টপ! উঠে আয়!"

"টপ বোধহয় কাউকে দেখেছে", বলল হার্বার্ট।

"কুমীর হতে পারে", বললেন স্পিলেট।

হার্ডিং বললেন—"মোটেই নয়। এ ল্যাটিচিউডে কুমীর থাকে না।"

মনিবের ডাক শুনে টপ জল থেকে উঠে এসেছিল। কিন্তু কিছুতেই শান্ত হতে পারছিল না। পাড় বেয়ে লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল জলের কিনারা বরাবর। যেন জলের তলায় অদৃশ্য কেউ হাঁটছে, টপ তার সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না। জল কিন্তু প্রশান্ত। অভিযাত্রীরা অনেকবার খুঁটিয়ে দেখেও জলের তলায় কিছু দেখতে পেলেন না।

একী রহস্য!

হতভম্ব হয়ে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার হার্ডিং-ও।

আধঘন্টা ধরে টপের পেছন পেছন হেঁটে প্রসপেক্ট হাইটে এসে পৌঁছোলেন অভিযাত্রীরা, অথচ বাড়তি জল বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ চোখে পড়ল না।

কি আর করা যায়, চিমনীতে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন সকলে।

হ্রদের পাড় বেয়ে অভিযাত্রীরা ফিরে চলেছেন, এমন সময়ে একটা কাণ্ড করে বসল টপ।

শান্ত জল। কিন্তু অকস্মাৎ পাড়ে দাঁড়িয়ে গেল টপ। জলের দিকে তাকিয়ে হাঁকডাক শুরু করল কর্কশ কণ্ঠে।

পরক্ষণেই একটা তিমিজাতীয় দানবাকৃতি প্রাণীকে ভেসে উঠতে দেখা গেল হ্রদের জলে। পুরো আকার দেখা গেল না; কিন্তু বিশাল বপুর আভাষ পাওয়া গেল, তাইতেই থমকে দাঁড়াতে হল অভিযাত্রীদের।

ডানপিটে ক্যাপ্টেনের কুকুরও ডানপিটে হবে, এ-আর আশ্চর্য কি? নইলে হঠাৎ তীরবেগে জলে ঝাঁপ দেয় টপ? ঘেউ ঘেউ ডাকে নিস্তব্ধ অরণ্য মুখর করে সে এগিয়ে চলল বিশালকায় দানব-প্রাণীটার দিকে। দেখতে দেখতে দারুণ ঝটাপটি শুরু হল স্থলচরের সঙ্গে জলচরের—ক্ষুদে প্রাণীর সঙ্গে দৈত্য প্রাণীর। ফল যা হবার, তাই হল।

টপকে নিয়ে জলে ডুব দিল দানব-প্রাণী!

ককিয়ে উঠল নেব—'গেল! ছজনের একজন কমল! টপ আর আসবে!'

নেবের ইচ্ছে ছিল বর্শা হাতে জলে ঝাঁপ দেওয়ার—বাধা দিলেন হার্ডিং।

নেবের বিলাপ শেষ হতে না হতেই দেখা গেল টপকে। কি এক অদৃশ্য শক্তির ঠেলায় জল থেকে দশ ফুট ঊর্ধ্বে ছিটকে গেল টপ!

আশ্চর্য কাণ্ড তো! ফের জলে পড়েই ডাঙার দিকে সাঁতার শুরু করল বেপরোয়া টপ। দ্রুত জল কেটে তীরে উঠতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তার ওপর। মৃত্যুমুখ থেকে যে ফিরেছে, সে নিশ্চয় অক্ষত অবস্থায় ফেরেনি। ফিরতেও পারে না। কোথাও কোথাও চোট লাগবেই।

কিন্তু……!

ভ্যাবাচাকা মুখে দৃষ্টি বিনিময় করলেন অভিযাত্রীরা। দানব জলচরের খপ্পর থেকে অদ্ভুত উপায়ে ফিরে এসেছে টপ, অথচ তার সারা গায়ে একটা আঁচড় পড়েনি।

আশ্চর্যের আরো বাকী ছিল। আচম্বিতে দেখা গেল হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। আলোড়ন উঠে আসছে জলের তলা থেকে। প্রচণ্ড মারপিট চলছে যেন সেখানে।

বিকেলে গড়িয়ে তখন গোধূলির রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে। হ্রদের জলেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। রঙে রঙ মিলিয়েও যেন হ্রদের জল সহসা লাল হয়ে শুরু করল। এ রঙ রক্তের রঙ। হ্রদের জলে রক্ত মিশছে!

একটু পরেই ভেসে উঠল দানবিক প্রাণীটা। ভাসতে লাগল নিস্পন্দ দেহে।

হই হই করে অভিযাত্রীরা নিষ্প্রাণ প্রাণীটাকে টেনে আনলেন ডাঙায়। সোল্লাসে বললে হার্বার্ট—'আরে। এ যে দেখছি ডুগং!

ডুগং অর্থাৎ সাগর-গাভী! আকারে প্রকাণ্ড—দৈত্য বলেই ভ্রম হয়। পনেরো ষোল ফুট লম্বা। ওজন কমসে কম তিন থেকে চার হাজার পাউণ্ড।

কিন্তু ডুগং দেখে চমকাননি সাইরাস হার্ডিং। তিনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেন মৃত জলচরের কণ্ঠের ক্ষতর দিকে। এই আঘাতেই নিহত হয়েছে এতবড় প্রাণীটা।

হাঁ-করা ক্ষতটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন—'আঘাতটা কিন্তু ছুরী জাতীয় ধারালো অস্ত্রের!'

'ছুরী!' মুখ কালো হয়ে গেল পেনক্রফটের। জলের তলায় ছুরী!'

বিচিত্র হেসে বললেন সাইরাস হার্ডিং– 'অদ্ভুত, তাই না? কিন্তু এ দ্বীপে এমন অদ্ভুত কাণ্ডতো আসা ইস্তক ঘটে চলেছে! জল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় কে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গুহার মধ্যে? টপকে শুকনো অবস্থায় কে পৌঁছে দিয়েছিল তোমাদের কাছে? এই মাত্র টপকে কে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল জলের ওপরে? কে ছুরী হেনে বধ করল ডুগংকে? কে সে? জলের তলায় লুকিয়ে থেকে কে রহস্যের পর রহস্য সাজিয়ে চলেছে আমাদের সামনে? আড়াল থেকে কেন সে তীক্ষ্ণ নিজর রেখেছে আমাদের ওপর?'

ভারাক্রান্ত অন্তরে অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন চিমনীগুহায়।

পরদিন ৭ই মে হার্ডিং প্রসপেক্ট হাইটে উঠলেন স্পিলেটকে নিয়ে। নেব রইউ ব্রেকফাস্ট বানানোর কাজে। হার্বার্ট আর পেনক্রফট নদীর ধারে গেল কাঠকুটো আনতে।

ডুগং বধের জায়গায় গিয়ে চিন্তিত মুখে জলের দিকে চেয়ে রইলেন হার্ডিং। কি এক রহস্যজনক শক্তির আকর্ষণে টপ তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে এনেছে এইখানে, তারপরেই যেন একটা অদৃশ্য হাত টপকে ছুঁড়ে দিয়েছে জলের ওপরে, টুঁটি টিপে হত্যা করেছে ডুগংকে।

কে সে?

এই সময়ে হঠাৎ জলের মধ্যে একটা স্রোতের টান লক্ষ্য করলেন হার্ডিং।

কিছু খড়কুটো ছুঁড়ে দিতেই জলের টানে ভেসে চলল সেগুলো। পেছন পেছন চললেন দুজনে।

লেকের দক্ষিণ পাড়ে পৌঁছে দেখা গেল জল যেন সেখানে বসে গেছে। যেন জলের তলায় পাথর ফুটো হয়ে গেছে। জল সেখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

ঠিক যেন একটা ঘূর্ণিপাক। উনি হাতের লাঠি দিয়ে জলের টান পরীক্ষা করতে গেলেন। কিন্তু জল তাঁর হাত থেকে লাঠি টেনে নিয়ে গেল। লাঠি আর দেখা গেল না।

জমিতে কান পেতে শুনলেন হার্ডিং। জলপ্রপাতের স্পষ্ট গুমগুম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন হার্ডিং। বললেন সোল্লাসে—"পেয়েছি। সুড়ঙ্গ এইখানেই রয়েছে। ফুটখানেক নীচে।"

"তারপর?"

"জল অন্য কোথাও দিয়েও বের করব, এই সুড়ঙ্গ শুকিয়ে নেব।"

"কিভাবে তা সম্ভব হবে বুঝছি না তো?"

"লেকের যে-পাড় সমুদ্রের দিকে, সেইদিকের গ্র্যানাইট পাথর উড়িয়ে দেব বারুদ দিয়ে। ফুট তিনেক জল কমিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে গেল।"

"বল কি হে। বারুদ দিয়ে গ্র্যানাইট ওড়াবে?"

"বারুদ মানে নিছক গান পাউডারে তো কাজ হবে না", চিমনী ফিরে অপর সবাইকে বুঝিয়ে বললেন সাইরাস হার্ডিং।" এরজন্যে চাই বিশেষ ধরনের শক্তিশালী বিস্ফোটক। "ঈশ্বরের কৃপায় মাল মশলা এই দ্বীপেই মজুদ আছে, শুধু বানিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা।"

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন হার্ডিং। ডুগং-এর চর্বি রেখে দেওয়া হয়েছিল। সামুদ্রিক গুল্ম পুড়িয়ে পাওয়া গেল সোডা-সমৃদ্ধ ক্ষার। সেই সোডা দিয়ে সাবান বানাতেই চর্বি থেকে আলাদা হয়ে গেল গ্লিসারিন। পাহাড়ের যে অঞ্চলে কয়লার স্তর দেখা গিয়েছিল, সেখানে পাওয়া গেল খনিজ ধাতু। মণ মণ পাথর পুড়িয়ে আলাদা করে নেওয়া হল হীরাকষ। হীরাকষ থেকে তৈরী হল সালফিউরিক এ্যাসিড। সামুদ্রিক গাছপালা পুড়িয়ে বেরোলো সোডা। সোডার সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে সাবান। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের তলা থেকে খুঁজে আনা হল সোরা। সালফিউরিক এ্যাসিডের সঙ্গে সোরা মিশিয়ে তৈরী হল নাইট্রিক এ্যাসিড। তাতে গ্লিসারিন মেশাতে পাওয়া গেল তেলতেলে হলদে রঙের কয়েক বোতল তরল পদার্থ।

বন্ধুদের ডাক দিয়ে বললেন হার্ডিং—"এসো হে, দেখে যাও আমার

কেমিষ্ট্রি বিদ্যে। এর নাম নাইট্রোগ্লিসারিন। এই দিয়ে দ্বীপ উড়িয়ে দেব আমি।"

চোখ বড় বড় করে পেনক্রফট বললে—"এই তেল দিয়ে গ্র্যানাইট পাথর গুঁড়ো করবেন?"

"হ্যাঁ। কাল একটা গর্ত খুঁড়বে তুমি। তারপর দেখবে ভেলকি।"

পরদিন একুশে মে।

লেক গ্রান্ট-এর পূর্ব পাড়। গাইতি চালাতে দেখা গেল পেনক্রফটকে। সে ক্লান্ত হলে হাত লাগাল নেব। সারাদিন ধরে মেহনত করে বিকেল নাগাদ খোঁড়া হল একটা গর্ত।

নাইট্রোগ্লিসারিন এমন একটা এক্সপ্লোসিভ আঘাত দিয়ে যাকে ফাটানো যায়। তাই গর্তের ওপর তিনটে খুঁটি পোঁতা হল। খুঁটি তিনটের ডগা বাঁধা হল এক জায়গায়। বাঁধা জায়গা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা ভারী লোহার পিণ্ড। লোহাবাঁধা দড়ির সঙ্গে আর একটা দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া হল বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত। শেষের দড়িতে মাখান রইল গন্ধকের বারুদ। দড়িদড়া সবই তৈরী হল গাছের ছাল দিয়ে। সবশেষে লোহার ডেলার ঠিক নীচে পাথরের গর্তে ঢেলে দেওয়া হল নাইট্রোগ্লিসারিন।

গন্ধক মাখান পলতে-দড়িতে আগুন দিলেন হার্ডিং! এ-দড়ি পুড়ে লোহা-বাঁধা দড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে সময় লাগবে কম করে পঁচিশ মিনিট। এরই মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চিমনী ফিরে এলেন দ্বীপবাসীরা।

যথা সময়ে গন্ধকের আগুন গিয়ে পৌঁছোলো লোহা বাঁধা দড়িতে। সে দড়ি পুড়তেই খসে পড়ল ভারী লোহাটা—দুরমুশের মতই প্রচণ্ড আঘাত হানল তরল নাইট্রোগ্লিসারিনের ওপর।

ভীষণ বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা দ্বীপটা। বড় বড় পাথর টুকরো ছিটকে গেল আকাশে। মাইল দুয়েক দূরে চিমনী গুহা বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল। সামলাতে না পেরে সটান মাটিতে আছড়ে পড়লেন দ্বীপবাসীরা!

হই হই করে দৌড়োলেন পাঁচজনে লেকের পাড়ে। গিয়ে দেখা গেল সত্যিই গ্র্যানাইটের পাড় উড়ে গিয়েছে! মস্ত একটা ছিদ্রপথে ভীষণ তোড়ে জল বেরিয়ে গজরাতে গজরাতে ফেনিল প্রপাতের আকারে গিয়ে পড়ছে সাগরের জলে!!

আকাশ বিদীর্ণ হল আনন্দধ্বনিতে!

গহ্বরের মুখটা দেখা গেল চওড়ায় বিশফুট আর উচ্চতায় মাত্র দুফুট। এত কম উচ্চতা থাকলে তো চলবে না। যাকগে, পরে তা নিয়ে ভাবা যাবে'খন। আপাততঃ সুড়ঙ্গ অভিযান তো হোক। নেব আর পেনক্রফট গাঁইতি চালিয়ে, খানিকটা চওড়া করে নিল সুড়ঙ্গ মুখ।

চকমকি আর ইস্পাত ঠুকে কাঠকুটোর দুটো মশাল জ্বালানো হল। একে একে সবাই প্রবেশ করলেন সেই আশ্চর্য গহ্বরে যেখানে যুগ যুগ ধরে কেবল জল বয়ে গেছে—মানুষের পদার্পণ ঘটেনি।

ভীষণ পিচ্ছিল পথ। পাছে পা হড়কে যায়, তাই যাত্রীরা একই দড়ি দিয়ে পরস্পরের কোমর বেঁধে রেখেছিলেন। টপ আগে আগে চলেছে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে।

দেখা গেল, গহ্বরের মেঝে তেমন ঢালু নয়। গহ্বরের ছাদও ক্রমশঃ উঠছে উঁচুতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা সিধে করে সবাই হেঁটে চললেন প্রকৃতির সেই একান্ত নিভৃত প্রস্তর-আলয়ের পিচ্ছিল মেঝে দিয়ে।

আচম্বিতে ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ। আস্তে আস্তে আরো নামার পর দেখা গেল গুহা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই একটা কুয়ো। কুয়োর পাড় ঘিরে উত্তেজিত ভাবে ছুটোছুটি করছে টপ, আর কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে হাঁকডাক জুড়েছে কর্কশ কণ্ঠে। ভাবখানা যেন, 'পালাচ্ছিস কেন? উঠে আয় না, এক চক্কর লড়া যাক!'

নিশ্চয় কোনো জলজন্তু ঘাপটি মেরে ছিল এখানে। এতগুলি আগন্তুকের আবির্ভাবে চম্পট দিয়েছে কুয়োর মধ্যে দিয়ে। এই কুয়ো দিয়েই লেকের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ছিল, আঁচ করে একটা জলন্ত ডাল নিয়ে ফেলে দিলেন হার্ডিং। জলতে জ্বলতে নেমে গেল মশাল। তারপর আওয়াজ হল—'ছ্যাৎ'

মশাল জলে পড়েছে। সময়টা হিসেব করে দেখলেন হার্ডিং। কুয়োর মুখ থেকে সমুদ্র তাহলে প্রায় নব্বই ফুট নীচে!

গুহার প্রান্তদেশ ফুটো করলে অনেকটা আলো পাওয়া যেত। জানলাও বানানো যেত। যেমন ভাবনা, অমনি কাজ। পেনক্রফট দমাদম শব্দে গাইতি চালালো পাথুরে দেওয়ালে। কঠিন পাথর। পেনক্রফট বেদম হলে গাঁইতি ধরল নেব। এইভাবে অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ স্পিলেটের হাত থেকে গাঁইতি ছিটকে বেরিয়ে গেল দেওয়ালের ফুটো দিয়ে।

মেপে দেখলেন হার্ডিং প্রায় তিনফুট পুরু এখানকার দেওয়াল।

আলোর বন্যায় গুহার আঁধার তখন পালিয়েছে। দেখা গেল আশ্চর্য সেই গুহার অভ্যন্তর। একদিক প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু। আর একদিক আশি ফুট উঁচু।

গভীর কণ্ঠে বললেন হার্ডিং—"বন্ধুগণ। এই আমাদের বাড়ী। নীচু ছাদের তলায় হবে আমাদের শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। উঁচু ছাদের তলায় বানাবো বসবার ঘর, জাদুঘর।"

"বাড়ীর নাম ?" বলল হার্বার্ট।

"গ্র্যানাইট হাউস।"

"হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!"

একটু জিরিয়ে নিয়ে চিমনীতে ফিরে এলেন অভিযাত্রীরা।

১৬

পরদিন ২২শে মে।

শুরু হল নতুন আস্তানার কাজ। চিমনী গুহাটাকেও রেখে দেওয়া হল ভবিষ্যতের কারখানার জন্যে।

প্রথমেই দল বেঁধে যাত্রীরা গেলেন সমুদ্রের তীরে। স্পিলেটের হাত ফস্কে ঠিকরে যাওয়া গাঁইতটা পাওয়া গেল সেখানে। ওপরে তাকাতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে সদ্য ফুটোটা।

ঠিক হল পাচটা ঘর হবে। পাঁচটা জানালা থাকবে। আর একটা দরজা।

দরজা থেকে লম্বা সিঁড়ি ঝোলানোর ব্যবস্থা হবে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত। সাইরাস হার্ডিং বুঝিয়ে দিলেন, লেকের দিকের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া দরকার। নইলে অনাহুত উপদ্রব হানা দিতে পারে। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে সিঁড়িটা টেনে তুললেই নিশ্চিন্ত। পাখী ছাড়া কারো ক্ষমতা হবে না উৎপাত করার।

"কিন্তু অত ভয় কাকে ?" সব শুনে বললে পেনক্রফট। সারা দ্বীপে তো মানুষের চিহ্ন দেখলাম না।"

"এখন নেই, কিন্তু পরে বাইরে থেকেও তো আসতে পারে!"

প্ল্যানমাফিক আগে জানলা বের করা হল পাথুরে দেওয়ালে ফুটো করে। গাঁইতির কাজ নয় জেনে শরণ নিতে হল নাইট্রোগ্লিসারিনের। ধারগুলো গাঁইতি আর শাবল দিয়ে সমান করে দিলেন অভিযাত্রীরা।

পাচ ভাগ করা হল গহ্বরকে। প্রত্যেক ঘরের সামনের দিক থাকবে সমুদ্রের দিকে। এত করেও জায়গা পড়ে রইল প্রচুর। আবার ইটের পাঁজা

বানিয়ে বিস্তর ইঁট তৈরী হল। সেই ইঁট সমুদ্রের দিক দিয়ে গহ্বরে তোলার জন্যে বানানো হল সিঁড়ি।

পেনক্রফট একাই ভার নিয়েছিল সিঁড়ির। নাবিক মানুষ তো। দড়ি-দড়ার ব্যাপারটা ভাল বোঝে। বেত মুড়ে সিঁড়ির দু'পাশের মূল দড়ি তৈরী হল। কাঠের ধাপ লাগানো হল আড়াআড়ি ভাবে। দেখা গেল সিঁড়ির দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে আশি ফুট।

চল্লিশ ফুট ওপরে একটা পাথুরে চাতাল ছিল। সিঁড়ির অর্ধেক ঝোলানো হল সেই চাতাল পর্যন্ত। বাকী অর্ধেক চাতাল থেকে তলা পর্যন্ত। ফলে বন্ধ হল লম্বা সিঁড়ির ভীষণ দুলুনি।

এবার ইঁট তোমার ব্যাপার। গাছের ছাল পাকিয়ে দড়ি বানিয়ে, সেই দড়ি কপিকলের মধ্যে গলিয়ে তোলা হল হাজার হাজার ইঁট। দেদার চুন দিয়ে ইঁট গেঁথে পার্টিশন করে ফেলা হল গহ্বরটিকে। রান্না ঘরে হল ইটের চিমনা—ধোঁয়া বার করে দেওয়ার জন্যে।

তারপর বড় বড় পাথর গড়িয়ে নিয়ে হ্রদের দিকের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিলেন হার্ডিং। সিমেণ্ট দিয়ে গেঁথে ঘাস লাগাতেই নিশ্চিহ্ন হল প্রবেশ পথ। নিরাপদ বোধ করলেন সকলে।

বাকী রইল ঘরগুলোর চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি ফার্নিচার। ও সব কাজ মুলতুবী শীতের জন্যে।

ইতিমধ্যে স্পিলেট সাহেব হার্বার্টকে নিয়ে শিকার করতে গিয়ে দেখে এলেন খরগোশের একটা বিশাল আড্ডা। মাটির ওপর ঝাঁঝরির মত অগন্তি গর্ত। এত গর্ত এবং এত খরগোশ যা কোনোদিন ফুরোবে না।

ঘর হল, খাবার রইল। এবার আসুক শীত, আসুক মালয় ডাকাত!

১৭

জুন মাস থেকেই শুরু হল শীতের প্রকোপ। ভ্রূক্ষেপ না করে "নতুন নতুন কাজ নিয়ে মেতে রইলেন দ্বীপবাসীরা। প্রথমেই টনক নড়ল মোমবাতি নিয়ে। হার্ডিংয়ের নির্দেশে ছটা সীল বধ করে ফেলল পেনক্রফট। সীলের চর্বি, চূণ আর সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়ে বানানো হল এঁকা-বেঁকা ষ্টিয়ারিক মোমবাতি। চূণ দিয়ে প্রথমে চর্বিকে সাবানে পরিণত করা হল। তারপর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ক্যালসিয়াম সালফেট আলাদা করতেই পড়ে রইল তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড। ওলিক, মারগারিক আর ষ্টিয়ারিক—এই তিনটে

ফ্যাটি অ্যাসিডের শেষের দু'টিকে মোমবাতি তৈরীর কাজে লাগলেন হার্ডিং। পলতে হল শাকসব্জির আঁশ দিয়ে।

সীলের চামড়া জমিয়ে রাখা হল পরে জুতো করার জন্যে। জামাকাপড়ের কথাও ভাবলেন হার্ডিং। শীত চেপে পড়লে গরম কাপড় দরকার হবেই। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ে ভেড়ার মত লোমওয়ালা মুশমন্ অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের লোম দিয়ে গরম জামা এ শীতে বোধহয় হয়ে উঠবে না।

রাশি রাশি খরগোশ আর মাছ শুকিয়ে নুন দিয়ে মজুদ রাখল নেব অসময়ের জন্যে। পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলো ঘষে-মেজে সাফ করা হল। কিছু কিছু নতুন যন্ত্রও তৈরী হল। যেমন একটা কাঁচি। ফলে সন্ন্যাসীর মত দাড়ি গোঁফ কেটে অনেকটা ভদ্রস্থ হলেন অভিযাত্রীরা।

তৈরী হল একটা বদখৎ চেহারার করাত। ঘষড়ে একটু বেশী জোর লাগলেও করাতটা কাজ দিল অনেক। টেবিল, চেয়ার, খাট, টুল, তাক— সবই হল এই একটি মাত্র করাতের দৌলতে।

তৈরী হল দুটো কাঠের সেতু। প্লেটো আর সমুদ্রতীরের মধ্যিখানে সেতুবন্ধন হতেই নেব আর পেনক্রফটের ফুর্তি দেখে কে। বালিতে পড়ে থাকা রাশি-রাশি শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে এনে মজুদ রাখল খাবার ভাঁড়ারে।

সবই পাওয়া গেল লিঙ্কলন দ্বীপে। টক শরবৎ বানানের জন্যে একরকম গাছের শেকড়, চিনি বানানের জন্যে ম্যাপল্ গাছ, চা-য়ের বিকল্প তৈরীর জন্যে এক জাতীয় ঘাস। নুন আছে, মাংস আছে, মাছ আছে। বাকী শুধু রুটি।

সাইরাস হার্ডিং তালে ছিলেন দ্বীপের মধ্যেই 'ব্রেডফ্রুট' জাতীয় গাছ খুঁজে নেওয়ার। গমের কাজটা তাই দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু বিধাতা আরও বেশী সদয় হলেন এ ব্যাপারে। এ রকম অভাবনীয় কাণ্ড কল্পনাতেও আনতে পারেননি দ্বীপের বাসিন্দারা।

পেনক্রফট রিচমণ্ডে থাকার সময়ে কয়েকটা পায়রা কিনে দিয়েছিল হার্বার্টকে। রোজ গম খাওয়াতে হত পায়রাদের। ফলে একটা গমের দানা আশ্চর্যভাবে ঢুকে গিয়েছিলে কোটের সেলাইয়ের ফাঁকে।

হঠাৎ একদিন সামান্য এই দানাটিই তুলে দেখাল হার্বার্ট। দেখেই লাফিয়ে উঠলেন সাইরাস হার্ডিং।

"গমের দানা! জয় ভগবান! রুটির অভাবও এবার মিটল!"

"এক দানা গমে রুটি?" অবিশ্বাসীকণ্ঠে বলল হার্বার্ট।

"এক দানা পুঁতলে প্রথম বছরে আটশো দানা, আটশো দানা পুঁতলে

দ্বিতীয় বছরে ছ'লক্ষ চল্লিশ হাজার দানা। বছর দুইয়ের মধ্যে গমের চাষ শুরু করে দেব হে!"

বিশে জুন গমের অমূল্য দানাটি রোপণ করা হল গ্র্যানাইট হাউসের ছাদের প্লেটোতে। মাটি সাফ করা হল। চূণ মেশানো ভাল মাটি মেশানো হল, বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরা হল। তারপর জলে ভেজা উর্বর মাটিতে বনমহোৎসব হয়ে গেল ঐ একটি মাত্র গমের দানা সাড়ম্বরে রোপণ করে।

১৮

সেই দিন থেকে উৎসাহের অন্ত রইল না পেটুক শিরোমনি পেনক্রফট-এর। শস্যক্ষেত্রটিকে নিয়মিত দেখে আসা, আশেপাশের কীটপতঙ্গ মেরে ফেলা ওর নিত্যকাজ হয়ে দাঁড়াল।

জুনের শেষ। তুমুল বৃষ্টিরও হল শেষ। নামল ঠাণ্ডা। লেকের জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেল।

গ্র্যানাইট হাউসের ভেতরটা বেশ গরম থাকায় আরাম পেলেন অভিযাত্রীরা। তার ওপর আগুন পোহাবার ফায়ার প্লেস বানিয়ে নেওয়ার কোনো অসুবিধেই রইল না। লেকের জল জমলেও আগেভাগেই লেক থেকে সরাসরি ভাঁড়ার ঘর পর্যন্ত জল টেনে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন হার্ডিং। বরফের তলা দিয়ে আসার দরুন আর ঘরের গরমে সে জল বরফ হতে পারল না।

যাই হোক, ঝড়জল থামবার পর দ্বীপবাসীরা ঠিক করলেন গরম জামা-কাপড় পরে জলাজায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে আসা যাক। মার্সি নদীর তীরে এ-অঞ্চলে পাখী আছে নানা ধরনের। শিকার ভালই মিলবে।

পাঁচই জুলাই ভোর ছ'টায় রওনা হলেন সবাই। সঙ্গে শিকারের জিনিসপত্র আর খাবার-দাবার। সবার আগে টপ।

জায়গাটা মার্সি নদীর দক্ষিণ পাড়ে। দ্বীপের বাসিন্দারা সেই প্রথম পা দিলেন সেখানে। টপের তাড়া খেয়ে ঝোপের মধ্যে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল একপাল শেয়াল। পালাবার সময়ে অনেকটা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ ডাক দেওয়ায় ভড়কে দাঁড়িয়ে গেল টপ। হার্বার্ট বুঝল, শেয়ালগুলো মেরু-শিয়াল— তাই কুকুরের মত ডাকতে পারে।

বেলা আটটা নাগাদ সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর বরাবর হাঁটতে লাগলেন সবাই। জায়গাটা অনুর্বর। পাহাড় পর্বত নেই। মাইল চারেক দূরে পেছনে দেখা যাচ্ছে দ্বীপের গাছপালা।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসে স্পিলেট বললেন—'মহাদেশে হরেক রকম জমিজমা জন্তুজানোয়ার দেখা যায়, এ-দ্বীপেও দেখছি তাই।'

হার্ডিং বললেন—'কথাটা বলেছ ঠিক, স্পিলেট। দ্বীপটার গড়ন আর ভূপ্রকৃতি সত্যিই অদ্ভুত। এককালে হয়ত মহাদেশেরই অঙ্গ ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে যত দ্বীপ আছে, আমার তো মনে হয় সবই মহাদেশের চূড়ো। দেশটা জলে তলিয়েছে, ডগাগুলো মাথা তুলে আছে। সেই কারণেই বোধহয় লিঙ্কলন দ্বীপে সব রকমের গাছ, জন্তু, পাখী দেখেছি। আশ্চর্য কিছু নয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউআয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলেশিয়া একত্রে এককালে পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ ছিল।'

'যেমন ছিল আটলান্টিস?' শুধোলো হার্বার্ট।

'হ্যাঁ, বাবা। আটলান্টিস নামে সত্যিই একটা মহাদেশ কোনোকালে থাকলে তা এইভাবেই ছিল! এখন তা জলের তলায়। লিঙ্কলন দ্বীপও যে মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা তলিয়ে গেছে, রয়েছে কেবল চূড়োটুকু।'

চোখ কপালে তুলে পেনক্রফট বললে—'বলেন কি ক্যাপ্টেন! তাহলে তো লিঙ্কলন দ্বীপও জলে ডুব মারবে যে কোনোদিন। সব দ্বীপ এভাবে ডুবে গেলে এশিয়া আর আমেরিকার মাঝের সমুদ্রটা ন্যাড়া হয়ে যাবে না?'

'আবার নতুন দ্বীপ জাগবে, বললেন হার্ডিং। 'প্রবাল পোকারা সমুদ্রের তলায় প্রতি মুহূর্তে কত দ্বীপ গড়ে চলেছে, সে হিসেব কি কেউ রাখে? চার কোটি সত্তর লক্ষ প্রবাল কীটের ওজন একদানা গমের সমান। অথচ এরাই সামুদ্রিক নুন থেকে এমন চূণাপাথর বানাচ্ছে যা গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত। সাগর তলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কত দেশই না গড়ে চলেছে এরা।'

'এ দ্বীপও কি প্রবাল কীটের তৈরী, ক্যাপ্টেন?.

'না। এ-দ্বীপ বানিয়েছে আগুন-পাহাড়।'

'সর্বনাশ! তাহলে তো আগুন-পাহাড় যে কোনোদিন ডুবিয়ে ছাড়বে দ্বীপশুদ্ধ আমাদের!'

'তার আগেই আমরা এখান থেকে চলেও যেতে পারি।'

কথায় কথায় পথ ফুরোলো। সামনে বিশাল বাদা। ক্ষেত্রফল মাইল কুড়ি। জমিতে কাদার সঙ্গে রয়েছে আগ্নেয়শিলা, পুরু ঘাসের চাপড়া, জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা, দুর্গন্ধময় পচা ঘাস। খাস ম্যালেরিয়ার ঘাঁটি যেন! জলে রয়েছে হাঁস, টিল, স্নাইপ প্রভৃতি পাখীর দল—মানুষ দেখলে ভয়ডর নেই। ছররা বন্দুক থাকলে নিকেশ করা যেত পালে পালে—তীরধনুকে তা সম্ভব নয়।

তবুও তীরধনুক দিয়ে কিছু পাখী মারা হল। বেশ রঙচঙে পাখী। হার্বার্ট পাকা পক্ষীবিদের মতই বলে উঠল—'আর সাবাস! এ তো দেখছি ট্যাডরন পাখী।'

সেই থেকে জলাভূমির নাম হয়ে গেল 'টাডরন বাদা'।

গ্র্যানাইট হাউস ফিরতে ফিরতে বাজল রাত আটটা।

১৯

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে শীতের কামড় যে কি জিনিস তা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গেল। হাওয়া বইলে আর রক্ষে নেই, হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠত ঠাণ্ডায়। নেব তো একদিন ঠাট্টা করে বললে পেনক্রফটকে—'দ্বীপে ভালুক থাকলে, ভালুকের চামড়ার কোট বানিয়ে দিতাম তোমাকে।'

কিন্তু ভালুক তো নেই লিঙ্কলন দ্বীপে। প্রসপেক্ট হাইটের ওপরে জঙ্গলের একধারে রোজ ফাঁদ পাতত দ্বীপবাসীরা। কিন্তু শেয়াল ছাড়া ফাঁদে কিছু পড়ত না। বড় জন্তু তো নয়ই। স্পিলেটের কথামত মরা শেয়ালের টোপ ফেলার পর থেকে কিছু কিছু বুনো শূওর পড়ল ফাঁদে। খরগোসও মাঝে মাঝে ধরা দিল গর্ত্যের মধ্যে।

তারপর একদিন আবার আকাশে-বাতাসে ঘনঘটা দেখা গেল। শুরু হল বরফপাত। সাদা হয়ে গেল সবুজ বনভূমি।

দ্বীপের বাসিন্দারা নিরুপায় হয়ে গ্র্যানাইট হাউসের গরমে বসে তক্তা চিরে বেশ কিছু চেয়ার টেবিল বানিয়ে নিলেন। নেব বেত পাকিয়ে তৈরী করল ঝুড়ি। ম্যাপল-রস জ্বাল দিয়ে হল মিছরির ডেলা।

আগস্টের শেষে বরফ পড়া থামল। দ্বীপবাসীরা বাইরে গিয়ে লিঙ্কলন দ্বীপকে আর চিনতে পারলেন না। যেদিকে তাকানো যায় শুধু বরফ আর বরফ।

ফাঁদের কাছে কিন্তু পাওয়া গেল নখযুক্ত থাবার চিহ্ন। বেড়াল জাতীয় চতুষ্পদের পদচিহ্ন। তবে ঠাণ্ডায় পশ্চিমের বন থেকে চলে এসেছে তারা এদিকে? ভাবনায় পড়লেন দ্বীপবাসীরা!

কিছুদিন পরে আবার ঠাণ্ডা পড়ল। আবার বন্দী হতে হল গ্র্যানাইট হাউসে। এ সময়ে সব চাইতে অস্থির হতে দেখ গেল টপকে। বারবার সে ছুটে যেত কুয়োর পাড়ে। গরগর করে গজরাতো আপন মনে।

হার্ডিং তাই দেখে বললেন—'টপ টের পেয়েছে কাউকে। কুয়োর তলায় নিশ্চয় কেউ এসে বসে থাকে।'

এর কিছুদিন পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা দ্বীপের ইতিহাসে স্মরণীয়।

ছাব্বিশে অক্টোবর। শীত কমেছে। বরফ গলেছে। পেনক্রফট গেছে ফাঁদের কাছে। দেখলে একটা বড় পিকারি শূওর ধরা পড়েছে—সঙ্গে দুটো মাস তিনেকের বাচ্চা।

সে রাতে মহাভোজ রান্না হল। বাচ্চা পিকারি সেঁকা, ক্যাঙারুর ঝোল, শূয়োরের মাংস, স্টোপনাইন বাদাম আর ওসবেগো ঘাসপাতার চা।

মহানন্দে পিকারি চিবুচ্ছে পেনক্রফট। আচমকা সেকী চীৎকার বেচারির:

'কি হল! কি হল!'

'হবে আবার কি—একটা দাঁত ভাঙল আমার!'

'দাঁত ভাঙল! সে কি পেনক্রফট, তোমার এত সাধের পিকারির মাংসে কি পাথর ঢুকেছিল?' শুধোলেন স্পিলেট।

পাথর নয়, পাথর নয়—মুখ থেকে শক্ত বস্তুটা বার করে দেখাল পেনক্রফট—সীসের গুলি!

বন্দুকের বুলেট!!

বিজন দ্বীপে পরিত্যক্ত ক্রীতদাস

ম্যাক্রুন্‌ডে

১

বন্দুকের বুলেট!

যে-দ্বীপে মানুষের কোনো চিহ্ন এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সেখানে মানুষের হাতিয়ারের চিহ্ন আসে কি করে? বুলেট নিশ্চয় শূওরের পেটে আপনাআপনি গজায় না, কেউ তাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু কে সে?

সামনে যেন ভূত দেখছে, এমনি ভাবে সবাই তাকিয়ে রইলেন বন্দুকের গুলিটার দিকে।

সাইরাস হার্ডিং শুধোলেন—'পেনক্রফট। যে শূওরের পেটে গুলিটা পেয়েছে তার বয়স কত?'

'মাস তিনেক। ফাঁদে পড়েও মায়ের দুধ খাচ্ছিল।'

'তাহলে তিন মাসের মধ্যে কেউ এ-দ্বীপে গুলি ছুঁড়ছে। সে মালয় বোম্বেটে হতে পারে, নাও হতে পারে। দ্বীপে সে এখনো আছে কি নেই, তাও জানি না। সুতরাং হুঁশিয়ার হয়ে চলা দরকার এখন থেকে।'

ফট করে নেব বলে উঠল—'আমার তো মনে হয় গুলিটা পেনক্রফটের মুখেই ছিল অ্যাদ্দিন।'

মহাখাপ্পা হয়ে বললে পেনক্রফট—'এই পাঁচ ছ'মাস ধরে নিরেট গুলিটা আমার মুখে ছিল, আর আমি জানতে পারিনি বলতে চাও? বেশ তো, এই হাঁ করলাম, দেখো দিকি মুখের কোথাও ফুটো-টুটো আছে কিনা।' বলেই সিংহের মত মুখ ব্যাদান করল। পেনক্রফট।

এত দুঃখেও হেসে ফেললেন ক্যাপ্টেন। বললেন—'নেবের কথা ছাড়ো। তিনমাসের মধ্যে দ্বীপে কেউ এসেছিল। সে মালয় ডাকাত হলেও হতে পারে।'

পেনক্রফট বললে—'একটা ছোট ক্যানো নৌকা বানাতে দিন পাঁচেক লাগবে। বানিয়ে নেব? তাহলে জলপথে দ্বীপটা দেখা যেত।'

হার্ডিং রাজী হলেন। কিন্তু কথা দিতে হল, নৌকা না হওয়া পর্যন্ত

গ্র্যানাইট হাউস ছেড়ে বেশী দূরে কেউ যাবে না। একদিন অবশ্য শিকারে বেরিয়ে হার্বার্ট একটা বেজায় উঁচু গাছের মগডালে উঠে দেখে এল চারপাশ। কিন্তু সমুদ্রের কোথাও বোম্বেটেদের জলযান বা দ্বীপের মধ্যে ধোঁয়া কিছুই দেখতে পেল না।

দুদিন পরেই ঘটল আর একটা নতুন রহস্য!

আটাশে অক্টোবর।

হার্বার্ট আর নেব গ্র্যানাইট হাউস থেকে মাইল দুই দূরে সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে দেখল একটা পেল্লায় কচ্ছপ চলেছে পাথরের ওপর দিয়ে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দুজনে মিলে উল্টে চিৎপাত করে দিল কচ্ছপটা। এ-অবস্থায় আর নিজে থেকে সিধে হওয়া সম্ভব নয় কচ্ছপের পক্ষে। তা সত্ত্বেও চারপাশে পাথর গুঁজে রাখা হল যাতে কোন মতেই পালাতে না পারে।

কিন্তু সেই কচ্ছপই দেখা গেল উধাও হয়েছে—আশ্চর্য উপায়ে!

ওরা ঠেলাগাড়ী আনতে গিয়েছিলেন গ্র্যানাইট হাউসে। কচ্ছপের মাংস দিয়ে মহাভোজের স্বপ্নে মশগুল হয়ে ফিরে এল। এসে দেখল পাথরগুলো যেমন তেমনি পড়ে আছে—ভোজবাজির মত শুধু মিলিয়ে গিয়েছে কচ্ছপটা!

শুনে গম্ভীর হলেন সাইরাস হার্ডিং!

২

ঊনত্রিশে অক্টোবর।

ঠিক পাঁচদিনের মধ্যেই গাছের ছাল জুড়ে ক্যানো তৈরী সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজ চলার মত সাদাসিদে নৌকো। ওজনে আড়াই মণ। লম্বায় বারো ফুট।

নৌকো কি রকম হয়েছে, পরখ করার জন্যে সবাই নৌকোয় গিয়ে বসলেন। হার্বার্ট ভয় পেয়েছিল, নৌকোয় জল চুঁইয়ে উঠছে দেখে। পেনক্রফট বললে—'নতুন নৌকো একটু জল তো উঠবেই। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দ্বীপ থেকে আধ মাইল তফাত থেকে নৌকো বেয়ে চলল পেনক্রফট। ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়কে এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। তীরভূমির অনেক কিছু অদেখা জায়গা নোটবইয়ে এঁকে নিচ্ছেন স্পিলেট। ঘণ্টাখানেক পরে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট—'ওটা কী! ওটা কী!'

সকলেই দেখলেন জিনিসটা। সমুদ্রের তীরে পড়ে রয়েছে বড় বড় দুটো পিপে, মাঝে বাঁধা একটা মস্ত সিন্দুক!

নোকো লাগানো হল তীরে। সিন্দুকটা বালির মধ্যে প্রায় চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছে। নিশ্চয় জাহাজডুবি হয়েছে আশেপাশে। দামী জিনিসপত্র বোঝাই করে সিন্দুকটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে পিপের মাঝে বেঁধে!

পরমোল্লাসে পাথর নিয়ে তখুনি সিন্দুকের ডালা ভাঙে আর কি পেনক্রফট। বাধা দিলেন হার্ডিং। বললেন—"লাভ কি বাক্সটাকে ভেঙে। আমাদেরই কাজে লাগবে আস্ত থাকলে।"

সুতরাং জোয়ারের জলে ফের ভাসিয়ে দেওয়া হল পিপেসমেত সিন্দুক। ভাসমান অবস্থায় নৌকো তাদের টেনে নিয়ে এল গ্র্যানাইট হাউসের সামনে।

ভাটার টানে জল না নামা পর্যন্ত নানান জল্পনায় মশগুল হয়ে রইল দ্বীপবাসীরা। সিন্দুকের নির্মাণকার্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের কোনো কারিগর বানিয়েছে একে—প্রাচ্যের কেউ নয়। সুতরাং সিন্দুকটা মালয় বোম্বেটেদের নয়। অতএব এ-বাক্স জাহাজডুবি মানুষদের। কিন্তু তারা কি লিঙ্কলন দ্বীপে উঠেছে? শূওরের পেটে বন্দুকের বুলেটের সঙ্গে এই বাক্স প্রাপ্তির কোনো সম্পর্ক আছে কি? হার্বার্ট আর নেব অবশ্য তন্নতন্ন করে লম্বা গাছের মগডালে উঠে দেখে এল, ভাঙা মাস্তল বা ভাঙা জাহাজের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

ভাটার সময়ে জল নেমে যেতেই বালির ওপর আটকে গেল পিপে সমেত সিন্দুক। যন্ত্রপাতি এনে অতি সন্তর্পণে বাক্স খুলল পেনক্রফট। দেখল, ভেতরে দস্তার পাত দিয়ে মোড়া থাকায় কিছুই নষ্ট হয়নি। সব তাজা, টাটকা। পরিপাটি করে সাজানো। পাওয়া গেল জামাকাপড়, কেতাব, রান্নার সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র আর যন্ত্রপাতি। বেঁচে থাকেতে গেলে সুসভ্য মানুষের যা-যা দরকার, সব কিছু দিয়ে ঠাসা সিন্দুকের ভেতরটা। এমন কি একটা ক্যামেরা এবং ফটোর যাবতীয় সরঞ্জাম পর্যন্ত পাওয়া গেল দরকারী জিনিসের মধ্যে। হার্ডিং পেলেন কাঁটা, কম্পাস, দূরবীন, সেক্সট্যান্ট, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার; নেব সসপ্যান, থালাবাসন, স্টোভ, কেটলী, ছুরী; স্পিলেট বন্দুক, বুলেট, বারুদ, ছররা-গুলি, ভোজালী; সবার জন্যে জামাকাপড়, অভিধান, বাইবেল, বিজ্ঞানের বই, সাদা কাগজ, ডাইরী।

একটা ব্যাপারে কিন্তু অবাক হতে হল সবাইকে। এত জিনিস, কিন্তু কোনটিতে লেখা নেই নির্মাতা কে বা কোন্ দেশ!

আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! নতুন এই রহস্য নিয়ে তখন অবশ্য মাথা-ঘামানোর ফুরসৎ নেই দ্বীপবাসীদের। এত জিনিস ভগবান যখন পাইয়ে দিয়েছেন, তখন নির্মাতার নামধাম না থাকাটা রহস্যজনক হলেই বা কি এসে যায়?

মুখ কালো করে রইল কেবল পেনক্রফট! সিন্দুকের মধ্যে সব আছে, নেই কেবল তামাক!

রাত্রে শোওয়ার আগে বাইবেল হাতে নিলেন হার্ডিং। পেনক্রফট বললে —"আমার একটা কুসংস্কার আছে ক্যাপ্টেন। বাইবেলটা হঠাৎ এক জায়গায় খুলুন—দেখবেন আমাদের এই অবস্থার উপযোগী ঈশ্বর নির্দেশ পাবেন।"

সাইরাস হার্ডিং তাই করলেন। কাঠি গোঁজা জায়গাটা হঠাৎ খুললেন। দেখলেন, সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের পাশে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। জোরে জোরে পড়লেন ক্যাপ্টেন:

"ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। তাঁকে যে খোঁজে, সে-ই পায়।"

৩

তিরিশে অক্টোবর। ভোর ছটা।

সত্যিই জাহাজডুবি হয়ে কেউ দ্বীপে উঠেছে কিনা দেখবার জন্যে এবং জাহাজডুবির আরো জিনিষপত্র পাওয়ার আশায় দ্বীপবাসীরা রওনা হলেন ক্যানোয় চেপে।

ক্যানো ভেসে চলল মার্সি নদী দিয়ে। জোয়ারের টানে দাঁড় টানার দরকার হল না। মাঝনদীতে নৌকো নিয়ে গিয়ে শুধু হাল ধরে বসে রইল পেনক্রফট।

দুই দিকের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল যাত্রীদের। উঁচু পাড়। তার ওপর নানারকম গাছপালা। বৃক্ষজগত সম্বন্ধে হার্বার্ট একটু খোঁজখবর রাখত বলে মাঝে মাঝে তীরে নৌকো ভিড়িয়ে সে ডাঙায় উঠল দরকারী গাছের সন্ধানে। এইভাবেই পাওয়া গেল রাই সরষের গাছ। পেনক্রফট তাই দেখে তো রেগে আগুন! হার্বার্ট কেন তামাকের গাছ পাচ্ছে না, এই হল তার রাগের কারণ!

বেশ কিছুদূর আসার পর দেখা গেল গাছপালা ফাঁকা হয়ে আসছে, এক-একটা গাছ বেজায় উঁচু। মাথায় একশ ফুট তো হবেই। দেখেই লাফিয়ে উঠল হার্বার্ট—"ইউক্যালিপটাস। ইউক্যালিপটাস!"

হার্ডিং বললে—"হার্বার্ট, এ-গাছকে অস্ট্রেলিয়ায় কি বলে জানো?"

"না, ক্যাপ্টেন।"

"ফিভার-ট্রি।"

"অদ্ভুত নাম তো! এ-গাছে জ্বর হয় বুঝি?"

"*ঠিক উল্টো। এ-গাছের হাওয়ায় জ্বর পালায়। দেখে গেছে যে জায়গায় জ্বর লেগেই আছে, ইউক্যালিপটাসের চাষ করায় সে জায়গা স্বাস্থ্যকর হয়ে* উঠেছে। এর হাওয়া জ্বর নিবারক।"

আরও দুমাইল এগোলো নৌকো। দুপাশে কেবল আকাশ ছোঁয়া ইউক্যালিপটাস। নদীর গভীরতাও ক্রমশঃ কমছে। নৌকো বোধ হয় আর যাবে না। এই অবস্থাতেই এক জায়গায় দেখা গেল বড় আকারের বিস্তর বাঁদর। পারে দাঁড়িয়ে তারা অবাক হয়ে কিচমিচ করতে লাগল চলন্ত নৌকো দেখে। বেশ বোঝা গেল, মানুষ নামক জীবকে এরা এই প্রথম দেখছে।

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর ক্যানোর তলা লেগে গেল নদীর মাটিতে। দূরে জলপ্রপাতের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনে বোঝা গেল নৌকো আর যাবে না। সুতরাং টেনে হিঁচড়ে তীরে তোলা হল হাল্কা ক্যানো, বেঁধে রাখা হল গাছের সঙ্গে।

ভারী সুন্দর জায়গাটা! নিরিবিলি, নির্জন, গাছগাছালির সমারোহে মনোরম। রান্নাবান্নার আয়োজন শুরু হল। ঠিক হল এইখানেই রাত কাটাবেন অভিযাত্রীরা। কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে পালা দিয়ে সারারাত পাহারা দেবে হার্বার্ট আর নেব।

কপাল ভাল, তাই বিঘ্নহীন রইল সে রাতের বনবাস।

২

পরের দিন একত্রিশে অক্টোবর। ভোর ছটা।

ঘাস, লতাপতা, ঝোপঝাড় কেটে দ্বীপের আগন্তুকরা এগিয়ে চললেন সমুদ্রের দিকে। এখানকার জমি বেশ উর্বর। জঙ্গলও বেশ ঘন।

সাড়ে নটা নাগাদ বিশাল একটা ঝর্ণার তীরে পৌছোলেন যাত্রীরা। সবাই যখন চিন্তিত কি ভাবে পেরোনো যায় এত বড় ঝর্ণা, পেনক্রফট তখন আহার সন্ধানে ব্যস্ত। জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে তুলে আনল একটার পর একটা চিংড়ি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল একটা থলি বোঝাই হয়ে গেছে চিংড়িতে। তাই দেখে নেব আহ্লাদে ফুটিফাটা পেনক্রফট কিন্তু বিমর্ষ। তার বড় দুঃখ, লক্ষ্মীছাড়া এই দ্বীপে সব আছে, নেই কেবল তামাক!

ঝর্ণা পেরোনোর দরকার হল না। তীর বরাবর আধঘণ্টা হাঁটতেই দেখা গেল সমুদ্র।

হার্ডিং কিন্তু অবাক হলেন তীরভূমি দেখে। দ্বীপের পূর্ব তীর পাথুরে, কিন্তু পশ্চিমতীরে দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল। বনভূমি পৌছেছে সাগর পর্যন্ত। দূরে থেকে দেখে মনে হয় যেন সবুজ বর্ডার দিয়ে নীল সাগরকে আটকে রাখা হয়েছে। মাইল দুই এইরকম গিয়েছে। তারপর ফের গাছপালা বিরল তীরভূমি সোজা রেখায় এগিয়ে গিয়েছে বহুদূর।

এতদূর এসেও জাহাজডুবির কোনো চিহ্ন যখন পাওয়া গেল না, তাহলে কি সত্যিই কেউ দ্বীপে আছে? এ প্রশ্নের জবাব দিলেন স্পিলেট। তিনি বললেন—"চিহ্ন নেই তো কি হয়েছে? চিহ্ন মুছে যেতে পারে, কিন্তু শুওরের পেটে তিন মাসের মধ্যে গুলিটা কে ঢুকিয়ে গেল?"

সুতরাং খাওয়া দাওয়ার পর আবার হাঁটা শুরু হল। সার্পেন্টাইন অন্তরীপের শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। পাঁচটা নাগাদ দেখা গেল তখনও দুমাইল পথ বাকী। সুতরাং রাতটা সেইখানেই কাটানোর মনস্থ করলেন যাত্রীরা।

ভাল জায়গা খুঁজছে সকলে, এমন সময়ে একটা বাঁশঝাড় চোখে পড়ল হার্বার্টের। বাঁশ দেখে আনন্দে আটখানা হল হার্বার্ট। পেনক্রফট ভুরু কুঁচকে বললে—"বাঁশ দিয়ে কি হবেটা শুনি?"

"বাস্কেট হবে, জলের নল হবে, বাড়ী তৈরী করা যাবে। বাঁশের কোড়ও খাওয়া যাবে—ভারতবর্ষে তাই খায় শুনেছি আমাদের দেশের অ্যাসপারাগাসের মত।"

যাক, তীরের কাছে পাওয়া গেল রাত কাটানোর মত একটা বাসস্থান। পর্বতের গায়ে একটা গহ্বর—সৃষ্টি হয়েছে যেন ঢেউয়ের আঘাতে। হার্বার্ট আর পেনক্রফট ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময়ে ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল গুহার মধ্যে।

চক্ষের নিমেষে হার্বার্টকে টেনে নিয়ে পাথরের আড়ালে বসে পড়ল পেনক্রফট। গর্জনটা কোনো বড় জানোয়ারের রক্ত হিম করে দেয়। পেনক্রফটের হাতের বন্দুকে রয়েছে ছোট গুলি—বড় জানোয়ার তাতে ঘায়েল হবে না।

হঠাৎ স্পিলেটকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। গহ্বরের মুখে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে চতুষ্পদ জীবটা। ভীষণাকার একটা জাগুয়ার।

স্পিলেটকে দেখেই লাফ দিতে যাচ্ছে দুরন্ত জাগুয়ার, চক্ষের পলকে বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলেন স্পিলেট। অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলি লাগল জাগুয়ারের দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে।

হার্ডিং আর নেব যখন এসে পৌছোলেন, জাগুয়ার মহাপ্রভু তখন

পরলোকের পথে। নেব তো মহাখুশী অমন সুন্দর চামড়া দেখে। বাক্য ব্যয় না করে সে বসে গেল চামড়া ছাড়াতে—পরে অনেক কাজে লাগবে জিনিসটা।

গুহার মধ্যে পাওয়া গেল বিস্তর হাড়গোড়। জাগুয়ারের উচ্ছিষ্ট।

বাইরে থেকে যাতে নতুন উপদ্রব গুহায় না ঢোকে, তাই মস্ত কাঠের ধুনি জ্বালানো হল গুহার মুখে। মার্কোপোলোর কথামত সাইরাস হার্ডিং মধ্য এশিয়ার তাতারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গাঁটশুদ্ধ বাঁশ কেটে ফেলে দিলেন আগুনের কুণ্ডে। কিছুক্ষণ পরেই দমাদম শব্দে ফাটতে লাগল একটার পর একটা বাঁশ। সে কী ভীষণ আওয়াজ! বুনোজন্তু কেন, ভূতপ্রেত পর্যন্ত বুঝি ত্রিসীমা ছেড়ে পালিয়েছিল সে রাতে!

৫

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল দ্বীপের দক্ষিণ তীরে অভিযান। ঠিক হল, ক্যানো মার্সি নদীর এদিকে যেভাবে বাঁধা আছে, ঐভাবেই আরো দিন কয়েক থাকুক। দ্বীপবাসীরা দক্ষিণ তীরে জাহাজডুবির চিহ্ন আছে কিনা দেখে আজ রাতেই মার্সি নদীর ও-মুখ পেরিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছোবেন।

স্পিলেট বলেছিলেন—দ্বীপে চোর ছ্যাঁচোর যখন নেই, তখন পেনক্রফটের নৌকো নিরাপদে থাকবে।'

'থাকবে কি?' বলেছিল পেনক্রফট। 'কচ্ছপটার কি হাল হয়েছিল, আজও সে রহস্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।'

স্পিলেট তাই শুনে বললেন—"খামোকা ঘাবড়াচ্ছো কেন? কচ্ছপ উল্টেছে জোয়ারের জলে।'

'তাই কি?' স্বগতোক্তি করলেন সাইরাস হার্ডিং—'কেউ জানেনা কচ্ছপকে উপুড় করেছে কে।'

নেব বলে উঠল—'সব তো বুঝলাম। কিন্তু এত ঘুরে গ্র্যানাইট হাউস ফিরতে গেলে মার্সি নদী পেরোবো কি করে?'

'গাছের গোড়া জলে ভাসিয়ে,' ছোট্ট জবাব পেনক্রফটের।

এতটা ঘুরে যাওয়া মানে চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি নেওয়া। সুতরাং খামোকা সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা। পথিমধ্যে জাহাজ-ডুবির কোনো নিদর্শন চোখে পড়ল না। পেনক্রফট বললে—'অ্যাদ্দিনে মাস্তুল শুদ্ধ বালিতে চাপা পড়ে যাওয়ার কথা।'

দুপুর একটা নাগাদ কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে এলেন যাত্রীরা। দুপুরের খাওয়া

খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হল পথচলা। তিনটে মাগাদ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা শান্ত সরোবর। সাগরের জল সরু হয়ে প্রাণালীর আকারে এসে মিশেছে। চারিদিকে পাহাড়ের বেষ্টন। ঠিক যেন একটা নিরিবিলি বন্দর।

টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখলেন ক্যাপ্টেন। চোখ ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু ভাঙা জাহাজ বা জীবন্ত মানুষের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না।

নিশ্চিন্ত হলেন সকলে। তিন মাসের মধ্যে এ-দ্বীপে যেই বন্দুক ছুঁড়ুক না কেন, এখন আর সে এখানে নেই। দ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সোল্লাসে বললেন স্পিলেট—'আর কি! লিঙ্কলন দ্বীপের একছত্র অধিপতি এখন আমরাই।'

ঠিক সেই সময়ে ভীষণ ঘেউ ঘেউ রব শোনা গেল বনের মধ্যে। উত্তেজিত ভাবে ছুটে এল টপ। পরক্ষণেই দৌড়ে গেল বনের মধ্যে। মানুষ-সঙ্গীদের সে যেন নিয়ে যেতে চাইছে অরণ্যের নতুন রহস্যের মধ্যে!

এত চেঁচামেচি কিসের? দেখা গেল টপের মুখে একটুকরো কাপড়!

কাপড়! তবে কি দ্বীপের রহস্যের সন্ধান পেয়েছে টপ?

পড়ি কি মরি করে অভিযাত্রীরা দৌড়োলেন টপের পেছন পেছন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরেও কিছু পাওয়া গেল না। টপের চেঁচামেচির কিন্তু বিরাম নেই। হঠাৎ সে দৌড়ে গেল একটা দেবদারু গাছের দিকে।

ওপরে তাকিয়েই সে কী চিৎকার পেনক্রফটের—'পেয়েছি! পেয়েছি! জাহাজডুবির চিহ্ন পেয়েছি!'

সত্যিই তো! গাছের মাথায় ওকি ঝুলছে? বিরাট আকারের একটা সাদা কাপড় না? এরই একটা টুকরো মাটিতে পড়েছিল এবং টপ কুড়িয়ে এনেছে মুখে করে!

স্পিলেট বলে উঠলেন—'পেনক্রফট, ওটা জাহাজডুবির চিহ্ন নয় এ হল—'।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিল পেনক্রফট—'বেলুনের কাপড়! আমাদেরই বেলুনের ধ্বংসাবশেষ! জয় ভগবান! লিঙ্কলন দ্বীপের গাছে কাপড়ও ফলে? আর কী! আমাদের কাপড়-চোপড়ের অভাবটা তো মিটল! বেলুনের মজবুত কাপড় সেলাই করে পোশাক বানিয়ে নেওয়া যাবে। জাহাজ বানিয়ে পাল পর্যন্ত খাটাবো এই বেলুন দিয়ে।'

আনন্দ হবারই কথা! দ্বীপবাসীরা প্রত্যেকেই খুশী হলেন বেলুন দেখে। এখন বোঝা গেল, বেচারা বেলুন ওদের নামিয়ে দিয়ে ঝড়ে উড়ে এসে আটকে গিয়েছিল এ দিকের গাছে।

সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠে পড়ল নেব, হার্বার্ট আর পেনক্রফট। ঘণ্টা ছুয়েকের মেহনতের পর দড়িদড়ার জট ছাড়িয়ে প্রায় আস্ত বেলুনটা নামানো হল নীচে।

পেনক্রফট বললে—'বেলুনে আর চড়ছি না—আস্ত থাকলেও নয়। ঐ দিয়ে বড় নৌকোর পাল বানাবো আমি।'

কিন্তু বেলুনটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা বড়-সড় পাথরের গহ্বরে নিরাপদে ঢুকিয়ে রাখা হল দড়িদড়া সমেত বেলুনকে। ঝড়-জলেও ক্ষতি হবে না মজবুত কাপড়ের।

এই সব করতেই বেলা গড়িয়ে বাজল ছ'টা। রওনা হলেন যাত্রীরা। যাওয়ার আগে জায়গাটার নাম রেখে গেলেন 'বেলুন বন্দর'।

জাহাজডুবির সিন্দুক যেখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গাটার নাম রাখা হয়েছিল 'ফ্লোটষাস পয়েন্ট'। দ্বীপবাসীরা সে অঞ্চলে পৌছোতে পৌছোতেই অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। মার্সি নদীর মুখের কাছে প্রথম বাঁকটায় পৌছোতে পৌছোতেই রাত ছুপুর হয়ে গেল। নদী এখানে আশি ফুট চওড়া।

গাছ কেটে ভেলা বানাবার আয়োজন করছে পেনক্রফট আর নেব, এমন সময়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট—'কি ভাসছে যেন?'

সত্যিই তো! অন্ধকারে গা মিশিয়ে কি একটা যেন ভাসতে ভাসতে আসছে মার্সি নদীর ওপর দিয়ে। চোখ পাকিয়ে তাকাল পেনক্রফট। তারপরেই দারুণ চীৎকার—'নৌকো! আমাদের ক্যানো!'

ভাসমান বস্তুটা আরো কাছে এগিয়ে এল। দেখা গেল, দ্বীপবাসীদের ক্যানোটাই বটে। কি এক অলৌকিক উপায়ে বাঁধন ছিঁড়েছে, জলে ভাসতে ভাসতে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে হাজির হয়েছে যাত্রীদের সামনে!

ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? ভূত-প্রেত দত্যি-দানো এঁরা কেউই মানেন না। কিন্তু পরের পর এ-সব কি ঘটছে আশ্চর্য এই দ্বীপে?

লগি দিয়ে ক্যানোটাকে কাছে টেনে আনা হল। দড়ি পরখ করা হল। হার্ডিং দেখলেন, দড়ি যেন পাথরে ঘষা খেয়ে কেটে গেছে।

'আশ্চর্য!' মৃতুস্বর স্পিলেটের!

'তা আর বলতে,' গম্ভীর কণ্ঠ হার্ডিং-য়ের।

অপদেবতা রহস্য ভাবিয়ে তুলল সকলকেই। কে সেই অদৃশ্য সহায় যে বারবার উপকার করে চলেছে দ্বীপের ডানপিটে বাসিন্দা ক'জনকে?

ক্যানোয় চেপে নদী পেরোনো হল। চিমনির ধারে নৌকো তুলে রেখে দল বেঁধে ওঁরা এগোলেন গ্র্যানাইট হাউসের দিকে।

এমন সময়ে বিষম হাঁক-ডাক শুরু করল টপ।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ডেরার সামনে পৌঁছোবার পর। দেখা গেল ঝুলন্ত সিঁড়িটি আর ঝুলছে না।

সিঁড়ি উধাও হয়েছে!!

৬

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হাওয়ায় এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সরে যায়নি তো? অনেক হাতড়ানো হল। কিন্তু সিঁড়ি আর পাওয়া গেল না।

স্পিলেট বললেন—'আর কি। শূওরকে যে মহাপ্রভুটি গুলি করেছিল, আমাদের গুহাটিও এবার সে দখল করল।'

শুনে তো মহা খাপ্পা হয়ে গালিগালাজ আরম্ভ করল পেনক্রফট। কিন্তু কেউ জবাব দিলেন না। একবার শুধু মনে হল কে যেন খাটো গলায় হেসে উঠল গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে!

হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রীরা রাত কাটালেন চিমনীতে। ঠিক হল, পরদিন সকালে উঠেই সিঁড়ি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাবে। সারারাত গ্র্যানাইট হাউসের সামনে পাহারায় মোতায়েন রইল টপ।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল সিঁড়িটি মাঝের চাতালে উঠিয়ে রেখেছে কেউ। ওপরের অংশটি ঝুলছে যেমন তেমনি। জানালাগুলো বন্ধ ছিল—বন্ধই রয়েছে। শুধু দরজাটি কে খুলেছে!

হার্বার্টের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তীরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে নিক্ষেপ করল সিঁড়ির নিচের ধাপ লক্ষ্য করে। বারকয়েক চেষ্টার পর দড়ি গলে গেল নীচের ধাপের এড়ো কাঠের মধ্যে দিয়ে। এবার কেবল টেনে নামানোর ব্যাপার!

কিন্তু এ কী বিপত্তি! দড়িতে টান দিয়েছে হার্বার্ট, অমনি বিদ্যুৎরেখার মত একটা হাত বেরিয়ে এল গ্র্যানাইট হাউসের দরজা দিয়ে; একটানে সিঁড়িটাকে উঠিয়ে নিল আরও ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজখাই চীৎকার করে উঠল পেনক্রফট—'গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দেব উল্লুক কোথাকার!'

নেব বললে—'কাকে গুলি করবে?'

'উল্লুককেই করব। দেখতে পেলে না হাতটা কার?'

'কার?'

'বাঁদরের, ওরাংওটাংয়ের, বেবুনের, গরিলার!'

বলতে না বলতে কয়েকটা বাঁদরের মুখ দেখা গেল জানালায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলল পেনক্রফটের বন্দুকে। একটা শাখামৃগ ঠিকরে এসে আছড়ে পড়ল সামনে। প্রকাণ্ড সাইজের বাঁদর। হার্বার্ট একনজরেই চিনতে পারল—'ওরাংওটাং।'

শুরু হল ওরাংওটাং বনাম দ্বীপবাসীদের আজব লড়াই। হার্বার্ট আবার দড়িবাঁধা তীর ছুঁড়ল। তীর গলে গেল ওপরের অংশের সিঁড়ির ধাপ দিয়ে। কিন্তু কপাল মন্দ। টান মারতেই পটাং করে ছিঁড়ল দড়ি।

এখন উপায়? গুলির পর গুলি চলল জানলা-দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু চালাক বাঁদররা গুলি কি জিনিস তা বুঝেছে। সুতরাং নাক, কান, আঙুল চকিতে দেখিয়েই সরে গেল গুলির জন্যে অপেক্ষা না করে।

অবশেষে ওঁরা দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রইলেন যাতে বাঁদররা বাঁদুরে বুদ্ধি দিয়ে ভেবে নেয়, রণে ভঙ্গ দিয়েছে গুহার মালিকরা। তখন নিশ্চয় নীচে নামবে হতচ্ছাড়ারা।

কিন্তু এ-জাতীয় বাঁদরদের বুদ্ধি মানুষের সমান যায়। এরা গরিলাদের মত ঝাঁ করে রেগে ওঠে না, বেবুনদের মত গবেট হয় না। সুতরাং বেদখলকারী ওরাংওটাংদের কাছে ধৈর্যের পরীক্ষায় হার মানলেন দ্বীপবাসীরা।

শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়ে সাব্যস্ত হল, লেকের দিকে বুঁজিয়ে দেওয়া পুরোনো প্রবেশপথ দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হবে। গাঁইতি শাবল নিয়ে সবে রওনা হয়েছেন সকলে, এমন সময়ে দারুণ জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলেন যাত্রীরা! দেখলেন তাজ্জব ব্যাপার! অজ্ঞাত কারণে বিষম ঘাবড়ে গিয়েছে ওরাংওটাংরা। এমন ভয় পেয়েছে যে সিঁড়ি নামিয়ে পালানোর কথা খেয়াল নেই। ছুটোছুটি করছে এ-জানলা থেকে ও-জানলায়।

গুলি করার এই তো সুযোগ। দমাদম শব্দে চলল গুলির পর গুলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল খতম হয়েছে ফাজিল বাঁদরগুলো।

হঠাৎ আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সিঁড়িটাকে কে যেন ঠেলে ফেলে দিল—সড়াৎ করে তা নেমে এল দ্বীপবাসীদের সামনে!

গ্র্যানাইট হাউসে উঠেছেন সকলে। আচমকা শোনা গেল একটা ভীষণ চীৎকার। সাঁ করে ঘরে ঢুকল যেন সাক্ষাৎ যমদূত মানে একটা লোমশ ওরাংওটাং। পেছনে কুড়ুল হাতে নেব।

প্যাসেজের মধ্যেই বোধহয় কোথাও লুকিয়ে ছিল ফচকে বাঁদরটা। রাগের মাথায় নেব তাকে কুড়ুল চালিয়ে মেরেই ফেলত যদি না বাধা দিতেন হার্ডিং।

উনি বললেন—'নেব, মেরো না। ওকে আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ফাইফরমাশ খাটাবো। তাছাড়া, আমার তো মনে হয় সিঁড়িটা নামিয়ে দিয়েছে এই ওরাংওটাংটাই।

সত্যিই কি তাই ? হার্ডিং কি মন থেকে কথাটা বললেন ?

যাক, সবাই মিলে গায়ের জোরে কাবু করলেন ছফুট লম্বা ভীষণ বলশালী ওরাংওটাংকে। পিছমোড়া করে বাঁধা হল তাকে। পেনক্রফট সঙ্গে সঙ্গে তার একটা নামও দিলে—জাপ্ ! মাষ্টার জাপ্ !

৭

গ্র্যানাইট হাউস পুনর্দখল করা গেল বটে, কিন্তু রহস্যে ঘেরা আশ্চর্য দ্বীপের নবতম রহস্যটির আর কিনারা হল না। ওরাংওটাং কাকে দেখে অমন আঁৎকে উঠেছিল ? প্রাণের ভয়ে কেন ছুটোছুটি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে একে একে প্রাণ দিয়েছিল ?

যাইহোক, ওরাংওটাংদের লাসগুলো জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। জাপ-কেও আস্তে আস্তে বশ মানানোর চেষ্টা চলল। প্রথমে শুধু তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল খাবার সময়ে। দেখা গেল জাপ দৈহিক শক্তিতে অসুরের মত হলে কি হবে, ভারী শান্ত। চুপচাপ বসে মানুষ-সঙ্গীদের আচার-আচরণ দেখা আর অনুকরণ করার চেষ্টা ছাড়া কোনো বেয়াড়াপনার ধার দিয়েও গেল না।

ইতিমধ্যে দ্বীপবাসীরা কতকগুলো কঠিন কাজে হাত দিলেন। মার্সি নদীর ওপর পোল তৈরী হল। পোলটা এমনভাবে তৈরী হল যাতে মাঝের অংশটা খুলে রাখা যায়। ফলে, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যাতায়াতের যেমন সুবিধে হল, জন্তুজানোয়ারদের গ্র্যানাইট হাউস অবধি আসা-যাওয়ার পথও বন্ধ করা গেল।

আর একটি কাজ করতে হল প্রসপেক্ট হাইটকে বহিরাগতের হানা থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে। মার্সি নদী আর লেকগ্রাণ্টের মাঝে একটা খাল কঠিন গ্রানাইট পাথর উড়িয়ে দিতে হল নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে। ফলে তিনদিকে নদী আর একদিকে খাল থাকায় চতুর্দিকে জলে ঘেরা হয়ে নিরাপদ হল দ্বীপবাসীদের বাসস্থান। খালটার নাম দেওয়া হল ক্রীক গ্লিসারিন।

এই জলঘেরা সুরক্ষিত অঞ্চলেই দ্বীপবাসীরা বানালেন একটা খোঁয়াড়। মার্সি নদীর অপর পার থেকে মুসমন আর লোমশ জন্তু ধরে এনে আটকে রাখতে হবে। নইলে শীত এলে এদের লোম দিয়ে গরম জামা হবে কেমন

করে? হার্ডিং-এর ইচ্ছা অনুসারে সাব্যস্ত হল খোঁয়াড়টাকে করতে হবে রেড ক্রীক যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে। জায়গাটায় ঘাস প্রচুর। জন্তুগুলো চরে খেতে পারবে।

একটা পোলট্রি বানিয়ে নেওয়া হল গ্র্যানাইট হাউসের কাছেই। রান্না করতে করতে নেব যাতে ছুটে গিয়ে পাখী ধরে আনতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই বাড়ীর কাছে তৈরী হল পাখীর বাড়ী। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ডালপালার তৈরী ক্ষুদে ক্ষুদে ঘর। ঘরের ভেতর পার্টিসন। পোলট্রিতে প্রথম আস্তানা নিল ছটো টিনামু পাখী। ছানাপোনা হওয়ার পর এরাই প্রথম সরগরম করল পোলট্রি-হাউস। এরপর এল ছটি হাঁস। নিজে থেকে উড়ে এল পেলিক্যান, মাছরাঙা, জল-মোরগ, বুনোপায়রা।

প্রসপেক্ট হাইটে তৈরী হল শস্যক্ষেত্র। শাকসব্জি আর শস্যের চাষ হবে এখানে। শক্ত কাঠের বেড়া রইল জমির চারদিকে। মাঝে পেনক্রফটের হাতে তৈরী বদখৎ চেহারার কাকতাড়ুয়া মূর্তি—দেখলেই ত্রিসীমায় ঘেঁসবে না উঞ্ছ পাখীর দল।

এতগুলো কঠিন কাজে জাপ সাহায্য করল গতর দিয়ে। চারদিক জল-ঘেরা হওয়ার পর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে। ছাড়া পেয়ে কিন্তু সে লম্বা দেওয়ার চেষ্টা করল না। বরং মনিবদের ভারী ভারী জিনিসপত্র বয়ে এনে কত উপকার যে করল, তার ইয়ত্তা নেই।

এবার নতুন ভাবনা শুরু হল। বেলুন বন্দর থেকে গুরুভার বেলুনটাকে আনা যায় কিভাবে? নতুন তৈরী সেতু থেকে বেলুন মাত্র সাড়ে তিন মাইল। গাড়ী না হয় নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু যা জগদ্দল গাড়ী, কালঘাম ছুটে যায় টানতে টানতে। গাড়ী টানার জন্যে যদি ঘোড়া, গরু, গাধা জাতীয় জন্তু-টন্তু ধরা যেত, মন্দ হত না।

ঈশ্বরও দ্বীপবাসীদের এ প্রার্থনাও পূরণ করলেন। সেদিন ছিল তেইশে ডিসেম্বর। হঠাৎ শোনা গেল ভীষণ চেঁচামেচি জুড়েছে টপ আর নেব। দৌড়ে গেলেন অন্যান্য দ্বীপবাসীরা। গিয়ে দেখেন কি, ভারী সুন্দর ছুটি বাহারি চতুষ্পদ গোল খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে এদিকে। দেখতে তাদের ঘোড়ার মতও বটে, আবার গাধার মতও বটে। ধোঁয়াটে রঙ, পা আর ল্যাজ সাদা, মাথায় গলায় কালো ডোরা।

হার্বার্ট দেখেই চিনেছিল অদ্ভুত জন্তুটাকে। বললে—'ওনাগা! ওনাগা! জেব্রা আর কোনাগার মিশেল!"

'গাধা বললেই গোল চুকে যায়।' বললে নেব।

'কোন ছুটো গাধার মত লম্বা নয়, চেহারাও গাধার মত বিশ্রী নয়—তাই এরা গাধাও নয়' বলল, হার্বার্ট।

পেনক্রফট অত গবেষণার ধার দিয়েও গেল না। সংক্ষেপে সে বললে—'বাঁচলাম। এদেরকে দিয়েই গাড়ী টানানো যাবে।'

বলেই সে ঘাসের মধ্যে গা ঢেকে গুঁড়ি মেরে গেল পোলটার কাছে। চুপিসারে পোল বন্ধ করে দিতেই জলঘেরা অঞ্চলে বন্দী হল বেচারা ওনাগা দুটি।

তৎক্ষণাৎ ওদের বশ মানানোর চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়া হল দিন কয়েকের জন্যে। জলঘেরা এই যে অঞ্চল, নাই তার প্লেটো, এখানে তো ঘাসের অভাব নেই। সুতরাং জবরদস্তি করে বেচারাদের ভয় পাইয়ে না দিয়ে চরে বেড়াক না আপন খেয়ালে। খানিকটা সয়ে গেলে গাড়ীতে জোড়া যাবে।

ইতিমধ্যে লাগাম ইত্যাদি বানিয়ে দিল পেনক্রফট। হার্ডিং বানালেন আস্তাবল—পোলট্রি বাড়ীর কাছেই। বেলুন বন্দর পর্যন্ত রাস্তাটিও তৈরী হয়ে গেল গাড়ী যাতায়াতের জন্যে। তারপর একদিন লাগাম পরানোর চেষ্টা হল ওনাগা দুটিকে।

বশ কি আর মানতে চায়? তেড়ে ফুঁড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল বুনো জানোয়ার দুটো। কিন্তু শেষকালে হার মানতে হল দ্বীপবাসীদের জেদ আর ধৈর্যের কাছে।

গড়গড়িয়ে গাড়ী চলল নতুন তৈরী রাস্তা দিয়ে বেলুন বন্দরে। পেনক্রফট গাড়ীতে না উঠে হেঁটে চলল ওনাগাদের লাগাম ধরে। সে-কী ঝাঁকুনি! রোলার দিয়ে বানানো মসৃণ রাস্তা তো নয়! কোন মতে ঝোপঝাড় কেটে একটা পথ বানিয়ে নেওয়া। পাথুরে পথে হাড় গুঁড়ো হবার উপক্রম হলেও অবশেষে গুরুভার বেলুন নিয়ে নির্বিঘ্নে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন দ্বীপবাসীরা।

৮

জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী এই দুই মাস নানা কাজের মধ্যে দিয়ে গেল।

বেলুনের কাপড় কেটে বানানো হল প্রত্যেকের জামা-কাপড়। তার আগে বেলুন আবরণের বার্ণিশ তুলতে হল সোডা আর পটাশ দিয়ে। বার্নিশ উঠে যেতেই পাওয়া গেল দিব্বি মোলায়েম, ধবধবে সাদা কাপড়। সেই কাপড় কেটে হল সার্ট প্যান্ট, মোজা, বিছানার চাদর। সিন্দুকে ছিল ছুঁচ, বেলুনে ছিল সুতো। সুতরাং ধৈর্য, অধ্যবসায় আর মেহনতের ফলে কিছু আর বাকী রইল না।

সাইরাস হার্ডিং কিন্তু গুলি-বারুদ অপচয় করতে নিষেধ করলেন। দ্বীপে সীসে নেই তো কি হয়েছে? লোহা দিয়ে বুলেট বানাবেন। গান-কটন দিয়ে সেই গুলি ছুঁড়বেন।

জুতো? তাও বানিয়ে দিল পেনক্রফট—সীল মাছের চামড়া দিয়ে।

এত কাজের মধ্যেও উদরদেবের তুষ্টি সাধনের দিকে কড়া নজর ছিল প্রত্যেকেরই। তাই বনজঙ্গল থেকে শাকসব্জি এনে লাগানো হল প্লেটোর উর্বর জমিতে। প্রচুর পরিমাণে শুকনো কাঠ আর কয়লা মজুদ করা হল ভাঁড়ারে। খরগোশের মাংস তো ছিলই, সেই সঙ্গে হামেশা বঁড়শি গেঁথে মাছ ধরত পেনক্রফট, ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ থেকে আসত কচ্ছপ আর কচ্ছপের ডিম। ওস্তাদ রাঁধুনি নেব নানারকম শাকসব্জি দিয়ে এমন খাসা ঝোল রাঁধত যে সুগন্ধে ভুর ভুর করত খাবার টেবিল।

নিত্য-নতুন রান্না আর স্বাদের মধ্যে একটা জিনিসের অভাব কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না দ্বীপবাসীরা। জিনিসটি পাউরুটি!

খাওয়ানোর ব্যাপারে নেবের ডান হাত হয়ে উঠেছিল মাস্টার জাপ। নেব রান্নাঘরে থাকলেই সে-ও থাকবে রান্নাঘরে। নেব ইঙ্গিত করলেই এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। বুদ্ধি তার প্রখর। কোনো কাজ একবার দেখলে ভোলে না। এমন সাগরেদ পেয়ে নেবও তাকে কাজ শিখিয়ে চলল অসীম ধৈর্য নিয়ে।

প্রথম দিন যেদিন জাপকে কোমরে কাপড় বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল প্রাতরাশের টেবিলের সামনে, সেদিন তো দ্বীপবাসীরা অবাক! আরও অবাক হলেন যখন সে ট্রেনিং পাওয়া টেবিল বয়ের মত খাবার জল দিল, বাসন পালটে দিল, খাবারের বাটি সামনে এগিয়ে দিলে। তার আশ্চর্য বুদ্ধি, ট্রেনিং আর কাজকর্ম দেখে হৈ-চৈ পড়ে গেল খাবার টেবিলে। ফরমাশের পর ফরমাস হতে লাগল মাস্টার জাপ-এর ওপর ঝোল দেওয়ার জন্যে, রোস্ট আনার জন্যে, প্লেট পালটানোর জন্যে!

শুধু কি খাওয়ার টেবিল। পথে বেরিয়েও মাস্টার জাপ সাহায্য করেছে সবাইকে। হাতে লাঠি নিয়ে হাঁটা চাই তার। মাটিতে গাড়ীর চাকা বসে গেলে কাঁধ লাগিয়ে অক্লেশে তুলে দেবে সে। হুকুম করলেই গাছে উঠে ফল পেড়ে আনবে। গ্র্যানাইট হাউস যেন তার বাড়ী, এখানকার বাসিন্দারা তার আপনজন।

জানুয়ারীর শেষের দিকে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের সানুদেশে রেড ক্রীকের উৎপত্তিস্থলে তৈরী হল খোঁয়াড়। উঁচু কাঠের খুঁটি দিয়ে হল মজবুত বেড়া। খুঁটিগুলোর ডগা পুড়িয়ে চেঁছে বর্শার মত করে রাখা হল। মোটা মোটা

কাঠের ঠেকনা দিয়ে এমন মজবুত করা হল বেড়াকে যাতে বলবান পশুরাও গুঁতিয়ে ভাঙতে পারে না।

খোঁয়াড়ের মধ্যে রইলো মুশমন, ছাগল প্রভৃতির থাকবার ঘর। সবশেষে তৈরী হল মজবুত ফটক।

সাতই ফেব্রুয়ারী সকাল হতেই মুশমনদের বিচরণক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন দ্বীপবাসীরা। পেনক্রফট, হার্ডিং, নেব আর জাপ পাহারায় রইলেন জঙ্গলের নানা দিকে। বিপরীত দিক থেকে তাড়া লাগালেন স্পিলেট আর হার্বার্ট। খোলা রইল একটা দিক—খোঁয়াড়ের গেট।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল শ'খানেক মুসলমানের মধ্যে খোঁয়াড়ে ঢুকেছে মাত্র তিরিশটা। বাকাগুলো চম্পট দিয়েছে বনের এদিকে-সেদিকে। দশটা বুনোছাগলও তাড়াখেয়ে ঢুকে পড়েছে ফটক পেরিয়ে।

ফটক বন্ধ করে দিলেন দ্বীপবাসীরা। যা জানোয়ার ধরা পড়েছে, তাই যথেষ্ট। সংখ্যায় এরা বাড়বে। প্রচুর পশম আর চামড়া—দুটোই যখন খুশী পাওয়া যাবে।

ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরলেন বাসিন্দারা। পরের দিন গিয়ে দেখলেন বনের পশু বেড়া ভেঙে বনেই ফিরে গিয়েছে কিনা। কিন্তু না, সারারাত অনেক চেষ্টা করেও তারা বেড়া টলাতে পারেনি। অতএব সে চেষ্টাও আর করছে না।

শীত আসবার আগেই জমিতে যাতে চাষবাস করা যায়, সে বিষয়েও মন দিলেন সকলে। হার্বার্ট খুঁজেপেতে একদিন কি এক বীজ নিয়ে এল বন থেকে—চাপ দিলেই তেল বেরোয়। উর্বর মাটিতে এমনি আরো অনেক শাকসব্জি পুঁতে দেওয়া হল শীতের আগেই। একরকম শেকড় থেকে বীয়ার জাতীয় মদ্য তৈরী হল ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে।

পোলট্রিতে এলো আরো চারটে পাখী। দুটো হাঁসজাতীয় বাস্টার্ড পাখী। আর দুটো বন মোরগ।

প্রসপেক্ট হাইটের কিনারায় লতাপাতা দিয়ে ঘিরে একটা বারান্দার মত তৈরী করা হয়েছিল। দিনের শেষে যাত্রীরা এইখানে বসে জিরোতেন, গল্প করতেন, নিজেদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেন।

সাইরাস হার্ডিং কিন্তু গম্ভীর মুখে শুধু শুনেই যেতেন, কোনো কথা বলতেন না। আনমনা হয়ে ভাবতেন, কুহক দ্বীপে অনেক ভেলকি দেখা গেল, অনেক রহস্য ঘনীভূত হল! অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল—কোনোটারই সমাধান তো এখনো হয় নি!

মার্চ।

ঝড়জল আরম্ভ হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে পাছে শস্যের চারা নষ্ট হয়ে যায়, তাই বিষম উদ্বিগ্ন হল পেনক্রফট। বেলুনের কাপড় দিয়ে ঢেকে এল তার সাধের শস্যক্ষেত্র।

বাইরে দুর্যোগ, ঘরে কিন্তু হাত চলছে সামনে। বেলুন-বস্ত্রে জামা হয়েছিল বটে, কিন্তু বোতাম ছিল না। কাট কেটে বোতাম বানিয়ে সে অভাবও পূরণ করলেন হার্ডিং সাহেব।

মাস্টার জাপ-এর জন্যে একটা ছোট্ট ঘর তৈরী হল গুদামঘরের কাছে। ইতিমধ্যে জাপ আরো অনেক ঘরোয়া কাজ শিখেছে। কাপড়-জামা পরিষ্কার করা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, কাঠ বয়ে আনা, উনুন ধরানো, এমন কি শোবার আগে পেনক্রফটের চারধারে চাদর গুঁজে যাওয়া—সবই নিপুণভাবে করছে সে।

স্বাস্থ্য ফিরেছে সবার। মাথায় দু'ইঞ্চি ঢ্যাঙা হয়েছে হার্বার্ট। বিজ্ঞান শিখেছে হার্ডিং সাহেবের কাছে, স্পিলেটের কাছে সাহিত্য।

পোলট্রির কাছে পিকারিদের জন্যেও একটা খোঁয়াড় বানানো হয়েছে। এটির তদারকি ভার পড়েছে মাস্টার জাপের উপর।

পিকারিদের খাওয়া-দাওয়া জোগানোর ফাঁকে ফাঁকে তাদের ল্যাজ ধরে খুনসুটি করতেও ছাড়ত না জাপ।

এই সময়ে একদিন সবাই বায়না ধরলেন লিফট বানিয়ে দিতে হবে ইঞ্জিনীয়ার হার্ডিংকে। সিঁড়ি বেয়ে ভারী জিনিস তোলা বড় কষ্টকর। হার্ডিং কথা দিলেন, লিফট বানিয়ে দেবেন।

'কিন্তু সে লিফট চলবে কিসের শক্তিতে?' প্রশ্ন করল পেনক্রফট।

'জলের শক্তিতে।' বললেন হার্ডিং।

দিন কয়েকের মধ্যেই তৈরী হল লিফট। হাতী ঘোড়া ব্যাপার কিছু না। হার্ডিং একটা চোঙার একদিকে কয়েকটা বৈঠা লাগালেন। আর একদিকে রইল একটা চাকা। সেই চাকায় লম্বা দড়ি লাগানো—দড়ির অন্য প্রান্তে একটা বাস্কেট। চোঙাটা রাখা হল গ্র্যানাইট হাউসের ভেতরই ছোট্ট ঝর্ণার নীচে। এ-ঝর্ণা হার্ডিং বানিয়ে নিয়েছিলেন লেক থেকে খাবার জল আনার জন্যে। এখন তিনি ঝর্ণাটা আরো একটু বাড়িয়ে নিলেন। জলপ্রপাতের মত বেগে জল পড়তে লাগল চোঙার বৈঠার ওপর—বাড়তি জল বেরিয়ে গেল ফুয়ো

দিয়ে। অত বেগে বৈঠায় জল পড়তেই বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল চোঙা— সেই সঙ্গে অন্য প্রান্তের চাকা। চাকা ঘুরতেই চাকায় বাঁধা দড়ি জড়িয়ে যেতে লাগল চাকার গায়ে। ফলে, দড়িতে বাঁধা বাস্কেট নীচ থেকে উঠে এল গ্র্যানাইট হাউসের দরজায়।

সতোরই মার্চ প্রথম চালু হল ওয়াটার লিফট। ভারী বোঝা থেকে আরম্ভ করে দ্বীপবাসীরাও লিফটে চড়ে ওপরে ওঠা শুরু করলেন। সবচাইতে পুলকিত হতে দেখা গেল টপকে।

বিরাম নেই হার্ডিং এর নতুন নতুন কাজের। এরপর তিনি পড়লেন কাঁচ তৈরী নিয়ে। বালি আছে, সোডা আছে, মাটির বাসন কোসন তৈরীর উনুন আছে। গনগনে আগুন জ্বালাতে হবে সেখানে। বালি, খড়ি, সোডা ইত্যাদি মালমশলা গলিত অবস্থায় তরল হলেই লোহার নল দিয়ে ফুঁ দিয়ে ইচ্ছেমত জিনিসপত্র বানিয়ে নেওয়া যাবে।

লোহার নলটা বানিয়ে দিল পেনক্রফট এক টুকরো লোহা নিয়ে। তারপর একে-একে তৈরী হল গ্র্যানাইট হাউসের জানালার শার্সি, গেলাস, প্লেট ইত্যাদি। চেহারা তেড়া বেঁকা হলেও কাজ তো চলে গেল! যাত্রীরা মহাখুশী হলো কাঁচের তৈজসপত্র দেখে।

ময়দার খোঁজ পাওয়া গেল এর পরেই। হার্বার্ট একরকম গাছ খুঁজে পেল জঙ্গলে। নাম সাইকাস। ওর বোঁটার মধ্যে পাওয়া গেল একরকম গুঁড়ো। ময়দার মত দেখতে। নেব তাই দিয়েই বানালো সুস্বাদ কেক আর পুডিং।

পয়লা এপ্রিল বারান্দায় জিরোচ্ছে যাত্রীরা। সামনের দিগন্তবিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর, এমন সময়ে স্পিলেট বলে উঠলেন—'হার্ডিং, বলতে পারো প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে আমাদের এই দ্বীপ? সেক্সট্যান্ট দিয়ে ভালো করে দেখে নিলে হয় না?

সেক্সট্যান্ট যন্ত্রটা পাওয়া গিয়েছিল জাহাজ ডুবির সেই সিন্দুকে। এ যন্ত্র দিয়ে যে কোন অঞ্চলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

পেনক্রফট কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'দরকার কি অত জেনে! বেড়ে আছি আমরা।'

'তা আছি। কিন্তু লিঙ্কন দ্বীপের ধারে কাছে অন্য কোনো দ্বীপ বা মহাদেশ আছে কিনা জেনে রাখা ভালো।'

হার্ডিং বললেন—'বেশ তো, জবাবটা কাল দেব।'

পরদিন জাহাজ ডুবির সেই সিন্দুকের মধ্যে থেকে মানচিত্র বার করল হার্বার্ট। প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন হার্ডিং।

সেক্সট্যান্ট দিয়ে অংক কষে বার করে দিলেন লিঙ্কলন দ্বীপ মহাসাগরের ঠিক কোন জায়গাটিতে আছে। ম্যাপে যদিও সে জায়গায় দ্বীপের কোনো চিহ্ন ছিল না। দ্রাঘিমার-লঘিমার হিসেব তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল তবে দেখা গেল, লিঙ্কলন দ্বীপ ম্যাপের যেখানে থাকা উচিত, সেখান থেকে দেড়শ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে একটা দ্বীপ—নাম ট্যাবর দ্বীপ।

পেনক্রফট লাফিয়ে উঠে বললে—'হুররে! ট্যাবর দ্বীপে যাব আমরা। ডেকওয়ালা একটা বড়সড় নৌকো বানিয়ে নেব। জোর হাওয়া পেলে পৌঁছোতে আর কতক্ষণই বা লাগবে, বড় জোর দুদিন।'

ঠিক হল, আবহাওয়ার ভাল অবস্থা থাকবে অক্টোবরে। তখন শুরু হবে ট্যাবর দ্বীপ অভিযান। ইতিমধ্যে বানিয়ে নিতে হবে মস্ত নৌকোটা।

১০

কাজ-পাগল পেনক্রফটকে আর পায় কে! নৌকো তৈরীর ভাবনা মাথায় ঢুকতে নাওয়া খাওয়া একরকম শিকেয় উঠল। একবার মাত্র খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে গ্র্যানাইট হাউসে আসা ছাড়া বাড়ীর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক তার রইল না। ছ'মাসের মধ্যে বানাতেই হবে নৌকো।

সুতরাং জাহাজ তৈরীর জায়গা বলতে যা বোঝায়, সেই ডকইয়ার্ড তৈরী হল চিমনী আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝামাঝি জায়গায়। তক্তার উপযুক্ত গাছ বেছে তক্তা চেরাও হল। সারি সারি তক্তা দাঁড় করিয়ে রাখা হল পাহাড়ের গায়ে। নৌকো হবে পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা। কাঠ কাটাও হল সেই অনুপাতে।

নৌকো তৈরীর ব্যাপারে হার্ডিং সাহায্য করতে লাগলেন পেনক্রফটকে। নেব রইল রান্নাবান্না নিয়ে, স্পিলেট আর হার্বার্ট শিকার নিয়ে।

এই শিকার করতে গিয়েই একদিন একটা মস্ত আবিষ্কার করে বসল হার্বার্ট আর স্পিলেট। একটা অদ্ভুত গাছ দেখলেন স্পিলেট। আঙুরের থোলো ঝুলছে যেন গাছটায়। সোজা ডাল আর থ্যাবড়া পাতা দেখে থমকে দাঁড়ালেন স্পিলেট। শুধোলেন—হার্বার্ট, এটা আবার কি গাছ?'

হার্বার্ট তো দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—'মিস্টার স্পিলেট, পেনক্রফটের মত উপকার করলেন। এটা তামাক গাছ।'

'তামাক!'

'উৎকৃষ্ট তামাক না হলেও তামাকের গাছই বটে।'

'ভাল আবিষ্কার করেছি তাহলে বলো? পেনক্রফট তো আনন্দ রাখার জায়গা পাবে না।'

'মিস্টার স্পিলেট, আমার ইচ্ছে, পেনক্রফটকে এখন তামাকের কথা জানাবো না। গাছ থেকে তামাক আগে তৈরী করি। তারপর পাইপ সেজে একদিন উপহার দিয়ে চমকে দেব ওকে।'

'বেশ তো।'

বেশ কিছু তামাক গাছ কাঁধে নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরলেন দুজনে। খবরটা জানানো হল কেবল হার্ডিং আর নেবকে। সব কটা গাছ এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হল যাতে পেনক্রফট না দেখিতে পায়। দু মাস ধরে এমনি ভাবে লুকিয়ে-চুরিয়ে গাছের পাতা কেটে শুকানো হল, তামাক তৈরী হল যে, পেনক্রফট বেচারা তিল মাত্র জানতে পারল না।

এই সময়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড তিমিকে দেখা গেল লিঙ্কলন দ্বীপের চারদিকে চক্কর দিচ্ছে। তিমি শিকারের সরঞ্জাম থাকলে একটা হিল্লে করা যেত দানবিক জীবটার, কিন্তু তা যখন নেই সখেদে কাজ নিয়ে মেতে থাকা ছাড়া উপায় রইল না পেনক্রফটের। সে কী আপশোষ বেচারীর। চোখের সামনে অষ্টপ্রহর সাঁতরে কাটছে বিশাল তিমি মাছ, অথচ তাকে হার্পুন দিয়ে গাঁথা যাচ্ছে না।

মারতে আর হল না, তিমি নিজেই ধরা দিল। ফ্লোটসাম পয়েন্টে, অর্থাৎ যেখানে জাহাজডুবির সিন্দুক পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানে একদিন আটকে গেল তিমি মহাপ্রভু।

দৃশ্যটা জানালা থেকে প্রথমে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল নেব। তৎক্ষণাৎ সবাই ছুটলেন সমুদ্রতীরে। পেনক্রফট কুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ালো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

গিয়ে দেখা গেল অক্কা পেয়েছে তিমি মাছ। ওপরে উড়ছে হাজারে হাজারে মাংসভুক পাখি। বাঁপাশে পাঁজরে গেঁথে রয়েছে একটা হার্পুন, মানে, তিমি শিকারের দড়িবাঁধা বর্শা।

স্পিলেট বললেন—'দ্বীপের ধারে কাছেই তাহলে তিমিশিকারী রয়েছে বলতে হবে।'

পেনক্রফট বলে উঠল—'তার কোনো মানে নেই মিস্টার স্পিলেট। হার্পুন গাঁথা হয়ে তিমিরা হাজার হাজার মাইল ছুটে চলে যায়। এ বেচারীও হয়ত আটলান্টিকে মরণমার খেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পরলোক যাত্রা করল।'

পেনক্রফট এককালে তিমি শিকারের জাহাজে হোয়েলারে কাজ করেছিল। তার উৎসাহ সেই কারণেই সব চাইতে বেশী। হার্পুন টেনে নিয়ে সে যখন

দেখলে হাতলের ওপর লেখা রয়েছে 'মেরিয়া স্টেলা—ভিনিয়ার্ড'—তখন তার চোখমুখের অবস্থা অন্তরকম হয়ে গেল।

'মেরিয়া স্টেলা' তার চেনা হোয়েলার—তিমি শিকারের জাহাজ। ভিনিয়ার্ড তার জন্মস্থান! সুতরাং আবেগে সে বিহ্বল হবে, এ-আর আশ্চর্য কি!

পচন ধরার আগেই তিমির গা থেকে সবচেয়ে দরকারী অংশ যা, অর্থাৎ তিমির চর্বির স্তর কেটে আনল পেনক্রফট। দরকারী হাড়গুলোও রাখল ভবিষ্যতের কাজের জন্তে। বাকী দেহটা ছেড়ে দিল পঙ্গপালের মত পাখীদের পেট ভরানোর জন্যে। আড়াই ফুট পুরু তেলের ডেলা কেটে জাল দেওয়া হল বড় বড় মাটির পাত্রে। শুধু জিভটা থেকেই বেরোলো ৬০০ পাউণ্ড তেল, নীচের ঠোঁট থেকে ৪০০ পাউণ্ড।

চর্বি জমিয়ে রাখা হল স্টিয়ারিন আর গ্লিসারিন উৎপাদনের জন্যে। গোটা বারো তিমির হাড় নিয়ে সমান মাপে কেটে মুখগুলো ছুঁচালো করলেন হার্ডিং। বললেন—'রাশিয়া আমেরিকায় অ্যালুইশিয়ান শিকারীরা এমনি ভাবে তিমির হাড় কনকনে ঠাণ্ডায় বেঁকিয়ে বরফ চাপা দিয়ে রাখে। তারপর চর্বি মাখিয়ে টোপ হিসেবে ফেলে রাখলেই ক্ষুধার্ত জানোয়ার তা গিলে ফেলে। পেটের গরমে বরফ গলে গেলেই ছিটকে সিধে হয়ে যায় বেঁকা হাড়—ছুঁচালো দিক পেটে গেঁথে মারা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের গুলি বারুদ খরচ কমাতে গেলে তিমির হাড়ের টোপ আরও দরকার।' শুনে হৈ-হৈ করে উঠল পেনক্রফট আর নেব।

ফের শুরু হল নৌকো তৈরীর কাজ। খাটতেও পারে বটে পেনক্রফট! মাথায় কিছু একটা ঢুকলে হল, ক্লান্তি জিনিষটাও যেন উবে যায় তার শরীর থেকে। অন্যান্য অভিযাত্রীরা স্থির করলেন তার এই অসীম অধ্যবসায়ের পুরস্কার দেওয়া হবে আগামী একত্রিশে মে।

একত্রিশে মে।

রাতের খাওয়া শেষ। উঠতে যাচ্ছে পেনক্রফট, এমন সময়ে কাঁধে হাত দিলেন স্পিলেট।—'পেনক্রফট, এখনো একটা জিনিস বাকী আছে।'

'আমার আর সময় নেই মিস্টার স্পিলেট, অনেক কাজ বাকী।'

'এক কাফ কফিও চলবে না?'

'আজ্ঞে না।'

'তামাক?'

ম্যাজিকের মত কাজ করল ঐ একটিমাত্র শব্দ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পেনক্রফট। তৎক্ষণাৎ তামাকঠাসা পাইপ এগিয়ে ধরলেন স্পিলেট, আগুন বাড়িয়ে দিল হার্বার্ট।

পেনক্রফট তো হতবাক! বিমূঢ়ের মত পাইপ কামড়ে, আগুন ধরিয়ে কিছুক্ষণ কেবল টানের পর টান। চোখ বুঁজে সে কি আয়েশ তার। দেখতে দেখতে তাল তাল ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল তার আনন্দ বিভোর মূর্তি, শোনা গেল কেবল হৃষ্ট কণ্ঠস্বর—'তামাক! তামাক! তামাকই বটে!'

আরো কিছুক্ষণ পরমানন্দে তামাক খাওয়ার পর ভালো করে মুখে কথা ফুটল পেনক্রফটের—'বলি, আবিষ্কারটা কার? হার্বার্টের?'

'মিস্টার স্পিলেটের,' বলল হার্বার্ট।

আর যায় কোথা! ছিটকে গিয়ে স্পিলেটকে এমনভাবে জাপটে ধরল পেনক্রফট যে ভদ্রলোকের দম আটকে আসে আর কি!

অতিকষ্টে নিঃশ্বেস নিতে নিতে বললেন স্পিলেট—পেনক্রফট, ধন্যবাদটা সবার প্রাপ্য! আমি তো শুধু গাছটা দেখেছিলাম, কিন্তু হার্বার্ট যে চিনতে পেরেছিল, হার্ডিং তামাক তৈরী করেছিল, আর অ্যাদ্দিন খোশখবরটা তোমায় বলতে না পেরে পেট ফুলে মরতে বসেছিল নেব!'

১১

জুন।

শীত পড়ছে। মুসমনদের গায়ের লোম কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু শুধু লোম দিয়ে তো শীতের কাপড় হয় না, লোম থেকে সুতো, সুতো থেকে কাপড় বুনবার যন্ত্রপাতি কোথায়?

উপায় বার করে ফেললেন হার্ডিং। সত্তর টেম্পারেচারে কাঠের গামলায় জল ঢেলে বেশ করে ধোয়া হল লোমগুলো। ঐ জলেই ডুবিয়ে রাখা হল পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, তৈলাক্ত ভাবটা একটু কমল। যেটুকু ছিল, তাও গেল সোডার জলে ধুয়ে নেওয়ার পর। বানানো হল বড় বড় কাঠের বারকোস। তার ওপর রাখা হল সাবান মাখানো লোম। গ্র্যানাইট হাউসের জলপ্রপাত দিয়ে চাপ দেওয়ার যন্ত্র বানালেন হার্ডিং। কাঠের চ্যাপটা মোটা মুগুর দিয়ে ক্রমাগত চাপ দিতে অবশেষে তৈরী হল ফেল্টের মত কাপড়। মিল থেকে বেরুল 'লিঙ্কলন-ফেল্ট'—মেরিনো, মসলিন, রেপ, সাটিন, কাশ্মিরী, আলপাকা, ফ্লানেল না হলেও তা টেঁকসই এবং কাজ চলার উপযুক্ত। শুরু হল দর্জির কাজ। আনাড়ি হাতে

তৈরী হলেও কোট, প্যান্ট, টুপী, কম্বলের চেহারা খারাপ হল না। এবার আসুক শীত, পড়ুক বরফ, ভয় পায় না দ্বীপবাসীরা।

বিশে জুন।

কনকনে ঠাণ্ডা আরম্ভ হয়েছে। এত ঠাণ্ডায় নৌকোর কাজ সম্ভব নয়। নিরুপায় পেনক্রফট গ্র্যানাইট হাউসে ছটফট করতে লাগল আর ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল হার্ডিংয়ের কাছে চটপট ট্যাবর দ্বীপে রওনা হওয়ার জন্যে। তার ইচ্ছে হার্বার্টকে নিয়ে যাবে সঙ্গে। কিন্তু হার্ডিংয়ের ইচ্ছে নয় এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার। হাতে গড়া নৌকো। পথ কম নয়, দেড়শ মাইল। মাঝ-দরিয়ায় যদি বেয়াদবি শুরু করে নৌকোটা? যদি এগোনো-পেছোনো দুটোই বন্ধ হয়ে যায়?

পেনক্রফট কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল সমানে—'নৌকো তৈরী হলে চড়ে দেখলেই আপনার আর কোনো ভাবনা থাকবে না, মিস্টার হার্ডিং।'

বরফ পড়া শুরু হল জুনের শেষে। খোঁয়াড়ে যদিও প্রচুর খাবার-দাবার মজুদ ছিল পশুদের জন্যে, তবুও হপ্তায় একবার গিয়ে তদারক করে আসত দ্বীপবাসীরা।

এই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারলেন স্পিলেট। একটা পেল্লায় অ্যালবেট্রস পাখীকে গুলি করে মাটিতে ফেলেছিল হার্বার্ট। পাখীটার পা জখম হয়েছিল কেবল—গুলি লেগেছিল পায়।

অ্যালবেট্রসদের ওড়বার শক্তি অসাধারণ। ডানা মেলে এরা কমসে কম দশফুট জায়গা নিয়ে ওড়ে। দেখেই মতলবটা মাথায় এল স্পিলেটের।

তিনি তাঁদের ছোট্ট ইতিহাস কাগজে লিখে থলিতে ভরে বেঁধে দিলেন অ্যালবেট্রসের গলায়। একটা চিরকুট রইল সেইসঙ্গে—'থলিটা যিনি পাবেন, তিনি দয়া করে—'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামে খবরের কাগজের অপিসে পাঠিয়ে দেবেন।'

ছাড়া পেয়েই আকাশে উড়ল অ্যালবেট্রস। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল দিগন্তে। একদিন হলেও কোনো সভ্য-মানুষের হাতে পড়বে থলিটা, টনক নড়বে পরিচিতবর্গের, উদ্ধার পাবে দ্বীপবাসীরা।

জুলাই।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে বাইরে। গ্র্যানাইট হাউসের খাবার ঘরে আর একটা

অগ্নিকুণ্ডর ব্যবস্থা করা হয়েছে আগুন পোহানোর জন্যে। খাওয়া-দাওয়ার পর এইখানেই বসে সবাই গল্পের আসর জমায়, নয় তো বই খুলে তন্ময় হয়, অথবা কাজ নিয়ে মেতে থাকে।

সেদিনও খোশ গল্প জমেছে। তামাক, কফি পান করছে অভিযাত্রীরা নিশ্চিন্ত আলয়ে। কানে ভেসে আসছে ঝড়ের হুহুংকার। আলোচনা হচ্ছিল আমেরিকার প্রগতি নিয়ে।

স্পিলেট বললেন—'যন্ত্রসভ্যতা কিন্তু একদিন হোঁচট খাবে—যেদিন পৃথিবীর কয়লা ফুরিয়ে যাবে।'

হার্ডিং বললেন—'কিন্তু কয়লা ফুরোতে এখনো আড়াইশ থেকে তিনশ বছর লাগবে।'

'তারপর ?'

'নতুন কিছু আবিষ্কার করবে ভাবীকালের মানুষ।'

'কি আবিষ্কার করবে ?' পেনক্রফটের প্রশ্ন। 'কয়লার বদলে আর কি মিলবে আঁচ করতে পারেন ?'

'জল।'

'অ্যাঁ ! জল দিয়ে জাহাজ চলবে, রেল চলবে ?'

'হাঁ, পেনক্রফট। আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। এমন একদিন আসবে যেদিন ইলেকট্রিসিটি দিয়ে জল থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা করে তাই দিয়ে কলকারখানা মেশিন চালানো হবে। অফুরন্ত এই শক্তির ওপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের সভ্যতা। কয়লার জায়গা নেবে জল। জলই আমাদের জীবন।'

আচমকা বিষম ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ। জাপও গোঁ-গোঁ করে উঠল তাল মিলিয়ে। দুজনে কুয়োর পাড়ে গিয়ে এমন ছুটোছুটি আরম্ভ করল যে চুপচাপ আর বসে থাকা গেল না।

স্পিলেট বললেন—'দেখছি সেই সামুদ্রিক জন্তুটা কুয়োর তলায় বসেছে আবার।'

পেনক্রফট খুব বকে উঠল খামোকা চেঁচামেচির জন্যে। ধমক খেয়ে জাপ সুড়সুড় করে উধাও হলে নিজের ঘরে। টপও মুখে চাবি দিল। কিন্তু তারপর থেকেই বেজায় গম্ভীর হয়ে গেলেন হার্ডিং।

মাসের শেষের দিকে ঝড়জল এবং বরফপাতে দারুণ ক্ষতি হয়ে গেল প্রসপেক্ট হাইটের ওপরকার পাখীর বাড়ীর। বেঁচে গেল খোঁয়াড়টা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের আড়ালে থাকায়।

আগস্ট।

আকাশ অনেকটা শান্ত। তিন তারিখে শিকারে বেরোলো দ্বীপবাসীরা—হার্ডিং বাদে। তাঁর নাকি কি কাজ আছে গ্র্যানাইট হাউসে।

কাজ আর কিছুই না। কুয়োর ভেতরটা ভাল করে দেখে আসা। মুখে সে কথা বললেন না হার্ডিং।

টপ আর জাপকে নিয়ে বাকী চারজনে মার্সি নদীর সেতু পেরিয়ে রওনা হল ট্যাডরন মার্স-য়ে পাখী শিকারের জন্যে। পোলের মাঝের অংশ তুলে দিয়ে ফিরে এলেন সাইরাস হার্ডিং।

অনেকগুলো প্রশ্ন অনেকদিন ধরে বিব্রত করছে তাঁকে। কুয়োর ধারে গিয়ে টপ কেন হাঁকডাক করে? কার অস্তিত্ব ধরা পড়ে তার অতি-অনুভূতিতে? সেদিন জাপও অত অস্থির হল কেন? সমুদ্র ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে কুয়ার যোগাযোগ আছে কি? কোনো গোপন সুড়ঙ্গ কি পাতালের মধ্যে দিয়ে অন্য কোনোদিকে গিয়েছে? কুহক দ্বীপের এতগুলি রহস্যের চাবিকাঠি কি ঐ গুহার মধ্যেই রয়েছে? হার্ডিং তাই পণ করেছিলেন, একদিন তিনি একা নামবেন কুয়োর ভেতরে। সঙ্গীদের কাউকে জানাবেন না, কাউকে সঙ্গে নেবেন না।

সেই সুযোগ এসেছে অনেকদিন পরে। লিফট ব্যবহারের পর থেকেই সিঁড়িটা তুলে রাখা হয়েছিল। হার্ডিং তার ওপরের দিকটা শক্ত করে বাঁধলেন কুয়োর ওপরে। বাকী অংশটা ঝুলিয়ে দিলেন কুয়োর ভেতরে। কোমরের বেল্টে নিলেন পিস্তল আর ছুরী। হাতে লণ্ঠন। একটুও বুক কাঁপল না তাঁর। তরতর করে নামতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে।

দেখলেন, কুয়োর গা মসৃণ নয়—খোঁচা খোঁচা পাথর এমনভাবে বেরিয়ে আছে যে, কোনো জন্তু ইচ্ছে করলে ধরে ধরে কুয়োর মুখ পর্যন্ত উঠে আসতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কোনো জন্তুর ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। একদম নীচে নেমেও তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। নিরেট দেওয়াল। ঠুকেও ফাঁপা বলে মনে হল না। সুড়ঙ্গ জাতীয় কিছুই নেই। জল দিব্বি শান্ত। স্থির। স্বচ্ছ। কোনোরকম প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে নেই।

উঠে এলেন হার্ডিং। নিজের চোখে দেখলেন বটে, তবুও তাঁর মন বলতে লাগল—'আছে, আছে, কিছু একটা আছে কুয়োর ভেতরে। মাঝেমাঝে সে আসে, টপ ঠিকই টের পায়।'

১২

দিনের শেষে পাখীরা বোঝা নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরলেন দ্বীপবাসীরা।

এত পাখী মারা হয়েছে যে জাপের সারা গায়ে ঝুলছে স্নাইপ পাখীর বাণ্ডিল, টপের গলায় টিল পাখীর মালা। ভূরিভোজ তো হলই, বিস্তর পাখী নুন দিয়ে রেখে দেওয়া হল ভবিষ্যতের জন্যে। তাছাড়া যা ঠাণ্ডা, নষ্ট কিছুই হবে না।

স্পিলেটকে চুপি চুপি কুয়ো অভিযানের কথা বললেন হার্ডিং। স্পিলেটও মাথা নেড়ে সায় দিলেন—'তুমি ঠিকই ধরেছো হার্ডিং। চোখে কিছু না পড়লেও নিশ্চয় কোনো জানোয়ার জল থেকে উঠে আসে ওখানে। টপ টের পায় ঠিকই।'

যাক, নৌকা নিয়ে আবার মত্ত হল পেনক্রফট। সাগরেদ রইল হার্বার্ট। পাল হল বেলুনের কাপড় দিয়ে। একটা নিশানও তৈরী হল মাস্তলের ডগায় বাঁধবার জন্যে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ যা—লিঙ্কলন দ্বীপের ফ্ল্যাগটিও হল অবিকল তাই। তফাৎ শুধু তারকার সংখ্যায়। সাঁইত্রিশটির জায়গায় রইল আটত্রিশটা তারা—বাড়তি তারাটা লিঙ্কলন দ্বীপের নামে।

প্রথম যেদিন গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় পতাকাটি উড়ল পত পত করে, সে দিন সে কী আনন্দ দ্বীপবাসীদের। উপর্যুপরি তিনবার হর্ষধ্বনি করে কেতামাফিক স্যালুট করলেন সকলে তাঁদের জাতীয় পতাকাকে।

এগারোই আগস্ট।

একটা যাচ্ছেতাই রকমের ব্যাপার ঘটল স্পিলেটের সামান্য ভুলে।

সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনতের পর অকাতরে ঘুমোচ্ছেন সবাই। ভোর চারটে নাগাদ ধড়মড় করে উঠে বসলেন প্রত্যেকেই টপের বিকট চীৎকারে।

আশ্চর্য! টপ তো এবার কুয়োর কাছে লম্ফঝম্ফ করছে না! ছুটোছুটি করছে গ্র্যানাইট হাউসের জানলার কাছে। দরজা আঁচড়াচ্ছে ক্ষিপ্তের মত!

ব্যাপার কি? জানলার ধারে গিয়ে বহু নীচে বরফের আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। বহুদূরে গাঢ় তমিস্রার মধ্যে থেকে ভেসে এল এতগুলো ক্রুদ্ধ গর্জন।

'সর্বনাশ! প্লেটোতে জানোয়ার ঢুকেছে মনে হচ্ছে? অবাক হয়ে বললে নেব—'নেকড়েও হতে পারে। শেয়াল হওয়াও বিচিত্র নয়।'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললে পেনক্রফট—'কি মুস্কিল! পাখীগুলোকে তো তাহলে আর আস্ত রাখবে না হতভাগারা! কিন্তু নদী পেরিয়ে এল কি করে ওরা?'

হার্ডিং বললেন—'নিশ্চয় কেউ পোল তুলতে ভুলে গেছে?'

'এই যাঃ জিভ কাটলেন স্পিলেট। 'ভুলটা আমার!'

'থাক, যা হবার তা হয়েছে,' বললেন হার্ডিং—'চটপট তৈরী হয়ে নাও সবাই।'

আবার গর্জন শোনা গেল নিশাচর শ্বাপদদের। শুনেই মনে পড়ল হার্বার্টের এ ডাক সে রেডক্রীকের শুরু যেখানে, সেখানে শুনেছে। জন্তুগুলো নেকড়ে জাতীয় শেয়াল, কিন্তু সাংঘাতিক হিংস্র।

ঝটপট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন অভিযাত্রীরা। শুরু হল এক দঙ্গল নেকড়ের মতই ভয়ংকরদের সঙ্গে সুমুখ লড়াই।

পোলট্রি হাউসটাকে আগে বাঁচানো দরকার। তাই সেইদিকেই সারি বেঁধে রওনা হলেন যাত্রীরা। এমন কি জাপও ইয়া মোটা লাঠি বাগিয়ে রইল সবার আগে।

রাতে গজরাতে গজরাতে আসছিল জানোয়ারদের দল। পিস্তল নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিচ্ছটায় দেখা গেল তাদের জ্বলন্ত চক্ষু। সংখ্যায় তারা অনেক—শ'খানেক তো বটেই।

শুরু হল লড়াই। টপের কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ল বিস্তর হানাদারদের, জাপের ডাণ্ডার ঘায়ে মরল আরো অনেক। গুলি চলল নির্ভুল লক্ষ্যে। গুলির আওয়াজ, জানোয়ারদের হুহুংকার, টপের বিকট গজরানি আর জাপের ডাণ্ডা পিটোনোর দমদাম শব্দে যেন নরক কাণ্ড চলল ঝাড়া দুটি ঘণ্টা ধরে।

ভোরের আলো ফুটতেই পোল পেরিয়ে রণে ভঙ্গ দিল বাদ বাকী জন্তুগুলো। গুণে দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশটা শেয়াল খতম হয়েছে সাতজনের কাছে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট—'জাপ কোথায়?'

সত্যিই তো! জাপকে দেখা গেল না ধারে কাছে কোথাও। গেল কোথায় সে? ভয় পেয়ে সবাই শেয়ালদের মৃতদেহের স্তূপ সরাতে সরাতে দেখলেন একদম তলায় মড়ার মত পড়ে রয়েছে জাপ। বুকে তার দারুণ কামড়ের চিহ্ন। হাতের মুঠোয় কেবল ডাণ্ডার বাঁটটুকু রয়েছে!

বেচারী! বীরের মতোই সে লড়েছে ছেঁকে ধরা শেয়ালদের সঙ্গে। মারের চোটে ডাণ্ডা ভেঙে যেতেই শেয়ালরা কাবু করেছে ওকে। শেয়ালদের মৃত দেহগুলো দেখলেই মালুম হয় কি প্রচণ্ড মার মেরেছে জাপ। আস্ত নয় কেউই—কারও খুলি, কারও চোয়াল, কারও পাঁজরা শত চূর্ণ করে ছেড়েছে একা জাপ।

জাপ বেঁচে আছে তো? উপুড় হয়ে দেখল নেব। আছে। বুকটা এখনো ধুকপুক করছে।

তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করে জাপকে নিয়ে আসা হল গ্র্যানাইট হাউসে। সেবা শুশ্রূষা চলল মানুষের মতই। আঘাত তেমন গুরুতর নয়—রক্ত ক্ষরণেই

কাহিল হয়ে পড়েছিল বেচারা। দিন দশেকের মধ্যেই নেবের বলকারক খাবার খেয়ে চাঙা হয়ে উঠল সে। এই সময়ে দেখা যেত রোজ রাত্রে বন্ধুর বিছানার পাশে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে টপ। ঘুমন্ত জাপের হাত চেটে আদর করছে আপনমনে।

পঁচিশে আগস্ট জাপের আর একটা কেরামতির নমুনা পেল দ্বীপবাসীরা। গম্ভীরভাবে পেনক্রফটের পাইপ নিয়ে তামাক খাচ্ছিল সে। নেবের চীৎকারের দৌড়ে এসে সেই কাণ্ড দেখে হেসে খুন হল সকলে।

পেনক্রফট বললে—'ঠিক আছে জাপ। এ পাইপ তোমাকে দিলাম। আমি আর একটা বানিয়ে নেব 'খন।'

অক্টোবর।

দশ তারিখে জলে ভাসল নতুন নৌকা। নাম দেওয়া হল 'বন-অ্যাডভেঞ্চার'।

সঙ্গে বেশ কিছু খাবার-দ্যবার নিয়ে রওনা হলেন যাত্রীরা। বেলা তখন সাড়ে দশটা। দেখতে দেখতে লিঙ্কলন দ্বীপ তিন চার মাইল পেছনে পড়ল। দূর থেকে দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হল সকলে।

পেনক্রফট বললে—ক্যাপ্টেন, নৌকো পছন্দ হয়েছে ?'

'চলছে তো ভালই,' বললেন হার্ডিং।

'দূর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত তো ?'

'দূরে কোথায় যেতে চাও পেনক্রফট ?'

'ধরুন ট্যাবরা দ্বীপে।'

'অপ্রয়োজনে কোথাও যাওয়াতে মত নেই আমার, পেনক্রফট। তুমি তো একলা যেতে পারবে না, একজন অন্ততঃ সঙ্গী নেবেই।'

'তাতো নেবই।'

'তাহলেই দেখ, পাঁচজনের মধ্যে থেকে দুজনের জীবন বিপন্ন করা হল। এটা কি ঠিক ? দরকার থাকলে ট্যাবর দ্বীপ কেন, আরও দূরে যেতে আমি রাজী। কিন্তু অদরকারে অত ঝুঁকি নেব কেন ?'

হার্ডিং-এর কথার জবাবেই যেন এর একটু পরেই জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে একটা পিপি আঁটা বোতল তুলে আনল হার্বার্ট !

বোতলটা নিয়ে ছিপি খুললেন হার্ডিং। ভেতরে এক তাড়া কাগজ। তাতে লেখা শুধু দুটি লাইন—

'ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত একজন ভাগ্যহীন'.

১৫৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং ৩৭°১১´ দক্ষিণ অক্ষাংশ

মওকা পেয়ে লাফিয়ে উঠল পেনক্রফট—'ক্যাপ্টেন, এখনও কি আপনি বাধা দেবেন ? মাত্র দেড়শ মাইল দূরে একজন আটক রয়েছে। বলুন এখন ট্যাবর দ্বীপে যাব কিনা।'

'আলবৎ যাবে পেনক্রফট।'

'কালকেই বেরিয়ে পড়ি ?'

'হ্যা, কালকেই বেরিয়ো পড়ো।' বলে চিরকুটটা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করলেন হার্ডি। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—'নির্বাসিত লোকটা নৌবিদ্যার অনেক কিছুই জানে দেখছি। ট্যাবর দ্বীপের অবস্থান আমরা যা বের করেছি, তার সঙ্গে এর হিসেব মিলে যাচ্ছে। তাছাড়া, লোকটা হয় ইংরেজ, নয় আমেরিকান। নইলে ইংরেজীতে চিঠি লিখত না।'

স্পিলেট বললেন—'তুমি ধরেছো ঠিকই, হার্ডিং। লোকটার ঠিকানা জানার পর সিন্দুক পাওয়ার ব্যাপারটাও পরিষ্কার হল। নিশ্চয় জাহাজ ডুবেছিল ট্যাবর দ্বীপের ধারে কাছে। ভাগ্যিস পাথরে ঠুকে ভেঙে যায়নি বোতলটা।'

হার্বার্ট বলে উঠল—'লোকটার কপাল দেখুন, বন-অ্যাডভেঞ্চার যেখান দিয়ে যাচ্ছে, বোতলটাও ভেসে এল ঠিক সেইখানে।'

ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য ! দ্বীপের বহু আশ্চর্য রহস্যের মতই রহস্যজনক। সাইরাস হার্ডিংয়ের মনে খটকা লাগলো বটে, কিন্তু এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

সেইদিনই সন্ধ্যে নাগাদ গোছগাছ সম্পূর্ণ হল। কথা ছিল শুধু দুজন যাবে—পেনক্রফট আর হার্বার্ট। কিন্তু স্পিলেট মহা হৈ-চৈ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর প্রতিবাদের কারণ হল একটাই। পেশায় তিনি সাংবাদিক। সুতরাং 'বন-অ্যাডভেঞ্চারে'র এই দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি থাকবেন না, এ কি হতে পারে ?

অগত্যা রাজী হতে হল হার্ডিংকে। পরের দিন লিঙ্কলন পতাকা উড়িয়ে রওনা হল বন-অ্যাডভেঞ্চার। সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার-দাবার এবং অস্ত্রশস্ত্র। সিকি মাইল গিয়ে দেখা গেল গ্র্যানাইট হাউসের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে টুপী রুমাল নেড়ে বিদায়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন হার্ডিং আর নেব।

দেখতে দেখতে গ্র্যানাইট হাউস অদৃশ্য হল। বহুদূর থেকে লিঙ্কলন দ্বীপকে

মনে হল যেন একটা ভারী সুন্দর সবুজে নুড়ি। মাঝে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়। বিকেল নাগাদ অগাধ জলের আড়ালে হারিয়ে গেল লিঙ্কলন দ্বীপের রেখা।

পেনক্রফটের উল্লাস দেখা গেল সব চাইতে বেশী। ঝিরঝিরে বাতাসে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে বন-অ্যাডভেঞ্চার। মাঝেমাঝে হার্বার্টের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে খোশ গল্প করছে স্পিলেটের সঙ্গে। ক্রমে রাত হল। তারার নিশানা দেখে কম্পাসের সাহায্যে ঠিক পথে তরতর করে বয়ে চলল নৌকো। ভোর হল নির্বিঘ্নে। সারাটা দিন কাটল মহাফূর্তিতে। বিকেল নাগাদ হিসেব করে দেখা গেল লিঙ্কলন দ্বীপ থেকে একশ বিশ মাইল আসা গিয়েছে। এইভাবে চললে কাল ভোরবেলা পৌঁছোনো যাবে ট্যাবর-দ্বীপে।

দারুণ উত্তেজনায় সে রাতে ঘুম এলনা কারো চোখে।

ভোর ছটায় চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট—'ট্যাবর দ্বীপ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকী দুজনের চোখেও ভেসে উঠল ট্যাবর দ্বীপের নীচু রেখা। বন-অ্যাডভেঞ্চারের মুখ ঈষৎ দক্ষিণ মুখো ছিল, এখন তা ঘুরিয়ে দেওয়া হল সোজা দ্বীপের দিকে।

বেলা এগারোটা নাগদে ট্যাবর দ্বীপ থেকে দুমাইল দূরে পৌঁছোলো বন-অ্যাডভেঞ্চার। তখন থেকে খুব সাবধানে এগোতে লাগল পেনক্রফট। অজানা জায়গা। চোরাপাহাড়ে লেগে তলা ফুটো হলে সর্বনাশ!

দ্বীপের এত কাছে এসে গেছে বন-অ্যাডভেঞ্চার, অথচ নির্বাসিত লোকটাকে তো তীরে ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে না। শুধু কি তাই, ধোঁয়া বা মনুষ্যবসতিরও কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো!

দুপুর বারোটা। ট্যাবর দ্বীপের বালিতে তলা আটকে গেল বন-অ্যাডভেঞ্চারের। নোঙর ফেলে ডাঙায় পা দিলেন অভিযাত্রীরা। প্রথমেই দরকার দ্বীপের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আইডিয়া।

প্রায় আধ মাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়। শতিনেক ফুট উঁচু। যাত্রীরা তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন সেইদিকে। তলায় পৌঁছে অল্প সময়ের মধ্যেই উঠে পড়লেন চূড়োয়।

দ্বীপটাকে স্পষ্ট দেখা গেল এবার। ডিমের মত আকার। পরিধি বড় জোর মাইল ছয়েক। চড়াই উৎরাইয়ের তেমন একটা বালাই নেই লিঙ্কলন দ্বীপের মত। বন-জঙ্গল ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

পাহাড় থেকে নেমে দ্বীপটাকে আগে এক চক্কর ঘুরে আসা মনস্থ করলেন অভিযাত্রীরা। তারপর অবস্থা বুঝে ভেতরে ঢোকা যাবে।

ঘণ্টা চারেক লাগল পুরো দ্বীপটাকে সমুদ্রের ধার দিয়ে এক পাক ঘুরে আসতে। পথে পাখীরা উড়ে গেল ওদের দেখে, সীলমাছেরা ভোঁ-দৌড় দিল জলের দিকে। বেশ বোঝা গেল, মানুষের সঙ্গে ইতিমধ্যে তাদের মোলাকাৎ হয়েছে। কিন্তু মানুষ তো চোখে পড়ল না! তবে কি যে এসেছিল, সে অন্য কোথাও চলে গেছে? মারাও যেতে পারে। বোতলটা দীর্ঘদিন ধরে জলে ভাসতে ভাসতে অ্যাদ্দিন পরে চোখে পড়েছে লিঙ্কলন দ্বীপবাসীদের।

দুপুরের খাওয়ার জন্য ফিরতে হল বন-অ্যাডভেঞ্চারে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ শুরু হল দ্বীপের ভেতর দিকে তল্লাসি পর্ব। ওঁদের দেখেই চোঁ-চোঁ দৌড় দিল বনের জানোয়ারয়া। ছাগল আর শুয়োরের সংখ্যাই বেশী। এককালে ট্যাবর দ্বীপে মানুষের বসবাস যে ছিল, এ সবই তার প্রমাণ। এমন কি জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলা রাস্তা পর্যন্ত দেখা গেল। কিছু গাছ কাটা হয়েছে। গুঁড়িতে কুড়ুলের কোপ অতি স্পষ্ট।

'একটা রাস্তা জঙ্গলের বুক চিরে কোনাকুনিভাবে চলে গেছে দ্বীপের ভেতরে। এই পথটাই ধরল অভিযাত্রীরা। এগিয়ে চলল একটা নদীর পাড় বরাবর। এ নদী মিলেছে সাগরে। মাঝে মাঝে জমিতে চাষবাস করার চিহ্ন দেখা গেল। হার্বার্ট দেখেই চিনতে পারল। কে যেন যত্ন করে বাঁধাকপি, টার্নিপ, ইত্যাদি চাষ করেছে। ভালই হল। লিঙ্কলন দ্বীপে এসব নিয়ে যেতে হবে।

স্পিলেট বললেন—'কিন্তু চাষের যা অবস্থা দেখছি, মানুষটা তো বেশীদিন থাকেনি এখানে। থাকলে এত মেহনতের জিনিস এভাবে নষ্ট হতে কেউ দেয়?

পেনক্রফট বললে—'বলেছেন ঠিকই। লোকটা কোন্ কালে দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। বোতলটা অ্যাদ্দিন ধরে ভেসে বেড়িয়েছে সমুদ্রের জলে।'

সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে। আর বনেজঙ্গলে থাকা চলে না। ফেরার কথা ভাবছে সকলে, এমন সময়ে বললে হার্বার্ট—'দেখুন, দেখুন, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে!

পড়ি কি মরি করে দৌড়ালেন তিনজনে। কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা একটা কুটির। চালটা পুরু তেরপলের।

অর্ধেক ভেজানো ছিল দরজাটা। ঠেলামেরে বেগে ভেতরে প্রবেশ করল পেনক্রফট।

শূন্য কুটির! কেউ নেই ভেতরে!

ভূতের মত অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন স্পিলেট, হার্বার্ট আর পেনক্রফট। গলা কাটিয়ে কত ডাকল পেনক্রফট, কিন্তু জবাব আর এল না।

আগুন জ্বালানো পেনক্রফট। খালি ঘরে মানুষ থাকার সব চিহ্নই বর্তমান, অথচ মানুষটি নেই। পেছনে আগুন পোহানোর চুল্লী। স্যাঁতসেঁতে হলদেটে চাদর পাতা একটা বিছানা। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন কেউ শোয়নি সেখানে। আগুনের চুল্লীর একদিকে দুটো মরচে ধরা কেটলি। কিছু ঠাণ্ডা কয়লা আর একরাশ কাঠ। তাকের ওপর নাবিকের পরিচ্ছদ—ময়লা এবং ছেঁড়া। টেবিলের ওপর টিনের প্লেট আর বাইবেল। এককোণে কোদাল কুড়ুল এবং আরো কিছু যন্ত্রপাতি। দুটো বন্দুক—একটা ভাঙা। তাকের ওপর বারুদ ভর্তি একটা পিপে। কার্তুজ আর ছররাও রয়েছে প্রচুর। ধুলোর পুরু স্তর ঢেকে রেখেছে সব কিছুই।

পেনক্রফট বললে—'ঘর খালি। বহুদিন কেউ এখানে থেকেছে বলেও মনে হয় না। আমার মতে রাতটা এখানেই কাটানো যাক।'

স্পিলেট বললেন—'ভালো যুক্তি দিয়েছ পেনক্রফট। দৈবাৎ যদি ফিরে আসে ঘরের মালিক, নিশ্চয় অখুশী হবে না আমাদের দেখে।'

'সে আর ফিরবে না।'

'দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে বলতেও চাও?'

'চলে গেলে কি আর বারুদ বন্দুক যন্ত্রপাতি ফেলে যেতো? জাহাজ ডুবি হয়ে অসহায় অবস্থায় যারা দ্বীপে আটক পড়ে, তাদের কাছে এ সব জিনিসের দাম অনেক মিস্টার স্পিলেট। সে এই দ্বীপেই আছে।'

'জীবিত তো?' শুধোলো হার্বার্ট।

'মারাও যদি যায়,' বলল পেনক্রফট। দেহটা তো পাওয়া যাবে।'

সারারাত আগুন জ্বলল কুঁড়ে ঘরে। কিন্তু কেউ এল না, দরজা খুলল না, বাইরেও কারও আসা যাওয়ার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ভোর হতেই তন্ন তন্ন করে হাড়গোড় খুঁজতে লাগলেন অভিযাত্রীরা। যদি পাওয়া যায়, কবর দিয়ে যেতে হবে। কুঁড়েঘরটা তৈরী হয়েছে বড় সুন্দর জায়গায়। সামনে মাঠ, দূরে সমুদ্র, বাঁদিকে নদীর মুখ, পেছনে পাহাড়, চারপাশে গাছ। বাড়ির সামনে খানিকটা মাঠ বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল, এখন তা প্রায় মাটিতে মিশেছে।

ঘরটার দেওয়াল যে তক্তায় তৈরী, তা ধার করা হয়েছে কোন একটা জাহাজ থেকে। দ্বীপের কাছেই জাহাজটার তলা ভেসে ছিল বোধ হয়। একটা কাঠের পাটাতনে জাহাজের ফিকে হয়ে আসা নামটা দেখলেন স্পিলেট :

Br—tan—a অর্থাৎ Britannia। কয়েকটি অক্ষর রোদে জলে একেবারে মুছে গেলেও নামটা পড়তে কোনো অসুবিধে হল না। জাহাজের নাম তাহলে ব্রিটানিয়া। যাই হোক, বন-অ্যাডভেঞ্চারে আকণ্ঠ খেয়ে নিয়ে অভিযাত্রীরা ফের বেরুলেন দেহাবশেষের সন্ধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য! দ্বীপের অর্ধেকেরও বেশী দেখার পরেও লোকটার কংকাল পাওয়া গেল না কোথাও! জানোয়ারদের পেটে কংকাল শুদ্ধ চলে গেল নাকি?

ক্লান্ত হয়ে বেলা দুটো নাগাদ গাছতলায় বসে পরামর্শ করলেন অভিযাত্রীরা কি করা যায় এখন। পেনক্রফট বললে—'কাল সকালে হাওয়া অনুকূল থাকবে। কালকেই লিঙ্কলন দ্বীপে ফিরব আমরা। হার্বার্ট, তুমি এখুনি যাও। এখান থেকে শাকসব্জি যা নিতে চাও, নিয়ে নাও। আমি মিস্টার স্পিলেটকে নিয়ে দেখি দু'একটা শূওর পাকড়াও করতে পারি কিনা।"

ঘণ্টাখানেক পর। ঝোপের মধ্যে দুটো শূকরকে বাগে এনেছেন পেনক্রেফট স্পিলেট, এমন সময়ে উত্তর দিক থেকে ভেসে এল হার্বার্টের আর্ত চীৎকার। সেই সঙ্গে রক্ত জল করা অমানুষিক হুংকার।

শূওর ফেলে ঝোপঝাড় টপকে তীরের মত ছুটলেন স্পিলেট আর পেনক্রফট। খোলা মাঠে দেখা গেল চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে হার্বার্ট। বুকের ওপর চেপে বসেছে ভীষণাকৃতি একটা ময়দানব।

চোখের পলক ফেলার আগেই অমানুষিক মানুষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেললেন স্পিলেট আর পেনক্রেফট। কিন্তু বিলক্ষণ বেগ যেতে হল তার হাত-পা বাঁধতে। ভীষণ জোর জন্তুর মত সেই হিংস্র মানুষটার গায়ে।

কপাল ভাল, অক্ষত থেকে গেছে হার্বার্ট।

পেনক্রুফট বললে—'বটে! নির্বাসিত লোক বলতে একেই বুঝতে হবে তাহলে!'

স্পিলেট বললে—'হ্যা, পেনক্রফট। কিন্তু ও এখন আর মানুষ নেই। চেহারা স্বভাব দুটোই তো দেখছি পুরোপুরি পশুর মত।'

সত্যিই তাই হয়েছে। বহুদিন একলা থাকার অভিশাপে সে আর মানুষ নেই। মুখ দিয়ে কথার বদলে বেরোচ্ছে ভাঙা-ভাঙা গজরানি। দাঁতগুলো মাংসাশী শ্বাপদদের মত চোখা-চোখা ধারালো। সে যে এককালে মানুষ ছিল, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শিখেছিল, আগুন জ্বালাতে জানত, তাও ভুলে গেছে।

তার মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছে, স্মৃতিও উধাও হয়েছে। স্পিলেট অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন তাকে, ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু চেয়েই রইল। তবুও কিন্তু চাহনির ধরন দেখে মনে হল, জ্ঞানটা এখনো আছে—পুরো যায়নি। কে জানে দীর্ঘদিন পরে স্বজাতিদের দেখে চেতনার স্ফুলিঙ্গ আবার তার মস্তিষ্কে আলোড়ন আনছে কিনা।

স্পিলেট বললেন—'একে আমরা লিঙ্কলন দ্বীপে নিয়ে যাবো।

'সেবাশুশ্রূষা করলে জ্ঞানগম্যি নিশ্চয় ফিরে আসবে। সায় দিল হার্বার্ট।

লোকটার পায়ের বাঁধন খুলে দিতে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াল। পালানোর চেষ্টা করল না। তীক্ষ্ণ চকিত চাহনি অভিযাত্রীদের ওপর বুলিয়ে নিয়ে এগোলো তাদের সঙ্গে।

প্রথমে যাওয়া হল তারই কুটিরে। জিনিসপত্র দেখেও কিন্তু পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হল না। এমন কি স্পিলেটের ফন্দীমাফিক তার সামনে আগুন জ্বালানোও হল—কিন্তু একবার মাত্র সেদিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল নরাকৃতি পশু-মানবটি। অগত্যা বন-অ্যাডভেঞ্চারে পেনক্রফটের হেপাজতে রেখে বাকী দুজন দ্বীপ থেকে নিয়ে এলেন লোকটার বাসন-কোসন, বন্দুক, গুলি-বারুদ। শাকসব্জি আর দুই জোড়া শূওর সংগ্রহ করতেও ভুল হল না স্পিলেট আর হার্বার্টের।

বন্দী কিন্তু নিথর দেহে বসে রইল কেবিনে। এত জিনিসপত্র দেখেও সে নির্বিকার। রান্না করা খাবার ধরা হল তার সামনে—ঠেলে সরিয়ে দিল। কিন্তু যেই একটা সদ্যমারা হাঁস তার সামনে বাড়িয়ে দিল হার্বার্ট, অমনি সে ছোঁ মেরে টেনে নিল হাঁসটা। গবগব করে খেতে লাগল কাঁচা মাংস!

পেনক্রফট তাই দেখে বললে—'মিস্টার স্পিলেট এর জ্ঞান ফিরবে কি?'

রাত নির্বিঘ্নে কাটল। বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে কয়েদীর। ঘুমিয়ে ছিল কিনা বলা মুস্কিল।

পনেরোই অক্টোবর।

ভোরবেলা রওনা হল বন-অ্যাডভেঞ্চার। গতিমুখ সোজা লিঙ্কলন দ্বীপের দিকে। প্রথম দিন কেবিনের মধ্যেই রইল লোকটা। ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে।

ষোলই অক্টোবর। বাতাসের টান বাড়ছে। চিন্তিত হল পেনক্রফট।

সতেরোই অক্টোবর। আটচল্লিশ ঘণ্টা তো হয়ে গেল, একটানা ভেসে চলেছে বন-অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু লিঙ্কলন দ্বীপ কোথায়?

আঠারোই অক্টোবর। লিঙ্কলন দ্বীপের দেখা নেই। হাওয়া আরো জোর হয়েছে। দামাল হয়েছে সমুদ্র। বিরাট একটা ঢেউ নৌকোর ওপর দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস ডেকের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখেছিলেন যাত্রীরা, নইলে ঢেউয়ের সঙ্গেই সাগরে গিয়ে পড়তেন সকলে।

এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অভিযাত্রীরা তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলছেন নিজেদের, এমন সময়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কয়েদী। ডেকের কার্নিশের কাঠ ভেঙে দিয়ে ফের ঢুকে গেল কেবিনে। ভাঙা জায়গা দিয়ে হু-হু করে জল বেরিয়ে যেতেই হাল্কা হয়ে গেল বন-অ্যাডভেঞ্চার !

কয়েদীর এই আশ্চর্য আচরণ দেখে তো আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল স্পিলেট আর পেনক্রফটের !

রাত নামল। পথ হারিয়েছে বন-অ্যাডভেঞ্চার তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে কপাল ভালো, রাত এগারোটা নাগাদ ঝড়ো হাওয়া কমে এল, সমুদ্র শান্ত হল, নৌকোর গতিবেগও বাড়ল।

ঘুম উড়ে গিয়েছিল যাত্রীদের চোখ থেকে। কে জানে, লিঙ্কলন দ্বীপে আর কোনোদিন ফিরে যাওয়া যাবে কিনা !

রাত দুটো। আচম্বিতে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট—'আলো ! আলো !'

উত্তর পূর্বদিকে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে যেন একটা বিশাল নক্ষত্র জ্বলছে দপ্-দপ্ করে। আগুন জ্বালিয়েছে কেউ। নিশ্চয় সাইরাস হার্ডিং। লিঙ্কলন দ্বীপও তো ঐ দিকে !

অনেক উত্তর দিকে চলে গিয়েছিল পেনক্রফট। ঐ আলো না জ্বালানো হলে ইহজীবনে আর ফিরতে হত না লিঙ্কলন দ্বীপে !

১৫

পরদিন, বিশে অক্টোবর সকাল সাতটা।

ট্যাবর দ্বীপ থেকে রওনা হওয়ার পর সেদিন হল চতুর্থ দিন। মার্সি নদীর মুখে হেলতে-দুলতে এসে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেঞ্চার।

সঙ্গীদের ফিরতে দেরী দেখে দারুণ ভাবনায় পড়েছিলেন সাইরাস হার্ডিং। নেবকে নিয়ে ঠিক সেই সময়ে তিনি প্রসপেক্ট হাইটে উঠছিলেন সমুদ্র পর্যবেক্ষণের জন্যে। বন-অ্যাডভেঞ্চারকে আসতে দেখে সব চাইতে আনন্দ হল নেবের। ধেই ধেই করে এক চক্কর নেচেই নিল মহানন্দে।

হার্ডিং কিন্তু নিরাশ হলেন ডেকের ওপর মাত্র তিনজনকে দেখে। ট্যাবর

দ্বীপের নির্বাসিত লোকটিকে তাহলে পাওয়া যায়নি। অথবা সে দ্বীপ ছেড়ে আসতে রাজী হয়নি।

সঙ্গীরা ডাঙায় নামার আগেই সেখানে হাজির হলেন হার্ডিং। সঙ্গে নেব।

বললেন হার্ডিং—'তোমাদের দেরী দেখে ভাবলাম ঝামেলায় পড়েছো।'

'ঝামেলা কিসের?' বলল স্পিলেট—'ভালভাবেই সাঙ্গ হয়েছে সব। পরে শুনবে'খন।'

'তোমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে দেখছি। চতুর্থ ব্যক্তিটি কোথায়?'

'আছে। আমরা চার জনেই ফিরেছি।'

'কোথায় সে? লোকটা কে বলো তো?'

'সেটা বলা মুস্কিল। কেননা এককালে সে মানুষ ছিল—এখন নেই।'

বলে, সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন স্পিলেট। পেনক্রফট সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'ক্যাপ্টেন, কেন জানি আমার মনে হচ্ছে লোকটাকে এখানে এনে মোটেই ভাল করিনি।'

'আরে দূর, ওসব ভেবোনা,' বললেন হার্ডিং—'এতে ওর ভালই হবে।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন ও যে একেবারেই জানোয়ার হয়ে গিয়েছে।'

'নির্জনতা একটা অভিশাপ পেনক্রফট। এককালে তো আমাদের মত মানুষ ছিল।'

স্পিলেট বললেন—'ক'মাস আগে জ্ঞান না থাকলে বোতলের চিরকুটটা লিখল কে?'

যাই হোক, কেবিন থেকে নিয়ে আসা হল জংলী লোকটাকে। খোলা জায়গায় দাঁড়াতেই মনে হল পালানোর ইচ্ছে জেগেছে মনে। কিন্তু সাইরাস হার্ডিং কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখতেই ভাবান্তর ঘটল। হার্ডিংয়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা এবং করুণা-স্নিগ্ধ চাহনির দিকে তীব্র চোখে তাকিয়েই মাথা হেঁট করল ভীষণ-মূর্তি লোকটা। দেখতে দেখতে হাবভাব শান্ত হয়ে এল তার—অস্থিরতার লেশমাত্র রইল না।

হার্ডিংয়ের সন্ধানী চোখ অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু দেখে নিল। লোকটার পাশবিক আচার-আচরণ-চেহারার অন্তরালে কোথাও একটা চেতনার স্ফুলিঙ্গ এখনো অনির্বাণ রয়ে গেছে। সেবা দিয়ে তাকে ফের মানুষ করা যাবে।

কয়েদীকে নিয়ে ফিরে এলেন সকলে গ্র্যানাইট হাউসে।

ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল হার্বার্ট, পেনক্রফট, স্পিলেটের। চটপট রান্না সেরে নিল নেব। খেতে বসে অদ্ভুত আগন্তুককে নিয়ে জল্পনার বিরাম রইল

না। লোকটা যদি ব্রিটানিয়া জাহাজের নাবিক হয়ে থাকে তো সে হয় ইংরেজ, না হয় আমেরিকান।

হার্ডিং জিজ্ঞেস করলেন হার্বার্টকে—'তোমাকে তো বাবা একটা কথা এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। লোকটার সঙ্গে তোমার মোলাকাৎটা হল কি ভাবে?'

'আমি তো শাকসব্জি তুলতে ব্যস্ত ছিলাম,' বললে হার্বার্ট। 'হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম গাছের ওপর থেকে সড় সড় করে বিদ্যুৎবেগে কি যেন নেমে এল। চোখ তোলবার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।'

'ভাগ্যিস চড়াও হয়েছিল তোমার ওপর, নইলে তো ওকে ধরাও যেত না। খালি হাতেই ফিরতে হত ট্যাবর দ্বীপ থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকো থেকে জিনিসপত্র নামানো হল। শূওরগুলো গেল খোঁয়াড়ে। বারুদের পিপে গ্র্যানাইট হাউসে। বন-অ্যাডভেঞ্চারকে রেখে দেওয়া হল বেলুন বন্দরের নিস্তরঙ্গ জলে।

দিন কয়েকের মধ্যে দেখা গেল অনেকটা মানুষের মত হয়েছে কয়েদী। রান্না মাংস দিলে এখন আর ঠেলে ফেলে দেয় না, খেয়ে নেয়। ঘুমের সুযোগ নিয়ে একদিন হার্ডিং তার চুল-দাড়ি কেটে ভদ্রস্থ করলেন চেহারাটিকে। জামা-কাপড় পরিয়ে দিতে বুনো ভাবটা আর রইল না। গ্র্যানাইট হাউসে বন্দ, থাকায় রাগে মুখ থমথমে হয়ে থাকলেও বাড়াবাড়ির ধার দিয়েও সে গেল না।

প্রতিদিন তার সঙ্গে কিছুটা সময় ব্যয় করতেন হার্ডিং। তার সামনে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন। নৌবিদ্যা প্রসঙ্গও থাকত তার মধ্যে। এমন সব কথা বলতেন যা শুনলে নাবিক মাত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মাঝেসাঝে কানখাড়া করে কথা শুনত আগন্তুক। মুখভাব দেখে মনে হত, কথাগুলো সে বুঝতে পারছে। সব সব সময়ে গম্ভীর হয়ে থাকলেও মধ্যে মধ্যে দুঃখের ছায়া ভাসত মুখে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। সাইরাস হার্ডিংয়ের প্রতি সে একটু অনুরক্ত হয়েছে।

হার্ডিং এই সুযোগটা নিলেন।

একদিন ঠিক করলেন বন্দীকে নিয়ে যাবেন জঙ্গলের কিনারায়। দেখা যাক না পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখচ্ছবি পালটায় কিনা।

স্পিলেট আর পেনক্রফট দুজনেই নিমরাজী হলেন প্রস্তাবটায়। বললেন—'গায়ে মুক্তির বাতাস লাগলেই ভোঁ-দৌড় দেবে।'

'দেখা যাক,' বললেন হার্ডিং—'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

আগন্তুককে লিঙ্কলন দ্বীপে আনার ন'দিন পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। হার্ডিং তার ঘরে ফিরে ডাকলেন—'ওঠো, আমার সঙ্গে চলো।'

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। একবার মাত্র সাইরাস হার্ডিংয়ের চোখে চোখ রাখল। পরক্ষণেই মাথা নীচু করে এল তাঁর পেছন পেছন। সবার পেছনে রইল পেনক্রফট।

লিফটে করে নীচে নামল সবাই। সমুদ্রতীরে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হল তাকে—দ্বীপবাসীরা রইলেন পেছনে।

ধীর পদে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল আগন্তুক। ফেনায়িত ভাঙা ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

স্পিলেট বললেন 'সমুদ্র দেখলে কি আর পালাতে চাইবে ও?'

'বেশ তো, জঙ্গলের সামনেই যাওয়া যাক,' বললেন হার্ডিং।

প্রসপেক্ট হাইটের ধার থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। আগন্তুককে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। সারি দিয়ে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বীপবাসীরা। পালানোর চেষ্টা করলেই পাকড়াও করব।

অপলকে বনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল আগন্তুক। সামনে অপরিসর খাল। ওপাশে গভীর জঙ্গল। ক্ষণেকের জন্যে মনে হল উদ্দাম বনের আহ্বান যেন আকুল করেছে তাকে। পা দুটো ঈষৎ বেঁকে গেল—এই বুঝি লাফিয়ে পড়বে খালের জলে। পর মুহূর্তে পিছিয়ে এসে ধপ্ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল আগন্তুক। দেখা গেল অশ্রুর ধারা নেমেছে গাল বেয়ে।

'বুঝেছি,' বললেন সাইরাস হার্ডিং, 'ফের মানুষ হলে তুমি, নইলে কাঁদতে পারতে না!'

১৬

দূরে সরে এলেন দ্বীপবাসীরা কিন্তু স্বাধীনতা পেয়ে পালিয়ে গেল না আগন্তুক। সুতরাং তাকে নিয়েই সকলে ফিরলেন গ্র্যানাইট হাউসে।

এই ঘটনার পর থেকে দেখা গেল দ্বীপবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে গতর খাটাতে সে-ও আগ্রহী। বেশ বোঝা গেল, সে সব বোঝে—মুখে কিছু বলে

না। একদিন পেনক্রফট তার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনল বুকভাঙা হাহাকার।
—'আমি এখানে ? না—না—না!'

লোকটার অতীত যে খুব দুঃখময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে থেকে থেকে এমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেন ? সদা গম্ভীর, বিষণ্ণময়, আলাদা থাকতে পারলে বেঁচে যায়। নিশ্চয় কোনো মহাপাপের অনুতাপে অনুতপ্ত সে। তুষের আগুনের মত জ্বলে-পুড়ে মরছে মনের ভেতর।

একদিন প্লেটোতে মাটি কোপাতে-কোপাতে হঠাৎ কোদাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠল আগন্তুক। দূরে থেকেও তার দিকে নজর রেখেছিলেন হার্ডিং। দেখলেন আগন্তুক ফের কাঁদছে। ঝরঝর করে জল পরছে চোখ দিয়ে।

হার্ডিংয়ের নরম মন কাতর হোল লোকটার নীরব অশ্রুপাত দেখে। কাছে গিয়ে তিনি তাকে স্পর্শ করলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—'আমার চোখে চোখ রাখো।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত হুকুম তামিল করল আগন্তুক। সোজা চাইল ক্যাপ্টেনের দিকে। মুহুর্মুহু ভাব পাল্টাতে লাগল তার অশ্রুসিক্ত মুখে। একবার মনে হল বুঝি এই পালাবে। পরের মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে। ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে দুই হাত ভাঁজ করে রাখল বুকে। থরথর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। বলল ভাঙা-ভাঙা স্বরে—'কে আপনারা ?'

আবেগ গলা কেঁপে গেল ক্যাপ্টেনের। বললেন—'বন্ধু, তোমার মতই আমরা **castaways**—পরিত্যক্ত মানুষ। ট্যাবর দ্বীপে তুমি খুব দুরবস্থায় ছিলে—বন্ধুর মতই নিয়ে এসেছি এই দ্বীপে।'

'বন্ধু! আমার বন্ধু!! বন্ধু বলে দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। না…না না। চলে যান আপনারা, সরে যান আমার কাছ থেকে।' বলতে বলতে ছিটকে গিয়ে সে দাঁড়াল প্লেটোর এক প্রান্তে—পলকহীন চোখে চেয়ে রইল ফেনিল সমুদ্রের পানে।

খবরটা সঙ্গীদের জানালেন হার্ডিং। শুনেই স্পিলেট বললেন—'নিশ্চয় কোনো গোপন রহস্য আছে এর জীবনে। এখন মরছে অনুতাপের আগুনে।'

হার্ডিং বললেন—'তা নিয়ে আমাদের দরকার কি ? অন্যায় করে থাকলে তার শাস্তিও হয়েছে যথেষ্ট। এখন ও নির্দোষ—অন্ততঃ আমাদের চোখে।'

ঘণ্টা দুয়েক গুম হয়ে সমুদ্রের তীরে বসে থাকল আগন্তুক। তারপর এসে দাঁড়াল হার্ডিংয়ের সামনে। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি রক্তবর্ণ, কিন্তু মুখে দ্বিধা সঙ্কোচের ভাব। ঘাড় হেঁট করে শুধোলো—'স্যার আপনারা কি ইংরেজ ?'

'না। আমেরিকান,' জবাব দিলেন হার্ডিং।

'বাঁচলাম।'

'তুমি কোন দেশের মানুষ ?'

'ইংলণ্ডের।'

মাত্র এই কটি কথা বলে ফেলে যেন বিষম বিব্রত হয়ে পড়ল বেচারী। ছুটে চলে গেল সমুদ্রতীরে। চঞ্চলভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করার পর ফিরে এসে শুধোলো হার্বার্টকে—'এটা কি মাস ?'

'নভেম্বর।'

'সাল ?'

'১৮৬৬।'

'বারো বছর ! বারো বছর !' বলেই সাঁ করে সে ছুটে চলে গেল হার্বার্টের সামনে থেকে।

হার্বার্টের মুখে নবাগতের অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে হার্ডিং বলেন—'বেচারী ! বারো বছর একা থেকেছে ট্যাবর দ্বীপে। জ্ঞান হারিয়ে অমানুষ হওয়াটা আশ্চর্য নয়।'

পেনক্রফট বললে—'আমার তো মনে হয় কোন গুরুতর অপকর্মের জন্যে ওকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।'

'যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড', বললেন হার্ডিং। 'নির্দিষ্ট দিনে মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না বলেই বোতলে চিরকুট ভরে ভাসিয়ে ছিল সাগরে।'

স্পিলেট বললেন—'তাহলে বুঝতে হবে অমানুষ জংলী হয়ে যাওয়ার আগেই এ-কাজ করতে হয়েছে তাকে। মানে বহু বছর আগে ?'

'সেক্ষেত্রে' বললে পেনক্রফট—চিরকুটের কাগজ স্যাঁতসেঁতে হয়ে যেত। কিন্তু রীতিমত শুকনো অবস্থায় চিঠির কাগজটা পেয়েছি আমরা। তাই না ক্যাপ্টেন ?'

অকাট্য যুক্তি। হার্ডিং জবাব দেবেন কি ? তিনি নিজেও বুঝলেন এ-দ্বীপের বহু রহস্যের তালিকায় বাড়ল আর একটি রহস্য। বোতলে ভরে চিরকুটটি অমন তাজা অবস্থায় বন-অ্যাডভেঞ্চারের গায়ে এসে লাগল কি করে ?

এরপর কিছুদিন পর্যন্ত রহস্যজনক আগন্তুক ফের বোবা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে খানিকটা ছন্নছাড়াও। আপন মনে কাজ করে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। শাকসবজী খায়। পাহাড়ের ফাটলে রাত কাটায়। গ্র্যানাইট হাউসে খেতে আসে না, রাত কাটাতেও আসে না। আস্তে আস্তে যেন আবার বন্য-স্বভাবটা ফিরে আসছে তার।

অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন দ্বীপবাসীরা। একদিন না একদিন তার দুঃস্বপ্নের কাহিনী তাকে বলতেই হবে নিজেকে হাল্কা করার জন্যে!

দশই নভেম্বর, রাত আটটা।

ঝড়ের মত প্রসপেক্ট হাইটের বারান্দায় উপস্থিত হল আগন্তুক। শ্বাপদের মতই জ্বলছে তার চোখ। মুখভাব অত্যন্ত হিংস্র।

এসেই যে প্রলাপ বকুনি শুরু করল আগন্তুক—'কেন আমি এসেছি এখানে?···আমাকে নিয়ে আসার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের?···জানেন আমি কে?···কেন, কি অপরাধে ট্যাবর দ্বীপে ছিলাম একলা?···আমাকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা, তা কি জানেন?···জানেন কি আমার পূর্ব জীবনের কোনো ঘটনা?···আমি চোর ডাকাত খুনে বাটপাড় কিনা তাও তো জানা দরকার—জানেন কি সে সব কথা?'

আগন্তুকের অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে আর ভীষণ উত্তেজনা দেখে হার্ডিং এগিয়ে গেলেন তাকে শান্ত করার জন্যে। কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে ঝাঁ করে পিছু হটে গেল সে—'না, না! বলুন···শুধু একটা কথা আমাকে বলুন···আমি স্বাধীন না, পরাধীন?"

'স্বাধীন', বললেন হার্ডিং।

'চললাম তাহলে' বলেই পাগলের মত বনের দিকে ছুটে মিলিয়ে গেল আগন্তুক। পেনক্রফট, হার্বার্ট আর নেব পেছনে ছুটল বটে, কিন্তু নাগাল ধরা গেল না।

পেনক্রফট ফিরে এসে বললে—'ও আর ফিরবে না।'

'ফিরবে, আমি বলছি ফিরবে।' বললেন হার্ডিং। 'কিছুদিন একলা থাকলেই ভয় পেয়ে ফিরে আসবে।'

এর পরের কয়েকদিন দ্বীপবাসীরা ব্যস্ত রইলেন হাওয়া-কল বানানোর ব্যাপারে। প্রসপেক্ট হাইটের ওপর তৈরী হল উইণ্ড মিল। হাওয়ার জোর সেখানে প্রচুর। নমুনা হার্ডিংয়ের। মেহনৎ পেনক্রফটের। কলটি বসার পর থেকেই ময়দার আর অভাব হল না দ্বীপবাসীদের। রুটির অভাব মিটল এতদিনে।

তেসরা ডিসেম্বর।

হার্বার্ট লেকের দক্ষিণতীরে মাছ ধরছে, পেনক্রফট আর নেব রয়েছে পোলট্রি হাউসে, হার্ডিং আর স্পিলেট চিমনীতে বসে সোডা তৈরী করছেন

সাবানের জন্যে। চীৎকার শোনা গেল ঠিক তখনি। হার্বার্ট চেঁচাচ্ছে ভীষণ আতংকে—'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল! মেরে ফেলল!'

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন দ্বীপবাসীরা লেকগ্রান্টের তীরে। এসে দেখলেন একটা জাগুয়ার লাফানোর উদ্যোগ করছে হার্বার্টের ওপর। প্রাণের ভয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছে হার্বার্ট।

আচম্বিত বিদ্যুৎবেগে বনের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হল আগন্তুক। বিনা-দ্বিধায় এক হাতে খোলা ছুরি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল জাগুয়ারের ওপর। দুর্ধর্ষ সাহস তার। প্রচণ্ড শক্তি বাহুতে। এক হাতে টুটি টিপে ধরল জাগুয়ারের, অপর হাতে ছুরি বসিয়ে দিল হৃৎপিণ্ডে। মোক্ষম ছুরিকাঘাত। খতম হল চতুষ্পদ।

টুঁটি ছেড়ে দিতেই ভূমির লুটিয়ে পড়ল ভীষণাকার জাগুয়ার। আগন্তুক তাকে লাথি মেরে যেই ছুটে পালাতে যাবে বনের মধ্যে, অমনি হার্বার্ট তাকে চেপে ধরে, চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে—'না না, আমি তোমাকে যেতে দেব না, কিছুতেই না।'

অন্যান্য দ্বীপবাসীরাও ততক্ষণে এসে গেছেন সেখানে। দরদর করে রক্ত পড়ছে আগন্তুকের কাঁধ থেকে—জাগুয়ারের থাবায় চিরে গেছে কাঁধের মাংস। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই দুদান্ত লোকটার।

হার্ডিং কাছে গিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন—'বন্ধু! নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছেলেটির জীবন বাঁচিয়ে আজ তুমি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধলে।'

'জীবন! কি দাম আমার এই জীবনের?' বলল আগন্তুক।

'সাংঘাতিক চোট পেয়েছ দেখছি।'

'ও কিছু না।'

'তোমার হাত দুটো আমাকে দেবে?'

ঝটিতি হাত দুটো নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে সবেগে প্রশ্ন করল আগন্তুক—'কে আপনারা? কি দরকার আমার সঙ্গে আপনাদের?…'

সংক্ষেপে প্রত্যেকের পরিচয় দিলেন হার্ডিং। নিজেদের সব ঘটনা বললেন; বললেন—'তোমাকে বন্ধুরূপে ট্যাবর দ্বীপ থেকে উদ্ধার করে যে আনন্দ পেয়েছি, সে রকম এর আগে কখনো পাইনি।'

শুনেই মুখ লাল হয়ে গেল আগন্তুকের! বেশ বোঝা গেল, আবার প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারী।

হার্ডিং বললেন—'আমাদের পরিচয় বললাম। এবার বলো তোমার পরিচয়।'

'না! না! আপনারা সাধু সজ্জন। আর আমি?'

এই কথা থেকেই রহস্যময় আগন্তুকের পাপপূর্ণ পূর্বজীবনের কিছুটা আভাষ পাওয়া গেল। দ্বীপবাসীদের অনুমান অভ্রান্ত। লোকটা এমন কিছু কুকর্ম করেছে অতীতে, যার অনুতাপে জ্বলে মরছে এখনো। সাধু পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাই তার এত দ্বিধা, সংকোচ, কুণ্ঠা।

যাই হোক, আওয়ার নিধনের পর থেকে সে আর বনে ফিরে গেল না বটে, কিন্তু গ্রানাইট হাউসেও ফিরল না। রইল গ্র্যানাইট হাউসের সীমানার মধ্যেই। থাকে পাহাড়ের ফাটলে। খায় শাকসবজী। দ্বীপবাসীদের এড়িয়ে চলতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

অপরিসীম সমবেদনা নিয়ে তার গূঢ় রহস্য শোনার প্রতীক্ষায় রইলেন দ্বীপবাসীরা। কিছুটা যখন বলেছে, বাকীটুকুও তাকে বলতেই হবে একদিন।

দিন সাতেক পর। সেদিন ছিল দশই ডিসেম্বর।

হঠাৎ হার্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। চোখ নামিয়ে বললে—'স্যার একটা অনুরোধ করব ?'

হার্ডিং বললেন—'নিশ্চয় করবে। বন্ধু হিসেবে করবে, নিছক সঙ্গী হিসেবে নয়।'

দুহাতে চোখ চেপে ধরল আগন্তুক। থর থর করে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ।

একটু সামলে নিয়ে বলল অবশেষে—'আপনাদের খোঁয়াড় এখান থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। দেখাশুনার জন্যে কেউ নেই সেখানে। আমি থাকতে চাই ওখানে।'

'কিন্তু ওখানে তো শুধু জানোয়ারদের থাকার ব্যবস্থা আছে, মানুষের তো নেই।'

'আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হার্ডিং—'বেশ, তোমার কোনো ইচ্ছেতেই বাধা দেব না। তবে মনে রেখো, গ্র্যানাইট হাউসের দরজা চিরকাল তোমার জন্যে খোলা। যাক, তোমার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে খোঁয়াড়ে।'

'খামোকা ভাববেন না ও নিয়ে। আমি করে নেব খন।'

'তা হয় না। ও ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।'

সাতদিনের মধ্যে একটা সুন্দর ঘর তৈরী হল খোঁয়াড়ে। আরামে থাকার

সমস্ত ব্যবস্থা রইল তার মধ্যে। আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে বন্দুক যন্ত্রপাতিও রইল সেখানে।

এত ব্যবস্থার কিছুই জানল না আগন্তুক। সে তখন প্লেটোর চাষবাস নিয়েই ব্যস্ত।

বিশে ডিসেম্বর।

খোঁয়াড়ে থাকার ঘর সম্পূর্ণ হয়েছে। এ-খবর হার্ডিং পৌঁছে দিলেন আগন্তুককে। ঠিক হল সেই রাতেই সে শুতে যাবে সেখানে।

রাত আটটা নাগাদ গ্র্যানাইট হাউসে গল্প গুজব করছে সকলে, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল আগন্তুক।

বলল—'যাওয়ার আগে আমার সব কথা আপনাদের বলে যেতে চাই।'

দাঁড়িয়ে উঠলেন হার্ডিং। বললেন—'বন্ধু, নাই বা বললে? আমরা শোনার জন্যে ব্যস্ত নই।'

'কিন্তু বলাটা আমার কর্তব্য।'

'তবে বসে বল, দাঁড়িয়ে নয়।'

'বসব না। দাঁড়িয়েই বলব।'

ঘরের কোণে আলো আঁধারির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল রহস্যে ঘেরা আগন্তুক। দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে শোনাল তার আশ্চর্য কাহিনী।

১৮৫৪ সাল। বিশে ডিসেম্বর। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল।

একটা ছোট্ট জাহাজ এসে নোঙর ফেলল বারমুলি অন্তরীপে। জাহাজের মালিক জাহাজেই আছেন। ইনি লর্ড গ্লেনারভন। স্কটল্যাণ্ডের ধনবান ব্যক্তি। সঙ্গে ছিলেন লেডী গ্লেনারভন, একজন ইংরেজ আর্মি মেজর, একজন ফরাসী ভূগোলবিদ্, তার অল্প বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ে দুটি ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের। এক বছর আগে সমুদ্রে নিখোঁজ হয়েছিল ক্যাপ্টন গ্রাণ্টের জাহাজ 'ব্রিটানিয়া।' লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজের নাম 'ডানকান'। ডান্‌কানের ক্যাপ্টেন হলেন জন ম্যাঙ্গল্‌স। জাহাজে সব মিলিয়ে খালাসী কর্মচারীর সংখ্যা পনের জন।

'ছমাস আগে আইরিশ সমুদ্রে একটা বোতল পায় ডান্‌কান জাহাজ। বোতলে এক তাড়া কাগজে ইংরেজী, ফরাসী আর জার্মান ভাষায় একটা খবর ছিল। নিখোঁজ ব্রিটানিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন আর তাঁর দুজন সঙ্গী বেঁচে আছেন। একটা দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছেন তিনজনে। দ্বীপের অক্ষাংশ দেওয়া ছিল ৩৭°১১´ দক্ষিণ। দ্রাঘিমা পড়া গেল না। সমুদ্রের জলে ধুয়ে গেছে। সুতরাং এই অক্ষাংশ বরাবর দেশ, সমুদ্র সবকিছুর ওপর দিয়ে গেলে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট আর তাঁর দুই সঙ্গীর আশ্রয়স্থল সেই দ্বীপটিতে পৌঁছোনো যাবে।

'উদ্ধারকার্যে এগোতে দ্বিধা করছিল ইংলণ্ডের নৌবিভাগ। দেখেশুনে মনস্থির করে ফেললেন লর্ড গ্লেনারভন। তিনি নিজেই বেরোবেন ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সন্ধানে। গ্রাণ্টের ছেলে মেয়েকে তিনি চিঠি লিখে আনিয়ে নিলেন ডান্‌কান্ জাহাজে।

'লম্বা সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্যে তৈরী হল ডান্‌কান্ জাহাজ। গ্লাসগো বন্দর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলল জাহাজ। ম্যাগেলান প্রণালী পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর বরাবর এগোলো প্যাটাগোনিয়া পর্যন্ত। বোতলের লিপি অনুযায়ী নাকি এই প্যাটাগোনিয়ার কাছেই কোথাও ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টকে কয়েদ করে রেখেছিল রেড ইণ্ডিয়ানরা।

'প্যাটাগোনিয়ার পশ্চিম উপকূলে আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে ডান্‌কান্ চলে গেল। ব্যবস্থা হল, পূর্ব উপকূলের কোরিয়েণ্টিজ অন্তরীপে ডান্‌কান্ তাদের জাহাজে তুলে নেবে।'

'সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ ধরে প্যাটাগোনিয়া ঘুরে পূর্ব উপকূলে হাজির হল ডান্‌কান্। পথে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে যাত্রীদের ফের জাহাজে তুলে নিয়ে দূর সমুদ্রপথে এগিয়ে চলল ডান্‌কান্। যাওয়ার পথে কোনো দ্বীপেই খোঁজ পাওয়া গেল না ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের। শেষকালে বারমুলি অন্তরীপে এসে নোঙর ফেলল ডান্‌কান্—আগেই তা বলা হয়েছে।

'লর্ড গ্লেনারভনের মতলব ছিল অস্ট্রেলিয়ার ভেতরেও তন্নতন্ন করে গ্রাণ্টের খোঁজ করা। তাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তিনি নেমে পড়লেন। এক আইরিশ ভদ্রলোকের বাড়ীতে খানাপিনায় বসে হঠাৎ একজন চাকরের মুখে শুনলেন ঈশ্বর কৃপায় ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলেই কোথাও আছেন।

'কে তুমি?' শুধোলেন লর্ড গ্লেনারভন।

'স্কটল্যাণ্ডের মানুষ আমি। ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের কর্মচারী ছিলাম। ব্রিটানিয়ার জলে ডোবার সময়ে আমিও জাহাজে ছিলাম,' জবাব দিল লোকটা।

'লোকটার নাম আয়ারটন। তার কাগজপত্র পড়ে দেখা গেল, বাস্তবিকই ব্রিটানিয়া জাহাজে কাজ করত সে। লোকটার বিশ্বাস, জাহাজ ডুবির পর শুধু সে-ই বেঁচে আছে। ব্রিটানিয়ার সবাই মারা গেছে—এমন কি ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টও।

আয়ারটন বললে, যেহেতু ব্রিটানিয়া অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে ডুবেছিল, সুতরাং তাঁকে ঐ অঞ্চলেই খুঁজে দেখতে হবে। কে জানে হয়ত জংলীদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট।

'লোকটার কথায় অবিশ্বাসের কিছু দেখলেন না লর্ড গ্লেনারভন। অনাড়ম্বর সরলভাবে বলল সব কিছু। তাছাড়া, ভদ্রলোকের বিশ্বাসী চাকর হিসেবেও রয়েছে দু' বছর। সুতরাং আয়ারটনের কথামত স্থির হল সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ ধরে অস্ট্রেলিয়ার ওপর দিয়ে যেতে হবে।

'লর্ড গ্লেনারভন, তাঁর স্ত্রী, গ্রান্টের ছেলেমেয়ে দুটি, আমি মেজর, ফরাসী ভূগোলবিদ্, ক্যাপ্টেন ম্যাঙ্গল্স্ আর কয়েকজন খালাসীকে নিয়ে পথ দেখিয়ে ডাঙার ওপর দিয়ে নিয়ে চলল আয়ারটন। ডানকানকে নিয়ে দ্বিতীয় কর্মচারী টম অস্টিন রওনা হল মেলবোর্ন সহরের দিকে—লর্ড গ্লেনারভনের দল সেইখানে গিয়েই জাহাজে উঠবে।' সেদিন ছিল তেইশে ডিসেম্বর, ১৮৫৫ সাল।

এইখানে বলে রাখা দরকার যে আয়ারটন লোকটা আসলে মুখোশধারী শয়তান। পয়লা নম্বরের বিশ্বাসঘাতক! এককালে সে সত্যিই কাজ করতে ব্রিটানিয়া জাহাজে। তারপর জোট বেঁধে বিদ্রোহ করে সে, জাহাজ দখল করার চেষ্টাও করে। তারই মৃদু শাস্তিস্বরূপ ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তাকে অস্ট্রেলিয়ায় পশ্চিম উপকূলে নামিয়ে দিয়ে গেছিলেন। এই কারণেই আয়ারটন জানত না যে ব্রিটানিয়া ডুবে গেছে। খবরটা লর্ড গ্লেনারভনের মুখেই সে প্রথম শোনে।

'আয়ারটনকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর সে নাম পালটালো। ছদ্মনাম হল বেন জয়েস। কিছু জেল পালানো কয়েদী জুটিয়ে একটা দল বানিয়ে নিল। নিজে হল তাদের পাণ্ডা। লর্ড গ্লেনারভনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডানকান জাহাজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে জাহাজ দখল করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর দলবল নিয়ে তোফা আরামে ডাকাতি করবে প্রশান্ত মহাসাগরে।...

'লর্ড গ্লেনারভনের দল চলেছে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দিয়ে। আয়ারটন ওরফে বেন জয়েসের খুনে দলটা গা-ঢেকে চলেছে কখনো লর্ড গ্লেনারভনদের আগে, কখনো পরে।

ডানকান ততক্ষণে মেলবোর্ন চলে গেছে। আয়ারটন মতলব আঁটল, লর্ড গ্লেনারভনের হুকুমনামা নিয়ে ডানকনকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে সরিয়ে দিতে হবে। জাহাজ দখলের সুবিধে ঐখানেই বেশী।

'লর্ড গ্লেনারভনদের তীর থেকে সরিয়ে নিয়ে এল আয়ারটন। গভীর জঙ্গলের এমন এক জায়গায় নিয়ে এল যেখানে খাবার বা জল পাওয়া যায় না। এইখানে এসে লর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে একটা চিঠি আদায় করল ডানকনের দ্বিতীয় কর্মচারীর নামে। চিঠিতে হুকুম দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন

—ডানকান যেন পত্রপাঠ টু-ফোল্ড উপসাগরে চলে যায়। গভীর জঙ্গলে যেখানে উনি ছিলেন, সেখান থেকে টু-ফোল্ড উপসাগর মাত্র দিন কয়েকের পথ। আয়ারটনের মতলব ছিল কিন্তু অন্যরকম। টু-ফোল্ড উপসাগরেই সে জাহাজ দখল করবে তার কয়েদী দলের সাহায্যে।

যাক, দুদিনের মধ্যেই আয়ারটন মেলবোর্ণ পৌঁছে গেল লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি নিয়ে। বিপত্তি দেখা গেল তারপরেই। কুচক্রী আয়ারটনের ঘোর চক্রান্তে বাদ সাধলেন দয়ালু ভগবান।

'আয়ারটনের কাছে লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি পেয়েই দ্বিতীয় কর্মচারী টম অস্টিন জাহাজ ছেড়ে দিল। কিন্তু একী কাণ্ড! ডানকান তো অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে টু-ফোল্ড উপসাগরের দিকে যাচ্ছে না—যাচ্ছে নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলের দিকে!'

'আয়ারটন তো রেগে টং! গোটা মতলবটা মাঠে মারা যেতে বসেছে দেখে প্রাণপণে চেষ্টা করল জাহাজ থামানোর। কিন্তু টম অস্টিন খুলে দেখালো লর্ড গ্লেনারভনের চিঠি। সত্যিই তো। সেখানে ভুল করে নিউজিল্যাণ্ড যাবার আদেশ দিয়ে ফেলেছেন লর্ড গ্লেনারভন! একেই বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!'

'অমন একটা খাসা ষড়যন্ত্র কেঁচে গেলো দেখে টম অস্টিনকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ দিতে লাগল আয়ারটন। নিরুপায় হয়ে তাকে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখল টম অস্টিন। ডানকান এগিয়ে চলল নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে।'

'যথাস্থানে পৌঁছে তেসরা মার্চ পর্যন্ত সেখানে টহল দিয়ে ফিরল ডানকান। সেইদিনই কামানের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনল আয়ারটন। ডানকান জাহাজ থেকে কামান দাগা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আওয়াজ শুনে ডানকানে এসে উঠলেন সদলবলে লর্ড গ্লেনারভন।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো! লর্ড গ্লেনারভন এখানে এলেন কি করে?'

'আয়ারটন চিঠি নিয়ে চলে যাওয়ার পর অনেক বিপদ-আপদ কষ্টের মধ্যে দিয়ে টু-ফোল্ড উপসাগর পৌঁছে ছিলেন লর্ড গ্লেনারভন। গিয়ে দেখলেন, ডানকান সেখানে আসেই নি। তবে কোথায় গেল তাঁর জাহাজ? টেলিগ্রাফ করলেন মেলবোর্ণে। জানলেন সেখান থেকেও ডানকান আঠারো তারিখে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, তা জানা গেল না।'

'তখন ঘোর সন্দেহে দেখা দিল লর্ড গ্লেনারভনের মনে। আয়ারটন কি তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করে ডানকান নিয়ে উধাও হয়েছে জলদস্যু হবে বলে?'

'লর্ড গ্লেনারভন একদিকে ছিলেন করুণাসিন্ধু, অপরদিকে প্রচণ্ড সাহসী।

ভেঙে পড়ার পাত্র নন তিনি। একটা সদাগরী জাহাজ ভাড়া নিয়ে ফের এগিয়ে চললেন সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর। এইভাবেই পৌছোলেন নিউজিল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে। সেখান থেকে পূর্ব উপকূলে গিয়ে দেখতে পেলেন ডানকানকে!'

'শেকলে বাঁধা আয়ারটনকে নিয়ে আসা হল সামনে। কত ভয় দেখালেন লর্ড গ্লেনারভেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে রাজী হল না। শেষকালে যখন হুমকি দেওয়া হল এই বলে যে তাকে সামনের যে কোনো বন্দরে ইংরেজ শাসন-কর্তার হাতে সঁপে দেওয়া হবে, তখন সুর পাণ্টালো আয়ারটন। বলল, তাকে যদি ইংরেজ গভর্ণরের হাতে না দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে বলবে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট কোথায়।'

'রাজী হলেন লর্ড গ্লেনারভন। সব কথা খুলে বলল আয়ারটন। জানা গেল, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট যেদিন তাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে তাঁর কি হাল হয়েছে তা আজো জানে না আয়ারটন।'

'যাইহোক, কথা রাখলেন লর্ড গ্লেনারভন। সাঁইত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর চলতে চলতে পৌছোলেন ট্যাবের দ্বীপে। আয়ারটনকে সে দ্বীপে নির্বাসন দিতে গিয়ে লীলাময় ঈশ্বরের আর এক লীলার নমুনা পেলেন। দেখলেন, দুই সঙ্গীসহ ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট ঐ দ্বীপেই রয়েছেন। ট্যাবর দ্বীপ সাঁইত্রিশ অক্ষাংশেই অবস্থিত।'

'ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল আয়ারটনকে।' লর্ড গ্লেনারভন বলে গেলেন—'লোকালয় থেকে অনেক দূরে এখন থেকে তুমি থাকবে। এখান থেকে পালানোর সাধ্য তোমার নেই। ভগবান তোমাকে দেখবেন। ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের মত একেবারে নিখোঁজ তুমি হবে না। আমি জানব তুমি কোথায় আছো—যদিও তোমার মত লোককে মনে রাখা আমার উচিত নয়।'

'১৮৫৫ সালের ১৮ই মার্চ সমুদ্রে মিলিয়ে গেল ডানকান।'

'একা পড়ে রইল আয়ারটন। দ্বীপে ফসল, গুলিবারুদ, যন্ত্রপাতি সবই ছিল। ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের বানানো কুঁড়ে ঘরটা তখন থেকে হল আয়ারটনের বাসস্থান।'

'শুরু হল আয়ারটনের প্রায়শ্চিত্ত। নির্জনে থেকে সে সত্যিই অনুতপ্ত হল কৃতকর্মের জন্যে। দিনরাত কেবলি এই কথা ভাবত। লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকত। কেউ যদি কোনোদিন তাকে উদ্ধার করতে আসে, সে কি তাদের সঙ্গে যাওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কোনোদিন? তীব্র

অনুশোচনায় বেচারী একা-একা ছুটফটিয়ে বেড়িয়েছে বনেজঙ্গলে, প্রার্থনা জানিয়েছে ভগবানকে। অনেকদিন পর তার মন অনেকটা শান্ত হল বটে, কিন্তু নির্জনবাসের ভয়াবহ অভিশাপ একটু একটু করে চেপে বসতে লাগল তার ওপর। আয়ারটন বুঝতে পারল, সে জংলী হয়ে যাচ্ছে, হিংস্র হয়ে যাচ্ছে, পশু হয়ে যাচ্ছে—ধীরে ধীরে জ্ঞান চৈতন্য মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে!'

'বছর দুই তিন পরে—সময়টা ঠিক করে বলা মুস্কিল—সত্যিই অমানুষ জানোয়ার হয়ে গেল আয়ারটন। এই অবস্থাতেই আপনারা তাকে উদ্ধার করে এনেছেন ট্যাবর দ্বীপ থেকে।'

'এখন বুঝছেন তো আমি কে? আমিই সেই আয়ারটন বা বেন জয়েস।'

আয়ারটনের আশ্চর্য কাহিনী শেষ হতেই একযোগে উঠে দাঁড়ালেন দ্বীপবাসীরা।

হার্ডিং বললেন—'বন্ধু, তুমি পাপ করেছিলে, শাস্তিও পেয়েছো। প্রায়শ্চিত্ত যেটুকু হওয়ার ছিল, ভগবানের বিচারে তা শেষ হয়েছে বলেই আমাদের মধ্যে তুমি এসে পৌঁছেছো। এখন থেকে তুমি আমাদের একজন।' হাত বাড়িয়ে দিলেন হার্ডিং—'আয়ারটন, আমার হাত নাও।'

কেঁদে ফেলল আয়ারটন। আবেগভরে চেপে ধরল হার্ডিংয়ের হাত।

'এখন থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে গ্র্যানাইট হাউসে থাকো,' বললেন হার্ডিং।

'ক্যাপ্টেন, আমাকে আর কিছুদিন খোঁয়াড়ে থাকতে দিন।'

'বেশ, তাই থাকো। কিন্তু একটা প্রশ্ন। তুমি যদি নির্জনেই থাকতে চেয়েছিলে তো চিরকুট বোতলে পুরে জলে ভাসিয়েছিলে কেন?'

'আমি বোতল ভাসিয়েছিলাম?' বিস্মিত হল আয়ারটন।

'সেই চিঠি পেয়েই তো ট্যাবর দ্বীপে রওনা হই আমরা। তাতে ছিল ট্যাবর দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমার হিসেব আর তোমার কথা।'

একটু চিন্তা করল আয়ারটন। তারপর মাথা নেড়ে বললে—'না তো? আমি তো কোনোদিন এরকম চিঠি জলে ভাসাইনি!'

'কখনো না?' অবাক হল পেনক্রফট।

'না, কোনোদিন না।'

বলে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, খোঁয়াড়ে চলে গেল আয়ারটন।

১৮

পরদিন একুশে ডিসেম্বর।

সমুদ্রতীরে নামলেন দ্বীপবাসীরা। দেখলেন আগের রাতেই খোঁয়াড়ে চলে গিয়েছে আয়ারটন।

স্পিলেটকে নিয়ে চিমনী গেলেন হার্ডিং। সেখানে স্পিলেট বললেন 'ত্যাখো হার্ডিং আয়ারটনের এই চিঠি সমেত বোতল ভাসানোর ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক।'

হার্ডিং বললেন—'ও বোতল আয়ারটন ভাসায়নি। এ-দ্বীপে আসা ইস্তক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে। এটি হল আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা। সব কটা রহস্যের মীমাংসা করার জন্যে যদি আমাকে দ্বীপের পেটেও ঢুকতে হয়, আমি তাই যাবো। আপাততঃ এসো শুধু কাজ করে যাই।'

জানুয়ারী। শুরু হল ১৮৬৭ সাল।

বছরের প্রথম মাসেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারলেন সাইরাস হার্ডিং। এ-দ্বীপে রহস্যের তো অন্ত নেই। কত কি ঘটতে পারে ভবিষ্যতে। হঠাৎ জাহাজডুবি হতে পারে দ্বীপের পশ্চিম তীরে, অথবা হানা দিতে পারে বোম্বেটেরা। খোঁয়াড় থেকে যাতে চকিতে খবর চলে আসে গ্র্যানাইট হাউসে, সে রকম একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়।

দশই জানুয়ারী ক্যাপ্টেন সঙ্গীদের জানালেন তিনি টেলিগ্রাফ সরঞ্জাম বসাবেন খোঁয়াড়ে আর গ্র্যানাইট হাউসে।

শুনে তো অবাক সকলে! হার্বার্ট বললে—'ইলেকট্রিক?'

'ইলেকট্রিক ব্যাটারী আমরা বানিয়ে নেব—মালমশলা সবই তো আছে। তারপর খুঁটি পেতে তার টেনে দিলেই হল।'

পেনক্রফট বললে—'দুদিন পরে তাহলে রেলগাড়ীও চড়ব বলুন?'

যাইহোক, প্রথমে তৈরী হল তার। লোহার তো অভাব নেই দ্বীপে। কতকগুলো লোহার কাঠি বানানো হল। একটা কঠিন ইস্পাতের পাতে তিন রকম আকারের তিনটে ফুটো রাখা হল। স্যাকরারা যেভাবে সোনা-রূপোর তার লম্বা করে, ঠিক সেইভাবে লোহার কাঠিগুলো টেনে হিঁচড়ে বার করা হল প্রথমে বড় ফুটো দিয়ে, তারপর মাঝারি ফুটো দিয়ে, সবশেষে ছোট ফুটো দিয়ে। ফলে এক-একটা কাঠি থেকে ৪০।৫০ ফুট লম্বা তার পাওয়া গেল।

তারগুলো পরপর জুড়তেই তৈরী হল খোঁয়াড় থেকে গ্র্যানাইট হাউস পর্যন্ত পাঁচ মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ তার।

এরপর ব্যাটারীর সমস্যা। তামা জিনিসটা ব্যাটারীর অন্যতম প্রধান উপকরণ। কিন্তু দ্বীপে সব আছে, শুধু তামা নেই!

কিন্তু সাবাস সাইরাস হার্ডিংয়ের সাফ মাথাকে। তাঁর মনে পড়ল 'বেকুইরেল'এর আবিষ্কারের কথা। ১৮২০ সালে 'বেকুইরেল' শুধু দস্তা দিয়ে তৈরী এক ব্যাটারী আবিষ্কার করেছিলেন। দস্তার তো অভাব নেই হার্ডিং-এর। অন্যান্য উপাদান বলতে নাইট্রিক অ্যাসিড আর পটাশ হলেই চলে যায়। ভেসে আসা রহস্যজনক সিন্দুকে ছিল দস্তার লাইনিং। বাকী উপকরণগুলি অনায়াসেই বানিয়ে নিলেন হার্ডিং এবং যথাসময়ে তৈরী হল চমৎকার একজোড়া ব্যাটারী। কাঁচের বোতলে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে কাঁচের নল ডুবিয়ে দেওয়া হল তার মধ্যে। নলের একমুখ ছিদ্রযুক্ত কাদামাটির ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ওপর দিয়ে ঢেলে দেওয়া হল পটাশ সলিউশন। কতগুলো বিশেষ গাছপালা পুড়িয়ে সেই ছাই থেকে তিনি পটাশ বানিয়ে নিয়েছিলেন। মাটির ছিপির মধ্যে দিয়ে যোগাযোগ রইল পটাশ আর নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে। এরপর দস্তার দুটো পাত দিয়ে অ্যাসিড আর দস্তার মধ্যে ডুবিয়ে ধরতেই শুরু হয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ। তার দিয়ে যুক্ত রইল দস্তার পাত দুটো। অ্যাসিডের দস্তা নেগেটিভ, পটাশের দস্তা পজিটিভ। এইভাবে অনেকগুলো বোতল সাজানোর পর ব্যাটারীর অভাব আর রইল না।

খুঁটি বসানো হল খোঁয়াড় থেকে গ্র্যানাইট হাউস পর্যন্ত। তার টাঙানো হল খুঁটির ডগা বরাবর। সেকেণ্ডে বিশ হাজার মাইল হিসেবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইবে এই তারের মধ্যে দিয়ে। নরম লোহার তার জড়িয়ে সাময়িকভাবে তা চুম্বকে পরিণত করার ব্যবস্থা হল। কারেন্ট বন্ধ হলেই চৌম্বকত্ব যাবে, কারেন্ট চালু হলেই চুম্বক লোহার ওপর খট করে এসে পড়বে। মর্সকোড অনুসারে টরে-টক্কা পদ্ধতিতে চলবে কথাবার্তা।

বারোই ফেব্রুয়ারী চালু হল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। গ্র্যানাইট হাউসে বসে খোঁয়াড়ে প্রশ্ন পাঠালেন হার্ডিং—'সব ঠিক তো?' তৎক্ষণাৎ এসে গেল জবাব। আয়ারটন জানালো—'হ্যাঁ, সব ঠিক।' পেনক্রফট এত উল্লসিত হল এই ব্যাপারের পর যে প্রতিদিনই একবার করে খোঁজ নিতে লাগল আয়ারটনের। হার্ডিং নিজেও সাতদিনে একবার যেতেন খোঁয়াড়ে। ফলে, আয়ারটন আর একদিনের জন্যেও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে পারল না!

এরপর ফটো তোলা নিয়ে মত্ত হল দ্বীপবাসীরা। সিন্দুকের মধ্যে ক্যামেরা

তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল ফটো ফুটিয়ে তোলার অন্যান্য উপকরণ। ফলে এন্‌তার ছবি তুলতে লাগলেন স্পিলেট আর হার্বার্ট। সব চাইতে সুন্দর ছবি উঠল অবশ্য জাপ-এর।

এক্কুশে মার্চ একটা মজার ব্যাপার ঘটল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চমকে উঠল হার্বার্ট—'একী! বরফপড়া শুরু হয়েছে দেখছি! সমস্ত দ্বীপ তো সাদা হয়ে গিয়েছে!'

সত্যিই তো। সমুদ্রতীর পর্যন্ত ধবধব করছে সাদা বরফের আস্তরণে। কিন্তু আশ্চর্য! থার্মোমিটারে তো বরফ পড়ার মত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। একী ভূতুড়ে ব্যাপার!

পেনক্রফট নীচে নামতে যাচ্ছে, তার আগেই জাপ নেমে গেল নীচে। সে ভূমি স্পর্শ করার আগেই সাদা চাদরটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে; ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে!

হার্বার্ট বলে উঠল—'যাচ্চলে! এযে দেখছি পাখী!'

বাস্তবিকই তাই। ধবধবে সাদা পাখীর পাল ছেয়ে ফেলেছিল দ্বীপের গাছপালা, সমুদ্রতীর!

দিন কয়েক পরেই এল ছাব্বিশে মার্চ। লিঙ্কলন দ্বীপবাসের দু'বছর পূর্ণ হল সেদিন।

১৯

দু' বছর! দীর্ঘ এই দুটি বছরে কত ঘটনাই ঘটে গেছে আমেরিকায়! আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই দ্বীপবাসীদের। গৃহযুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? যুদ্ধের ফলাফল কি। এমনি নানা ধরনের আলোচনায় দিন কাটে লিঙ্কলন দ্বীপের আগন্তুকদের।

এ দ্বীপের কোনো চিহ্নই নেই ম্যাপে। তার মানে দুনিয়ার কেউ জানে না দ্বীপটার অস্তিত্ব। জানে না বলেই আশপাশ দিয়ে এই দীর্ঘ দুটি বছরে একটি জাহাজকেও যেতে দেখা যায়নি।

ডানকান্ জাহাজ একদিন না একদিন ফিরে আসবে ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত আয়ারটনকে তুলে নেওয়ার জন্যে। লর্ড গ্লেনারভন সে রকম আভাষই তো দিয়ে গেলেন। কে জানে এই পাঁচ মাসের মধ্যে এসে তিনি ফিরে গেছেন কিনা। যাই হোক, এখনই একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়া দরকার সেখানে। তাতে লেখা থাকবে আয়ারটনের বর্তমান ঠিকানা এবং লিঙ্কলন দ্বীপের অবস্থান।

ঝড়বাদলার সময়ে লর্ড গ্লেভারটন ট্যাবর দ্বীপে আসবেন না নিশ্চয়। এলে সেই অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আসবেন। সে সময়ে বন-অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে নোটিশটা রেখে আসতে হবে ট্যাবর দ্বীপে।

স্পিলেটের মাথায় আর একটা ফন্দী এল। স্বদেশ ফিরতে হলে কবে কোন জাহাজ আসবে সে আশায় না থেকে বেশ বড় গোছের একটা জাহাজ বানিয়ে নিলে কেমন হয়? বারোশ মাইল সমুদ্রযাত্রা করার মত উপযুক্ত জাহাজ হওয়া চাই অবশ্য।

প্রস্তাবটায় পেনক্রফটের আপত্তি ছিল না। তার মত হল, হার্ডিং হুকুম দিলে সে মাথায় পাহাড় বয়ে আনতেও রাজী। কিন্তু হার্ডিং ডানকান জাহাজের আসার আশায় ট্যাবর দ্বীপে বিজ্ঞপ্তি রেখে আসার প্রস্তাব করলেন। ফলে, বড় জাহাজ তৈরীর প্রসঙ্গ আর বেশী দূর এগোলো না।

কিন্তু কথা উঠল বন-অ্যাডভেঞ্চারে চেপে একবার সারা দ্বীপটাকে টহল দিয়ে আসা দরকার। দু'বছর হল, দ্বীপটাকে সেরকম ভাবে আজও দেখা হয়নি। যাত্রার দিন ধার্য হল ষোলই এপ্রিল।

আয়ারটনকে সঙ্গে নিতে চাইলেন হার্ডিং। কিন্তু সে রাজী হল না। তখন স্থির হল জ্যাপকে নিয়ে এই কদিন গ্র্যানাইট হাউসে থাকবে।

বেশ কিছু খাবার-দাবার নিয়ে রওনা হল বন-অ্যাডভেঞ্চার। দ্বীপের মোট পরিধি নব্বই মাইল। প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগবে বইকি।

প্রথম রাতটা ভালই কাটল অন্তরীপের ধারে। দ্বিতীয় দিন ভোর হতেই আবার জল কেটে এগিয়ে চলল বন-অ্যাডভেঞ্চার। জঙ্গল সমাকীর্ণ তীরভূমির ফটো তুলতে লাগলেন স্পিলেট। দুপুরের পর তীরভূমিতে গাছপালার বদলে দেখা গেল অদ্ভুত গড়নের পাহাড়ের সারি। এক-একটা পাহাড়ের এক-এক রকম গড়ন। আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল দ্বীপবাসীরা! কারো মুখে কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে টপ। প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে।

এই রকম চলল আট-ন মাইল। তারপর এল জলাভূমি। হাজার হাজার বন মোরগের হাঁক-ডাক। বিকেলের দিকে একটা ছোট উপসাগরের কাছে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেঞ্চার। স্পিলেট হার্বার্টকে নিয়ে গেলেন শিকারে। ফিরলেন একরাশ হাঁস আর স্নাইপ পাখী নিয়ে।

পরদিন ভোরবেলা আবার শুরু হল যাত্রা। বেলা আটটা থেকে বাড়তে লাগল হাওয়ার বেগ। আকাশে দেখা গেল ঘোড়ার ল্যাজের মত মেঘ।

পেনক্রফট বললে—'গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ঘোড়ার ল্যাজের মত ঐ মেঘ আকাশে দেখলেই জানবেন ভয়ংকর কিছু ঘটবেই। ঝড় আসবেই।'

পাঁচ কথার মধ্যে সাইরাস হার্ডিং বললেন—'সমস্ত ভার তোমার পেনক্রফট। ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ এখান থেকে পনের মাইল।'

'মানে আড়াই ঘন্টার পথ', বলল পেনক্রফট। 'বাতাস আর স্রোত দুটোই যদি তখন প্রতিকূল অবস্থায় থাকে, তাহলে তো উপসাগরে নৌকা ঢোকাতে পারব না।'

'আগেই তো বলেছি পেনক্রফট, সমস্ত ভার তোমার', বললেন হার্ডিং।

'আহারে, এই সময় তীরে একটা লাইট হাউস যদি থাকত,' আপশোষ করল পেনক্রফট।

স্পিলেট বলে উঠলেন—'ভালো কথা হার্ডিং। তোমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য আছে। ট্যাবর দ্বীপ থেকে ফেরার সময়ে রাত্রে তুমি যদি পাহাড়ের ওপর আগুন না জ্বালতে, লিঙ্কলন দ্বীপে আর পৌছোতে হত না আমাদের।'

'আমি আগুন জেলেছিলাম?' হার্ডিং তো হতবাক!

পেনক্রফট বলে উঠল—'আরে হ্যাঁ, ফেরার পথে সে রাতে তো আমরা পথ হারিয়ে লিঙ্কলন দ্বীপ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস আপনি প্রসপেক্ট হাইটের ওপর আগুনটা জেলেছিলেন।'

ঢোঁক গিলে বললেন হার্ডিং—'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। হঠাৎ কি যে খেয়াল হল।'

'খেয়ালটা যদি আয়ারটনের মাথায় এবার আসে তো ভাল।' বলল পেনক্রফট।

মিনিট কয়েক পর।

নৌকোর গলুয়ের কাছে দাঁড়িয়ে হার্ডিং আর স্পিলেট। খাটো গলায় বললেন হার্ডিং—'স্পিলেট, বিশ্বাস করো, উনিশে অক্টোবর রাত্রে প্রসপেক্ট হাইটের ওপরে বা দ্বীপের অন্য কোথাও কোনোরকম আগুন আমি জালিনি।'

২০

আস্তে আস্তে সত্যিই ঝড় আরম্ভ হল। উপসাগরের মুখে ঢোকবার সময়ে ঢেউগুলো এমন তোলপাড় কাণ্ড শুরু করল যে পেনক্রফট-য়ের সাহস হল না বন্দরে বোনাভেঞ্চার নিয়ে যাওয়ার। রাতটা কোনোরকমে কেটে গেল বাইরে।

ভোরবেলা দামাল হাওয়া শান্ত হল। ধীরেসুস্থে বন্দরে প্রবেশ করল

বন-অ্যাডভেঞ্চার। শান্ত জল। অগ্ন্যুৎপাতের দরুণ লাভা জমে গিয়ে দুপাশে খাড়া পাহাড়। বাতাস আসার কোনো দিকেই পথ নেই—জল আসার ঐ সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথটি ছাড়া।

হার্ডিং বললেন—'একসঙ্গে অনেকগুলি জাহাজ রাখা যায় দেখছি এখানে।'

স্পিলেট বললেন—'তা আর বলতে।'

নেব বললে—আমরা যেন একটা হাঙরের মুখে ঢুকেছি।'

হার্বার্ট বললে—'একেবারে হা-য়ের ভেতর চলো। কিন্তু ভয় নেই, এ-মুখ আমাদের কপ্‌ করে গিলে নেবে না।

বিকেল চারটে নাগাদ মার্সি নদীর মুখেতে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেঞ্চার। আয়ারটন আর জাপ সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের অভ্যর্থনার জন্যে। জাপের সে কী ফূর্তি ওদের দেখে।

গোটা দ্বীপটা তো দেখা হল, কই সে রকম অদ্ভুত জীব চোখে পড়ল না তো? আগুনের ব্যাপারটা হার্ডিং ভুলতে পারছিলেন না কিছুতেই। এ নিয়ে স্পিলেটকে কতবার কত প্রশ্ন তিনি করেছেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন—'স্পিলেট, তুমি ভুল দেখোনিতো? আগুন-পাহাড়ের হঠাৎ-আগুনের ঝলক দেখে থাকতেও তো পারো!'

'আরে না, সে আগুন মানুষের জ্বালানো। তুমি পেনক্রফট আর হার্বার্টকে জিজ্ঞেস করেই দেখো না' : বললেন স্পিলেট।

পঁচিশে এপ্রিল। সন্ধ্যে হয়েছে। প্রসপেক্ট হাইটের বারান্দায় গুলতানি করছেন দ্বীপবাসীরা। এমন সময়ে দ্বীপের রহস্য নিয়ে কথা তুললেন হার্ডিং।

বললেন—'কতকগুলো রহস্যজনক ঘটনা নিয়ে একটু আলোচনা না করে স্বস্তি পাচ্ছি না। তোমাদের প্রত্যেকের মতামত জানতে চাই ঘটনাগুলো সম্পর্কে।

'প্রথমেই ধরো আমি বেলুন থেকে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রে। অথচ তোমরা আমাকে পেলে দ্বীপের সিকি মাইল ভেতরে আধমরা অজ্ঞান অবস্থায়। আমি গেলাম কি করে এতটা পথ? তারপর, আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছিলে তোমরা। এতটা পথ টপ গেল কি করে?'

হার্বার্ট বললে—'সহজাত বুদ্ধি দিয়ে।'

হার্ডিং বললে—'অদ্ভুত বলতে হবে সেই সহজাত বুদ্ধিকে। ঐ রকম তুফান মাথায় নিয়ে এতটা পথ সে গেল, অথচ গায়ে জলকাদার চিহ্ন পাওয়া গেল না? এটাও কি সহজাত বুদ্ধির ব্যাপার? এতটুকু ক্লান্তও হয়নি সে। কেন?

'এরপর ধরো সেই ডুগং-য়ের রহস্যজনক মৃত্যু। কার ধারালো ছুরীতে তার

গলা দুটুকরো হয়েছিল? কে টপকে অমন জোরে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল? শুওরটার পেটে গুলি করেছিল কে?

'সারা দ্বীপে টহল দিয়েও জাহাজ ডোবার কোনো চিহ্ন পেয়েছি কি? পাইনি। অথচ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঠাসা সিন্দুকটা এল কোত্থেকে? জিনিসপত্রে কোথাও লেখা নেই কোন দেশের কোন কারখানায় সেগুলি নির্মিত। কেন?

'আয়ারটনের ঠিকানা জানিয়ে কে ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই বোতলটা বন-অ্যাডভেঞ্চারের যাওয়ার পথে?'

'কুয়োর ধারে গিয়ে কোন্ অদৃশ্য জীবের অস্তিত্ব টের পেয়ে অস্থির হয় টপ? এমন কি জাপও।'

'ওরাংওটাংরা গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে কাকে দেখে অত ভড়কে গিয়েছিল। কে সিঁড়িটাকে ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল?'

'ক্যানোটাকে কষে বাঁধা হয়েছিল গাছের সঙ্গে। অথচ রাত দুপুরে ঠিক যখন আমাদের ক্যানোর দরকার হল, তখন তা দড়ি ছিঁড়ে ভাসতে ভাসতে সামনে চলে গেল কি করে? কচ্ছপটা উল্টোনো ছিল। কে তাকে সিধে করে দিয়েছিল?'

'সব শেষের ঘটনাটা আরো অদ্ভুত। এবপর এক কথায় বলা যায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। পেনক্রফট, তোমরা ট্যাবর দ্বীপ থেকে ফেরার সময়ে প্রসপেক্ট হাইটের ওপর নাকি একটা আগুন জলতে দেখেছিলে। ভুল দেখোনি তো? খুব বড় নক্ষত্রকে আগুন বলে মনে হয় নি?'

'অসম্ভব' বললে পেনক্রফট। 'মেঘে ঢাকা আকাশে তারা আসবে কোত্থেকে?'

স্পিলেট বললেন—'তাছাড়া, সে আগুন ভীষণ জোরালো। তারার মত টিমটিমে নয়।'

'শোনো তাহলে', গম্ভীর গলা হার্ডিংয়ের—'উনিশে অক্টোবর রাত্রে আমি অথবা নেব আগুন জ্বালাইনি। আমরা গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে-ই যাইনি। আগুন তোমরা দেখেছো ঠিকই এবং সে আগুন জালিয়েছিল অন্য কেউ, তোমাদের লিঙ্কলন দ্বীপে ফিরিয়ে আনার জন্যে।'

স্পিলেট, হার্বার্ট, পেনক্রফট—তিন জনেই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। দ্বীপে একটা অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে। একটা শুভশক্তি অদৃশ্য সহায়রূপে তাদের সাহায্য করে চলেছে। বার বার সেই কল্যাণকর শক্তি ঠিক সঙ্কট মুহূর্তে আশ্চর্য ক্ষমতাবলে দ্বীপবাসীদের বিপদ মুক্তি ঘটাচ্ছে। কে সে? দ্বীপের অধিদেবতা? লিঙ্কলন দ্বীপের পাতাল-গর্ভে কি তার নিবাস? কে জানে!

লিঙ্কলন দ্বীপে শীত নামল। দ্বীপবাসীদের নির্বাসিত জীবনে এই হল তৃতীয় শীত। গরম জামাকাপড়ের অভাব নেই—কষ্ট হল কম। চারটে মাস কেটে যাবার পর এল অক্টোবর। বসন্ত কাল। গাছপালা নতুন সাজে সাজল। সবুজ সমারোহে চোখ জুড়িয়ে গেল।

সতেরোই অক্টোবর প্রকৃতির এই চোখ জুড়োনো রূপ দেখে হার্বার্টের সাধ হল দৃশ্যটাকে ফটো তুলে রাখার। গ্র্যানাইট হাউসের জানালায় দাঁড়িয়ে শাটার টিপল সে। অন্ধকার ঘরে কেমিক্যাল সলিউশনে ফটো প্লেট ধুয়ে নিয়ে এসে দাঁড়াল জানলার আলোয়। দেখল খাসা ছবি উঠেছে। কিন্তু আকাশ যেখানে এক হয়ে গিয়েছে সমুদ্রের সঙ্গে, ঠিক সেইখানে একটা কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় কাঁচের দাগ। তাই বারবার জলে ধুতে লাগল হার্বার্ট, কিন্তু দাগ আর উঠল না।

আচ্ছা জ্বালা তো! টেলিস্কোপ থেকে লেন্স খুলে নিয়ে দাগটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল হার্বার্ট। পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠল বিকট চীৎকার ছেড়ে! লেন্সটাও আর একটু হলে হাত ছিটকে ভেঙে যেত।

দৌড়ে গেল সে হার্ডিংয়ের কাছে। ফটো নেগেটিভ আর লেন্সটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে রুদ্ধশ্বাসে—'প্লেটটা একবার দেখবেন ক্যাপ্টেন?...'

খুঁটিয়ে দেখলেন হার্ডিং। পরমুহূর্তে টেলিস্কোপ নিয়ে ছুটলেন খোলা জানলায়। অনেকক্ষণ ধরে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করার পর চোখে পড়ল সেই কালো দাগটা। ক'সেকেণ্ড খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন শুধু একটি শব্দ—'জাহাজ।'

সত্যিই তাই। লিঙ্কলন দ্বীপের দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছে একটা জাহাজ!

দ্বীপের রহস্য

দি—সিক্রেট অফ দি আয়ল্যাণ্ড

দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা আজ শেষ হল। জাহাজ আসছে রহস্য দ্বীপের দিকে কিন্তু তবু কেন উল্লসিত হতে পারছেন না দ্বীপবাসীরা? লিঙ্কলন দ্বীপকে যে ভালবেসেছেন ওরা! দীর্ঘদিন আরামে থেকেছেন, দ্বীপের সব কিছুকেই আপন করে জেনেছেন। এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে? এই ধরনের নানা চিন্তায় বিচলিত হলেন দ্বীপবাসীরা।

পেনক্রফট টেলিস্কোপ নিয়ে ঠায় দেখছে জাহাজকে। এখনো প্রায় বিশ মাইল দূরে রয়েছে জাহাজটা। পতাকা উড়িয়ে, আগুন জেলে বা বন্দুক নির্ঘোষ দিয়ে সংকেত করবেন দ্বীপবাসীরা? কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এ-দ্বীপের খবর তো কেউ রাখে না? তবে জাহাজটা এদিকে আসছে কেন?'

হঠাৎ হার্বার্ট বলে উঠল—'ডানকান জাহাজ নয় তো?

স্পিলেট বললেন—'টেলিগ্রাফে ডেকে আনা হোক আয়ারটনকে—এখুনি।'

আয়ারটন এল বিকেল নাগাদ। জাহাজটা ডানকান জাহাজ কিনা, হার্ডিংয়ের এই প্রশ্ন শুনেই মুখটা শুকিয়ে গেল বেচারীর। মৃদুকণ্ঠে শুধু বললে—'ডানকান? এত তাড়াতাড়ি? না, না।' চোখে টেলিস্কোপ লাগানোর পর অবশ্য বলল—'এটা ডানকান নয়। ডানকান কলে চলে।'

ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে রইল আয়ারটন। কারো সঙ্গে কথা বলল না।

পেনক্রফট দূরবীন কষছিল সমানে। হঠাৎ দেখলে জাহাজের মুখ একটু বেঁকে গেছে। সর্বনাশ! দ্বীপ পেরিয়ে চলে যাবে নাকি জাহাজটা? রাত নামছে। আগুন জ্বালিয়ে রাখলেও তো সংকেত করা যেত?

অস্থির হলেন স্পিলেট! আর দেরী নয়। এখুনি আগুন জ্বালাতে হবে। হার্ডিংয়ের কিন্তু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল জাহাজ দেখে। জাহাজের অতর্কিত আবির্ভাবটাকে কিছুতেই ভালো মনে নিতে পারছিলেন না উনি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হল নেব আর পেনক্রফট গিয়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালবে বেলুন বন্দরে। ওরা বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল দ্বীপের দিকে ফের মুখ ঘুরিয়েছে জাহাজটা।

নেব আর পেনক্রফট যাওয়া স্থগিত রাখল। আয়ারটন দূরবীনের মধ্যে

দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল, জাহাজে ধোঁয়ার চিমনী নেই। অর্থাৎ এ-জাহাজ ডানকান নয়।

দূরবীন দিয়ে এবার দেখতে লাগল পেনক্রফট। বললে—'মজবুত জাহাজ দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাগের রঙটাও তো ছাই ধরা যাচ্ছে না।' আরও কিছুক্ষণ পরে—'ফ্ল্যাগটা আমেরিকার নয়, ইংলণ্ডেরও নয়। ইংলণ্ডের হলে লাল রঙ দেখা যেত। ফরাসী কিংবা জার্মানীর ফ্ল্যাগও নয়। রাশিয়ার হলে সাদা রঙ বোঝা যেত। স্পেনের হলে হলদে রঙ। খুব সম্ভব এ নিশান এক রঙের। রঙটা মনে হচ্ছে—'

নিশানটা ঝুলে পড়েছিল। আচমকা বাতাসের ঝাপটায় পতপত করে উড়তে লাগল ঠিক তখনি। চোখে দূরবীন লাগিয়ে আয়ারটন চমকে উঠল।

'আরে সর্বনাশ। কালো ফ্ল্যাগ যে!'

কালো নিশান! তাহলে কি ওটা বোম্বেটে জাহাজ? লিঙ্কলন দ্বীপ তাদের লুঠের ভাঁড়ার? হার্ডিংয়ের আশংকাই তাহলে সত্যি হল?

নানা দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হলেন সকলে। হার্ডিং বললেন—'অত মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। দ্বীপে নাও আসতে পারে বোম্বেটে জাহাজ, হয়ত দেখেশুনেই চলে যাবে। তবুও সাবধানের মার নেই। আয়ারটন আর নেব গিয়ে উইণ্ড-মিলের পাল খুলে নামাক—ওগুলোই আগে চোখে পড়ে। গ্র্যানাইট হাউসের জানালা দরজা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দাও। আগুনটাগুন সব নিভিয়ে দাও।'

'বন-অ্যাডভেঞ্চার?' হার্বার্টের প্রশ্ন।

'বেলুন বন্দরে নিরাপদ থাকবে,' বলল পেনক্রফট। 'ওখানে ওরা খুঁজেই পাবে না।'

হার্ডিংয়ের গলা কেঁপে গেল এবার—'ওরা যদি দ্বীপ দখল করতে চায়, আমরা রুখে দাঁড়াব তো?'

'আলবৎ!' সমস্বরে বললেন সকলে—'জান দেব তবু লিঙ্কলন দ্বীপ দেব না।'

আবার যুদ্ধ। মনে মনে আরম্ভ হয়ে গেল মহড়া! কে জানে ডাকাতদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কত, লোকসংখ্যাই বা কত।

রাত নামল। অন্ধকার। জাহাজে আলো জ্বলছে না—দেখাও যাচ্ছে না। পেনক্রফট বললে—'কাল সকালে উঠে দেখব হয়ত চলে গেছে ব্যাটারা।'

জবাব এল সমুদ্রের দিক থেকে। অন্ধকার চমকে উঠল হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে—সেইসঙ্গে কামান দাগার বিকট শব্দ!

সর্বনাশ! জাহাজ এখনো যায় নি! শুধু তাই নয়, জাহাজে কামানও আছে! কামান দাগার আলো দেখা আর শব্দ শোনার মধ্যে প্রায় সেকেণ্ড

ছয়েকের ব্যবধান ছিল। সেই হিসেবে জাহাজটা তীরভূমি থেকে রয়েছে প্রায় সওয়া মাইল দূরে!

আচম্বিতে কড় কড় শব্দে মুখর হল নিস্তব্ধ সমুদ্রতীর। জলে নোঙর পড়ছে। শেকলের ঘর্ঘর আওয়াজ। গ্র্যানাইট হাউসের ঠিক সামনেই ওৎ পেতে বসল বোম্বেটে জাহাজ!

২

এতক্ষণে বোঝা গেল কি ফিকিরে রয়েছে বোম্বেটে। রাতটা জলে কাটাবে, ভোর হলেই নামবে ডাঙায়!

লড়াইয়ের জন্যে অবশ্য কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছেন হার্ডিং। গ্র্যানাইট হাউসের জানলাদরজার ফোকরগুলো লতাপাতায় ছাওয়া হয়েছে। কিন্তু শস্যক্ষেত্র, পোলট্রিহাউস, খোঁয়াড়—এ-সব তো একেবারে তছনছ করে ছাড়বে হতচ্ছাড়ারা। তাছাড়া জলদস্যুরা সংখ্যায় মোট ক'জন, সেটা না জানলে লড়াইয়ে নামাটা ঠিক হবে কি? তার ওপর ওদের রয়েছে কামান, দ্বীপবাসীদের সম্বল তো মাত্র কয়েকটা বন্দুক!

হঠাৎ আয়ারটন বললে—'আমার একটা আর্জি আছে, ক্যাপ্টেন।'

'বলো', বললেন হার্ডিং।

'আমি গিয়ে দেখে আসতে চাই জাহাজে মোট ক'জন আছে।'

হার্ডিং অনেক বাধা দিলেন। কিন্তু একরোখা আয়ারটন কোনো কথাই শুনল না। প্রাণের ভয়? তার আবার প্রাণের দাম কি? মাত্র তো সোয়া মাইল সাঁতরাতে হবে। সাঁতার বিদ্যেটা ভালই জানে আয়ারটন।

কি আর করা যায়। হার্ডিং দেখলেন অনুশোচনা-ক্লিষ্ট আয়ারটন একটা কিছু মহৎ কাজ করে নিজের কাছে নিজে বড় হতে চাইছে। বাধা দিলে হিতে বিপরীত হবে। সুতরাং তিনি রাজী হলেন। ঠিক হল পেনক্রফট নিজে উপদ্বীপ পর্যন্ত তার সঙ্গে যাবে। কে জানে অন্ধকারে গা মিশিয়ে জলদস্যুদের এক আধজন তীরে নেমে পড়েছে কিনা। দুজন থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

সমুদ্রতীরে গিয়ে গায়ের সব জামাকাপড় খুলে ফেলল আয়ারটন। বেশ করে চর্বি মালিশ করল সারা গায়ে যাতে ঠাণ্ডাটা কম মালুম হয়। নেব গিয়ে সেই ফাঁকে মার্সি নদীর তীর থেকে নিয়ে এল ক্যানোটা।

দুই অসমসাহসিককে নিয়ে দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল

ক্যানো। দ্বীপের অন্যপ্রান্তে গিয়ে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে জলে নেমে পড়ল আয়ারটন। পাহাড়ের ফাটলে ঘাপটি মেরে রইল পেনক্রফট।

কিছুক্ষণ আগে জাহাজে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। সেইদিকেই নিশানা করে ওস্তাদ সাঁতারু আয়ারটন এগিয়ে চলল নিঃশব্দে অথচ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল জাহাজের পাশে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল নোঙরের শেকল ধরে। তারপর শেকল ধরে ধরে উঠে গেল ডেকের ধারে। উঁকি মেরে দেখল খালাসীদের সার্ট প্যান্ট শুকোচ্ছে একদিকে। আর একদিকে কিছু বোম্বেটে বসে তখনো খোশ গল্প জুড়েছে। একটা প্যান্ট টেনে নিয়ে পরল আয়ারটন। তারপর চুপিসারে আড়ি পেতে শুনল ডাকাতদের কথাবার্তা। জাহাজটার নাম নাকি 'স্পীডি'। ক্যাপ্টেন বড় চোস্ত আদমী। নাম, বব হার্ডি।

চমকে উঠল আয়ারটন। বব হার্ডি? কী আশ্চর্য! বব হার্ডি যে তার ভীষণ পরিচিত! অস্ট্রেলিয়ায় জেলপালানো কয়েদীদের নিয়ে যে ডাকাত দলটি বানিয়েছিল আয়ারটন, সেই দলেই বব হার্ডি ছিল তার বিশ্বস্ত সাগরেদ। লোকটা দুর্ধর্ষ রকমের ডাকাবুকো, ভাল নাবিক।

মদের ঝোঁকে বোম্বেটেরা আরও অনেক কিছু কথা বলল। অস্ট্রেলিয়ার 'নরফোক' দ্বীপে 'স্পীডি' জাহাজটা দখল করেছে বব হার্ডি। অস্ত্রশস্ত্র থেকে আরম্ভ করে কিছুরই অভাব নেই এ-জাহাজে। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপক ডাকাতি জমেছে ভাল। লিঙ্কলন দ্বীপে বব হার্ডি হঠাৎ এসে পড়েছে। এই তার প্রথম আগমন। দ্বীপ যদি পছন্দ হয়, তাহলে এইখানেই একটা গোপন ঘাঁটি বানিয়ে রাখবে।

সর্বনাশ সাইরাস হার্ডিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিস্তর মেহনত করে দ্বীপের শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দ্বীপ তো পছন্দই হবে ডাকাতগুলোর!

না:, আর কোন দ্বিধা নয়। যেভাবেই হোক বব হার্ডির শয়তানী ষড়যন্ত্র বানচাল করতে হবে। বোম্বেটেরা সংখ্যায় নাকি পঞ্চাশজন। জাহাজে কামানও রয়েছে চারটে। ছ'জন দ্বীপবাসীর পক্ষে শত্রুপক্ষের লোকবল আর অস্ত্রবল খুবই বেশী বলতে হবে। সুতরাং—

ভয়ানক মতলবটা তখনি মাথায় এল আয়ারটনের। এতে তার প্রাণ যাবে, কিন্তু দ্বীপবাসীরা বেঁচে যাবেন। যাঁরা এত উপকার করেছেন, তাঁদের জন্যে এই পঙ্কিল প্রাণটা বিসর্জন দেওয়াই উচিত।

গোটা জাহাজটা উড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প করল আয়ারটন। বারুদঘরে আগুন দিলেই রেণু রেণু হবে জাহাজ—সেইসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে আয়ারটন! তা হোক! পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হবে!

গোলাগুলির ভাঁড়ার জাহাজের পেছন দিকে থাকে। মাতাল বোম্বেটেরা ঘুমিয়ে পড়লে আয়ারটন পা টিপে টিপে এগুলো সেইদিকে। মাস্তলের চার-দিকে দেখল নানারকম বন্দুক পিস্তল গোঁজা রয়েছে। একটা পিস্তল টেনে নিল আয়ারটন। বারুদঘর ওড়াতে পিস্তলের একটা গুলিই যথেষ্ট!

বারুদঘরের সামনে গিয়ে বুক দমে গেল আয়ারটনের। এ কী! ভারী তালা ঝুলছে যে! তালা ভাঙতে গিয়ে আওয়াজ হলেই তো সর্বনাশ!

আয়ারটনের অসুরের মত দৈহিক শক্তি কাজে লাগল এবার। স্রেফ হাতের মোচড়ে তালা খসিয়ে আনল সে। ঠিক সেই সময়ে কে যেন খপ করে তার কাঁধ খামচে ধরে হুংকার দিলে কড়া গলায়—'এখানে কি করা হচ্ছে?'

এক নজরেই চিনল আয়ারটন। বব হার্ডি!

বব হার্ডি কিন্তু চিনতে পারল না আয়ারটনকে। সে তো জানে কোন-কালে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে আয়ারটন। তাই ওর বেল্ট খামচে ধরে ফের ধমকে উঠল বব—'করা হচ্ছে কি এখানে?'

হ্যাচকা টানে বেল্ট ছাড়িয়ে নিল আয়ারটন। তৎক্ষণাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বব হার্ডি—'কে কোথায় আছো, জলদি এসো!'

ঐ ডাকাতে হাঁক শুনেই ঘুম ছুটে গেল দু তিনজন বোম্বেটের। আয়ার-টনের হাতে-পায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। চক্ষের নিমেষে পিস্তলের বাঁট চালিয়ে শুইয়ে দিল দুজন ডাকাতকে। কিন্তু তৃতীয়জনের ছুরি এসে বিঁধল তার কাঁধে!

ইতিমধ্যে বারুদঘরের পাল্লা টেনে দিয়েছে বব হার্ডি। ডেকের ওপরেও শোনা যাচ্ছে বোম্বেটেদের ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে পালিয়ে যাওয়া স্থির করল আয়ারটন। পর পর দুবার গুলিবর্ষণ করল পিস্তল থেকে। একটা গুলি বব হার্ডিকে লক্ষ্য করে ছুটল বটে, কিন্তু আয়ু ছিল বলে বেঁচে গেল সে। আচমকা মারপিটের ফলে বোম্বেটেরাও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

সুযোগটাকে পলকের মধ্যে কাজে লাগাল আয়ারটন। পিস্তলের মোক্ষম গুলিতে ছাতু হল লণ্ঠন। অন্ধকার সিঁড়ির দিকে ছিটকে গেল আয়ারটন। জনা দু'তিন বোম্বেটে নামছিল সিঁড়ি বেয়ে। আয়ারটনের চতুর্থ গুলিতে একজন খতম হল। অন্যেরা এমন ভড়কে গেল যে তিন লাফে ডেকে গিয়ে পড়ল আয়ারটন। পিস্তলের বাকী দুটি গুলির একটিতে নিহত হল আরো একজন বোম্বেটে। পরমুহূর্তেই রেলিং টপকে সমুদ্রের জলে তলিয়ে গেল সে।

মাত্র ছ'সাত ফুট যেতে না যেতেই শিলাবৃষ্টির মত বুলেট এসে পড়তে লাগল আশপাশে।

মুহুর্মুহু বন্দুক নির্ঘোষ শুনে আঁৎকে উঠেছিল পেনক্রফট! বেচারা আয়ার-টন! সে কী আর বেঁচে আছে? দ্বীপবাসীরাও অত ফায়ারিংয়ের আওয়াজ শুনে বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে নেমে এল সমুদ্রতীরে। কিন্তু নদী পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। নৌকো তো ওপারে।

রাত বারোটার সময়ে ফিরল দুই মূর্তিমান। পেনক্রফট আর জখম আয়ারটন!

আয়ারটনের জাহাজ উড়িয়ে দেওয়ার বিফল প্রচেষ্টা শোনার পর হতাশ হয়ে বললে পেনক্রফট—'আর কী! এবার গেছি আমরা। পঞ্চাশজনের সঙ্গে মাত্র ছজন?'

৩

সারারাত কাটল অসহ্য উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে। গুলিগোলা থেমে গেছে। জাহাজের দিক থেকেও আর কোনো সাড়া নেই।

ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল 'স্পীডি'র আবছা চেহারা। কুয়াশা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ রক্ষে। তারপরই তো দ্বীপের ওপর হামলা শুরু হবে খুনে বোম্বেটেদের।

কৌশলপূর্ণ রণনীতি স্থির করল দ্বীপবাসীরা। এমনভাবে লড়তে হবে যাতে বোম্বেটেরা মনে করে দ্বীপবাসীর সংখ্যাই অনেক। তাহলেই ধাবড়ে দেওয়া যাবে হতচ্ছাড়াদের।

প্ল্যানমাফিক চার দলে ভাগ হয়ে গেলেন ছ'জন দ্বীপবাসী। হার্বার্টের সঙ্গে হার্ডিং গেলেন চিমনীতে। নেব আর স্পিলেট রইলেন মার্সি নদীর মুখে। আয়ারটন আর পেনক্রফট লুকিয়ে রইল উপদ্বীপের দু'জায়গায়। প্রত্যেকের হাতে রইল বন্দুক রাইফেল।

ভোর ছটার পর থেকে কুয়াশা ফিকে হতে আরম্ভ করল। দূরবীনের ভেতর থেকে হার্ডিং দেখতে পেলেন, জাহাজের চারটে কামানের মুখ ফেরানো রয়েছে দ্বীপের দিকে। জনাতিরিশ জলদস্যু ছুটোছুটি করছে ডেকের ওপর। দুজন দূরবীন কষে দেখছে লিঙ্কলন দ্বীপকে।

কিছুক্ষণ পর একটা নৌকো নামল জলে। তাতে সাতজন বোম্বেটে। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। চারজন দাঁড় টানছে, একজন সীসে বাঁধা দড়ি দিয়ে জল মাপছে। দুজন নৌকোর মুখের কাছে বন্দুক বাগিয়ে বসে আছে।

আয়ারটন আর পেনক্রফট দেখল, বোম্বেটে নৌকো আসছে তাদের দিকেই বন্দুকের আওতার মধ্যে আসার অপেক্ষায় রইল ওরা।

বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসেছে নৌকো। একজন দাঁড়িয়ে উঠে তীরে নামবার জায়গা খুঁজছে বোধহয়। আচমকা দু'দুবার বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল পাহাড়ের আড়াল থেকে। জল মাপতে মাপতে একজন লুটিয়ে পড়ল নৌকোর মধ্যেই। দাঁড়িয়ে ওঠা লোকটারও হাল হল একই।

সেকেণ্ড গুণতে যা সময় গেল। জাহাজ থেকে বিকট শব্দে ছুটে এল কামানের গোলা। আয়ারটন আর পেনক্রফটের মাথার ওপরকার পাহাড়ের চূড়ো উড়ে গেল গোলার ঘায়ে। বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ্য করে কামান দাগছে বব হার্ডি!

মহা হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেল বোম্বেটেদের নৌকোয়। আর একজন এসে বসল হালে। মিনিট কুড়ি পরে ওদের নৌকো এসে পৌঁছোলো মার্সি নদীর জলে। আচম্বিতে আরো দুটি গুলি উড়ে এল নেব আর স্পিলেটের বন্দুক থেকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। দুজন বোম্বেটে চিৎপটাং হল নৌকোর মধ্যে। বন্দুকের ধোঁয়া নিশান করে অবশ্য তক্ষুণি গর্জে উঠল জাহাজের কামান। আরো কিছু পাথর ভেঙেচুরে ছড়িয়ে গেল—কারো গায়ে আঁচড়টি লাগল না।

তিনজন তাগড়াই বোম্বেটে নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে চলল জাহাজের দিকে। হার্ডিং আর হার্বাটের সামনে দিয়ে গেলেও গুলি খরচ করলেন না ওঁরা বন্দুকের আওতার বাইরে থাকার জন্যে। জাহাজে গিয়ে নৌকো ভিড়তেই সে কী হট্টগোল ডেকের ওপর। তৎক্ষণাৎ বারোজন ডাকাত বীর বিক্রমে লাফিয়ে পড়ল নৌকোয়। আরও একটা নৌকো নামল জাহাজ থেকে। তাতে উঠল আটজন বোম্বেটে। একটা নৌকো গেল উপদ্বীপের দিকে, আর একটা মার্সি নদীর মুখ লক্ষ্য করে। ফলে সঙ্গীন হয়ে পড়ল পেনক্রফট আর আয়ারটনের অবস্থা। এবার খাড়ি পেরিয়ে দ্বীপে ফিরে না গেলেই নয়।

ওৎ পেতে রইল দুজনে। আরো দুটোকে নিকেশ না করে নড়বে না ওরা। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসতেই দুই গুলিতে আরো দুই বোম্বেটে শুইয়ে দিয়েই লাফিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। তীরবেগে ছুটল নৌকোর দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটল আশপাশ দিয়ে। ওরা গিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল নৌকোয়। খাল পেরিয়ে সিধে গিয়ে গা ঢাকা দিল চিমনীতে।

আটজনকে নিয়ে যে নৌকোটা আসছিল মার্সি নদীর মুখের দিকে, তার ওপরেও দুটো বুলেট ছুঁড়ে দিলেন স্পিলেট আর নেব। দুটো শয়তান অক্কা

পেতেই চোরা পাথরে নৌকো লেগে গেল উল্টে। বাকী ছজন বন্দুক উঁচু করে জল পেরিয়ে এসে উঠল তীরে। পরক্ষণেই চোঁচা দৌড় দিল ফ্লোটসাম পয়েণ্টের দিকে। দেখতে দেখতে বন্দুকের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছয় বিটলে!

হার্ডিং তাই দেখে বললেন—'লড়াইয়ের মোড় ঘুরতে চলেছে কিন্তু। এরপর নিশ্চয় নৌকো নিয়ে মরতে আর কেউ আসবে না। আসবে জাহাজ নিয়ে খাড়ির ভেতর। তখন তো বন্দুক দিয়ে কামানকে টক্কর দেওয়া যাবে না।'

হার্ডিংয়ের কথা শেষ হতে না হতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট—'সর্বনাশ! শয়তানের বাচ্চাগুলো দেখছি নোঙর তুলছে। ক্যাপ্টেন, আর এ জায়গা নিরাপদ নয়। চলুন গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে আশ্রয় নিই।'

হার্ডিংয়ের অনুমানই সত্যি হল। পাল খাটিয়ে দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল 'স্পীডি'! তারপর খাড়ির দিকে। বটে! খাড়ির ভেতর জাহাজ ঢুকিয়ে কামান দেগে চিমনী গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতলব এঁটেছে ধুরন্ধর বব হার্ডি!

আর তো স্পিলেট আর নেবের থাকা চলে না। ওঁরা পাহাড়ের আড়াল থেকে পালিয়ে এলেন চিমনীতে। জাহাজ থেকে কেউ দেখতে পায়নি। পেলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেত দুজনেই। চিমনীতে ফিরেই দ্বীপবাসীরা লুকিয়ে পালিয়ে গেলেন গ্র্যানাইট হাউসের সামনে। লিফটে চেপে ওপরে উঠতে এক মিনিটও লাগল না।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই প্রলয়কাণ্ড। খাড়ির মধ্যে ঢুকছে 'স্পীডি' আর মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করছে চিমনীর ওপর। তছনছ হয়ে যাচ্ছে চিমনীর পাথর।

আচম্বিতে একটা গোলা উড়ে এসে লাগল গ্র্যানাইট হাউসের জানলায়!

চেঁচিয়ে উঠল পেনক্রফট—'গেল! গেল! শয়তানের বাচ্চাগুলো টের পেয়ে গেছে আমরা কোথায় আছি।'

হয়ত তাই। দ্বীপবাসীরা ভেবেছিলেন নিশ্চয় লতায়-পাতায় ছাওয়া জানলা দরজা দেখে কিছু বুঝতে পারবে না ডাকাতরা! কিন্তু ঐ লতাপাতাই হয়েছে কাল! ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে সবুজ পাতা দেখে নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছে বব হার্ডির।

অথবা বেমক্কা ভুল পথে ছুটে আসেনি তো একটা গোলা?

ঠিক এই সময়ে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল একটা ভয়াবহ শব্দে সেই সঙ্গে বহুকণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার!

দৌড়ে জানলায় এলেন সকলে। দেখলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! অতবড় 'স্পীডি' জাহাজটা আচম্বিতে যেন একটা জলস্তম্ভের মাথায় চেপে শূন্যে ছিটকে গেছে! ফেটে দুভাগ হয়ে গিয়েছে তার তলদেশ!

দশ সেকেণ্ডও গেল না। দুর্ধর্ষ 'স্পীডি' দুর্দান্ত বোম্বেটেদের নিয়ে তলিয়ে গেল জলে।

৮

এ-রকম একটা অসম্ভব কাণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন সকলে। চোখের সামনে দেখা গেল ফেটে উড়ে গেল অতবড় জাহাজটা। কিন্তু কেন?

সম্বিৎ ফিরতেই দৌড়োলেন সকলে সমুদ্রতীরে। দেখলেন নিশ্চিহ্ন হয়েছে স্পীডি। হতভম্ব হয়ে বললেন হার্ডিং—'এ কী অলৌকিক কাণ্ড।'

'অলৌকিক মনে হলেও আসলে কিন্তু এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই,' বললে পেনক্রফট, 'বোম্বেটেরা তো আর ট্রেনিং পাওয়া সৈনিক নয়। সুতরাং উত্তেজনার মুহূর্তে নিশ্চয় কারো গুলি ছুটে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে বারুদ ঘর।'

জোয়ারের জল নামার পর দেখা গেল স্পীডি ধ্বংস হয়েছে কিভাবে। কাৎ হয়ে পড়েছিল জাহাজটা। কল্পনাতীত শক্তির প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে সামনের দিকটা। শিরদাঁড়া বরাবর গোটা জাহাজটাকে সেই মহাশক্তি যেন চিরে দুভাগ করে দিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে জাহাজের সামনের দিকটাই যেন গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গিয়েছে— ভেতরের কিছুই সেই অজ্ঞাত প্রলয় দেবতার রুষ্ট প্রহার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি! তামার পাত-কাত উড়ে বেরিয়ে গেছে! বিশ ফুট জায়গা জুড়ে একটা বিরাট ফুটো দেখা যাচ্ছে!

সামনের দিকেই বিশাল ছেঁদার সৃষ্টি হয়েছে। পেছনে নয়। তাহলে তো পেনক্রফটের অনুমান মিথ্যে হয়ে যায়! বারুদ ঘর থাকে তো জাহাজের পেছনে। স্পীডি ধ্বংসের মূল কারণ তাহলে বারুদ ঘরে বিস্ফোরণ নয়?

প্রমাণ পাওয়া গেল ভাঙা জাহাজের ডেকে ওঠার পর। কুড়ুল গাঁইতি নিয়ে অক্ষত অবস্থায় যা কিছু পাওয়া গেল তীরে সরিয়ে আনতে লাগলেন দ্বীপ-বাসীরা। জোয়ারের আগেই এ কাজ সারতে হবে। বাসনকোসন, যন্ত্রপাতি, সিন্দুক, বাক্স, পিপে—সব কিছুই দড়িদড়া কপিকল দিয়ে নৌকোয় নামিয়ে ডাঙায় তুলতে লাগলেন সকলে।

ক্রমে ক্রমে দ্বীপবাসীরা এলেন পেছন দিকে ! বারুদ ঘর পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় !

যাই হোক, দ্বীপবাসীদের আনন্দের সীমাপরিসীমা রইল না অস্ত্রাগার বোঝাই গোলাবারুদের সমারোহ দেখে। কিছুই নষ্ট হয়নি। তামার লাইনিং দেওয়া বারুদের বিশটা পিপে নামানো হল নীচে।

পেনক্রফট নিজেও বোকা বনে গেল বিস্ফোরণের ধরন দেখে। গলুইয়ের ভেতর পর্যন্ত গুঁড়িয়ে গেছে। অথচ বারুদ ঘরে কিচ্ছু হয়নি। এ কী রকম ব্যাপার ? এ আবার কি রহস্য ?

তিন দিন গেল শুধু ভাঙা জাহাজ থেকে সব জিনিসপত্র উদ্ধার করতে। জিনিসের তো আর শেষ নেই। গ্র্যানাইট হাউসের ভাঁড়ার উপচে পড়ল। অস্ত্রাগারের অবস্থাও হল তাই। বন্দুক, পিস্তল, টোটা যে কত পাওয়া গেল তার ইয়ত্তা নেই। কামান চারটেও নামিয়ে আনল পেনক্রফট। সুযোগ মত গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় বসানোর ইচ্ছে রইল কামানগুলো।

তিরিশে নভেম্বর 'স্পীডি' ধ্বংসের রহস্য আঁচ করতে পারলেন হার্ডিং।

স্পীডি তখন ভেঙেচুরে জলে তলিয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধার দিয়ে আসছে নেব। এমন সময়ে হঠাৎ একটা লোহার চোঙা চোখে পড়ল। মোটা চোঙা। গায়ে বিস্ফোরণের চিহ্ন। চোঙা নিয়ে এসে দেখাল হার্ডিংকে। উল্টে-পাল্টে দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি ! বললেন—'স্পীডির অমন দুরবস্থার কারণটা এবার বোঝা গেল।'

পেনক্রফট চোখ কপালে তুলে বললে—'বলেন কি ? ঐ চোঙার জন্যেই কি স্পীডি ডুবেছে ?'

'হ্যাঁ। এটা নিছক চোঙা নয়—একটা টর্পেডোর কিছুটা অংশ।'

হাঁ হয়ে গেলেন সবাই—'টর্পেডো !'

'হ্যাঁ, টর্পেডো। জলের বিভীষিকা সাংঘাতিক এই অস্ত্র ছুঁড়ে স্পীডিকে কে উড়িয়ে দিয়েছে, তা বলতে পারব না। তবে আর একবার যে চরম বিপদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছে কুহক দ্বীপের রহস্যময় সেই অধিদেবতা, তা বোঝা যাচ্ছে। বোম্বেটেদের খপ্পর থেকে এই শুভ শক্তিই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের।'

৩

টর্পেডো নামক মারণাস্ত্রটির প্রলয়ংকর ধ্বংসকারী ক্ষমতা সাইরাস হার্ডিং নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধে। পেল্লায় রণতরীকে

চক্ষের নিমেষে যে অস্ত্র ডুবিয়ে দেয়, 'স্পীডি' তার দাপটের কাছে অতি নগণ্য বলতে হবে। জলস্তম্ভ কি এমনিতে হয়েছে ?

সব তো হল, স্পীডি ধ্বংসের কারণ এতক্ষণে মালুম হল। কিন্তু খাঁড়ির জলে মারণাস্ত্রটিকে রেখে দ্বীপবাসীদের এত উপকার করল কে ?

ঘুরে ফিরে এল সেই অজ্ঞাত-পরিচয় অদৃশ্য বন্ধুর কথা। এ দ্বীপে পা দেওয়ার মুহূর্তটি থেকে যে একটার পর একটা উপকার করে চলেছে দ্বীপে নবাগতদের, কিন্তু কিছুতেই সামনে আনছে না নিজেকে। রহস্যময় এই শুভশক্তির ক্ষমতা অলৌকিক, অমানুষিক, অপার্থিব।

কুহক দ্বীপের রহস্যগুলির উল্লেখ করে হার্ডিং বললেন—'যত শীগ্‌গির সম্ভব তাঁকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। অন্যান্য সঙ্গীরাও রাজী হল তাঁর এই সিদ্ধান্তে।

এরপর কিছুদিন পর্যন্ত আবার খেতখামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন দ্বীপ-বাসীরা। পেনক্রফট কামান চারটেকে ঘসেমেজে ঝকঝকে তকতকে করে বসিয়ে নিল গ্রানাইট হাউসে। কামানের নলের জন্যে নতুন চারটে ফোকর দেওয়াল ফুটো করে বসানো হল জানালাগুলোর মাঝে মাঝে। তারপর যেদিন একে-একে চারটে কামান দেগে যাচাই করা হল গোলাগুলোর দৌড় কদ্দুর, সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হলেন প্রত্যেকেই। শেষ গোলাটা পাঁচ মাইল স্বচ্ছন্দে উড়ে গিয়ে পাথর গুঁড়িয়ে দিল ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপের।

এরপর সত্যি সত্যিই দুর্গের মত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল গ্র্যানাইট হাউস।

পেনক্রফট তো সোল্লাসে বলে উঠল—'বোম্বেটেগুলো এক একটা জাগুয়ার বললেই চলে। জাগুয়ারের মতই ওদের মারা উচিত। আয়ারটন, ঠিক কিনা ?'

থতমত খেয়ে আয়ারটন শুধু বললে—'কি বলব বলুন, আমিও তো জাগুয়ার ছিলাম।' বলে আর দাঁড়াল না আয়ারটন।

৬

যে ছটি বোম্বেটে নৌকো উল্টে যাবার পর দ্বীপের মধ্যে পালিয়ে ছিল তাদের কথা ভেবে কিন্তু বড় উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল দ্বীপবাসীরা। ঠিক হল, এবার এই ছয় শয়তানকে তল্লাস করতে হবে। দ্বীপের অদৃশ্য বন্ধুটির গোপন বিবরণও খুঁজে বার করতে হবে। তার আগে দিন দুয়েকের জন্যে খোঁয়াড়ে যাওয়া দরকার আয়ারটনের। পশুগুলোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে আবার ফিরে আসবে গ্রানাইট হাউসে।

কথামত নব্বই নভেম্বর খোঁয়াড়ে চলে গেল আয়ারটন। একাই গেল। গিয়ে টেলিগ্রাফে খবর পাঠালে সব কুশল।

এই ছদিন হার্ডিং একটা বড় কাজ সারলেন। পাথর গেঁথে তিন ফুট উঁচু চওড়া বাঁধ তুলে লেকের জল উঁচু করে দিলেন। ফলে, ঢাকা পড়ে গেল গ্র্যানাইট হাউসের পুরোনো প্রবেশ পথ।

দিন দুয়েক পরে, যেদিন আয়ারটনের ফেরার কথা, সেদিন দুপুর নাগাদ স্পিলেট বললেন—'চলো বন-অ্যাডভেঞ্চারের অবস্থাটা দেখে আসা যাক। বোম্বেটেদের চোখে যদি পড়ে। তাহলেই সর্বনাশ!'

হাতে কোনো কাজ না থাকায় স্পিলেট পেনক্রফট আর হাবার্টকে নিয়ে রওনা হলেন বেলুন বন্দরের দিকে। গুলিভর্তি বন্দুক অবশ্য তৈরী রইল। কখন কোন মুহূর্তে চড়াও হবে ছয় বোম্বেটে তা কি বলা যায়!

বেলুন বন্দরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলল পেনক্রফট। দিব্বি জলে ভাসছে বন-অ্যাডভেঞ্চার!

ডেকে ওঠার পর কিন্তু টনক নড়ল পেনক্রফটের। নোঙরের দড়িটা পরীক্ষা করে বললে—'আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

'আবার কি ঘটল?' শুধোলেন স্পিলেট।

'নোঙরের দড়িতে নতুন করে গিঁট দিয়েছে কেউ। এ ধরনের গিঁট তো আমি কখনো দিই না।'

'তুমিই দিয়েছো, খেয়াল নেই।'

'না, মিস্টার স্পিলেট। এ ধরনের গিঁট আমার হাত দিয়ে কোনো দিন বেরোয় না। এ গিঁট আমার নয়।'

তাহলে কি কেউ বন-অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে বেরিয়ে ছিল? এক চক্কর ঘুরে এসে ফের বেঁধে রেখে গেছে যথাস্থানে? স্পিলেটের অন্ততঃ সেই বিশ্বাস দেখা দিল মনের মধ্যে। গ্র্যানাইট হাউস ফিরে হার্ডিংকে সব বলতে তিনি বললেন—'সব সময় চোখে রাখার জন্যে একটা বন্দর কাছাকাছি তৈরী করতে হবে দেখছি। বন-অ্যাডভেঞ্চারকে নজর ছাড়া করা চলবে না।'

বিকেল নাগাদ খোঁয়াড়ে টেলিগ্রাফ করা হল আয়ারটনকে। আসবার সময়ে যেন দুটো ছাগল আনে সে। কিন্তু অবাক কাণ্ড তো! কোন জবাবই এল না তারবার্তার!

সে রাতে ফিরল না আয়ারটন। পরের দিন সকালে উঠে বারবার টেলিগ্রাফ করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না তার। ভাবনায় পড়ল দ্বীপবাসীরা। টেলিগ্রাফ বিগড়েছে, না, আয়ারটন বিপদে পড়েছে?

গুলিভরা বন্দুক বাগিয়ে তক্ষুণি রওনা হলেন সকলে। গ্র্যানাইট হাউস পাহারার জন্যে রইল কেবল নেব। টেলিগ্রাফ খুঁটির লাইন ধরে মাইল দুয়েক আসার পর দেখা গেল চুয়াত্তর নম্বর খুঁটিটা কে উপড়ে শুইয়ে রেখেছে মাটির ওপর। সেই সঙ্গে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে দিয়েছে টেলিগ্রাফ তার!

হন্তদন্ত হয়ে সবাই এগিয়ে চললেন খোঁয়াড় অভিমুখে। তার ছিঁড়েছে যারা, আয়ারটনকেও নিশ্চয় জখম করেছে তারা। বেঁচে আছে তো আয়ারটন?

ঐ তো দেখা যাচ্ছে খোঁয়াড়ের ফটক। গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে মজবুত বেড়া। ভাঙেনি কোথাও। ফটকটাও বন্ধ রয়েছে—যেমনটি থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ বিরাজ করছে গোটা খোঁয়াড় অঞ্চলে। না আছে জানোয়ারদের হাঁকডাক, না আছে আয়ারটনের সাড়াশব্দ। হঠাৎ বিষম রেগে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ।

এগিয়ে গেলেন হার্ডিং। সঙ্গীরা বন্দুক হাতে একটু পেছনে—দরকার বুঝলেই গুলি চলবে। ফটকের হুড়কো খুলে সবে ভেতরে পা দিয়েছেন হার্ডিং অমনি শোনা গেল বন্দুক-নির্ঘোষ এবং আতীব্র আর্তনাদ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে হার্বার্ট।

৫

হাতের বন্দুক নিক্ষেপ করে বেগে দৌড়ে গেল পেনক্রফট- 'মেরে ফেলল, শয়তানের বাচ্চাগুলো মেরে ফেলল বাছাকে।'

স্পিলেট আর হার্ডিংও দৌড়েছিলেন। হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষা করে স্পিলেট বললেন—'বেঁচে আছে এখনো।'

হার্ডিং বললেন—খোঁয়াড়ের ভিতরে নিয়ে চলো।' বলেই লাফ দিয়ে উঠে উনি বেড়ার কোণ ঘুরে ছুটলেন। সামনেই পড়ল একজন বোম্বেটে। তার বন্দুকের গুলি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাঁর টুপী। পরক্ষণেই হার্ডিংয়ের হাতের ছুরী আমূল বসে গেল তার বুকে। বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়ল খুনে বোম্বেটে।

সেই ফাঁকে পেনক্রফট আর স্পিলেট হার্বার্টকে পাঁজাকোলা করে খোঁয়াড়ের ভেতর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন আয়ারটনের বিছানায়। পেনক্রফটের সে কি হা-হুতাশ আর ব্যাকুলতা। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হল হার্ডিং আর স্পিলেটকে। দুজনের কেউই ডাক্তার নন। কিন্তু যুদ্ধে থাকার দরুন প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু কিছু জানেন স্পিলেট। সেই বিদ্যে নিয়েই শুশ্রূষায় মন দিলেন তিনি।

হার্বার্টের অবস্থা মোটেই সুবিধের মনে হল না। নাড়ি ক্ষীণ। মুখ ফ্যাকাশে। জ্ঞান একেবারেই নেই। গুলিটা অবশ্য পাঁজরার এ-পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—ভেতরে নেই। কিন্তু যাবার পথে কোথায় কতখানি অনিষ্ট করে গেছে তা কে বলবে?

স্পিলেট বললেন—'গুলি কিন্তু হৃদপিণ্ড ছোঁয়নি।'

কিন্তু তবুও কেন জ্ঞান হারিয়েছে হার্বার্ট? পাঁজড়ের হাড়ে গুলির ধাক্কা লাগার জন্যে? রক্তপাতের জন্যে? ফুসফুসে চোট লাগার জন্যে? ওষুধের মধ্যে তো ঠাণ্ডা জল। ডাক্তাররাও ঠাণ্ডা জলের উপকারিতা মেনে নিয়েছেন গুরুতর কেসে। ক্ষতস্থানকে জিরেন দেওয়ার ব্যাপারে তুলনা নেই ঠাণ্ডা জলের। তাছাড়া, প্রথমদিকে ক্ষতস্থানে হাওয়া লাগানো খুবই বিপজ্জনক। ঠাণ্ডাজল আগলে রেখে দেয় ক্ষতকে শুশ্রূষা শুরু না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং তাই দিয়েই স্পিলেট শুশ্রূষা করে চললেন। পেনক্রফট সার্ট ছিঁড়ে ন্যাকড়ার পটি বানিয়ে দিয়েছিল। সেই কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে সেখানে ঠাণ্ডা জল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। ভেতরের পুঁজ যাতে ক্ষতমুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তাই কাৎ করে শুইয়ে রাখা হল হার্বার্টকে। জ্বর আসতে পারে। তাই জ্বরনাশক সেই গাছের ছাল ফুটিয়ে ক্বাথ তৈরী খাওয়ানো হতে লাগল তাকে। পাঁচন খাওয়া সত্ত্বেও এল জ্বর। সারা দিন গেল, রাত গেল, জ্ঞান আর ফিরল না। উৎকণ্ঠার অবধি রইল না অন্যান্যদের। হার্বার্টের তখন এই-যায় সেই-যায় অবস্থা।

পরের দিন, বারোই নভেম্বর। চোখ মেলে তাকাল হার্বার্ট। স্পিলেট, হার্ডিং আর পেনক্রফটকে চিনতে পারল। ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলল দু'একটা। যাক, মোহ-ঘুম তো ভেঙেছে। আর ভয় নেই।

জ্বর এবং যন্ত্রণা আর বাড়ল না। একনাগাড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার ফলে ক্ষতস্থান পচবার সুযোগ পেল না, ক্রমাগত পুঁজ বেরিয়ে যেতে লাগল ঘায়ের মুখ দিয়ে। স্বাভাবিক ঘুম ঘুমোতে লাগল হার্বার্ট!

চব্বিশ ঘণ্টা একটানা যমের সঙ্গে লড়াই চলল হার্বার্টকে নিয়ে। আর কোনো কথা ভাববার সময়ও ছিল না। আয়ারটন নিরুদ্দেশ। অথচ খোঁয়াড়ের বাইরে বা ভেতরে কোথাও ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। আশ্চর্য তো! সেকী তবে দস্যুদলে ফের যোগ দিল? হার্ডিং এ সম্ভাবনা একেবারেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলেন।

স্পিলেট বললেন—'আয়ারটনকে পাকড়াও করার পর নিশ্চয় ওরা খোঁয়াড়ের মধ্যেই ছিল! আমাদের আসতে দেখে পালিয়েছে।'

শুধু তাই নয়, যাবার সময়ে আয়ারটনকে যা গুলিবারুদ দেওয়া হয়েছিল, নিয়ে গেছে শুধু সেইগুলিই। এটাও ঠিক যে শয়তানগুলো নিশ্চয় আড়ালে ওৎ পেতে রয়েছে। খোঁয়াড় থেকে বেরোলেই হত্যা করবে দ্বীপবাসীদের।

এখন উপায়? নেবকে নিয়ে মহাভাবনায় পড়লেন স্পিলেট। বললেন 'আমাদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে নেব যদি খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে?'

'তা পড়তে পারে' বললেন হার্ডিং। 'বেরোলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না। রাস্তাতেই ওকে মারবে শয়তান বোম্বেটেগুলো। তার চাইতে আমি বরং যাই গ্র্যানাইট হাউসে।'

'পাগল হয়েছো? বাধা দিলেন স্পিলেট। খোঁয়াড়ের ওপরেই ডাকাতদের এখন নজর। তুমি কি নতুন ফ্যাসাদ ডেকে আনতে চাও?'

ঠিক এই সময়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে টপ এসে দাঁড়াল সামনে। চোখ উজ্জ্বল হল সাইরাস হার্ডিংয়ের।

বললেন—'ঠিক আছে। টপ যাবে খবর নিয়ে। ফিরে আসবে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে।'

ছোট একটা কাগজে লিখলেন হার্ডিং—'হার্বার্ট জখম হয়েছে। আমরা রয়েছি খোঁয়াড়ে। তুমি সাবধানে থেকো। গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে পা দিও না। বোম্বেটেরা ধারে কাছে দেখা দিয়েছে কি? জবাব পাঠাও টপকে দিয়ে।'

কাগজটা টপের গলায় বেঁধে ফটক ঈষৎ ফাঁক করে বললেন হার্ডিং—'টপ, নেব, নেব। টপ, নেব, নেব।' সেই সঙ্গে আঙুল দেখালেন গ্র্যানাইট হাউসের দিকে।

আর বলতে হল না। বিদ্যুৎরেখার মত লাফিয়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেল টপ।

এক ঘণ্টা পর। আচম্বিতে বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক। তৎক্ষণাৎ ফটক ফটক ফাঁক করলেন হার্ডিং। শতখানের গজ দূরে গাছপালার মধ্যে একতাল ধোঁয়া চোখে পড়তেই গুলিবর্ষণ করলেন সেইদিকে। সেই মুহূর্তে তীরের মত ছিটকে এসে ভেতরে ঢুকে পড়ল টপ।

টপের গলার চিরকুটে চিঠি পাঠিয়েছে নেব। লিখেছে—গ্র্যানাইট হাউসের ধারে কাছে ডাকাতদের দেখা যায় নি। আমি বাইরে পা দেব না। হার্বার্ট, বেচারা, হার্বার্ট!

বোম্বেটেদের গতিবিধি এবার তাহলে স্পষ্ট হল। 'স্পীডি' উড়ে যাওয়ার পর তারা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিল দ্বীপের পশ্চিম দিকে। এসে দেখলে সাজানো কুঁড়ে, খাবার দাবারের কোন অভাব নেই। সুতরাং আরামে থেকে গেল খোঁয়াড়ে। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল আয়ারটন।

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে তাকে কাবু করল ছয় শয়তান। তারপরেই অন্যান্য দ্বীপবাসীরা আসতেই ওরা খোঁয়াড় ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। সংখ্যায় ওরা এখন পাঁচজন। কিন্তু আড়ালে আবডালে থেকে একে একে মুষ্টিমেয় দ্বীপবাসীদের নিকেশ করার ফন্দী এঁটেছে তারা।

এ-অবস্থায় খোঁয়াড়েই থাকা ছাড়া আর পথ নেই। নেব? সে ভীরু নয়। গ্র্যানাইট হাউসে জাপকে নিয়ে দিব্বি থাকতে পারবে।

হার্ডিং বললেন—'সবার আগে হার্বার্টের জীবন। আগে সে বাঁচুক, সেরে উঠুক। তারপর হার্মাদদের ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

গেলো আরো কয়েকটা দিন। ঠাণ্ডা জলকে গা সওয়া টেম্পারেচার রেখে সামনে ক্ষতস্থানে ঢালা হচ্ছে। ফলে, ঘা পেকে উঠতে পারে নি, বিষিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। হার্বার্টের পুনর্জীবন ঘটল যেন। জ্বর একদম ছেড়ে গেল।

দশ দিন পর, ২২শে নভেম্বর, হার্বার্টের অবস্থা বেশ ভালোর দিকে দেখা গেল। বলকারক খাবার খেল অল্প পরিমাণে। ফের রক্তাভ হল গাল। ঝকঝকে চোখে ফুটল হাসি। পাছে সে বেশী কথা বলে ফের কাহিল হয়ে পড়ে তাই পেনক্রফট একাই একনাগাড়ে বকর বকর করে চলেছিল এবং আবোল-তাবোল উদ্ভট অলীক গল্প বানাচ্ছিল মুখে মুখে।

'বোম্বেটেরা? ছোঃ, গুলি করে ঝাঁঝরা করব ব্যাটাদের!' বলল পেনক্রফট।

'ওরা আর আসেনি?' শুধোয় হার্বার্ট।

'না, বাবা। আর ছায়া মাড়ায়? তবে পালিয়ে বেটারা যাবে কোথায়। তুমি একটু সেরে ওঠো, কান ধরে বেল্লিকগুলোকে টেনে আনব। পেছন থেকে গুলি করা আর সামনা-সামনি টক্কর দেওয়া কি জিনিস, হাড়ে হাড়ে বুঝবে!'

'আমি কিন্তু এখনও বড় দুর্বল, পেনক্রফট।'

'দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে, বাবা। ভারী তো একটা গুলি! বুকে লেগেছে,

বেরিয়ে-ও গেছে ! অমন কত গুলির খেলা দেখেছি। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না !'

এই ভাবেই শনৈঃ সনৈঃ সেরে উঠতে লাগল হার্বার্ট। ভাগ্যিস গুলিটা বেরিয়ে গেছে ; যদি ভেতরে থেকে যেতো ? যদি হাত বা পা কেটে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিত ?

'ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে,' বললেন স্পিলেট।

'কিন্তু যদি সত্যিই হাত-পা কাটবার হত, পারতে কী ?' শুধোন সাইরাস হার্ডিং।

'চেষ্টা করে দেখতাম, সাইরাস। তবে ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

দিন যায়, হার্বার্ট ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করতে থাকে। বাকী পাঁচজন বোম্বেটেকে যথা সময়ে কুকুরের মত গুলি করে মারার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন অভিযাত্রীরা।

৯

হার্বার্ট সেরে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। কিন্তু খোঁয়াড়ে তাকে নিয়ে বেশী দিন থাকা চলবে না। গ্র্যানাইট হাউসের মত নিরাপদ এবং আরামপ্রদ নয় খোঁয়াড়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ জায়গা থেকে তাকে সরানো দরকার।

নেবের কাছ থেকে আর কোনো খবর আসেনি। তার জন্যে ভাবনাও নেই। নেবের সাহস আছে। গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে থাকলে কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হার্বার্ট ঘুমিয়ে পড়লে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে যাওয়া নিয়ে কথাবার্তা হত। স্পিলেট বুঝিয়ে বলতেন, এ পরিস্থিতিতে হার্বার্টকে নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরতে গেলেই চোরা গুলির ঘায়ে মরতে হবে। পেনক্রফট কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চাইত না। তার এক কথা—'বুলেটের ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে নাকি ? ছেড়ে দিন না, এখনি একাই জঙ্গলে গিয়ে একটা বোম্বেটেকে যমালয় পাঠাচ্ছি।'

'তুমি একা, তারা পাঁচজন,' বলতেন হার্ডিং।

'আমি যেতে রাজী আছি, সঙ্গে টপ—'

'মাথা ঠাণ্ডা করো। চোরা গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'গুলি নাও লাগতে পারে,' বলত পেনক্রফট।

'হার্বার্টের কিন্তু বুকে লেগে ছিল,' বললেন হার্ডিং।

অকাট্য যুক্তি। কেউ আর কোনো জবাব দিতে পারত না। শুধু অবরুদ্ধ আক্রোশ ফুলত পেনক্রফট।

'আহা রে, এই সময়ে আয়ারটন যদি সঙ্গে থাকত,' একদিন আপশোষ করলেন স্পিলেট।

'অত দুঃখ করবেন না, সে মরেনি!' অদ্ভুত স্বরে জবাব দিল পেনক্রফট।

'কেন পেনক্রফট, তোমার কি মনে হয় শয়তানগুলো আয়ারটনকে বাঁচিয়ে রেখেছে?'

'বাঁচিয়ে রাখলেই তো পোয়াবারো।'

'কি বলছ! পুরোনো দোস্তদের পেয়ে আয়ারটন তাদের দলে ভীড়েছে বলতে চাও? বেইমানি করেছে আমাদের সঙ্গে?'

বিনা দ্বিধায় জবাব দিল পেনক্রফট—'করলেই বা কে জানছে?'

'পেনক্রফট' বললেন হার্ডিং। 'আয়ারটনকে এত হীন মনে করো না। আমি তার হয়ে বলছি, সে বেইমানি করবে না।'

'আমিও,' বললেন স্পিলেট।

'তাহলে আমার ভুল হয়েছে। মিস্টার হার্ডিং, আমার মাথার ঠিক নেই। বন্ধ ঘরে আমি আর বন্দী থাকতে পারছি না। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'আর একটু ধৈর্য ধরো পেনক্রফট। স্পিলেট, হার্বার্টকে আর কদিন পরে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে?'

'বলা মুস্কিল। সেরে ওঠার মুখে পথের ঝাঁকুনিতে ফের বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। তবে মনে হয়, আট দিন পর রওনা হওয়া যাবে।'

টপকে নিয়ে স্পিলেট বন্দুক উঁচিয়ে বার দুয়েক রাস্তায় টহল দিয়ে এলেন। সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলেই টপ চেঁচাত, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতেন তিনি। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। দ্বিতীয়বার ২৭শে নভেম্বর, বনের মধ্যে সোয়া মাইল যেতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ। সামনে পেছনে ছুটতে লাগল বার বার। ঝোপের মধ্যে কিসের গন্ধ পেয়েছে যেন সে।

পাঁচ মিনিট টপের পেছনে রইলেন স্পিলেট। তারপর ঘন ঝোপের মধ্যে থেকে একটুকরো ন্যাকড়া টেনে আনল টপ।

রক্তমাখা ছেঁড়া কাপড়টা নিয়ে স্পিলেট তক্ষুনি খোঁয়াড়ে ফিরে এলেন। সবাই মিলে ভাল করে পরীক্ষা করতেই বুঝলেন, ন্যাকড়াটা আসলে আয়ারটনের ওয়েস্ট কোটের—গ্র্যানাইট হাউস ফ্যাক্টরীতে তৈরী!

হার্ডিং তখন বললেন—'পেনক্রফট, এখন দেখছো তো? আয়ারটন সহজে ধরা দেয়নি। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। তার সততা সম্বন্ধে এখনো সন্দেহ আছে?'

'না, ক্যাপ্টেন। ওকথা বলার জন্যে আমি অনুতপ্ত। কিন্তু একটা জিনিস এখন স্পষ্ট হয়ে গেল।'

'কী?'

'আয়ারটনকে খোঁয়াড়ে খুন করা হয়নি! তার মানে, সে এখনো বেঁচে আছে।'

'হয়ত।' চিন্তিত মুখে বললেন ইঞ্জিনীয়ার।

হার্বার্ট অস্থির হয়ে পড়েছিল গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে যাওয়ার জন্যে। তার জন্যেই সবাই আটক রয়েছেন খোঁয়াড়ে, এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না সে। গ্র্যানাইট হাউসে কত কাজ রয়েছে। তাছাড়া সেখানকার খোলামেলা হাওয়ায় সমুদ্রের সামনে তাড়াতাড়ি গায়ে জোর ফিরে পাবে সে। সুতরাং তাকে এখুনি নিয়ে যাওয়া হোক।

২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যে সাতটার সময়ে সহসা ঘেউ ঘেউ করে উঠল টপ। দেখা গেল, তার লাফঝাঁপ হাঁকডাকের মধ্যে রাগ নেই, খুশীর ছোঁয়া রয়েছে।

হার্ডিং পেনক্রফট এবং স্পিলেট বন্দুক নিয়ে দৌড়ে গেলেন বেড়ার ধারে।

'কেউ আসছে নিশ্চয়!'

'হ্যাঁ।'

'শত্রু নয়!'

'হয়ত নেব।'

'আয়ারটনও হতে পারে।'

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই বেড়া টপকে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল খোঁয়াড়ের খাসজমিতে।

জাপ। মাস্টার জাপ সশরীরে আবির্ভূত হয়েছে খোঁয়াড়ে। টপ তো হৈ-হৈ করে উঠল তাকে দেখে।

'জাপ! নিশ্চয় নেব পাঠিয়েছে।' বললে স্পিলেট।

জাপের গলায় একটা থলি ঝুলছে দেখা গেল। থলিতে নেবের হাতে লেখা একটা চিরকুট।

'শুক্রবার, ভোর ছটা। বোম্বেটেরা প্লেটো আক্রমণ করছে। নেব।'

হতভম্ব হয়ে সবাই তাকায় পরস্পরের মুখপানে। প্রসপেক্ট হাইটে খুনের দল? তার মানেই তো ধ্বংস, বিপর্যয়, সর্বনাশ!

জাপকে দেখেই বুদ্ধিমান হার্বার্ট বুঝেছিল, গ্র্যানাইট হাউসে বিপদ দেখা দিয়েছে। মহাব্যস্ত হয়ে জেদ ধরল সে—গ্র্যানাইট হাউসে যাবেই। বার বার বলতে লাগল—'ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমাকে নিয়ে চলুন। আমার কোনো কষ্ট হবে না।'

স্পিলেট একদৃষ্টে চেয়েছিলেন হার্বার্টের মুখপানে। দেখলেন, বেচারার পাণ্ডুর মুখে যে-টুকু রক্তোচ্ছাস দেখা যাচ্ছে, তা শুধু ওর মনের জোরে। এ-অবস্থায় বাধা দিলে মন ভেঙে যাবে হার্বার্টের—হিতে বিপরীত হবে—অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে পারে।

রাজী হলেন স্পিলেট। ওনাগা এনে তক্ষুনি গাড়ীতে লাগানো হল। পেনক্রফট চলল লাগাম ধরে খুব সাবধানে ঝাঁকুনি যদ্দুর সম্ভব বাঁচিয়ে। দুপাশে বন্দুক উঁচিয়ে চললেন স্পিলেট আর হার্ডিং।

যাবার আগে হার্বার্টকে শুধোলেন হার্ডিং—তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'ভয় পাবেন না। রাস্তায় মরব না আমি।' জবাব দিল হার্বার্ট।

যথা সময়ে দেখা গেল গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে নীল সমুদ্র। প্রসপেক্ট হাউস এসে গেছে।

আচমকা হায়-হায় করে উঠল পেনক্রফট—'শয়তানের বাচ্চাগুলো সব শেষ করে দিয়ে গেল গো!'

একী! ধোঁয়া উঠছে যে উইণ্ড মিল আর পোলট্রি হাউস থেকে। ধোঁয়ার মধ্যে ঘুর ঘুর করছে নেব।

ডাকাডাকি শুনে দৌড়ে এল নেব। বললে—'এই আধঘণ্টা হল ওরা চলে গেল।'

চলে তো গেল, কিন্তু কিছুই তো আর আস্ত রেখে যায় নি। আগুন লাগিয়ে ছাই করেছে উইণ্ড মিল আর পাখীর বাড়ী! ভেঙেচুরে একসা করে গেছে সব কিছু. এমন কি পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে গেছে খেতের ফসল পর্যন্ত।

নেব শুধালো—'মিস্টার হার্বার্ট ভালো আছেন তো?'

হার্বার্ট! গাড়ীর কাছে দৌড়ে গেলেন স্পিলেট। গিয়ে দেখলেন সর্বনাশ হয়েছে! ফের মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে হার্বার্ট।

১০

আবার শুরু হল যমে মানুষে লড়াই!

হার্বার্টকে তোলা হল গ্র্যানাইট হাউসে। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে

যেতে লাগল। দেখা দিল পালাজ্বর। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ। গা-যেন পুড়ে যেতে লাগল। একেবারে জ্বরের আক্রমণে।

স্পিলেট বললেন– 'জ্বরনাশক ওষুধ চাই।'

হার্ডিং বললেন—'কোথাও পাবো? পেরুভিয়ান গাছের ছাল নেই, কুইনাইনও নেই।'

'লেকের ধারে উইলো গাছ তো আছে। উইলোর ছাল গুঁড়িয়ে খাওয়ালে খানিকটা কাজ হবে।'

হার্ডিং নিজে গিয়ে উইলোর ছাল নিয়ে এলেন। সন্ধ্যের দিকে খাওয়ালেন হার্বার্টকে। হার্বার্ট কিন্তু আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। লিভার তো জখম হয়েছিলই, এবার হল মস্তিষ্ক। ভুল বকতে লাগল হার্বার্ট। মহাভাবনায় পড়লেন স্পিলেট। হার্ডিংকে একান্তে ডেকে বললেন—'কুইনাইন জাতীয় ওষুধ না হলে এ-জ্বর কমবে না। জ্বর না কমালে হার্বার্টকে বাঁচানো যাবে না। এটা ম্যালিগনাণ্ট ফিভার।'

'ম্যালিগনাণ্ট জ্বর!' ভয় পেয়ে গেলেন হার্ডিং।

'হ্যাঁ, সাইরাস। আমার ভুল হয় নি। জলা থেকে জ্বরটা নিয়ে এসেছে হার্বার্ট। একটা চোট সামলে উঠল বেচারী, দ্বিতীয় ধাক্কায় যদি ওষুধ দিতে না পারি, তৃতীয় ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারবে না হার্বার্ট' বললেন স্পিলেট।

'কিন্তু উইলো গাছের পাঁচন তো খাওয়ানো হচ্ছে। তাতেও তো জ্বর কমে।' বললেন হার্ডিং।

'তাতে কুইনাইন আর কতটুকুই বা আর আছে বলো। এ-জ্বরে কুইনাইন একমাত্র দাওয়াই। আবার বলছি, একটা ধাক্কা কোনমতে সামলেছি। আর একটা এল বলে। তৃতীয়টার আগেই যদি কুইনাইন না দেওয়া যায়, হার্বার্ট আর ধকল সইতে পারবে না।'

কুইনাইন! বিজন দ্বীপে কুইনাইন কোথায় পাওয়া যাবে? হার্বার্টকে তাহলে কি বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে তুচ্ছ একটা ওষুধের অভাবে?

ভয়ংকর খবরটা চেপে রাখা হল পেনক্রফটের কাছে।

রাত্রে আবার এল জ্বর। আরক্ত মুখে সে কী প্রলাপ বকুনি। দ্বীপের অধিদেবতার কাছে কাকুতি মিনতি থেকে শুরু করে আয়ারটনকে বারবার ডাকা কিছুই বাদ গেল না। তারপর পড়ে রইল মড়ার মত।

পরের দিন, ৯ই ডিসেম্বর মুহুর্মুহু জ্ঞান হারাতে লাগল হার্বার্ট। অস্থিচর্মসার হাত দুখানি দিয়ে খামচে ধরতে লাগল বিছানার চাদর। অবস্থা খুবই শোচনীয়।

স্পিলেট বললেন—'আজকের রাত কালরাত হয়ে দেখা দেবে হার্বার্টের জীবনে—কুইনাইন না দিলে মৃত্যু অনিবার্য।'

সত্যিই আর কোন আশা নেই। সঙ্গীদেরও আর চিনতে পারছে না। হার্বার্ট।

রাত তিনটা নাগাদ আচমকা ককিয়ে চীৎকার করে উঠল হার্বার্ট। প্রচণ্ড খিঁচুনি সুরু হয়েছে। আর বুঝি রাখা গেল না হার্বার্টকে। নেব পাশে বসেছিল। দৌড়ে গিয়ে খবর দিল পাশের ঘরে।

টপের অদ্ভুত ডাকটা শোনা গেল ঠিক তখনি। রাগ নয়। খুশী নয়—কিরকম যেন বেসুরো গলায় ডেকে উঠল টপ।

হার্বার্টের ঘরে দৌড়ে গেলেন সকলে। নাড়ি যেন ঘোড় দৌড় করছে। শেষ হয়ে আসছে হার্বার্টের আয়ু! খুব জোর আর একটা দিন।

ক্রমে ভোর হল। সোনা রোদ এল জানলা দিয়ে। হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল পেনক্রফটের কণ্ঠে। আঙুল দিয়ে সে দেখাচ্ছে টেবিলের দিকে।

সবারই চোখে পড়ল কৌটোটা। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে ছোট্ট একটা কাগজের কৌটো। ওপরে লেখা একটি মাত্র লাইন—

জোরে জোরে পড়লেন সাইরাস হার্ডিং—

'সালফেট অফ কুইনাইন!'

১১

কৌটো খুলে স্পিলেট দেখলেন, ভেতরে রয়েছে সাদা রঙের গুঁড়ো। পরিমাণে প্রায় তুশ গ্রেন তো হবেই। আঙুলের ডগায় সামান্য একটু নিয়ে জিভে লাগালেন। দারুণ তেতো! নিঃসন্দেহে কুইনাইন!

তৎক্ষণাৎ কফি বানানো হল। আঠারো গ্রেন কুইনাইন মিশিয়ে অল্প অল্প করে পান করানো হল হার্বার্টকে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সহজ হয়ে এল হার্বার্ট।

অত্যন্ত অদ্ভুত এই ব্যাপার নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলল দ্বীপবাসীদের মধ্যে। দ্বীপের অধিদেবতা আবার এসেছিলেন তাঁদের চরম বিপদের মুহূর্তে। কিন্তু চারদিক বন্ধ দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট দুর্গে তিনি প্রবেশ করলেন কিভাবে?

যাই হোক, তিন ঘণ্টা বাদে সমানে কুইনাইন খাওয়ানো হতে লাগল হার্বার্টকে।

দশদিন পর। বিশে ডিসেম্বর। জ্বর নেমে গেছে হার্বার্টের। তবে শরীর ভীষণ কাহিল।

যে পেনক্রফট হাল ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, সেই পেনক্রফটের স্ফূর্তি এখন দেখে কে! আনন্দের চোটে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে স্পিলেটের দম বন্ধ করে দেয় আর কি! সেই থেকে সে স্পিলেটের আগে নতুন খেতাব জুড়ে দিল। মিস্টার স্পিলেট হলেন 'ডক্টর স্পিলেট'!

ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারী গেল, ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠল হার্বার্ট। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় খিদে চনমনে হতেই নেবের হাতের বলকারক ঝোল খেয়ে দেখতে দেখতে চাঙা হল অনেকটা। সমুদ্রে স্নান করার পর শরীর আরো ঝরঝরে হয়ে উঠল।

এবার দুটি কাজ শেষ না করে গ্র্যানাইট হাউস ফিরবেন না পণ করলেন দ্বীপবাসীরা। প্রথম কাজ হল, পাঁচ বোম্বেটেকে জাহান্নামে পাঠানো। দ্বিতীয় কাজ হল, দ্বীপবাসীদের পরম বন্ধু হিতকামী অধিদেবতাটির গোপন আস্তানা খুঁজে বার করা।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী রওনা হলেন দ্বীপবাসীরা দল বেঁধে। গ্র্যানাইট হাউসে কেউ রইলেন না। জাপ আর টপও রইল অভিযানে।

লিফটটা টুকরো টুকরো করে সরিয়ে রাখা হল। সিঁড়িটা পুঁতে রাখা হল চিমনীর মাটিতে। সবশেষে পেনক্রফট গ্র্যানাইট হাউস থেকে নামল ডবল দড়ি বেয়ে।

ওনাগা দিয়ে টানা গাড়ীতে রইল হার্বার্ট। পুরোপুরি আরোগ্য হলেও পাহাড়-জঙ্গলে অভিযান করার মত শক্তি তার শরীরে এখনো আসেনি।

কাঠের সেতু পেরিয়ে আস্তে আস্তে ঘন জঙ্গলে ঢুকলেন অভিযাত্রীরা। জন্তু জানোয়ারগুলোর ভীত চকিত ভাব দেখে হার্ডিং বললেন—'এরা মানুষ দেখে এত চমকে উঠছে যখন, তখন বুঝতে হবে এসব পথেই বোম্বেটেরা হামলা করে গিয়েছে।'

বোম্বেটেদের নিশানা অবশ্য পাওয়া গেল আরো অনেক ভাবে। মাটিতে পায়ের ছাপ, ভাঙা ডালপালা, পোড়া ছাই ইত্যাদি।

রাতটা কাটল ঝর্ণার ধারে। পরদিন রওনা হয়ে পথি মধ্যে ফের পাওয়া গেল ডাকাতদের পায়ের ছাপ। গুনে দেখা গেল পাঁচজনের পদচিহ্ন! তার মানে, আয়ারটনকে তারা দলে টানতে পারে নি! প্রাণ দিয়েছে বেচারী তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। পুরোনো দোস্তদের সঙ্গে মিতা পাতায়নি!

সে রাতও কাটল খোলা জায়গায়। পরের দিন দ্বীপের শেষ সীমায় হাজির হল দ্বীপবাসীরা। কিন্তু বোম্বেটেদের বা অধিদেবতার কোনো গোপন আস্তানার চিহ্ন পাওয়া গেল না কোনোখানে!

১২

গেল কোথায় তাহলে বোম্বেটেরা?

স্পিলেট বললেন—'আমার তো মনে হয় ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের কোন গুহা-টুহার মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে ব্যাটারা!'

উনিশে ফেব্রুয়ারী অভিযাত্রীরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগোলো খোঁয়াড়ের দিকে। হার্ডিংয়ের মতলব হল, খোঁয়াড়কে ঘাঁটি বানিয়ে সেখান থেকে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ে অনুসন্ধান চালানো। হতে পারে ডাকাতরা পাহাড়ে থাকে, কিন্তু খোঁয়াড়কে ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং খোঁয়াড় যদিও বা বেদখল হয়ে গিয়ে থাকে গায়ের জোরে তা পুনর্দখল করতে হবে।

খোঁয়াড়ে যাওয়ার আগে জানা দরকার সত্যিই সেখানে শত্রুপক্ষ ওৎ পেতে আছে কিনা। যদি থাকে তো দিনের আলোয় সেখানে যাওয়া মানেই প্রাণটা খোয়ানো। তাই রাত আটটা নাগাদ স্পিলেট রওনা হলেন শুধু পেনক্রফটকে নিয়ে। নিঃশব্দে বন পেরিয়ে এসে দুজনে দাঁড়ালেন খোলা জায়গাটার এক প্রান্তে। প্রায় তিরিশ ফুট ফাঁকা মাঠের পর খোঁয়াড়ের ফটক। পাল্লা বন্ধ। এই জমিটুকু পেরোনোই বিপজ্জনক। ভেতর থেকে গুলি চললে আর রক্ষে নেই।

পেনক্রফট কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দর মত এগিয়ে যাচ্ছিল প্রাণের পরোয়া না রেখে, বাধা দিলেন স্পিলেট।

বললেন—'আর একটু পরেই অন্ধকারে হাত পর্যন্ত দেখা যাবে না। তখন যেও।'

কিছুক্ষণ পর সত্যিই গাঢ় আঁধারে ঢেকে গেল খোলা জায়গাটা। হামাগুড়ি দিয়ে দুজনে গেলেন ফটকের সামনে। সর্বনাশ! পাল্লা তো ভেতর থেকে বন্ধ! তার মানে ডাকাতরা খোঁয়াড়ের ভেতরেই আড্ডা গেড়েছে।

ফিরে এলেন দুজনে। হার্ডিং সব শুনে গাড়ীশুদ্ধ সদলবলে রওনা হলেন খোঁয়াড় অভিমুখে। পুরু ঘাসের আস্তরণে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি আর পায়ের আওয়াজ তেমন শোনা গেল না। টপের গলায় দড়ি বেঁধে নেব টেনে নিয়ে চলল অতি সন্তর্পণে।

খোলা জায়গা পেরিয়ে দরজার সামনে পৌঁছোলেন দ্বীপবাসীরা।

গিয়ে দেখলেন—অবাক কাণ্ড! পাল্লা হাট করে খোলা!

তাজ্জব ব্যাপার তো! দিব্বি গেলে বলল পেনক্রফট, সত্যিই দরজা বন্ধ ছিল একটু আগে।

মহা মুস্কিলের ব্যাপার তো? ডাকাত ব্যাটারা তাহলে খোঁয়াড়ের মধ্যেই রয়েছে এখনো। একজন হয়ত বাইরে গেছে ফটক খুলে।

হার্বার্ট গুটি গুটি কিছুটা ঢুকেছিল ভেতরে। ফিরে এসে বললে—'ক্যাপ্টেন, আলো জ্বলছে।'

'কোথায় হার্বার্ট?'

'ঘরের ভেতরে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল পাঁচজনে। একটা জানলা দিয়ে ম্যাড়মেড়ে আলোর রেখা এসে পড়ছে বাইরে!

হার্ডিং বললেন—'বোম্বেটেরা তাহলে ভেতরেই আছে। ওরা জানে না আমরা এসে পড়েছি। শূয়ারদের ঘায়েল করার এই হল সুযোগ। এগোও।'

তক্ষুনি দুভাগ হয়ে এগোলেন দ্বীপবাসীরা। খোঁয়াড়ের বেড়ার গা দিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দচরণে মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন কুঁড়েঘরের দরজায়।

উঁকি দিলেন হার্ডিং। টেবিলের ওপর একটা আলো জ্বলছে। বিছানায় কে একজন শুয়ে আছে।

আচম্বিতে ছিটকে পেছনে সরে এলেন হার্ডিং—'আয়ারটন!'

নিমেষ মধ্যে পাঁচজনেই একযোগে মাতাল হাওয়ার মত বেগে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। আয়ারটনই বটে। কিন্তু যেন ঘুমিয়ে আছে। নিদারুণ নির্যাতনের চিহ্ন হাতের কব্জিতে, পায়ের গাঁটে। ঘা হয়ে গিয়েছে সেখানে।

শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকাল আয়ারটন—'আপনি?...এসেছেন আপনারা?'

হার্ডিং বললেন—'হ্যাঁ, আয়ারটন, আমরা এসেছি।'

'আমি এখন কোথায়?'

'খোঁয়াড়ে।'

'একলা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওরা এখুনি আসবে। বন্দুক তৈরী করুন,' বলেই ফের নেতিয়ে পড়ল আয়ারটন। পড়ে রইল আচ্ছন্নের মত।

হার্ডিংয়ের পরামর্শ মত আর দেরী না করে তক্ষুনি গাড়ীটাতে টেনে নিয়ে আসা হল খোঁয়াড়ের ভেতরে। কে জানে কখন চড়াও হয় ডাকাতরা।

আচমকা আবার গরগর করে উঠল টপ!

গাড়ীট্যাকে ভেতরে আনা হয়েছে। ফটকের হুড়কো আঁটা হচ্ছে, এমন সময়ে ভীষণ ডেকে উঠল টপ। পরক্ষণেই দারুণ ঝটকায় দড়ি ছিঁড়ে ছুটল খোঁয়াড়ের পেছন দিকে। পেছন পেছন জাপ।

দৌড়োলো বাকী সকলে। বন্দুক তৈরী। কিন্তু তার আর দরকার হল না।

খোঁয়াড়ের পেছনে ছোট্ট ঝর্ণার পাশে চাঁদের ঝকঝকে আলোয় শুয়ে থাকতে দেখা গেল পাঁচটা মড়াকে।

পাঁচ বোম্বেটের মৃতদেহ !!

১৩

এ কী ফ্যানটাসটিক কাণ্ড! কে মারল পাঁচ পাঁচটা খুনে বদমাস-কে?

পরদিন সকালে আয়ারটনের জ্ঞান ফিরলে তার দুর্ভোগের কাহিনী শোনা গেল। বাস্তবিকই মর্মন্তুদ সেই উপাখ্যান।

খোঁয়াড়ে যেদিন আসে আয়্যরটন তার পরের দিনই রাত্রে ডাকাতরা তার মুখে কাপড় গুঁজে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যায় ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের নীচে একটা অন্ধকার গুহায়। ঐ গুহাই ছিল ওদের আস্তানা।

ঠিক হয়েছিল ওকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু একজন ওকে হঠাৎ চিনে ফেলল। অস্ট্রেলিয়ার সেই 'বেন জয়েস' না? তোবা! তোবা!

তারপর থেকেই চেষ্টা চলল ওকে দলে টানার। আয়ারটনকে হাত করে দ্বীপের অন্যান্য বাসিন্দাদের খুন করে পুরো দ্বীপটায় মালিক হওয়ার মতলব এঁটে ছিল হতভাগারা। চারমাস ধরে তার ওপর চলল অকথ্য নির্যাতন। সে অত্যাচার যে কি নিষ্ঠুর নির্মম নারকীয়, তা আয়ারটনের বর্তমান অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। এমন হল শেষকালে যে চোখ কানের শক্তি হারিয়ে ফেলতে লাগল আয়ারটন—তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করল না। এরপর তার আর কিছু মনে নেই। কি করে যে সে গুহার অন্ধকার থেকে খোঁয়াড়ের নরম বিছানায় এল, তাও এক রহস্য!

হার্ডিং তখন বলে উঠলেন—'রহস্য তো ডাকতদের অক্কা পাওয়াটাও! পাঁচজনেই যে মরে পড়ে আছে ঝর্ণার ধারে, এটাই বা হল কি করে?'

'মরে পড়ে আছে বোম্বেটেরা!' দারুন উত্তেজনায় উঠে বসবার চেষ্টা করল আয়ারটন। সবাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল বাইরে—ঝর্ণার ধারে।

দিনের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখা গেল পাঁচটা লাশ। কাল রাত থেকে পড়ে আছে একই ভাবে। দেখে তো বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই গুলিয়ে গেল আয়ারটনের!

হার্ডিংয়ের হুকুমে আগাপাশতলা পরীক্ষা করা হল মড়াগুলোর। ক্ষত বলতে যা বোঝায়, তা কোনো দেহতেই পাওয়া গেল না। তবে একটা আশ্চর্য দাগ দেখা গেল প্রতিটি দেহে। দাগটা একটা লাল দগদগে ছোপ। কারও বুকে কারও পিঠে, কারও কাঁধে।

হার্ডিং বললেন—'বুঝলাম। এই দাগগুলোর মধ্যে দিয়েই মরণ-মার খেয়েছে ডাকাতরা।'

স্তম্ভিত হয়ে বললেন স্পিলেট—'কিন্তু হাতিয়ারটা কি ধরনের?'

'বিদ্যুৎ চালিত হাতিয়ার বলা যেতে পারে।'

'কিন্তু এ রকম মারাত্মক মার মারল কে?'

'দ্বীপের অধিদেবতা। আয়ারটন, তোমাকে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় থেকে খোঁয়াড়ে এনে রেখেছিলেন তিনিই।'

মড়াগুলোকে মাটিতে গোর দেওয়া হল। সেই সঙ্গে দ্বীপবাসীদের অর্ধেক কাজ হল সম্পূর্ণ। এখন শুধু অধিদেবতার গুপ্ত আলয়টি বার করতে পারলেই মনটা শান্ত হয়।

পেনক্রফট বলে উঠল—'আরও একটা কাজ এখনো বাকী। ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে নোটিশ রেখে আসতে হবে। নইলে ডানকান জাহাজ এসে যদি ফিরে যায়?'

'বন-অ্যাডভেঞ্চারে যাবেন তো?' ম্লান হাসল আয়ারটন। 'বন-অ্যাডভেঞ্চার' কি আর আছে। গুঁড়িয়ে জলের তলায় চলে গেছে। দিন কয়েক আগে শয়তানগুলো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল বন-অ্যাডভেঞ্চারে চেপে। কিন্তু বব হার্ডির মত পাকা নাবিক তো কেউই নয়। ফলে পাহাড়ে লেগে তলিয়ে গেছে বন-অ্যাডভেঞ্চার।'

বন-অ্যাডভেঞ্চার নেই! দারুণ ভেঙে পড়ল পেনক্রফট। হার্বার্ট সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'মন খারাপ করো না পেনক্রফট। আর একটা আরো বড় নৌকো বানিয়ে নেব আমরা।'

কিন্তু সে রকম নৌকো বানাতে তো পাঁচ-ছ মাস লাগবেই।'

'তা লাগুক। এ বছর আর ট্যাবর দ্বীপে যাওয়া হল না।' বললেন স্পিলেট।

উনিশে ফেব্রুয়ারী থেকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান-পর্ব শুরু হল ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ে সহস্র রন্ধ্রের মধ্যে। এককালে আগ্নেয়গিরি ছিল যে পাহাড়, যার অগণিত সুড়ঙ্গ পথে গলিত লাভাস্রোত বয়ে গেছে পৃথিবীর জঠর হতে উৎসারিত হয়ে, সেই পাহাড়ের অজ্ঞাত রন্ধ্রে রন্ধ্রে হানা দিল দ্বীপবাসীরা। কোথায় দ্বীপের অধিদেবতা? দেখা দিন! দেখা দিন!!

বিশাল একটা গহ্বরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সাইরাস হার্ডিং। একটা গুম গুম গুরু গুরু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? এ কিসের শব্দ? কিসের নির্ঘোষ? দূরায়ত কোন সর্বনাশের সংকেত? নিভন্ত আগ্নেয়গিরি কি আবার জাগছে?

স্পিলেট বললেন—'তাহলে তো দেখছি আগ্নেয়গিরি মরেও মরেনি।'

হার্ডিং বললেন—'মরা আগ্নেয়গিরিও বেঁচে ওঠে বইকি।'

'লিঙ্কলন দ্বীপের সর্বনাশ হয়ে যাবে ফের অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে।'

'নাও হতে পারে। লাভার স্রোত পুরোনো পথে বয়ে যাবে। লেকের দিকে আর উপত্যকার দিকে চলে যাবে। গ্র্যানাইট হাউস অক্ষত থাকবে বলেই তো মনে হয়। তবে আমরা একটু প্যাঁচে পড়ব ঠিকই। অগ্ন্যুৎপাত না হলেই মঙ্গল।'

পেনক্রফট সব শুনে বললে—'হুঁঃ, সর্বনাশ হলেই হল আর কি! হোক অগ্ন্যুৎপাত। অধিদেবতা থাকতে কাউকে ডরাই না।'

কিন্তু কোথায় তিনি? কোথায় দ্বীপের অধিদেবতা? বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বত গুহাসুড়ঙ্গ—সবই তো তন্ন তন্ন করে দেখা হল। কিন্তু মহাশক্তিধর অলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর সেই তিনি তো কোথাও নেই?

নিশ্চয় তাহলে তিনি দ্বীপের ওপরে থাকেন না—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মনমরা হয়ে গ্র্যানাইট ফিরে এলেন দ্বীপবাসীরা পঁচিশে ফেব্রুয়ারী।

১৪

দেশে যাওয়ার জন্যে এখন আর দ্বীপবাসীদের সেরকম ভাবে মন কেমন করে না। দ্বীপবাসের তিনটি বছর পূর্ণ হওয়ার পর সবারই মন বসে গিয়েছিল

লিঙ্কলন দ্বীপে। এ দ্বীপেই আমৃত্যু থাকার ইচ্ছে সবার। মাঝে দিন কয়েকের জন্যে স্বদেশ ঘুরে এলে মন্দ হয় না।

তাই একটা জাহাজ বানানোর প্ল্যান করা হল। আড়াইশ থেকে তিনশ টনের মত জাহাজ। বানাতে সময় ল্যাগবে সাত আট মাস। হার্ডিং নক্সা তৈরীতে মন দিলেন। পেনক্রফট গাছ কেটে জাহাজের মেরুদণ্ড, পাঁজরা, পাটাতন ইত্যাদি বানিয়ে জড়ো করতে লাগল চিমনীর কাছে ডকইয়ার্ডে (জাহাজ তৈরী করার জায়গা)। কাঁচা কাঠে জাহাজ তৈরী সম্ভব নয় বলে কাঠ কেটে কিছু দিন খোলা হাওয়ায় ফেলে রাখার পর তক্তা তৈরী হল তাই দিয়ে। হার্ডিং আরও প্ল্যান করলেন, খোঁয়াড়কে কেল্লার মত সুরক্ষিত করবেন।

পাজী বোম্বেটেগুলো খেত-খামার, পাখীর বাড়ী, উইণ্ড মিলের যা কিছু ক্ষতি করেছিল, সব মেরামত করে দেওয়া হল আস্তে আস্তে। টেলিগ্রাফ তার নতুন করে পাতা হল। সমস্ত কাজের সহযোগিতা করল আয়ারটন।

১৫ই মে জাহাজের খোল তৈরী সম্পূর্ণ। শীতের প্রাদুর্ভাবে বন্ধ রইল কাজকর্ম।

শীত এল। শীত গেল। বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা ঘটল নতুন দুর্ভাবনার।

সেদিন ছিল সাতই সেপ্টেম্বর। সাইরাস হার্ডিং দেখলেন—ভলকে ভলকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের শিখর দিয়ে !!

১৩

ধোঁয়া !

মরা আগ্নেয়গিরির মাথায় ধোঁয়া ! ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় তাহলে ফের জাগছে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে লিঙ্কলন দ্বীপ কি আর আস্ত থাকবে ?

দারুণ কিছু নাও ঘটতে পারে। পুরোনো পথে লাভার স্রোত বেরিয়ে যেতে পারে। যদি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে নতুন পথ খুলে যায়, তাহলে অবশ্য খোঁয়াড়ের দফারফা হয়ে যাবে।

ধোঁয়া কিন্তু কমল না। ক্রমশঃ বেড়েই চলল।

দ্বিগুণ উৎসাহে জাহাজের কাজ নিয়ে মাতল সবাই।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হল জাহাজের কাঠামো। স্পিডি জাহাজ থেকে পেতলের পেরেক আর লোহার পাতগুলো খুলে এনে আয়ারটন আর পেনক্রফট নতুন জাহাজে লাগিয়েছে। পাল তোলা জাহাজের চেহারাটা এখন বোঝা যাচ্ছে বেশ। কিন্তু তক্তা লাগাতে সময় লাগবে অনেক।

পনেরোই অক্টোবর রাত্রে একটা নতুন ঘটনা ঘটল।

খেয়ে-দেয়ে গুলতানি করছেন সকলে, এমন সময়ে ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিগ্রাফের ইলেকট্রিক বেল।

ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি? এ সময়ে তো খোঁয়াড়ে কেউ নেই? কলিং বেল তাহলে বাজাল কে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন দ্বীপবাসীরা। এতো ভারী গোলমেলে ব্যাপার?

হার্ডিং বললেন—'ঘণ্টা যেই বাজাক না কেন, সে আবার বাজাবে।'

নেব শুধোলো—'কে বাজাচ্ছে বলে মনে হয় আপনার?'

'সেই তিনি ছাড়া কে আর বাজাবেন' বলল পেনক্রফট।

কথাটা ফুরোতে না ফুরোতেই ফের ক্রিং-ক্রিং করে বাজল ঘণ্টা।

হার্ডিং যন্ত্রের কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'কি চান?'

জবাব এল—'এখুনি খোঁয়াড়ে চলে এস।'

উত্তেজিত হয়ে বললেন হার্ডিং—'যাক, অ্যাদ্দিনে তবে পরিষ্কার হতে চলল কুহক দ্বীপের যত কিছু রহস্য।'

বাস্তবিকই, লিঙ্কলন দ্বীপের মাটি স্পর্শ করার মুহূর্ত থেকে একটির পর একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রহেলিকার পর প্রহেলিকায় অত্যন্ত জটিল ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। আজ সব কিছুর মীমাংসা হতে চলেছে। ঘুম-টুম উড়ে গেল চোখ থেকে। শুধু জাপ আর টপকে গ্রানাইট হাউসে রেখে বাকী সকলে নেমে এল সমুদ্রতীরে।

অন্ধকার রাত। তার ওপর মেঘের সমারোহ। তারার আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ঘুটঘুটে আঁধারে নীরবে দ্রুতপদে এগিয়ে চললেন দ্বীপবাসীরা। আবেগ উত্তেজনায় প্রত্যেকেই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। দ্বীপের অধিদেবতা ডেকে পাঠিয়েছেন! যাঁকে খুঁজে হয়রান হয়েছেন সবাই, তিনি স্বেচ্ছায় ডাক দিয়েছেন দ্বীপবাসীদের।

বিদ্যুৎ চমক শুরু হল। সেই সঙ্গে মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি। বাজ পড়ছে এদিকে-ওদিকে। ঝড় এল বলে।

খোঁয়াড়ের দরজায় পৌঁছোতে না পৌঁছতে এল ঝড়।

ভেতরে ঢুকলেন সকলে। কিন্তু কই? কেউ তো নেই ভেতরে! অন্ধকার।

লণ্ঠন জ্বালালো নেব। ঘরের মধ্যে কাউকে দেখা গেল না।

একি রসিকতা! টেলিগ্রামে স্পষ্ট তলব এসেছিল—'এখুনি খোঁয়াড়ে চলে এস।'

হঠাৎ হার্বার্ট দেখল, একটা চিঠি রয়েছে টেবিলের ওপর। হার্ডিং চিঠি পড়লেন। ইংরেজীতে লেখা—'নতুন তার ধরে এসো।'

হার্ডিং মুহূর্ত মধ্যে বুঝতে পারলেন কি হয়েছে। দ্বীপের অধিদেবতা খোঁয়াড় থেকে তারবার্তা পাঠান নি। পুরানো তারের সঙ্গে নতুন তার লাগিয়ে নিয়েছেন। তারপর নিজের ডেরায় বসে সেখান থেকে খবর পাঠিয়েছেন।

বাইরে এলেন দ্বীপবাসীরা। সত্যি সত্যিই দেখা গেল একটা নতুন তার প্রথম খুঁটির ওপরে পুরোনো তারের সঙ্গে লাগানো। সেখান থেকে তারটা মাটির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে দ্বীপের পশ্চিম দিকে।

তার বরাবর এগিয়ে চললেন দ্বীপবাসীরা। তারটা কখনো গাছের নীচু ডালের ওপর দিয়ে, কখনো মাটির ওপর দিয়ে চলেছে। উপত্যকায় এসেও ফুরোলো না তার। পাহাড়ের গা দিয়ে এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। তবে কি রহস্যময় এই অধিদেবতারা গুপ্ত বাসস্থান সমুদ্রের ধারে কোনো পর্বতগুহায়?

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। বাজ পড়ল আগ্নেয়গিরির ওপর—সে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। রাত এগারোটা নাগাদ দ্বীপের পশ্চিম দিকে এলেন দ্বীপবাসীরা। পাঁচশ ফুট নীচে ফেনিল সমুদ্রের বিরাম-বিহীন গজরানি শোনা গেল।

তারের লাইন পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে এখান থেকে। বিপদ সঙ্কুল জায়গা। কাটলের মধ্যে দিয়ে প্রাণটা হাতে নিয়ে নেমে এলেন সবাই সমুদ্র-তীরে। তারপর দেখা গেল, তার মিলিয়ে গেছে সমুদ্রের জলে!

হতভম্ব হয়ে গেলেন সকলে। নিঃসীম নৈরাশ্য আচ্ছন্ন করে ফেলল প্রত্যেকের চেতনা। কি সর্বনাশ! অধিদেবতার অনুসন্ধানে শেষকালে জলে ডুব দিতে হবে?

হার্ডিং বললেন—'ধৈর্য ধরো। ভাঁটা শুরু হতে দাও। নিশ্চয় গোপন গুহার মুখ জলের ওপর ভেসে উঠবে।'

সত্যিই তাই হল। বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় দ্বীপবাসীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা পর্বত গহ্বরে। বাজ পড়ার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে মাথার মধ্যে যেন গোল লেগে যাচ্ছে—প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি অনুচররা বুঝি তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।

গভীর রাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে সমুদ্র তীরে নামলেন হার্ডিং। দেখলেন জলের নীচে মস্ত একটা সুড়ঙ্গ একটু একটু করে জেগে উঠছে। তারটা খাড়াইভাবে নেমে গিয়ে সেই গহ্বরের মধ্যেই ঢুকেছে।

একঘণ্টা পর দ্বীপবাসীরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নেমে এলেন সমুদ্রতীরে।

প্রায় আট ফুট উঁচু একটা সুড়ঙ্গ মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। থিলেনের মত গুহার মুখের তলা দিয়ে সগর্জনে ছুটছে সমুদ্রের জল।

একটা কালো মত কি যেন ভাসছিল গুহার ঠিক মুখে। হার্ডিং হেঁট হয়ে টেনে আনলেন। একটা নৌকো। লোহার পাত দিয়ে মোড়া। দুটি দাঁড। পাথরের সঙ্গে বেশ করে বাঁধা রয়েছে।

আর কথাটি না বলে নৌকোয় চড়ে বসলেন সবাই। নেব, আয়ারটন আর পেনক্রফট—এই তিনজনে নৌকো চালিয়ে নিয়ে চলল গুহার ভেতরে। নৌকোর মুখে লণ্ঠন তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন হার্ডিং পথ দেখানোর জন্যে।

সুড়ঙ্গের ছাদ ঠিক ধনুকের মত বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। সে কী বিশাল গহ্বর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় যেটুকু দেখা গেল, তাতেই মাথা ঘুরে গেল দ্বীপবাসীদের। লিঙ্কলন দ্বীপের তলায় এতবড় একটা গহ্বর রয়েছে! কদ্দুরে গেছে গহ্বরটা? দ্বীপের মাঝ পর্যন্ত কী?

বাইরে বজ্রপাত—ভেতরে শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ। নৌকো চলেছে ছল-ছলাৎ শব্দে। পাহাড়ের গা বরাবর তারের লাইন-ও চলেছে সামনে।

গহ্বরের মুখ থেকে আধ মাইল ভেতরে আসার পর নৌকো থামালেন হার্ডিং।

একটা ভীষণ জোরালো আলো দেখা গেল সামনে। অতবড় গহ্বরটা আলোয় আলো হয়ে গিয়েছে অত্যুজ্জ্বল সেই আলোকচ্ছটায়। বড় বড় কালচে থামের বেঁকানো ছাদটা জল থেকে প্রায় শখানেক ফুট উঁচু। সুবিশাল গহ্বরের কোথাও অন্ধকারের লেশ মাত্র নেই প্রখর আলোর দৌলতে। আলোটা এত জোরালো এবং এত সাদা যে বিদ্যুৎবাতি বলেই মনে হল!

আরো কাছে গেল নৌকো। আলোর পর পাথুরে দেওয়াল—গহ্বরের শেষ। কিন্তু এই শেষ প্রান্তেই গহ্বর এত চওড়া হয়ে গিয়েছে যে দেখলেই মনে হয় যেন একটা পাতাল লেকে প্রবেশ করেছেন দ্বীপবাসীরা।

বিশাল এই হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বস্তু ভাসছে। তিমি মাছের মত প্রকাণ্ড, চুরুটের মত গড়ন। দুপাশ ছুঁচোলো। গায়ে যেন দু'দুটো চোখ জ্বলছে। চোখ ধাঁধানো ইলেকট্রিক আলো ঠিকরে আসছে সেখান দিয়ে। প্রায় আড়াইশ ফুট লম্বা আর দশ বারো ফুট উঁচু অদ্ভুত বস্তুটা কিন্তু নড়ছে না, হেলছে না, দুলছে না; নিথর, নিস্পন্দ এবং বিলকুল নিস্তব্ধ!

স্তম্ভিত দ্বীপবাসীদের নিয়ে নৌকো আরো কাছে গেল। উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারছিলেন না হার্ডিং। খপ করে স্পিলেটের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন—'ইনিই সেই মানুষ।...হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনিই...তিনি ছাড়া আর

কেউ নন! হলফ করে বলতে পারি—ইনিই তিনি!' বলে ধপ করে নৌকোয় বসে পড়লেন হার্ডিং। ফিস ফিস করে একটা নাম বললেন স্পিলেটের কানে।

শুনেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন স্পিলেট। এ-নাম যে তিনিও জানেন। দারুণ উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেল তাঁর। বললেন ছাড়া-ছাড়া স্বরে —'তিনি! কিন্তু…তিনি যে মস্ত ক্রিমিন্যাল—বিরাট অপরাধী!! পলাতক আসামী!!!'

ছোট্ট করে বললেন হার্ডিং—'ইনিই তিনি!'

নৌকো গিয়ে ভিড়ল ভাসমান অতিকায় বস্তুটার গায়ে। বাঁ দিকের কাঁচ ঢাকা ফোকর দিয়ে সে কী আলোকচ্ছটা! চোখ ধাঁধিয়ে যায় সে দিকে তাকালে।

দলবল নিয়ে ওপরে উঠলেন হার্ডিং। হ্যাচ তুলে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন নীচে। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা চত্বর—জাহাজের ডেকের মত। ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করছে জায়গাটা। ডেকের অন্য প্রান্তে দরজা খুললেন হার্ডিং। সুসজ্জিত একটা ঘর। সে ঘরের পর লাইব্রেরী ঘর। ছাদ থেকে প্রখর বিদ্যুৎ বাতি উদ্ভাসিত করে রেখেছে ঘরের সব কিছু।

লাইব্রেরী ঘরের অন্য প্রান্তের দরজা খুলে একটা বিশাল হল ঘরে ঢুকলেন হার্ডিং। বড় জাহাজের সেলুনের মতই দামী দামী জিনিসপত্র এবং ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ঘর। ঘর তো নয়—যেন একটা সংগ্রহশালা! দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্রে ঠাসা।

এই ঘরে একটা অত্যন্ত দামী আরাম কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় এক ব্যক্তির দিকে সটান এগিয়ে গেলেন সাইরাস হার্ডিং।

বললেন—'ক্যাপ্টেন নিমো, আমাদের তলব করেছিলেন। আমরা এসেছি।'

১৬

ভদ্রলোক এতক্ষণ দেখেন নি দ্বীপবাসীদের। হার্ডিংয়ের কথা কানে যেতেই উঠে বসলেন। ঝকমকে ইলেকট্রিক আলোয় দেখা গেল ঋষিতুল্য এক মূর্তি। উজ্জ্বল মুখশ্রী; উন্নত ললাট, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চোখের চাহনি—যেন হুকুম করতেই তিনি জন্মেছেন, শ্বেতশুভ্র চুল লুটোচ্ছে কাঁধের ওপর, সাদা দাড়ি এলিয়ে আছে বুকের ওপর।

চেহারা সৌম্য গম্ভীর হলে কি হবে, জরায় কাহিল হয়ে পড়েছেন ঋষিমূর্তি।

দেখলেই বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও বেশ তেজালো অথচ প্রশান্ত কণ্ঠে ইংরেজীতে জবাব দিলেন ভদ্রলোক—'আমার কোনো নাম নেই।'

'না থাক, আপনার সব কথা আমি জানি,' বললেন হার্ডিং।

সূচীতীক্ষ্ণ চাহনি দিয়ে হার্ডিংয়ের মর্মস্থল পর্যন্ত যেন দেখে নিলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

পরক্ষণেই কেদারার বালিশে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন—'জানলেই বা কি, আমি তো মরতে চলেছি!'

স্পিলেট ভদ্রলোকের হাত টেনে নিয়ে দেখলেন, জ্বর হলে যে-রকম হয়, হাত সেই রকম গরম।

হার্ডিং এবং স্পিলেটকে বসতে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

পেনক্রফট আর নেব ভেবেছিল, দ্বীপের অধিদেবতা নিশ্চয় দেবতার মত কেউ হবেন। কিন্তু ইনি তো আর পাঁচটা মানুষের মতই মানুষ! ইনিই মারাত্মক বিপদের হাত থেকে বার বার বাঁচিয়েছেন দ্বীপবাসীদের!

কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্ডিং এঁকে চিনলেন কি করে? নাম শুনেই সটান উঠে বসলেন কেন রহস্যময় এই পুরুষ? এ নাম তো কারও জানা সম্ভব নয়!

একদৃষ্টে হার্ডিয়ের দিকে চেয়ে শুধোলেন ক্যাপ্টেন নিমো—'আপনি আমার আগের নাম জানেন?'

'জানি। আশ্চর্য এই ডুবো-জাহাজের বৃত্তান্তও জানি।

'নোটিলাস?'

'হ্যা, নোটিলাস।'

'তিন বছর একটানা আমি একলা রয়েছি সাগরের তলায়। বহু বছর পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। অজ্ঞাতবাসের খবরটা ফাঁস করল কে?'

'এমন একজন ফাঁস করেছে যার ওপর আপনার কোনো জোর খাটে না। সুতরাং তাকে বিশ্বাসহন্তাও বলতে পারেন না।'

'বুঝেছি। ষোল বছর আগে সেই যে ফরাসী ভদ্রলোকটি হঠাৎ এসে পড়েছিলেন আমার জাহাজে, এত কথা নিশ্চয় তিনিই প্রচার করেছেন?'

'হ্যা। নাম তার প্রফেসর আরোনা।'

'আমি তো ভেবেছিলাম নরওয়ের ঘূর্ণিপাকে পড়ে ভদ্রলোক মারা গেছেন। 'নোটিলাস' নিজে তখন ঘূর্ণিপাক থেকে সরে আসার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।'

'খুব বেঁচে গিয়েছিলেন ওঁরা। দেশে ফিরে 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী' নামে একটা বিখ্যাত বই লেখেন। আপনার ইতিহাস সেই বইতেই আছে।'

'আমার জীবনের মাত্র সাত মাসের ইতিহাস বলুন!'

'তা হোক। কিন্তু সেই সাত মাসের বিস্ময়কর উপাখ্যান আপনাকে স্মরণীয় করে রেখেছে।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন নিমো—'স্মরণীয়! ক্রিমিন্যাল হিসেবে, মানুষের শত্রু হিসেবে, ভয়ানক অপরাধী হিসেবে স্মরণীয়, তাই না?'

আহত কণ্ঠে বললেন হার্ডিং—ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার বিগত দিনের কীর্তিকলাপ বিচার করা আমাকে সাজে না। কেন যে আপনি অমন অদ্ভুত জীবনযাপন করতেন, তা আমি জানি না। জানতেও চাই না। আমি শুধু জানি যে লিঙ্কলন দ্বীপে পা দেওয়ার পর থেকে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু প্রতিমূহূর্তে আমাদের আগলে রেখেছেন, মারাত্মক আপদবিপদ থেকে আমাদের রক্ষে করেছেন। আমরা যে এখনো জীবিত রয়েছি, তা শুধু সেই অসাধারণ ক্ষমতাবান আর কল্যাণময় মহাপুরুষের অসীম কৃপার জন্যেই—এ-কথাও আমি জানি যে আপনিই সেই মহাপুরুষ!'

ক্যাপ্টেন নিমো সামান্য হাসলেন—'তা ঠিক, আমিই সেই মানুষ।'

উঠে দাঁড়ালেন স্পিলেট আর হার্ডিং। গভীর কৃতজ্ঞতায় টইটম্বুর অন্তর প্রত্যেকের। প্রত্যেকেই চাইছে সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটুক মহানুভব এই মানুষটির সামনে।

সকলের মনোভাব বুঝেই হাতের ইঙ্গিতে বসতে নির্দেশ করলেন ক্যাপ্টেন নিমো। বললেন—'আগে আমার সব ইতিহাস শুনুন। তারপর যা কিছু বলবার বলবেন।

এই বলে ক্যাপ্টেন নিমো শোনালেন তাঁর আশ্চর্য ইতিহাস। সংক্ষেপে বললেন যদিও, কিন্তু ঐটুকু বলতেই মনের এবং শরীরের শেষ শক্তিবিন্দুটুকুও ব্যয় করতে হল! হার্ডিং কতবার বললেন একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে।, কিন্তু কোনো অনুরোধ উপরোধে কান না দিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো যা বললেন তা এই :

ক্যাপ্টেন নিমো ভারতবাসী। বুন্দেলখণ্ড রাজ্য তখন স্বাধীন ছিল। সে রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন তিনি। প্রিন্স ডাকার—এই ছিল তাঁর নাম।

দশ বছর বয়েসই রাজা তাঁকে ইউরোপ পাঠালেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। যাতে ফিরে এসে ইউরোপের দেশগুলোর মত উন্নত করে তুলতে পারা যায় অনুন্নত বুন্দেলখণ্ডকে।

অনন্যসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন প্রিন্স ডাকার। দশ থেকে তিরিশ

এই বিশ বছর ধরে তিনি বিজ্ঞান, সাহিত্য আর শিল্প বিস্তায় বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। চর্কীপাক দিলেন সারা ইউরোপ। যেহেতু রাজার ছেলে, বিপুল বিত্তের অধিকারী, অতএব সবদেশেই মাথায় তুলে রাখা হল তাঁকে। প্রিন্স ডাক্কারের কিন্তু সংসারের আমোদ-আহ্লাদ ভোগবিলাসের প্রতি কোনো লালসাই ছিল না। জ্ঞান পিপাসা তাঁকে অস্থির করত নিরন্তর। উত্তরকালে যাতে স্বাধীন আর শক্তিশালী একটা জাতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বিখ্যাত হতে পারেন—এইটেই ছিল তাঁর একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

বুন্দেলখণ্ডে প্রিন্স ডাক্কার ফিরে এলেন ১৮৪৮ সালে। যথাসময়ে বিয়ে হল, দুটি বাচ্চাও হল। কিন্তু সংসারের সুখভোগ তাঁর সইল না। মহত্তর কর্মের আহ্বানে তিনি অস্থির হয়ে রইলেন।

১৮৫৭ সালে শুরু হল সুবিখ্যাত সিপাই বিদ্রোহ। প্রিন্স ডাক্কারও বিদ্রোহী হলেন। তুমুল লড়াই হল। বিশটা যুদ্ধে তিনি দশবার জখম হলেন। কিন্তু ব্যর্থ হল সিপাই বিদ্রোহ। হেরে গেল বিদ্রোহীরা। যুদ্ধে অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের জন্যে প্রিন্স ডাক্কারের তখন এত নামডাক চারদিকে যে ইংরেজ শাসনকর্তা তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ফলে আত্মগোপন করে রইলেন প্রিন্স।

ইংরেজরা ফের দখল করে নিল স্বাধীন রাজ্যগুলো। প্রিন্স ডাক্কার পালিয়ে গেলেন বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়-পর্বতে। এতদিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইভাবে এক ফুৎকারে শেষ হয়ে যাওয়ার মন তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। সভ্য জাত, তথা সমস্ত মানুষ জাতটার ওপর বিষিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনের ভেতর পর্যন্ত। তাই একদিন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ধনসম্পদ যা ছিল সব নিয়ে কুড়িজন একান্ত অনুরক্ত সাগরেদকে সঙ্গী করে ভোজবাজির মতই যেন একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঘৃণা-নিষ্ঠুর হতোদ্যম প্রিন্স ডাক্কার। কেউ জানতেও পারল না কোথায় উবে গেলেন প্রিন্স।

কিন্তু সত্যিই তিনি গেলেন কোথায়? স্বাধীন শক্তিশালী উন্নত দেশ গঠনের স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেছে—এখন তিনি কোথায়?

সাগরের তলায়। যেখানে সাদা মানুষ নামক ঘৃণিত জাতটা তাঁর পিছু নিতে পারবে না—সেইখানে।

অসম সাহসিক সৈনিক এবার হলেন কুশলী বৈজ্ঞানিক। প্রশান্ত মহাসাগরে একটা নির্জন দ্বীপে হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাঁকে সদলবলে। তৈরী হল জাহাজ তৈরীর ডক। নিজের অভিনব নক্সা অনুযায়ী বানালেন ডুবোজাহাজ। আবিষ্কার করলেন সমুদ্রের অফুরন্ত জলের শক্তি থেকে

বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টির পন্থা। সেই শক্তি দিয়ে জাহাজ চালানো থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক বাতি, এমন কি ডুবোজাহাজের ভেতরকার বাতাস গরম রাখা ইত্যাদি হরেক রকম অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। ডুবোজাহাজ আবিষ্কার করে তিনি তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য নিদর্শন রাখলেন পৃথিবীর ইতিহাসে।

সমুদ্রে রত্নের অভাব নেই, খাবার-দাবারের অভাব নেই। সুতরাং কিছুরই অভাব রইল না প্রিন্স ডাক্তারের। সাত সাগরের জলে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন প্রিন্স তাঁর আশ্চর্য ডুবোযানে। জাহাজের নাম দিলেন 'নোটিলাস'। নিজে নতুন নাম নিলেন—ক্যাপ্টেন নিমো।

বছরের পর বছর পৃথিবীর এ-প্রান্ত, থেকে সে-প্রান্তে, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে ঘুরে বেড়াতেন ক্যাপ্টেন। কত জাহাজ কত ধনরত্ন নিয়ে ডুবে গেছে সমুদ্রে। সে-সব আহরণ করতেন। ১৭০২ সালে কোটি কোটি মোহর-সমেত একটা স্প্যানিশ জাহাজ ভিগো উপসাগরে তলিয়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন নিমো সমুদ্রগর্ভ থেকে সেই মোহর তুলে এনে বিলিয়ে দিতেন সেইসব দুর্ভাগা দেশের লোকদের মধ্যে যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সাহায্য করতেন বটে, কিন্তু নিজের নামটি গোপন রাখতেন।

অনেক বছর এইভাবে ডাঙার মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে সমুদ্রবাসের পর আচমকা ১৮৬৬ সালের ৬ই নভেম্বর নোটিলাসে এসে আশ্রয় নিল তিন ব্যক্তি। এদের একজন ফরাসী—প্রফেসর আরোনা। অপর দুজন তাঁর চাকর আর একজন জেলে। আমেরিকার একটা জাহাজ নোটিলাসকে ধাওয়া করেছিল সমুদ্র রাক্ষস ভেবে। নোটিলাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তলিয়ে যায় মার্কিন জাহাজ—এই তিন ব্যক্তি দৈবাৎ ঠাঁই পায় নোটিলাসের মধ্যে। প্রফেসর আরোনার কাছেই ক্যাপ্টেন নিমো শোনেন যে পৃথিবীর দেশগুলো ধরে নিয়েছে নোটিলাস আসলে একটা বোম্বেটেদের ডুবোজাহাজ। সুতরাং পৃথিবী জুড়ে তোড়জোড় চলছে নোটিলাসকে ধ্বংস করার।

যাইহোক, তিন আশ্রিতকে সমুদ্রে বিসর্জন না দিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসের ভেতরে কয়েদীর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন এই সর্তে যে পৃথিবীর মুখ তাদের কেউই আর দেখতে পাবে না। কিন্তু সাত মাস পরে ১৮৬৭ সালের ২২শে জুন তিনজনে পালিয়ে যায় নোটিলাসেরই একটা নৌকো নিয়ে। সে সময়ে নরওয়ের কুখ্যাত ঘূর্ণিপাক মেলস্ট্রমে গিয়ে পড়েছিল নোটিলাস। ঝনাঝন শব্দে পাক খাচ্ছিল অতবড় ডুবোজাহাজ। নৌকোটা ছিটকে

গিয়েছিল ঘোরার বেগে—ক্যাপ্টেন নিমো জানতেন তিনজনেই ডুবে মরেছে সাগরের জলে।

কিন্তু তারা মরেনি। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছিল। দেশে ফিরে গিয়ে প্রফেসর তার সাত মাসের রোমাঞ্চকর সমুদ্রবাসের অভিজ্ঞতাসহ ক্যাপ্টেন নিমোর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। বইটার নাম 'টোয়েন্টি থাউজাণ্ড লীগস আনডার দি সী'।

এই ঘটনার পর বহু বছরে সাগরে সাগরে টহল দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো। একে একে মারা গেল তাঁর বিশজন একান্ত বিশ্বাসী অনুচর। বেঁচে রইলেন কেবল ক্যাপ্টেন নিমো।

তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। একলাই নোটিলাসকে চালিয়ে নিয়ে এসে এলেন লিঙ্কলন দ্বীপের তলায় এই বিশাল গহ্বরে। এ রকম গোপন ঘাঁটি তার আরও ছিল। দরকার হলেই তিনি সেসব জায়গায় গিয়ে নোটিলাসকে মেরামত করতেন, নিজেও জিরিয়ে নিতেন।

কিন্তু বিপদ হল লিঙ্কলন দ্বীপে আসার পর। এখানে তিনি রয়েছেন গত ছ'বছর। বেরিয়ে যাবার পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে আগ্নেয়গিরির ভেতরকার উৎপাতে। ছোটখাট জাহাজের পক্ষে গহ্বরের মুখ যথেষ্ট বড় হলেও, নোটিলাসের পক্ষে নয়।

ফলে এই অঞ্চলেই তিনি দিন গুণছেন মৃত্যুর। জলে জলে টো-টো করা সাঙ্গ হয়েছে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন তিনি দেখলেন কয়েকজন লোককে নিয়ে একটা বেলুন ঘুরতে ঘুরতে পড়ছে লিঙ্কলন দ্বীপের দিকে! উনি তখন ডুবুরীর পোশাক পরে জলের নীচে বেড়াচ্ছিলেন। হার্ডিং জলে ছিটকে যেতে দয়াপরবশ হয়ে উনি তাঁকে জল থেকে তুলে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় রেখে আসেন।

তখন থেকেই তাঁর চিন্তা হল কি করে এই পাঁচ দ্বীপবাসীর কাছ থেকে পালানো যায়। কি সে পথ তো বন্ধ! নোটিলাস আর কোনোদিন লিঙ্কলন দ্বীপের গোপন ঘাঁটি ছেড়ে বেরোতে পারবে না।

বাধ্য হয়ে তিনি আড়াল থেকে নজর রাখলেন পাঁচজনের ওপর। দেখলেন লোকগুলি খাটিয়ে, সৎ এবং পরস্পরকে খুব ভালবাসেন। ক্যাপ্টেন নিমো ডুবুরীর পোশাক পরে গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর তলায় যেতেন। কুয়োর দেওয়াল বেয়ে কিছুটা উঠে শুনতেন তাঁদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা। দ্বীপবাসীরা যে দাসপ্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষ নিয়ে লড়ে এসেছেন, তাও শুনলেন। এ-ধরনের লোকরাই তো ক্যাপ্টেন নিমোর সমর্থন ও

সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। এই আদর্শ নিয়েই তো তিনি লড়েছেন, স্ত্রী-পুত্র-রাজত্ব হারিয়েছেন!

ইনি শুধু হার্ডিংকে বাঁচাননি, টপ-কে চিমনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, লেকের জল থেকে টপ-কে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ডুগংকে মেরেছিলেন, দরকারী জিনিসপত্র বোঝাই সিন্দুক সমুদ্রতীরে রেখে এসেছিলেন, গভীর রাতে বাঁধন কেটে ক্যানোটাকে মার্সি নদী দিয়ে দ্বীপবাসীদের সামনে এনে দিয়েছিলেন, ওরাংওটাংরা গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করলে ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে দিয়েছিলেন, আয়ারটনের খবর লিখে সমুদ্রের জলে বোতল ভাসিয়েছিলেন, প্রসপেক্ট হাইটে আগুন জ্বেলে পেনক্রফটকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, খাড়ির মুখে টর্পেডো ছেড়ে বোম্বেটে জাহাজ উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কুইনাইন সরবরাহ করে হার্বার্টকে নবজীবন দিয়েছিলেন, ইলেকট্রিক গুলি দিয়ে বোম্বেটে পাঁচটাকে মেরেছিলেন।

কিন্তু হার্ডিং যে তাঁর সম্বন্ধে এত খবর রাখেন, তা জানতেন না। জানলে টেলিগ্রাফের তার পেতে দ্বীপবাসীদের তিনি এখানে ডেকে আনতেন না। ডেকেছেন অবশ্য আরো কিছু উপকার আর উপদেশের জন্যে।

ইতিহাস শেষ হল। হার্ডিং সকলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন ক্যাপ্টেন নিমোকে।

কিন্তু সে সব কথায় কান না দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—'আমার ইতিহাস শোনার পর বলুন দিকি আমার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? বলুন, কি রায় আপনাদের।'

হার্ডিং বুঝলেন বিশেষ একটি জাহাজডুবি সম্পর্কে মতামত জানতে চাইছেন ক্যাপ্টেন নিমো। 'টোয়েন্টি থাউজাণ্ড লীগস আনডার দি সী' গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। অসহায় বাচ্চাকাচ্চা সমেত মায়েদের পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল নোটিলাস। সভ্যজগতে এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড পড়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন নিমো এমন অস্থির হয়েছিলেন যে নোটিলাস দিশেহারা ভাবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে মেলস্ট্রমে পড়েছিল।

হার্ডিং এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

ক্যাপ্টেন নিমো তখন বললেন—'মনে রাখবেন, জাহাজটা ছিল শত্রুপক্ষের! আমি ওদের ধাওয়া করিনি। ওরাই আমাকে তেড়ে এসেছিল। আমার তখন পালাবার পথ ছিল না। একটা সংকীর্ণ অল্প গভীর উপসাগরে আটকে গিয়েছিলাম। আমার বেরিয়ে যাওয়ার পথ রোধ করে তেড়ে এসেছিল বলেই

আত্মরক্ষার জন্যে জাহাজটাকে ডোবাতে হয়েছিল আমাকে। এখন বলুন, কাজটা অন্যায় করেছিলাম কি ?'

হার্ডিং বললেন—'আপনার কাজের সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই, ক্যাপ্টেন নিমো। মানুষ তো কিছু করছে না, করাচ্ছেন তিনি—সেই ওপরওয়ালা। আমরা শুধু যন্ত্র, যন্ত্রী তিনি। তিনি করাচ্ছেন বলেই আমরা করছি। মানুষের কাজের বিচারের ভারটাও তাই তাঁর। ক্যাপ্টেন, আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে। আপনার মত পরোপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারালে আমাদের দুঃখের সীমাপরিসীমা থাকবে না !'

হার্বার্ট নতজানু হয়ে বসল ক্যাপ্টেন নিমোর পাশে। চুমু খেল তাঁর হাতে।

চোখে জল এসে গেল নিমোর। আশীর্বাদ করলেন হার্বার্টকে মাথায় হাত রেখে। বললেন—'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন !'

১৭

ভোর হল। কিন্তু গহ্বরে ভোরের আলো ঢুকল না। নোটিলাসের তীব্র বিদ্যুৎবাতির দৌলতে অবশ্য অন্ধকারের লেশ মাত্র রইল না গহ্বরের মধ্যে। ঝলমলে সেলুন কক্ষের মহার্ঘ জিনিসপত্র দেখে বিস্মিত হল সকলে। সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা দামীদামী তৈলচিত্র ঝুলছে ঘরময়, রয়েছে মার্বেল আর ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু। জলাধারে ঝলমল করছে সংগ্র সামুদ্রিক সম্পদ, মুক্তোর গির্জে। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখালেন ক্যাপ্টেন নিমো। সবশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নোটিলাসের যা আদর্শ, সেই মহান বাণীর দিকে। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিউজিয়ামের মাথায় 'Mobilis is mobile'

তারপর আর পারলেন না। উত্তেজনার ফলে ঝিমিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন আরাম কেদারায়। স্পিলেট নাড়ি পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে জীবনী শক্তি। না, ক্যাপ্টেন নিমোকে আর বাঁচানো যাবে না।

পেনক্রফট বলল—ওঁকে বাইরের রোদ-হাওয়ায় নিয়ে গেলে ভাল হত কিন্তু।'

হার্ডিং বললেন—'নোটিলাস ছেড়ে উনি কোথাও যাবেন কি ?'

কথাটা যেন শুনতে পেয়েই ঘোর কাটিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন নিমো। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—'হ্যাঁ, আমি এই নোটিলাসেই মরতে চাই। আপনাদের একটা কথা দিতে হবে। আমার একটা ইচ্ছে রাখতে হবে। তাহলেই জানবেন কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হবে।'

হার্ডিংয়ের সাথে গলা মিলিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন সকলে।

'কাল আমার মৃত্যু হবে'—বললেন ক্যাপ্টেন নিমো। হার্বার্ট আর একটু হলে কেঁদে উঠত, হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

বললেন—'আগামীকাল আমি মারা যাব। এই নোটিলাস হবে আমার কফিন। সমুদ্রের জলে শেষ আশ্রয় নেব আমি আমার সব সঙ্গীর মতই।

'নোটিলাস যেখানে ভাসছে, সেখানে জল খুব গভীর। নোটিলাস এই জলে চিরকালের মত ডুবে থাকবে—কবর দেবে আমার প্রাণহীণ দেহকে।

'আগামীকাল আমার মৃত্যুর পর আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন। প্রিন্স ডাক্কারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক বাক্স হীরে আপনাদের দেব। এই রইল সেই বাক্স। আমি যখন স্বামী ছিলাম, পিতা ছিলাম—এ হীরে তখনকার সঞ্চয়। আর আছে সাত সাগর ছেঁচা মোতির সঞ্চয়। আপনারা সৎ-মানুষ, সৎকাজেই নিশ্চয় খরচ করবেন এই সম্পদ। প্রিন্স ডাক্কারের আর যা কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র নোটিলাসের মধ্যে দেখছেন, সব কিছু নিয়েই নোটিলাস ডুব দেবে চিরকালের মত। মৃত্যুর পরেও জানবেন আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। আপনাদের সব কাজে যোগ দেব।

'কাল আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার পর আপনারা হীরের বাক্সটা নিয়ে বাইরে গিয়ে এ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন। তারপর নোটিলাসের ওপরে উঠে ভেতরে নামবার 'হ্যাচ'টি বেশ করে এঁটে দেবেন যাতে এক ফোঁটা জলও না ঢোকে।

'এরপর নৌকোয় উঠবেন। নোটিলাসের সামনের দিকে দেখবেন দুটো ছেঁদা আছে। ছেঁদায় লাগানো স্টপ কক দুটি খুলে দেবেন। তাহলেই সমুদ্রের জল নোটিলাসের নীচের জলাধার গিয়ে জমবে। আস্তে আস্তে ভারী হয়ে জলে ডুবে যাবে আমার নোটিলাস।'

'কথা দিন, আমি যা বললাম, তা করবেন ?'

হার্ডিং বললেন—'কথা দিচ্ছি।'

'তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে একলা থাকতে দিন।'

সদলবলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হার্ডিং। ঘুরে ঘুরে দেখলেন ডুবো-জাহাজের বিভিন্ন ঘর। ইলেকট্রিক শক্তি চালিত জটিল যন্ত্রপাতি দেখে মাথা ঘুরে গেল হার্ডিংয়ের। স্তম্ভিত হলেন কারিগরি বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখে। অতি উন্নত প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে সর্বত্র।

নোটিলাসের ওপরকার প্ল্যাটফর্মে উঠতে দেখা গেল কাঁচের লেন্সের মত ঢাকনার মধ্যে একটা মস্ত ফুটো। অনেকটা চোখের মত দেখতে। প্রখর

বিদ্যুৎরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেখান থেকে দানবিক চক্ষুর মত। ভেতরে রয়েছে হালের চাকা। এই ঘর থেকেই নোটিলাস চালাতেন নিমো—জোরালো আলোয় দেখতেন সমুদ্রতলের বহুদূর পর্যন্ত।

খাবার ঘরে গিয়ে খেতে বসলেন দ্বীপবাসীরা।

আয়ারটন তখন বললে—'নোটিলাস চেপে আমরা কিন্তু এ দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম।'

পেনক্রফট বললে—'মাথা খারাপ? জলের তলায় জাহাজ চালাতে আমি অন্ততঃ পারব না।'

হার্ডিং বললেন—'কেন বাজে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছ? নোটিলাস আমাদের সম্পত্তি নয়। একে দখল করাও আমাদের সাজে না। তাছাড়া, সুড়ঙ্গের সরু মুখ দিয়ে একে বার করাও আর সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন নিমোর ইচ্ছা মানে আমাদের কাছে তা অমোঘ আইন। তাঁর শেষ ইচ্ছাকে সম্মান দেবো নোটিলাস শুদ্ধ তাঁকে সমাহিত করে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই গেলেন সেলুন-কক্ষে।

বিশ্রামের ফলে ক্যাপ্টেনের চোখের জ্যোতি ফিরে এসেছিল। ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন—'আপনারা এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে চান?'

পেনক্রফট ঝাঁ করে বলে উঠল—'গিয়ে আবার ফিরে আসব।' ফের হাসলেন নিমো—'তা তো আসবেই। এ দ্বীপকে যে বড্ড ভালবাসো তোমরা।'

হার্ডিং বললেন—'আমাদের ইচ্ছে, লিঙ্কলন দ্বীপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দেব, প্রশান্ত মহাসাগরে একটি ঘাঁটি বানাবো।'

'স্বদেশকে বড্ড ভালবাসেন আপনারা' বললেন ক্যাপ্টেন নিমো। একটু থেমে ফের বললেন—'মিস্টার হার্ডিং, শুধু আপনার সঙ্গে গোপনে কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে চাই।'

হার্ডিংকে রেখে আর সবাই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে হার্ডিং ডেকে পাঠালেন তাঁদের। কিন্তু নিমোর সঙ্গে গোপন কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গ ভাঙলেন না।

সারাদিন গেল। নোটিলাসের মধ্যেই রয়ে গেলেন দ্বীপবাসীরা। আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেন নিমোর প্রাণ প্রদীপ নিভে আসতে লাগল। কিন্তু চোখে-মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করলেন না। অবশেষে এল মৃত্যুর মুহূর্ত। মাঝে মাঝে বিড় বিড় স্বরে টুকরো টুকরো কথা বললেন—সারা জীবনের স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ ছিল সেই সব কথার মধ্যে।

রাত বারোটার একটু পরেই হঠাৎ প্রবল চেষ্টায় দুহাত বুকের ওপর জড়ো করলেন ক্যাপ্টেন নিমো। মৃত্যুর জন্যে যেন তৈরী হলেন। হাত-পা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। প্রাণবায়ু কণ্ঠে এসে ঠেকেছে। মহান আত্মা তৈরী হয়ে হয়েছে মহত্তর লোকে যাওয়ার জন্যে। দেহ তাই নির্জীব।

রাত একটার সময়ে ফের প্রাণের স্ফুরণ দেখা দিল তাঁর চাহনিতে। মৃত্যু-কালীন রোশনাই সমুজ্জ্বল করল হীরক উজ্জ্বল দুই চক্ষু। বিড় বিড় করে শুধু বললেন—'ঈশ্বর—স্বদেশ!'

মারা গেলেন ক্যাপ্টেন নিমো। পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন যেন। প্রাণহীন ক্যাপ্টেন নিমোর ওরফে প্রিন্স ডাক্কারের চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দিলেন হার্ডিং। মাথা ছুঁয়ে প্রার্থনা জানালেন 'হে ঈশ্বর! মঙ্গল করো এই মহাপুরুষের মুক্ত আত্মার।'

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল হার্বার্ট আর পেনক্রফট। জল গড়িয়ে পড়ল আয়ারটনের গাল বেয়ে। পাথরের মূর্তির মতন নতজানু হয়ে বসে রইল নেব।

হীরের বাক্স নিয়ে নোটিলাস ছেড়ে নেমে এলেন দ্বীপবাসীরা। ক্যাপ্টেন নিমোর সব কটি ইচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করা হল। বন্ধ করে দেওয়া হল তাঁর ঘরের দরজা। নোটিলাসের ভেতরে বাইরে যাতায়াতের লোহার ঢাকনিটাও একেবারে এঁটে দেওয়া হল। নৌকোয় চেপে নোটিলাসের সামনে যেতে দেখা গেল বড় সাইজের দুটো ছেঁদা। স্টপকক ঘুরিয়ে ফুটোর মুখ খুলে দিতেই হু-হু করে জল ঢুকতে লাগল নোটিলাসের চৌবাচ্চায়। দেখতে দেখতে লেকের জলে ডুবে গেল আশ্চর্য ডুবোযান—সমাধিস্থ হল প্রিন্স ডাক্কারের সাবমেরিন কফিন।

১৮

ভোর হল।

গহ্বরের মুখে ফিরে এলেন দ্বীপবাসীরা। নৌকাটি তুলে রাখা হল গহ্বরের পাশে একটি পাথরের তাকে।

গুপ্ত গহ্বরের নামকরণ করা হল—ডাক্কার গহ্বর।

আবেগে অভিভূত হয়ে নীরবে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন। তখন সকাল ন'টা।

এরপর থেকেই বড় নৌকো তৈরীর কাজ নিয়ে মাতলেন সাইরাস হার্ডিং। সেই সঙ্গে অন্য সকলে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নৌকোটিকে বানিয়ে নেওয়ার

জন্যে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করে চললেন সকলে। ট্যাবর দ্বীপে খবর রেখে আসতে হবে—নইলে ডানকান জাহাজ এসে ফিরে যাবে যে!

আড়াই মাস হাড়ভাঙা খাটুনির পর আয়ো এগিয়ে গেল নৌকোর পাঁজর। এবার আরম্ভ হল তক্তা বসানোর কাজ।

১৮৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের পয়লা তারিখে আচম্বিতে প্রকৃতি যেন ক্ষেপে গেলেন লিঙ্কলন দ্বীপের ওপর। যেমন ঝড়, তেমনি বাজপড়া! বিরাম বিহীন ভাবে বজ্রপাতের ফলে কত গাছ যে পুড়ে গেল, তার ইয়ত্তা নেই। সাইরাস হার্ডিং লক্ষ্য করলেন, আকাশের এই উন্মত্ততার সঙ্গে পাতালের যেন একটা সম্পর্ক আছে। নইলে আগ্নেয়গিরিকেও অত চঞ্চল হতে দেখা যাবে কেন?

তেসরা জানুয়ারী হার্বার্ট প্লেটোতে উঠেছিল। দেখল তাল তাল ধোঁয়া মেঘের আকারে বেরোচ্ছে পাহাড়ের চূড়া দিয়ে। আকাশ ছেয়ে গেল সেই ধোঁয়ায়।

অনেকক্ষণ ধোঁয়ার রকম সকম লক্ষ্য করে বললেন হার্ডিং—'কথাটা আর গোপন রাখার দরকার দেখি না। আগ্নেয়গিরির ভেতরে আগুন জ্বলছে—অগ্ন্যুৎপাতের আর দেরী নেই।'

আয়ারটন মাটিতে কান পেতে বললে—'একী! মাটির তলায় গুম গুম আওয়াজ শুনছি।' কান পেতে সকলেই শুনল সেই গুরু গম্ভীর আওয়াজ। মাঝে মাঝে একটা জোরালো আওয়াজে মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। গুরু গুরু নিনাদের মধ্যে এ যেন গভীর গর্জন!

'গোলায় যাক ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়!' বললে পেনক্রফট। 'ধোঁয়া বেরোতে চায় বেরোক। আমাদের নৌকোর কাজটা বন্ধ রাখি কেন?' বলে সবাইকে নিয়ে কাজে বসে গেল সে।

সন্ধ্যের দিকে পাহাড় চূড়োয় আগুন দেখা গেল। হার্বার্ট তো দেখেই চেঁচিয়ে উঠল ভয়েযন্ত্রে। যেন একটা দানবিক মশাল জ্বলছে পাহাড়ের মাথায়। রাতের অন্ধকারেও তালতাল ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে আগুনের আঁচে। সহস্র অগ্নিশিখা লেলিহান জিহ্বা মেলে ছুটে যাচ্ছে কালো আকাশের পানে। ছাই বাষ্প, ধোঁয়ায় নক্ষত্ররা ঢেকে গিয়েছে। সেইসঙ্গে যেন মেশিনগান বর্ষণের মতে মুহুর্মুহু গর্জন চলছে পাহাড়চূড়ায়।

হার্ডিং বললেন—'সর্বনাশ! এত তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে যাবে ভাবিনি তো।' হার্বার্ট ভয়ে বিস্ময়ে শুধু বলল—'কি ভয়ংকর সুন্দর আগুনের খেলা!'

স্পিলেট বললেন—'তাড়াতাড়ি বলছ কেন হার্ডিং। আড়াই মাস আগেই

আগুন পাহাড়ের নোটিশ পেয়েছি আমরা। তখন ছিল সামান্য আগুন এখন তা দাউ দাউ করে জ্বলছে!'

এই সময়ে আরও একটা উপসর্গ টের পাওয়া গেল। মাটি কাঁপছে! ভূমিকম্পের মাটি কাঁপুনির সঙ্গে অবশ্য তফাৎ আছে এই মাটি কাঁপুনির।

৪ঠা, ৫ই আর ৬ই জানুয়ারী ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় ছেয়ে রইল কুটিল ধূম্রকুণ্ডলীতে। আগুন সহ ঠিক্‌রে এল টকটকে রাঙা পাথর—শূন্যে ছিটকে গিয়ে আবার পাথরের টুকরোগুলো নেমে এল পাহাড়ের মুখেই। দেখে টিটকিরি দিল পেনক্রফট—'বারে! লোফালুফির খেলা দেখাচ্ছো নাকি দৈত্য পাহাড়!' একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল। গলিত লাভা এখনো জ্বালামুখ পর্যন্ত ঠেলে ওঠেনি!

এই তিন দিন একটানা নৌকো তৈরীর কাজ চলল। এরই মধ্যে আয়ারটন ও হার্ডিং গেলেন খোঁয়াড়ের জন্তুদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে মস্ত আকারের মেঘ ভেসে যেতে দেখা গেল। আগ্নেয়-ধূলায় ভরপূর প্রতিটি মেঘ। খোঁয়াড়ের কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই বারুদের মত কালো গুঁড়ো ঝুর ঝুর করে ঝরতে লাগল আকাশ থেকে। দেখতে দেখতে বন জঙ্গল ঢেকে গেল কয়েক ইঞ্চি পুরো গুঁড়োয়। যেন পিউমিস স্টোনের পাউডার পড়ছে আকাশ থেকে। সেই সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ ধাতুর পরিত্যক্ত মল।

হার্ডিং বললেন—'ভয়ানক কাণ্ডের আর দেরী নেই দেখছি। এই কালো হল খনিজ পদার্থের গুঁড়ো। আগ্নেয়গিরির উদরে যে মহাপ্রলয় দেখা দিয়েছে—এটা তার প্রমাণ।

খোঁয়াড়ে আয়ারটনকে রেখে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে আগ্নেয়গিরির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এলেন হার্ডিং। রেড ক্রীক পেরিয়ে এলেন গন্ধক প্রস্রবনের কাছে। দেখলেন বিপুল পরিবর্তন এসেছে গোটা তল্লাটে! একটার জায়গায় তেরোটা গন্ধক প্রস্রবন মাথা চাড়া দিয়েছে। ভেতর থেকে যেন দুরমুশের ঠেলায় মাটি ফেটে চৌচির হতে চাইছে। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস, কার্বনিক অ্যাসিড আর ঘন বাষ্পে টেকা দায়। পায়ের তলায় মাটিও কাঁপছে। কিন্তু কই, লাভার স্রোত তো এখনো নামেনি? আগুন আর ধোঁয়ার স্তম্ভ যেন গগন চুম্বন করতে চাইছে, অগ্নিদগ্ধ ধাতুর মলে মাটি ছেয়ে যাচ্ছে। লাভার স্রোত কিন্তু তখনো নামেনি। ক্যাপ্টেন নিমো তাহলে ঠিকই আঁচ করেছেন। বিপদ এখানে নয়—এখানে নয়। ফিরে এলেন হার্ডিং। আয়ারটনকে নিয়ে গেলেন ডাকার গহ্বরে। প্রতিপদক্ষেপে হোঁচট খেলেন আসবার পথে। মেঘ থেকে বর্ষিত গুঁড়োয় ছেয়ে গেছে মাটি; ধূলোর ঘূর্ণি ঝড়ে কেউ কাউকে দেখতে

শুদ্ধ পাচ্ছেন না। চোখ মুখ রুমালে ঢেকেও মনে হচ্ছিল বুঝি দম আটকে যাচ্ছে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে বসেছে। বাতাসে যেন অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে।

দশটা নাগাদ দুজন পৌঁছোলেন ছাই ঢাকা ঢালু পার্বত্য প্রদেশে। হার্ডিং বললেন—নৌকোটা তো এখানেই থাকার কথা।

'আছে' বলল আয়ারটন। বলে হাল্কা নৌকোটা খাঁজ থেকে টেনে নামাল।

'উঠে বসো, আয়ারটন', বললেন হার্ডিং। দুজনে গেলেন বিশাল লেকটার একদম শেষ প্রান্তে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। নোটিলাস নেই যে ইলেকট্রিকের আলো ছড়াবে। লণ্ঠনের আলোয় দাঁড় টেনে নৌকো নিয়ে যাওয়া হল পাথুরে দেওয়ালের একদম গায়ে। মৃত্যু পুরীর মত নিস্তব্ধ পাতাল গহ্বরে ভেসে এল শুধু একটাই ধ্বনি—গুরু গুরু গুমগুম ধ্বনি—যেন মৃত্যুর মাদল বাজছে···কাল-ভৈরবের ভয়ঙ্কর সংকেত শোনা যাচ্ছে।

আসবার পথে গন্ধকের উগ্র গন্ধে কেন দম আটকে আসছিল এখন তার কারণটা বোঝা গেল। বোঝা গেল, কেন জঙ্গল থেকে পশুপাখী জানোয়ারেরা উধাও হয়েছে, কেন নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট হয়েছে।

পাথরের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। দাঁড়ের মাথায় লণ্ঠন বেঁধে অনেক ওপর পর্যন্ত দেওয়ালের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন হার্ডিং। এ দেওয়াল আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলকে ঢেকে রেখেছে। কত পুরু দেওয়াল? দশ ফুট হতে পারে, একশ ফুট হতে পারে। কিন্তু যে হারে গুরু গম্ভীর নিনাদ ভেসে আসছে পাথরের মধ্যে দিয়ে, মনে হচ্ছে দেওয়াল তেমন পুরু আর নেই। তাছাড়া ফেটে চৌচির দেওয়ালের নানা দিক দিয়ে দুর্গন্ধ গ্যাস বেরিয়ে দূষিত করে তুলেছে গহ্বরের বাতাসকে। পাথরের ফাটল জল পৃষ্ঠের দুতিন ফুট উঁচুতে নেমে এসেছে।

স্তম্ভিত হয়ে সেই দৃশ্য দেখে হার্ডিং শুধু বললেন—'ক্যাপ্টেন নিমো ঠিকই বলেছিলেন। সাংঘাতিক বিপদটা এইখান থেকেই আসছে!'

নৌকা নিয়ে ফিরে এলেন সাইরাস হার্ডিং।

১৯

পরদিন আটুই জানুয়ারী।

আয়ারটনকে নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরলেন হার্ডিং। সবাইকে ডাকলেন। ডাক্কার গহ্বরে যে ভীষণ বিপদ দেখা দিচ্ছে তা বললেন। সবশেষে বললেন, ভয়ংকর সেই পরিণতি থেকে পরিত্রাণের আর কোনো পথ নেই!

হার্ডিংয়ের হেঁয়ালী শুনে সবাই তো অবাক। কি যে বলতে চাইছেন হার্ডিং কেউ বুঝতে পারলেন না।

হার্ডিং তখন বললেন—'ক্যাপ্টেন নিমো মৃত্যুর আগে আমাদের শেষ উপকার করেছেন এই খবরটি দিয়ে। আমাকে গোপন বলেছিলেন, লিঙ্কলন দ্বীপ আর পাঁচটা দ্বীপের মত নয়। যে কোনো দিন এ-দ্বীপ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। কাল ডাক্কার-গহ্বরে গিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর প্রমাণ পেয়েছি। ডাক্কার-গহ্বর আগ্নেয়গিরির ভিত পর্যন্ত গেছে। আগুন পাহাড়ের কেন্দ্রস্থল আর সমুদ্রের জল—এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা দেওয়ালের। আগুন পাহাড়ের পেটে যে উলট-পালট কাণ্ড চলছে, লণ্ডভণ্ড ব্যাপার শুরু হয়েছে, তার চাপে এই দেওয়াল ফুটিফাটা অবস্থায় পৌঁছেছে। ভেতরের প্রলয় প্রস্তুতি আরও একটু এগোলে, আরও চাপ বাড়বে, দেওয়াল একদম ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তখন সমুদ্রের জল গিয়ে আগুন পাহাড়ের পেটে পড়বে।'

পেনক্রফট বলল—'ভালই তো! আগুনটা ফস করে নিভে যাবে।'

হার্ডিং বললেন—'যেখানে লাভা ফুটছে কল্পনাতীত উত্তাপে, সেখানে হঠাৎ জল পড়লে নিমেষ মধ্যে তা বাষ্প হয়ে যাবে। পেনক্রফট! ফলটা কি হবে জানো? গোটা লিঙ্কলন দ্বীপটা বোমার মত ফেটে উড়ে যাবে! মাউন্ট এটনার জঠরে ভূমধ্যসাগরের জল ঢুকলে সিসিলি দ্বীপ যেমন উড়ে যাবে—ঠিক তেমনি ভাবে নিশ্চিহ্ন হবে লিঙ্কলন দ্বীপ!

সম্ভাবনাটা এবার বুঝল সবাই। একী সাংঘাতিক বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বীপবাসীরা! উপায় নেই, উপায় নেই! ভয়াবহ এই চরম বিপদ থেকে বাঁচবার পথ আর নেই। ডাক্কার গহ্বরের পাথুরে দেওয়াল যদ্দিন পারবে, আগ্নেয়গিরির প্রলয়-চাপ সহ্য করবে। তারপর প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে কত সাধের এই লিঙ্কলন দ্বীপ!

চোখ ফেটে জল এল দ্বীপবাসীদের। দ্বীপটাকে তাঁরা প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলেন। শস্য শ্যামলা করেছিলেন। ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধির প্ল্যান করেছিলেন। সব শেষ হতে চলেছে! ডাক্কার গহ্বরের দেওয়াল আর কদ্দিন খাড়া থাকবে? কয়েক মাসও থাকতে পারে, কয়েক ঘণ্টাও থাকতে পারে। তারপর সব শেষ! শেষ! শেষ!

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পেনক্রফট!

আর কোনো পথ যখন নেই, তখন নৌকোটিকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা যাক। দ্বীপ উড়ে যাক, নৌকো নিয়ে তো ভাসা যাবে।

খাওয়া দাওয়া ভুলে উদয়াস্ত খেটে নৌকো সম্পূর্ণ করার কাজে তন্ময় হলেন সকলে।

তেইশে জানুয়ারী।

নৌকোর ডেক অর্ধেক তৈরী হয়েছে। এই কদিন আগ্নেয়গিরি নতুন কোনো উৎপাত করেনি। কিন্তু সে দিন রাত ছটোয় আচম্বিতে একটা ভীষণ শব্দ হল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল লিঙ্কলন দ্বীপ।

দ্বীপবাসীরা ভাবলেন, হয়ে গেল বুঝি, দ্বীপ বোধ হয় ফেটে উড়ে গেল। দৌড়ে বাইরে এলেন সকলে। দেখলেন, আগ্নেয়গিরির শিখরদেশটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সমস্ত আকাশে যেন দাবানল জ্বলছে। প্রায় হাজার ফুট উঁচু এবং কোটি পাউণ্ড ওজনের বড় চূড়োটা ভেঙে সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে গিয়েছে। বিশাল ছিদ্রপথ দিয়ে তেড়ে ফুঁড়ে ঠেলে উঠছে আগুন আর আগুন—সমস্ত আকাশ লাল হয়ে গিয়েছে ধ্বংসদেবতার ভয়ংকর আগুন খেলায়।

সেই সঙ্গে নেমেছে লাভার স্রোত!

জ্বলন্ত গলিত লাভা চলেছে খোঁয়াড়ের দিকে! লক্ষ জিহ্বা মেলে অগ্নিস্রোত নাচতে নাচতে নেমে চলছে ধ্বংসের বিষাণ বাজিয়ে। দ্বীপবাসীরা গাড়ী নিয়ে তক্ষুনি রওনা হলেন খোঁয়াড়ের দিকে। ফটকের কাছে যেতে না যেতেই লাভার স্রোত সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত খোঁয়াড়ের বেড়ায় পৌঁছে গেল। তক্ষুনি দুহাট করে খুলে দেওয়া হল ফটকের পাল্লা। ভয়ার্ত জন্তুগুলো উর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিল বনের ভেতর।

এক ঘণ্টার মধ্যেই খোঁয়াড় ভরে গেল জ্বলন্ত লাভায়। পেছনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি, যে ঝর্ণার পাশে বোম্বেটে পাঁচটার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, তার জল বলতে গেলে চক্ষের নিমেষে প্রচণ্ড শব্দে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। আগুন লেগে ছারখার হয়ে গেল খোঁয়াড়। শুকনো ঘাসের মত নিমেষ মধ্যে পুড়ে গেল ঘর বাড়ী! খোঁয়াড় বলতে কিছুই রইল না!

সকাল সাতটা নাগাদ আর থাকা গেল না সে অঞ্চলে। বনে আগুন লেগে গেল। লাভার স্রোত নদী ছাপিয়ে খোঁয়াড়ে যাওয়ার পথ আটকে দিল। লেকের তীরে এসে দাঁড়ালেন দ্বীপবাসীরা।

বড় বড় গাছ গুলোতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল লাভার ছোঁয়াচ লাগতেই। সেকী সাংঘাতিক দৃশ্য! লেকের জল লাভার স্রোতকে খানিকটা রুখবে ঠিকই, কিন্তু তারপর? তারপর তো দ্বীপের বনজঙ্গল পানীয় জল সবই নিশ্চিহ্ন হবে। মরুভূমির মত দ্বীপে শেষকালে কি না খেয়ে থাকতে হবে? জ্বলন্ত পাথর ছিটকোচ্ছে শিখর দেশ থেকে, ঘনঘন বজ্রগর্জনের মত প্রচণ্ড

আওয়াজে কাঁপছে দিকবিদিক, চ্যাপটা টেবিলের মত হুটো জালামুখ দিয়ে সমানে নির্গত হচ্ছে আগুন, ছাই, লাভা! সেকী দৃশ্য!

লাভার স্রোত লেকের ধারে এসে পৌঁছোলো বলে। সাইরাস হার্ডিং চেঁচিয়ে উঠলেন—'চটপট যন্ত্রপাতি আনো। বাঁধ দিয়ে লাভার স্রোত ঘুরিয়ে দেব। পুরো স্রোতটা লেকের জলে পড়বে।'

তাই হল। দৌড়ে গিয়ে জাহাজ তৈরীর কারখানা থেকে কুড়ুল গাঁইতি এনে ঝপাঝপ শব্দে কাঠ কেটে একটা ফুট তিনেক উঁচু বাঁধ বানিয়ে ফেললেন সকলে।

ঠিক সময়ে শেষ হল বাঁধ তৈরী। পরক্ষণেই লাভার স্রোত পথিমধ্যে সবকিছু পুড়িয়ে জালিয়ে এসে হাজির হল বাঁধের তলায়। লাভা জমতে জমতে অবশেষে কুড়ি ফুট উঁচু থেকে জলন্ত লাভার ধারা অবর্ণনীয় প্রপাতের আকারে পড়তে লাগল লেক গ্রান্টের জলে!

জলে পড়ামাত্র লাভা জমে কঠিন পাথর হয়ে গেল। তার ওপর পড়ল লাভা—আবার হল কঠিন পাথর। শুধু কি তাই! নিমেষ মধ্যে লেকের জল বাষ্প হয়ে ঠিকরে গেল আকাশের দিকে দিকে! জল আর লাভার মধ্যে সেই লড়াই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রচণ্ড হু-উ-উ-স্ শব্দে বাষ্প তৈরী হচ্ছে, দূর আকাশে তালগোল পাকিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে, গলিত লাভার স্রোত তবুও পড়ছে···পড়ছে···পড়ছে! লেকের জল এক সময় ফুরোবেই—কিন্তু লাভার স্রোত থামবে না। পৃথিবীর জঠর থেকে তার আবির্ভাব—এত সহজে কি ফুরিয়ে যাবে ধ্বংসলীলা!

অবশেষে হার মানল লেকের জল। এককালে যেখানে সুন্দর সরোবর ছিল, এখন সেখানে রইল ধোঁয়া ঢাকা জমাট লাভার পাহাড়!

জল আগুনকে নেভায়, এবার আগুন জলকে হারিয়ে দিল!

যাক, কিছুদিনের জন্যে গ্র্যানাইট হাউস, প্রসপেকট হাইট আর নৌকোর কারখানা নিরাপদ!

তখন থেকে রাতেও কাজ চলল নৌকোর। আলোর তো অভাব নেই—আকাশ জুড়ে আগুন পাহাড় আলো জালিয়ে রাখে সারারাত। লাভার স্রোতও চলেছে বিরামবিহীন ভাবে। আগের চাইতে পরিমাণটা একটু কম বলেই মনে হল। নতুন লাভা নামলে বিপদ আছে বইকি। লেকগ্রান্টের জল আর নেই। ২৫শে থেকে ৩০শে জানুয়ারী—এই ছ'দিনে বিশদিনের কাজ সাঙ্গ করলেন ছ'জনে মিলে।

দ্বীপের পূর্ব দিক খানিকটা রক্ষে পেলেও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে

পশ্চিম ভাগের। সেখানকার অরণ্যসম্পদ ছাই হয়ে গিয়েছে। জন্তু জানোয়ার ভয়ে উন্মাদ হয়ে পালিয়েছে জলাভূমির দিকে। জাগুয়ার, ক্যাপিবারা, বুনো-শূওর, কোয়ালা—সব পালিয়েছে।

গ্র্যানাইট হাউস ত্যাগ করে মার্সি নদীর মুখে তাঁবুতে থাকা শুরু করলেন দ্বীপবাসীরা। গ্র্যানাইট হাউস আর নিরাপদ নয়—যে কোনো মুহূর্তে দেওয়াল ধ্বসে পড়তে পারে।

শ্মশান হয়ে এসেছে লিঙ্কলন দ্বীপ! সে দৃশ্য দেখা যায় না—চোখ ফেটে জল আসে। হৃদয়বিদারক দৃশ্য সন্দেহ নেই। এককালে যা সবুজে সবুজ ছিল এখন তা ধূ-ধূ-ধূসরতায় ছেয়ে গেছে। বনজঙ্গলের জায়গায় কিছু কিছু পোড়া গুঁড়ি তখনো মাথা তুলে আছে। হ্রদ, নদী—সব গ্রাস করে নিয়েছে প্রলয়ংকর লাভাস্রোত। তৃষ্ণা নিবারণের জল পর্যন্ত নেই দ্বীপে। কালো কালো খুঁটির মত গাছ ছাড়া কিছু নেই। শ্মশানও বুঝি এর তুলনায় সুন্দর।

দেখে বুকভাঙা নিঃশ্বেস ফেলেছিলেন স্পিলেট। হার্ডিং শুধু বলেছেন-'চালাও কাজ! আগুন পাহাড়ের আগুন এখনো নেভেনি!'

বিশে ফেব্রুয়ারী। আর একমাস মেহনৎ করলেই জলে ভাসবে নৌকো! এক মাস! আগ্নেয়গিরির উৎপাত সয়ে এই একটি মাস টিকে থাকবে তো লিঙ্কলন দ্বীপ? সাইরাস হার্ডিং এবং পেনক্রফটের ইচ্ছে খোলটা সম্পূর্ণ হলেই জাহাজ জলে ভাসাতে হবে। ডেক, ওপরকার কাজ, ভেতরকার কাজ পরে করলেও চলবে। দ্বীপ উড়ে যাওয়ার আগেই জলপোতে আশ্রয় নিতেই হবে। সব চেয়ে ভাল হত যদি বেলুনবন্দরে গিয়ে কাজ সারা যেত। এদিকের তুলনায় ওদিকটা অনেক নিরাপদ।

তাই দ্বীপবাসীরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে আগ্নেয়গিরির দানবিক মশালের আলোয় দিনে-রাতে সমানে খেটে চললেন খোল সম্পূর্ণ করার কাজে।

তেসরা মার্চ। আর মাত্র দশদিন হাত চালালেই সাঙ্গ হবে নৌকো। ভাসবে জলে। বেঁচে যাবেন দ্বীপবাসীরা। পেনক্রফট তো বলেই ফেলল—'আর কী! বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। আগে যাবো ট্যাবর দ্বীপে। শীতটা সেখানে কাটাবো।'

কিন্তু আগ্নেয়গিরির রুদ্রমূর্তি নতুন করে দেখা দিল প্রথম সপ্তাহ থেকেই। গলিত লাভা এবার আকাশে ঠিকরে গিয়ে সেখান থেকে হাজার হাজার কাঁচের সুতোর মত ঝরে পড়তে লাগল দ্বীপের ওপর!

লাভাবৃষ্টি করেও ক্ষান্ত হল না অগ্নিপাহাড়। সংহার মূর্তির আরেক নিদর্শন

দেখা গেল নতুন লাভার স্রোতে। জলন্ত স্রোত পাখীর বাড়ী, আস্তাবল ধ্বংস করে দিল প্রসপেক্ট হাইট পর্যন্ত গিয়ে!

ভয়ার্ত পাখীরা উড়ে গেল। সব চাইতে ভয় পেল টপ আর জাপ। ইতর প্রাণী তো, সহজাত অনুভূতি দিয়ে ওরা বুঝেছে—এবার আর রক্ষে নেই। ভৈরব মূর্তি নিয়ে মরণের ডংকা বাজিয়ে আসছে ধ্বংসের দেবতা। সব শেষ হতে চলেছে। প্রসপেক্ট হাইটের ওপর থেকে লাভার স্রোত জলপ্রপাতের আকারে হুড়হুড় করে নামতে লাগল সমুদ্রতীরে। ভয়াবহ সেই দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা চলে শুধু নায়াগ্রা জলপ্রপাতের—শুধু যা জলের বদলে নামছে অগ্নিস্রোত!

সব শেষ! এখন সম্বল কেবল ঐ নৌকো! আধা খ্যাঁচড়া অবস্থাতেই জলে ভাসাতে হবে নৌকো। আর সময় নেই। ঠিক হল পরদিন সকাল হলেই অসম্পূর্ণ নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভাসবেন দ্বীপবাসীরা!

কিন্তু সকাল পর্যন্ত আর পৌছোনো গেল না।

আটুই মার্চ রাত্রে আচমকা ভয়ানক শব্দে রাশি রাশি বাষ্প প্রচণ্ড তেজে ছিটকে এল আগ্নেয়গিরির জালামুখ দিয়ে। প্রায় হাজার তিনেক ফুট উঁচু হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল বাষ্প রাশি! ঠিকরে গেল চূর্ণবিচূর্ণ প্রস্তর খণ্ড!

আর রক্ষে নেই! ডাক্কার গহ্বরের দেওয়ালে তাহল অ্যাদ্দিনে ফাটল! সমুদ্রের জল নিশ্চয় বিপুল তোড়ে প্রবেশ করছে আগুন পাহাড়ের প্রলয় জঠরে। নিমেষ মধ্যে তা বাষ্পে পরিণত হয়েছে—হুহুংকার শব্দে ছিটকে গিয়েছে অগ্নিস্রাবী পাহাড়ের মুখ দিয়ে।

কিন্তু অফুরন্ত জলরাশি আর অনির্বাণ অগ্নিরাশির মিলনে যে বিপুল পরিমাণ বাষ্প চক্ষের পলকে তৈরী হল, তাকে নির্গত করার পক্ষে নেহাতই ছোট্ট আগুন পাহাড়ের ঐটুকু মুখ!

সুতরাং কল্পনায় আনা যায় না, এমনি একটা বিস্ফোরণ ঘটল চোখের পাতা ফেলার আগেই। ভয়াল সেই বিস্ফোরণে কানের পর্দা ফাটানো শব্দ নিশ্চয় একশ মাইল দূরেও পৌছেছিল সেই রাত্রে। আকাশ বাতাস যেন থরথর করে কেঁপে শিউরে উঠল সহস্র বজ্রের সমতুল্য সেই ভয়াবহ নিদারুণ শব্দে। আগ্নেয় পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বহু উঁচুতে ছিটকে গিয়ে ফের নেমে এল সাগরের জলে!

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল লিঙ্কলন দ্বীপ। নিমেষ মধ্যে সাগরের বড় বড় ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না সে অঞ্চলে!

অথই জলের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে রইল কেবল একটা পাথরের টুকরো। লম্বায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় বিশ ফুট এবং জল থেকে উচ্চতায় দশ ফুট এই পর্বত-খণ্ডটি গ্র্যানাইট হাউসের একমাত্র ধ্বংসাবশেষ। গ্র্যানাইট হাউস খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তলিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের জলে—টুকরোগুলি ওপর ওপর জমা হয়েছিল। রাশিকৃত টুকরোর একটির মাথা জেগেছিল তাথৈ তাথৈ সমুদ্রের ওপর।

লিঙ্কলন দ্বীপ বলতে অবশিষ্ট রইল ক্ষুদ্র পরিসর এই পর্বত খণ্ডটি। এর ওপরেই সাঁতরে এসে উঠলেন দ্বীপবাসীরা—জাপ বাদে। বেচারী বিস্ফোরণের ফলে পাথরের কাটলে আটকে মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে দ্বীপের সব জন্তু জানোয়ারই। আশ্চর্যজনকভাবে কেবল বেঁচে গিয়েছেন ছজন দ্বীপবাসীসহ টপ। এক্সপ্লোসনের সময়ে তাঁরা ছিলেন তাঁবুর মধ্যে। আচম্বিতে দ্বীপটি লক্ষ চূর্ণ হয়ে উড়ে যেতে দ্বীপবাসীরা ছিটকে এসে পড়লেন সমুদ্রের জলে। সামনে ঐ পর্বতখণ্ডটি দেখে সাঁতরে এসে উঠল তিরিশ ফুট লম্বা কুড়ি ফুট চওড়া ছোট্ট জায়গাটিতে।

দীর্ঘ ন'দিন কাটল পাহাড়-ভাঙা এই টুকরোর ওপর। কি করে যে কাটল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টির জল জমেছিল পর্বত-খণ্ডের খাঁজে। সেই জল পান করেই জীবনটাকে কোনোরকমে খাঁচার মধ্যে ধরে রাখলেন এঁরা।

আর ছিল দিন দুয়েকের মত সামান্য খাবার। একটু একটু করে তাই খেয়ে কেটেছে এই কটা দিন।

নৌকোটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আগুন জ্বালানোর আর কোনো উপায় নেই। মৃত্যু অবধারিত জেনে মড়ার মত পর্বতখণ্ডের ওপর শুয়ে রইলেন ছজনে। বৃষ্টির জল পান করে কাটল আরো পাঁচটা দিন। অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছেন প্রত্যেকেই। উঠে বসবার সামর্থ্যটুও কারো শরীরে নেই। দৈহিক শক্তি একেবারেই নিঃশেষিত। প্রলাপ বকতে আরম্ভ করেছে নেব আর হার্বার্ট।

মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেই শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন অসম সাহসি মানুষ ক'জন। কেবল আয়ারটনকেই মাঝে মাঝে প্রাণপণে উঠে বসতে দেখা যাচ্ছে। দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করে ফের এলিয়ে পড়ছে পাথুরে মেঝেতে।

সেদিন ছিল চব্বিশে মার্চ। হঠাৎ আয়ারটন একটা কালো কৌটা দেখল

দূর সমুদ্রে। শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে বিন্দুটাকে দেখেছিল আয়ারটন। দেখামাত্র অতি কষ্টে উঠে বসল। তারপর টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠে হাত নেড়ে ইসারা করতে লাগল কৃষ্ণ বিন্দুটিকে।

আস্তে আস্তে বড় হল কালো ফোঁটাটা! দেখা গেল একটা জাহাজের মাস্তুল আর পাল। মনে হল, পাহাড়-ভাঙা টুকরোটার দিকেই আসছে পালতোলা জাহাজটা।

দুটি মাত্র শব্দ ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল আয়ারটন।

'ডান্‌কান জাহাজ!' বলেই জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল পর্বত খণ্ডে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অভিযাত্রীরা দেখলেন একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন সকলে। ঘরটা জাহাজের ঘর। মৃত্যুর মুখ থেকে সশরীরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল কি করে? হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন হার্ডিং, স্পিলেট, পেনক্রফট, নেব, হার্বার্ট।

রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল আয়ারটনের একটি কথায়—'ডান্‌কান্।'

হ্যাঁ, ডানকানই বটে। লর্ড গ্লেনারভনের জাহাজের বর্তমান চালক রবার্ট গ্র্যাণ্ট—ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের ছেলে। বারো বছর পরে তিনি এসেছিলেন ট্যাবর দ্বীপ থেকে আয়ারটনকে তুলে নিয়ে যেতে।

ডানকান এখন চলেছে আমেরিকা অভিমুখে।

কিন্তু রবার্ট গ্রাণ্ট খবর পেলেন কি করে যে আয়ারটন এখন লিঙ্কলন দ্বীপে রয়েছে, লিঙ্কলন দ্বীপের অবস্থান তো মানচিত্রে নেই? দ্বীপবাসীরাও তো ট্যাবর দ্বীপে নোটিশ রেখে আসেনি? সাইরাস হার্ডিংয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে রবার্ট গ্রাণ্ট অবাক হয়ে বললেন—'সেকী কথা! আপনারাই তো নোটিস রেখে এসেছিলেন ট্যাবর দ্বীপে। তাতে শুধু আয়ারটন কেন আপনাদের সবার খবর ছিল। এই তো সেই কাগজ।'

শুনে চমকে উঠলেন স্পিলেট। হার্ডিং অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—'ক্যাপ্টেন নিমো! ক্যাপ্টেন নিমো!'

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলেন হার্ডিং। হাতের লেখাটা খুবই চেনা। এই লেখাই তিনি দেখেছিলেন বোতলে ভেসে আসা চিরকুটে। ক্যাপ্টেন নিমো ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত আয়ারটনের হদিশ জানিয়েছিলেন সেই কাগজে।

পেনক্রফট বলে উঠল—'তাই বলুন! ক্যাপ্টেন নিমোই তাহলে বন-অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে ট্যাবর দ্বীপে গিয়েছিলেন! কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলুন তো!'

'শুধু এই নোটিসটা রেখে আসার জন্যে।' বলল হার্বার্ট।

অভিভূত কণ্ঠে বললেন হার্ডিং—'বুঝেছি. মহাপুরুষ ক্যাপ্টেন নিমো আরেকটি উপকার করে গেছেন আমাদের না জানিয়ে। ইনিই তাহলে বন-অ্যাডভেঞ্চার চালিয়ে একলা গেছেন ট্যাবর দ্বীপে নোটিশ রাখতে—তাই অন্য ধরনের গিঁট দেখে অবাক হয়েছিল পেনক্রফট।' এই বলে টুপী খুলে বললেন সশ্রদ্ধ কণ্ঠে—'ঈশ্বর মঙ্গল করুন ক্যাপ্টেন নিমোর অমর আত্মার।' সঙ্গীরাও একই ভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশে।

এই সময়ে আয়ারটন বাড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেন নিমোর দেওয়া সেই হীরের বাক্সটি। বলল—'এটা কোথায় রাখব বলুন। মরব জেনেও বাক্সটা আমি ছাড়িনি। এই নিন—আমার কাজ শেষ।'

অবরুদ্ধ আবেগে হার্ডিং কোনো কথা বলতে পারলেন না। রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বললেন—'আয়ারটন! আয়ারটন!'

রবার্ট গ্রান্টকে বললেন—'দেখুন, ট্যাবর দ্বীপে রেখে গিয়েছিলেন এক মহাপাতককে, অনুতাপের আগুনে পুড়ে আজ সে কত খাঁটি হয়ে উঠেছে।'

ক্যাপ্টেন নিমোর অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনলেন রবার্ট গ্রান্ট, শুনলেন লিঙ্কলন দ্বীপে বেলুন অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর জীবন যাত্রার উপাখ্যান।

কয়েক সপ্তাহ পরে ফের আমেরিকার মাটিতে পা দিলেন দ্বীপবাসীরা। দেখলেন, দেশে ফের শান্তি ফিরে এসেছে। ঘরোয়া যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হীরেমোতির পেটিকা থেকে বেশ কিছু রত্ন বিক্রী করে সেই টাকায় অনেকখানি জমিজায়গা কেনা হল Iowa স্টেটে। সবচেয়ে ভালো মুক্তোটা উপহার দেওয়া হল লেডী গ্লেনারভনকে—হতভাগ্য ক'জনকে ডানকানে চাপিয়ে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

নতুন কেনা জমিজায়গায় আর একটা লিঙ্কলন দ্বীপ গড়ে তুললেন অভিযাত্রীরা। নতুন উপনিবেশের পত্তন ঘটল সেখানে। প্রশান্ত মহাসাগরে অতলে নিমজ্জিত লিঙ্কলন দ্বীপের বিভিন্ন জায়গার নামানুসারে নামকরণ হল নতুন কলোনীর। মার্সি নদী, ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়, লেক গ্রান্ট—সবই রইল।

ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁর সঙ্গীদের কুশলী হাতে দেখতে দেখতে শ্রী আর সমৃদ্ধি যেন উপচে পড়ল নতুন উপনিবেশ। লিঙ্কলন দ্বীপের ছ'জন আর ছাড়াছাড়ি হন নি—আমৃত্যু একসাথে থাকার পণ করেছেন সকলে। নেব তার মনিব ছাড়া বাঁচবে না। আয়ারটন সবার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। পেনক্রফট নাবিকত্ব ভুলে চাষী হতেও রাজী। হার্বার্ট হার্ডিংয়ের শিক্ষকতায় লেখাপড়া

নিয়ে ব্যস্ত। স্পিলেট আত্মহারা তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা নিউ লিঙ্কলন হেরাল্ড নিয়ে।

মাঝে মাঝে হার্ডিংদের আস্তানায় বেড়াতে আসেন লর্ড এবং লেডী গ্লেনারভন, ক্যাপ্টেন জন ক্যাঙ্গলস এবং তাঁর স্ত্রী, রবার্ট গ্রাণ্ট নিজে, মেজর ম্যাকনাব, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট আর ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চরিত্ররা।

সংক্ষেপে, সুখী সেখানে প্রত্যেকেই। অতীতের মত ভবিষ্যতেও ছাড়াছাড়ি হতে রাজী নন। অত সুখের মধ্যেও ক্ষণেকের জন্যেও কেউ ভুলতে পারেন না বিজন দ্বীপটিকে। নির্বান্ধব অবস্থায় পৌছোনোর পর সুদীর্ঘ চারটি বছর তাদের সব চাহিদা মিটিয়েছে সেই দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের মাথায় এখন জেগে রয়েছে একটিমাত্র গ্র্যানাইট প্রস্তর খণ্ড—লিঙ্কলন দ্বীপের, এবং ক্যাপ্টেন নিমোর সমাধি স্তম্ভ।

মেঘকাটা কাঁচি

[ক্লিপার অফ দি ক্লাউড্স্ বা রোবার দি কনকারার]

[একশ বছর আগে জুল ভের্ণ উড়ন্ত যন্ত্রকে কল্পনা করেছিলেন। ফ্লাইং মেশিন আবিষ্কৃত হলে পৃথিবী জুড়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন।

ফ্লাইং মেশিন এ যুগে আর কল্পনার বস্তু নয়; কিন্তু রোবারের অত্যাশ্চর্য আকাশযান আজও বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। আজকের এরোপ্লেন শিশু বললেই চলে তাঁর অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন উড়োজাহাজের কাছে।

রোবারের অ্যালবেট্রস এবং টেবর হেলিকপটারের মত শূন্যে বিচরণ করতে পারে, যুদ্ধজাহাজের মত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে, সাবমেরিনের মত ঢেউয়ের তলায় গোঁৎ মারতে পারে; এমন কি শুকনো ডাঙা দিয়েও ঝড়ের মত চলতে পারে!

ভের্ণ দু'দুটো অসাধারণ সায়ান্স-ফিকশন উপন্যাস লিখেছেন রোবারের পরমাশ্চর্য আবিষ্কারের অভিনব কাহিনী নিয়ে। প্রথমটি ক্লিপার অফ দি ক্লাউড্স (রোবার দি কনকারার), দ্বিতীয় মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড! অ্যাডভেঞ্চার, উৎকণ্ঠা, বিজ্ঞানের বিস্ময়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে দুটি উপন্যাসেই।]

(১) রহস্যজনক শব্দ

দুম! দুম!

প্রায় একই সঙ্গে গুলি ছুটে গেল দুটো পিস্তল থেকে। গজ পঞ্চাশেক দূরে পরম শান্তিতে ঘাস খাচ্ছিল একটা গরু। বিনা দোষে একটা বুলেট বিদ্ধ হল তার পিঠে।

গুলি যারা ছুঁড়ল, তারা কিন্তু রইল অক্ষত।

কিন্তু এরা কারা? অত তলিয়ে জানবার দরকার অবশ্য নেই। আপাতত এইটুকু জানলেই চলবে যে দুজনের একজন ইংরেজ, অপরজন আমেরিকান।

গুলি ছুঁড়ে যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে নায়গ্রা জলপ্রপাতের বাঁ পাড়ে। প্রপাত থেকে মাইল তিনেক দূরে, কানাডার মাটির সঙ্গে আমেরিকার মাটির যোগসূত্র রচনা করছে যে ঝুলন্ত সেতুটা, তার কাছেই।

আমেরিকান ভদ্রলোকের সামনে এসে বলল ইংরেজ ভদ্রলোক :

'মশায়, গুলি ফসকেছে তো বয়ে গেল। শুনে রাখুন, গানটা 'রুল ব্রিটানিয়া'!

'আপনার মাথা! এ-গান 'ইয়াঙ্কি ডুডল'!'

আবার গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হল বলে!

গুলি চললেই গরু বেচারী নির্ঘাৎ অক্কা পাবে এবার! তাই স্রেফ দুগ্ধ-শিল্পের খাতিরে দুই সহযোগীদের একজন শশব্যস্ত হয়ে বললে—'তার চেয়ে বলুন না 'রুল ডুডল' বা 'ইয়াঙ্কি ব্রিটানিয়া'!'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। গ্রেটবৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকছে এ ধরনের নামকরণে। খুশী হয়ে যোদ্ধারা ফিরে গেল 'গোট আয়ল্যাণ্ডে'। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। শুরু হল ডিম সহযোগে চা পান।

এ-কাহিনীতে এদের আর দেখা যাবে না। দরকারও হবে না।

কিন্তু সত্যি বলছে কে? আমেরিকান, না, ইংরেজ? এই মুহূর্তে তা রহস্য থাকলেও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল দ্বৈরথ যুদ্ধ থেকে। বিষয়টা নিশ্চয় সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। নইলে জীবনপণ করে কেউ লড়তে নামে? মাসখানেক ধরে এ-কী কাণ্ড ঘটছে সারা পৃথিবীর আকাশে?

ভূগোলকে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে অনেক লক্ষ বছর আগে। কিন্তু আকাশের পানে এমন ভাবে কেউ চেয়ে থাকেন কোনদিন। আগের রাতে আশ্চর্য ট্রাম্পেট সঙ্গীত শোনা গেছে আকাশে। কানাডার লেক ইরী আর লেক ওনটারিওর মাঝে শূন্য থেকে ভেসে এসেছে সৃষ্টিছাড়া গানের গমক! গানটা কোন দেশের এই নিয়েই লেগেছিল ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত জগাখিচুড়ি নিষ্পত্তি ঘটলেও রহস্য রহস্যই থেকে গিয়েছে। শব্দটা আকাশ থেকে নামছে ঠিকই। কিন্তু কেন? খুশী উচ্ছল কোনো নভোচারী কি ট্রাম্পেট নিয়ে গানবাজনা জুড়েছে আকাশে? আনন্দে আটখানা হয়ে গানের গিটকিরি ছাড়ছে শূন্যপথে?

কিন্তু তা-তো নয়! বেলুনবিহারীদের টিকি দেখা যাচ্ছে না আকাশে, অথচ আশ্চর্য গানের ধারা পৃথিবী পৃষ্ঠে ঝরে পড়ছে বিরামবিহীনভাবে। কখনো আমেরিকার আকাশে, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ইউরোপের গগনে, এক সপ্তাহ পরে এশিয়ার মেঘলোকে।

এক কথায়, সারা পৃথিবী জুড়ে অলৌকিক গানটা যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়ীর ধারে কাছে রহস্যজনক গান শুনলে কার না কৌতূহল হয়। গানের উৎস সন্ধানে ছাদে উঠে উঁকিঝুঁকি মারা কি অস্বাভাবিক? এক্ষেত্রে বাড়ী বলতে সারা পৃথিবীটাকে বোঝাচ্ছে। পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি গ্রহে যাওয়া যখন সম্ভব নয়, গানটার স্রষ্টা তাহলে কে? বাতাস না থাকলে গান শোনা যায় না। শব্দপ্রবাহ বাতাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুস্তরের বিস্তার বড়জোর মাইল ছয়েক। তার মানে, সঙ্গীত লহরীর সৃষ্টি হচ্ছে এই ছ'মাইলের মধ্যেই—তার বাইরে মহাশূন্য থেকে নয়। কিন্তু তবুও তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

খবরের কাগজওয়ালারা এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার নিয়ে গরম গরম খবর ছাপতে লাগল। সত্যি মিথ্যে খবর ছাপিয়ে কাটতি বাড়াতে লাগল কাগজের। সে খবর কখনো মাথা গরম করে ছাড়ল পাবলিকের, কখনো গরম মাথা ঠাণ্ডা করে দিল বরফের মত। মানুষ যেন উন্মাদ হয়ে গেল সংবাদ পত্রের উল্টোপাল্টা খবরে। পার্টি পলিটিক্স পর্যন্ত শিকেয় উঠল। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে ধ্বনিত হল—মান-মন্দিরগুলো কি ঘাস কাটছে?

আকাশ রহস্যের জবাব যদি আকাশ পর্যবেক্ষকরাই দিতে না পারে তো ওরকম মান-মন্দির রেখে লাভটা কী? লক্ষকোটি মাইল দূরের নক্ষত্রকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বিবর্ধিত করতে পারছে জ্যোতির্বিদরা। কিন্তু মাত্র ক'মাইল মধ্যেকার রহস্যকে দেখতে পাচ্ছে না? গোল্লায় যাক অমন জ্যোতির্বিদরা!

প্যারিস মান-মন্দির জবাব দিল খুব ঢেকেঢেকে—গা বাঁচিয়ে। তাদের গণিত বিভাগ নাকি আকাশ রহস্যকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি মাপ। ঘামানোর উপযুক্ত মনে করেনি বলে। জিওডেটিক* সেকশন অবশ্য আকাশে কিছু দেখতে পায়নি। আবহাওয়া বিভাগেও কিছু দেখা যায়নি। একই রকম জবাব এল আরো অনেক মান-মন্দির থেকে। তাদের খটমট নাম নাই বা লিখলাম।

যুক্তরাষ্ট্রের নানা অঞ্চল থেকে ভাসাভাসা রিপোর্ট এল। মে মাসের পাঁচ ছ'তারিখে গভীর রাতে যেন একটা ইলেকট্রিক আলো ফ্ল্যাশলাইটের মত দপ করে জ্বলে উঠেছিল আকাশে। বিশ সেকেণ্ড পরে নিভে গিয়েছিল বিচিত্র আলো। আবির্ভূত হয়েছে পিক ডু মিডি'র আকাশে নয়টা আর দশই মে রাত্রে। কোথাও দেখা গেছে রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে, রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আলো আবির্ভূত হয়েছে আরেক জায়গায়, তিনটে থেকে চারটের

*পৃথিবী এবং পৃথিবীর অংশ মাপ জোক করবার বিজ্ঞানকে বলে জিওডেসি। জিওডেটিক হল জিওডেসি সংক্রান্ত বিষয়।

মধ্যে নাইস-এর আকাশে ঝলসে উঠেছে রহস্ত-বর্তিকা, ভোরের দিকে দেখা গিয়েছে আরো দূরের অঞ্চলে।

এতগুলো খবরকে গালগল্প বলে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিশ্চয় একটা আলো দেখা যাচ্ছে আকাশে। হয় সেটা একটাই আলো, অথবা অনেকগুলো আলো। একটাই হোক কি অনেকগুলোই হোক, আলোটা যে ঘণ্টায় একশ বিশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রেটবৃটেনে দারুণ তর্কাতর্কি শুরু হল বিভিন্ন মানমন্দিরে। গ্রীন উইচ এক কথা বলে তো অক্সফোর্ড অমনি তার উল্টোটা বলে। কেউ বলে 'কানের ভুল', কেউ বলে 'চোখের মরীচিকা'। সবশেষে সবাই অবশ্য বললে—'দূর! দূর! ওটা কিছুটা নয়! বিভ্রম বলতে যা বোঝায়, তাই আর কী!'

ভিয়েনা আর বার্লিন মানমন্দিরের কথা কাটাকাটির ঠেলায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারন করল। তটস্থ হল পৃথিবীবাসীরা। শেষকালে রাশিয়া বললে, দুপক্ষই ঠিক বলছেন। থিওরীটা কল্পনায় অসম্ভব হলেও বাস্তবে সত্যি!

সুইজারল্যাণ্ড থেকে জুরিখ পর্যন্ত সবকটা মানমন্দির তখন অসম্ভব সেই প্রসঙ্গ নিয়ে জ্ঞান দিতে শুরু করল বিশ্ববাসীদের—প্রমাণ করা সম্ভব নয় জেনেও কথার কচকচিতে কম গেল না কেউই।

ইটালির ভিসুভিয়স, এটনা আর মণ্টিকাভোর উল্কা পর্যবেক্ষকরা কিন্তু একবাক্যে বললে জিনিসটা অলীক নয়। সত্যি সত্যিই দিনের বেলা বাষ্প-মেঘের মত কি যেন দেখা গিয়েছে আকাশে। রাত্রে ছুটে গিয়েছে উল্কার মত অদ্ভুত একটা বস্তু।

হালে পানি না পেয়ে শেষকালে হাঁপিয়ে পড়ল বৈজ্ঞানিকরা। বিদঘুটে এ-রহস্য নিয়ে কাঁহাতক আর মাথা ঘামানো যায়? প্রকৃতির নিশ্চয় অজ্ঞাত কারণে আলো আর শব্দের ভেল্কী দেখাচ্ছে আকাশে—এই রকম একটা কথা দিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা ঠাণ্ডা করার যখন তোড়জোড় চলছে পৃথিবী জুড়ে, ঠিক তখনি খবর এল ফিনমার্ক আর স্পিটবার্জেনের মানমন্দির থেকে। ২৬, ২৭, ২৮, ২৯—মে মাসের এই চারদিন মেরুজ্যোতির মাঝে আকাশ-দৈত্যের মত প্রকাণ্ড একটা পাখীর ছায়ামূর্তি দেখা গিয়েছে। প্রাণীটা কি, তা খুঁটিয়ে দেখা যায় নি যদিও। তবে উড়ন্ত বিভীষিকার গা থেকে অদ্ভুত কতকগুলো কণিকা ছিটকে এসে বিস্ফোরিত হচ্ছিল বোমার মত!

সুইডেন আর নরওয়ের জ্যোতির্বিদ আর উল্কাবিদদের খবর শুনে কিন্তু অবাক হল না ইউরোপের পণ্ডিতরা। যে দুটো দেশ কোনো ব্যাপারেই একমত

হতে পারেনি কস্মিনকালে, তারা একই সুরে একই কথা বলছে, এটাই তো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ !

দক্ষিণ আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার সব কটা মানমন্দির অবশ্য হো-হো করে হেসে উঠল ফিনমার্ক-স্পিটবার্জেনের কাহিনী শুনে !

অস্ট্রেলিয়ান টিটকিরির ভয়ে কিন্তু পেছিয়ে রইলনা শুধু একজন চীনেম্যান। ভদ্রলোক জি-কা-বে মানমন্দিরের ডিরেক্টর। উনি বললেন—'আশ্চর্য নয়। জিনিসটা খুব সম্ভব একটা ব্যোমযান···ফ্লাইং মেশিন !'

এ কী উদ্ভট কথা ! এ কী ননসেন্স বাকতাল্লা !

আকাশ বাজনদারের রহস্য নিয়ে ইউরোপে কথার লড়াই যা না হল, তার অনেক বেশী দেখা দিল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে।

ইয়াঙ্কি জাতটা ঘুরিয়ে নাক দেখানো পছন্দ করে না—পষ্টাপষ্টি বলে দেয় যা বলবার। লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছোতে হলে সোজাপথেই যায়—গলিঘুঁজির ধার ধারে না।

সুতরাং গগন-প্রহেলিকা নিয়ে তাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ পেছিয়ে থাকতে যাবে কেন ? তারা যা বলল, তা ইউরোপের পর্যবেক্ষণের ঠিক উল্টো। বাজনদারকে নিয়ে বিতণ্ডা নয়, সময় নিয়ে লাগল বাক্যযুদ্ধ। সবাই নাকি একই সময়ে একই সেকেণ্ডে দেখেছে আকাশরহস্যকে। দেখেছে অবশ্য আকাশের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় দিগ্‌রেখার ওপরে। কিন্তু ম্যাসাচুসেটস থেকে মিচিগান পর্যন্ত আর নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে কোলাম্বিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একই সময়ে দর্শন দান করল আকাশ-বায়েন। এ কি করে সম্ভব হয় ?

মিলিটারী একাডেমী অবশ্য বললে, বেশী চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে সব ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ হিসেবেই ভুল রয়েছে। বিসমিল্লায় গলদ আর কি !

পরে পর্যবেক্ষকরা দেখল, জিনিসটা এরোলাইট, মানে, সিলিকেট ঠাসা উল্কা-পাথর ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু উল্কা-পাথর নিশ্চয় প্যাঁ-পোঁ করে ট্রাম্পেট বাজাতে পারে না ! তাহলে ?

'ট্রাম্পেট-ফ্রাম্পেট সব গাঁজাখুরি কথা'—একথা কিন্তু ধোপে টিঁকল না ! কান আর চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। আকাশের গান কান দিয়ে যারা শুনছে, আকাশের আলো চোখ দিয়ে যারা দেখেছে, তারা তেড়ে মারতে এল অবিশ্বাসীদের। শেষকালে একদিন ইয়েল কলেজে শেফিল্ড সায়ান্স স্কুলের পর্যবেক্ষকরা গানটার স্বরলিপি পর্যন্ত তুলে ফেলল। ১২ই আর ১৩ই মে ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাতে যেই বাজনা বাজতে লাগল অনেকটা সুরলোকের সঙ্গীতের

মত তক্ষুণি খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে গেল ছেলেরা। দেখা গেল, গানটা ডি মেজরের কোরাস।

একজন কট্টর ইয়াঙ্কি তাই না দেখে বললে বিজ্ঞের মত—'ঠিক ধরেছি। এর পেছনে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ব্রেন। দলবল নিয়ে ফরাসিরা আকাশে উঠে গান গাইছে।'

বোস্টন মানমন্দিরের মতামতের খুব দাম আছে জ্যোতির্বিদ আর উল্কাবিদ মহলে। এরাই বললে—'তামাসা করার সময় এটা নয়। ব্যাপারটা গুরুতর।'

অবশেষে এগিয়ে এলেন সিনসিনাটি মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মিঃ কিলগোর। ইনি মাইক্রোমিটার নিয়ে নক্ষত্র মেপে জগৎ বিখ্যাত। অনেক পর্যবেক্ষণের পর ইনি বললেন—'সত্যিই আকাশে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।' কিন্তু জিনিসটা আসলে কি, তার গতিবেগ কতটা, গতিপথই বা কি, কেউ তা বলতে পারল না।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড কাগজটার প্রচার আছে। সেখানে কোনো খবর বেরোনো মানেই হু-হু করে খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। একটা উড়ো খবর বেরোলো এই কাগজেই :

'রাগিনারা বেগমের বিপুল সম্পদের দুই উত্তরাধিকারীর মধ্যে রেষারেষির কাহিনী নিশ্চয় কেউ ভোলেন নি। বছর কয়েই আগে আর একটু হলেই লড়াই লেগে গিয়েছিল আর কি ফ্রাঙ্কভিল আর ষ্টীলটাউন—এই দুই আজব শহরের মধ্যে।'

'ফ্রাঙ্কভিল শহরের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসি বৈজ্ঞানিক ডক্টর সারাসিনের ওপর ষ্টীলটাউনের প্রতিষ্ঠাতা জার্মান ইঞ্জিনীয়ার হের স্থলৎসের আতীব্র ঘৃণার কাহিনী এত সহজে ভুলে যাওয়ার কথা নয়।'

'ফ্রাঙ্কভিলকে নিমেষ মধ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে হের স্থলৎস একটা ভয়ংকর ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন।'

'ইঞ্জিনটার প্রাথমিক গতিবেগ একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। হিসেব ভুল হওয়ার দরুন দানবিক কামান থেকে গোলাটা সাধারণ গোলার ষোলগুণ বেশী গতিবেগ নিয়ে—অর্থাৎ ঘণ্টায় সাড়ে চারশ মাইল বেগে ছিটকে আসায় ভূমি স্পর্শ করতে পারেনি। উল্কাপাথরের সামিল হয়ে উড়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে—অনন্তকাল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে বলে।'

'আকাশ রহস্যের মূলে এই গোলাটি নেই তো?'

বলিহারি যাই নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংবাদদাতার মৌলিক কল্পনাশক্তিকে। কল্পনায় কিনা হয়! কিন্তু হের স্থলৎসের ক্ষেপণাস্ত্রে তো ট্রাম্পেট ফিট করা

ছিল না। সুতরাং এত বাগবিতণ্ডা সবই তলিয়ে গেল। ভেসে রইল শুধু একজনের কথা। খাঁটি কথা ঠিকই। কিন্তু সার কথাটি বেরিয়েছে যে এক চীনেম্যানের মুখ থেকে! জি-কা-বে'র ডিরেক্টর এ কথা না বলে অন্য কেউ বললে তো তাকে মাথায় তুলে নাচানাচি আরম্ভ হয়ে যেত! চৈনিক বচন নিয়ে তো আর……

সুতরাং মনের মিল হল না। চলল আলোচনার পর আলোচনা। ইতিমধ্যে কিছুদিন আর নতুন খবর এল না। উড়ন্ত বিভীষিকা কি তাহলে হারিয়ে গেল মহাশূন্যে? তলিয়ে গেল প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারতে মহাসাগরে? ট্রাম্পেট আর বাজছে না কেন?

সাময়িক বিরতির ঠিক পরেই জুন মসের ছ তারিখ থেকে ন তারিখের মধ্যে পর পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যা মহাজাগতিক লীলা বলে ধামাচাপা দেওয়া যায় না।

ঘটনাগুলো ঘটল ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে। হামবুর্গে সেন্টমাইকেল টাওয়ারের চূড়ায়, তুরস্কে সেন্ট সোফিয়া মিনারের শিখরদেশে, রোয়েনে গির্জের ধাতব ডাণ্ডায়, ষ্ট্রাসবার্গে আশ্রমের ডগায়, আমেরিকার লির্বাটি মূর্তির মাথায় আর বোস্টনে বাঙ্কার হিল মনুমেন্টের চূড়োয়, চীনদেশে ফোর হানড্রেড জেনি মন্দিরের মাথায়, তাঞ্জোরে মন্দির পিরামিডের বোলতলায়*, রোমে সেন্ট পিটারের ক্রশে, লণ্ডনে সেন্ট পলস-য়ের ক্রশে, মিশরে গিজে পিরামিডের ডগায়, প্যারিসে ১৮৮৯ সালে বিশ্বমেলা উপলক্ষে নির্মিত লৌহ-টাওয়ারের চূড়ায়—হাজার ফুট উঁচুতে—উড়তে দেখা গেল একই রকমের একটা নিশান। যে জায়গায় ওঠা দুঃসাধ্য বললেই চলে, কেন সেখানে উড়িয়ে দিয়ে গেছে তার পতাকা!

পতাকাটা কালো রঙের। কালোর-ওপর তারা ছিটোনো। মাঝে জ্বলজ্বল করছে সোনালী সূর্য।

* 'দি বেগমস ফরচুন' কাহিনীতে ষ্টীলটাউন বনাম ফ্রাঙ্কভিল শহরের আশ্চর্য লড়াইয়ের বর্ণনা আছে। উপন্যাসটি রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মতের মিল অসম্ভব

'খবরদার ! প্রতিবাদ করলেই—'

'যতক্ষণ মুখ আছে। ততক্ষণ প্রতিবাদ করব।'

'আপনার হুমকির ধার ধারি না—'

'ব্যাট ফিন, মুখ সামলে কথা বলবেন !'

'আঙ্কল প্রুডেন্ট, মুখ সামলে কথা বলবেন !'

'ফের বলছি, প্রপেলারটা পেছনে থাকবে !'

'আমরাও বলছি ! আমরাও বলছি !' সায় দিল পঞ্চাশজন একসঙ্গে।

'না, না, না ! সামনে থাকবে !' গলা ফাটিয়ে দিল ইভান্স।

'সামনে ! সামনে। সামনে !' তারস্বরে ধুয়ো ধরল বাকী পঞ্চাশজন।

'মতের মিল কস্মিনকালেও হবে না !'

'হবে না ! হবে না !'

'তাহলে ঝগড়া বাড়িয়ে লাভ কি ?'

'এটা ঝগড়া নয়—আলোচনা !'

এরপর পনেরো মিনিট ধরে টিটকিরি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের ঝড় বয়ে গেল যেন হলঘরে।

ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটে এত বড় হলঘর খুব কমই আছে। ক্লাবটা ফিলাডেলফিয়ার একটি নামকরা সংঘ। রাস্তার আলো কে জ্বালবে—এই নিয়ে এইমাত্র একজনকে ভোটের মারফৎ নির্বাচন করা হল। মারপিট, হাতাহাতি, কথা-কাটাকাটি—কিছুই বাদ যায় নি সামান্য ইলেকসনকে কেন্দ্র করে। এখন শুরু হয়েছে নতুন উত্তেজনা। বিষয়টা অতি সামান্য। বেলুনের গতিপথ নিয়ে জোর আলোচনা চালাচ্ছেন বেলুনবাজরা !

বিশাল ঘরে কনুই গুঁতোগুঁতি থেকে আরম্ভ করে হাত পা ছোঁড়া গলাবাজি নিয়ে মত্ত রয়েছে শ'খানেক বেলুনবাজ। এরা কেউই ইঞ্জিনীয়ার নয়—সবাই সখের বেলুনবাজ অ্যামেচার। বাতাসের চাইতে ভারী বস্তুকে বাতাসে ভাসানো যে সম্ভব ; অথবা উড়ন্ত যন্ত্র, আকাশ জাহাজ একদিন যে আর কল্পনার বস্তু থাকবে না—এই অলীক ধারণাকে কেউ জোরদার করতে গেলেই

* ভের্ণ ভারতবর্ষের মন্দিরকে কখনো বলেছেন প্যাগোডা কখনো পিরামিড।

তেলেবেগুনে জলে ওঠে একশ বেলুনবাজ। তাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতেও কসুর করে না। মাথা গরম লোকগুলোকে অতি কষ্টে সামলে রেখেছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট আঙ্কল প্রুডেন্ট।

আমেরিকা দেশটা এমন একটা দেশ যেখানে আঙ্কল হতে গেলে বিয়ে করার দরকার হয় না, কাচ্ছাবাচ্ছা, ভাইপো ভাইঝি না রাখলেও চলে।

আঙ্কল প্রুডেন্টও ফিলাডেলফিয়ার খুব নামী পুরুষ। প্রুডেন্ট ওর পদবী। তাঁর নামের মানে বিবেচক, আসলে কিন্তু মানুষটা অসমসাহসিক ডানপিটে। টাকার কুমীর বললেই চলে তাঁকে। নায়গ্রা জলপ্রপাতের বড় অংশীদার। সম্প্রতি অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে একটা লাভজনক পরিকল্পনা কেঁদেছেন। নায়গ্রা দিয়ে সেকেণ্ডে সাড়ে সাতহাজার কিউবিক মিটার জল বয়ে যাচ্ছে। জলের এই তোড় থেকে সত্তর লক্ষ হর্স পাওয়ার শক্তি বের করে নেওয়া সম্ভব। তিনশ মাইল পর্যন্ত অঞ্চলের সমস্ত কারখানায় যদি এই শক্তি চালান দেওয়া যায়, তাহলে বছরে লাভ হবে তিরিশ কোটি ডলার। সিংহের বখরা আসবে আঙ্কল প্রুডেন্টের পকেটে। ভদ্রলোক বিয়ে-থা করেননি। পরিচারক বলতে সবেধন নীলমণি একজনই আছে। নাম তার ফ্রাইকোলিন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সমস্ত তাকে করতে হয়।

যেহেতু পকেটে পয়সা আছে, সুতরাং আঙ্কল প্রুডেন্টের বন্ধু আছে, শত্রুও আছে। সবচেয়ে বড় শত্রুও হল ক্লাব সেক্রেটারি স্বয়ং।

ইনি ফিল ইভান্স। ইভান্সও বড়লোক। হুইলটন ওয়াচ কোম্পানীর ম্যানেজার। দিনে পাঁচশ ঘড়ি তৈরী হয় এ কোম্পানীতে। আঙ্কল প্রুডেন্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নাহলে বুকটা জুড়িয়ে যেত ইভান্সের। দুজনেরই বয়স ছেচল্লিশ। দুজনেই স্বাস্থ্যবান এবং সমান সাহসী। দুজনের মনের মিল হয়নি শুধু একটি কারণে। আঙ্কল প্রুডেন্ট দারুণ রাগী ফিল ইভান্স দারুণ ঠাণ্ডা। একেবারে উল্টো প্রকৃতি দুজনের। একজনের মেজাজ আগুন-গরম, অপর জনের বরফ-ঠাণ্ডা। একজন একটুতেই চটে লাল, অপর জনের মাথা গরম করাব ক্ষমতা ত্রিভুবনের কারো নেই।

দুজনেরই যখন সমান সমান শুধু ঐ মেজাজটি ছাড়া, তখন ফিল ইভান্সই বা প্রেসিডেন্ট হবেন না কেন? বিশবার ইলেকশান হল। বিশবারই দেখা গেল দুজনেই ভোট পেয়েছেন সমান সমান। সারা জীবন ধরে ইলেকশন করলেও নিক্তির কাঁটার মত দুজনে ভোট পেতেন সমান সমান—কমও না, বেশীও নয়।

শেষ কালে অচলাবস্থার সমাধান করলেন ক্লাব কোষাধ্যক্ষ জেম চিপ। ইনি

কড়া নিরামিষাশী। সুরা স্পর্শ করেন না। অর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক ব্রাহ্মণ * জেম চিপকে সাহায্য করলেন ক্লাব সদস্য উইলিয়াম ফোর্বস। ইনি একটা মস্ত কারখানার ম্যানেজার। সেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়াকে সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে গ্লুকোজ তৈরী হয়। ফোর্বস-এর পরমাসুন্দরী দুটি মেয়ে আছে। মিস ডরোথি, সংক্ষেপে ডল। মিস মার্থা, সংক্ষেপে ম্যাট।

সমস্যার সমাধান করা হল অভিনব উপায়ে। ধবধবে সাদা দুটো পিচবোর্ড নেওয়া হল। সমান মাপের দুটো কালো লাইন টানা হল বোর্ড দুটোয়। আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্সের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল দুটো সরু ছুঁচ। দুজনকেই বলা হল, লাইনের ঠিক মাঝখানে ছুঁচ ফুটোতে হবে। শুধু চোখে মেপে নিয়ে বসিয়ে দিতে হবে প্রথমবারেই—চোখটাকেই মনে করতে হবে কম্পাস। যার ছুঁচ লাইনের ঠিক মাঝে বিঁধবে, তিনিই হবেন প্রেসিডেন্ট।

দুজনেই যেন এক পায়ে খাড়া ছিলেন এমন একটা প্রতিযোগিতার জন্য। ছুঁচ নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে ঘ্যাচ করে বিঁধিয়ে দিলেন লাইনের ঠিক মাঝখানে।

শুধু চোখে অন্ততঃ তাই মনে হল। দুজনেরই ছুঁচ সমান জায়গায় গেঁথেছে —উনিশ বিশ তফাৎও নেই!

মহা মুশকিল তো! বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল সদস্যদের মাথা।

শেষকালে এই সমস্যারও সমাধান বাৎলালেন একজন সদস্য। ইনি মাইক্রোমিটার দিয়ে মাপতে বসলেন। এই পদ্ধতিতে হীরের কাঁটা দিয়ে এক মিলিমিটারকে দেড়হাজার ভাগে ভাগ করা যায়। মাইক্রোসকোপের তলায় রাখবার পর দেখা গেল আঙ্কল প্রুডেন্ট জিতেছেন মাত্র তিনদাগ এগিয়ে থাকার জন্যে। অর্থাৎ লাইনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দেড়হাজার ভাগের ছ'ভাগ দূরে আছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিল ইভান্স আছেন ন'ভাগ দূরে!

এই ঘটনার পর ফিল ইভান্সকে হতে হল সেক্রেটারী। আঙ্কল প্রুডেন্টকে প্রেসিডেন্ট। সেই থেকেই প্রেসিডেন্টের ওপর হাড়েহাড়ে চটে আছেন সেক্রেটারী!

*উপমাটা জুল ভের্নের নিজের।

(৩) দর্শনার্থী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের পচিশ বছরে কম এক্সপেরিমেণ্ট হয়নি বেলুনকে মেশিন লাগিয়ে খুশীমত চলোনো যায় কিনা—এই নিয়ে। ১৮৫২ সালে দোলনায় প্রপেলার লাগিয়েছিলেন হেনরী গিফার্ড। ১৮৭২ সালে লোমে, ১৮৮৩ সালে তিসানদিয়ার ব্রাদার্স এবং ১৮৮৪ সালে ক্যাপ্টেন ক্রেবস এবং রেনার্ড জবর মেশিন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অন্যান্য বেলুনিস্টদের। হাওয়ার উল্টো দিকে গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল এই সব মেশিনের দৌলতে। কিন্তু হাওয়ার টান বাড়লে আর রক্ষে ছিল না। বদ্ধ ঘরে, শান্ত আবহাওয়ায় ভাল কাজ দিয়েছিল মেশিন চালিত বেলুন। সেকেণ্ডে পাঁচ-ছ গজ বেগে হাওয়া বইলেও উড়ত দিব্বি। কিন্তু সেকেণ্ডে ন'গজ বেগে হাওয়ার টান শুরু হলে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু—হয়ে স্রেফ দাঁড়িয়ে যেত যন্ত্রচালিত বেলুন। পেছন হটতে থাকত সেকেণ্ডে এগারো গজ বেগে ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করলেই। খড়কুটোর মত উড়ে যেত ঝড়ের মুখে পড়লে অর্থাৎ সেকেণ্ডে সাতাশ থেকে তেত্রিশ গজ বেগে হাওয়া শুরু হলে। ঝড় যখন হারিকেন ঝড় হয়ে যেত, অর্থাৎ, সেকেণ্ডে ষাট গজ বেগে ধেয়ে যেত দামাল হাওয়া—তখন ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে যেত মেশিন সমেত আস্ত বেলুন। ভাঙাচোরা টুকরো টাকরা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত যদি হারিকেন ঝড় সাইক্লোন ঝড়ে পরিণত হত, অর্থাৎ সেকেণ্ডে একশ গজ বেগে ছুটত ক্ষ্যাপা হাওয়া। তাই বেলুন চালনা নিয়ে অত এক্সপেরিমেণ্ট সত্ত্বেও কোনো কাজে লাগেনি বেলুন মেশিন। কার এত বুকের পাটা আছে অপলকা নভোযান নিয়ে আকাশে উঠে প্রাণটা খোয়াবে?

পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে কিছু লাভ হয়েছে বইকি। প্রগতির সিঁড়ি বেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগোনো গিয়েছে। হেনরী গিফার্ডের স্টীম ইঞ্জিন আর লোমের গায়ে জোরে চালিত যন্ত্র বাদ দিলে ইলেকট্রিক মোটর কাজ দিচ্ছে ভালই। তিসানদিয়ার ব্রাদার্স উদ্ভাবিত পটাসিয়াম বাইক্রোমেট ব্যাটারী দিয়ে সেকেণ্ডে চার গজ পর্যন্ত গতিবেগ তোলা গেছে। ক্যাপ্টেন ক্রেবস এবং রেনার্ডের ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেশিন বারো হর্সপাওয়ার শক্তি দিয়ে সেকেণ্ডে সাড়ে ছ-গজ গতিবেগেও বেলুন ছুটিয়েছে।

শেষোক্ত মেশিনের গুপ্ত রহস্য ফাঁস করতে চাননি ক্যাপ্টেন ক্রেবস এবং রেনার্ড। ইঞ্জিনীয়ার আর ইলেকট্রিসিয়ানরা অবশ্য স্টীম হর্স নিয়ে গবেষণা করতে করতে পাইল-রহস্য উদ্ধার করে ফেলল দুদিনেই। তারপর যে মেশিন বানিয়ে নিল তার কাছে ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেশিন কিছুই নয়। কল চালানো বেলুনের যারা ভক্ত, তারা উৎফুল্ল হল এই আবিষ্কারে।

এত প্রগতি সত্ত্বেও কিন্তু গজগজ করতে লাগল একদল ব্যক্তি। তাদের মতে ঐ রকম পেটমোটা বিরাট চেহারা নিয়ে কোন মতে বাতাসে ভেসে থাকা যায়। কিন্তু প্রকাণ্ড আয়তন নিয়ে বাতাসের টান কাটিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? বাতাসের মাঝেই তো ভাসতে হচ্ছে বেলুনকে। সেই বাতাসকে পেছনে ফেলে যাওয়ার কল্পনা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসই তো বাধা দেবে তার বিরাট চেহারাটাকে। সে বাধা কাটিয়ে বেলুন যাবে কি করে?

বেলুন-মেশিন নির্মাণে সবাইকে টেক্কা মেরেছিলেন বোস্টনের জনৈক অজ্ঞাত-নামা কেমিস্ট। ভদ্রলোক উন্নত ধরনের একটি ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেশিন বানালেন—কিন্তু তার পাইলের গুপ্তকথা কাউকে ভাঙলেন না। নিখুঁতভাবে নক্সা আঁকার ফলে এবং চুলচেরা হিসেবের গুণে তাঁর আবিষ্কৃত মেশিন বেলুনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সেকেণ্ডে বিশ থেকে বাইশ গজ গতিবেগে।

তাজ্জব কাণ্ড! নয় কি?

এক লক্ষ ডলার দিয়ে আবিষ্কারটা কিনে নিয়েছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। টাকা দিয়েছিলেন কয়েক কিস্তিতে। শেষ কিস্তি মিটিয়ে দেবার সময়ে শুধু বলেছিলেন—'এত সস্তায় এমন আবিষ্কার!'

মেশিন নিয়ে তক্ষুণি তোড়জোড় শুরু হল ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে। আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে সৎকাজে কেউ কোমর বেঁধে লাগলে কখনো টাকার অভাব হয় না। যা কেউ করেনি, তা করবার মতলব কারো মাথায় এলে, টাকা আসতে থাকে দশদিক থেকে। বেলুনিস্টদের নতুন অ্যাডভেঞ্চারকে মদৎ দিতেও এগিয়ে এল আমেরিকানরা। দেখতে দেখতে ফাণ্ডে জমা পড়ল তিনলক্ষ ডলার। সাংঘাতিক এক্সপেরিমেন্টের জন্যে চাই সাংঘাতিক নভোচারী। সে রকম নভোচারী সারা আমেরিকায় একজনই ছিলেন। নাম তাঁর হেনরী টিনডার। এঁর তদারকিতে শুরু হল কাজকর্ম।

হেনরী টিনডার হেঁজিপেঁজি নন শুধু তাঁর অমর কীর্তির জন্যে। তিন তিনটে অসম্ভবকে সম্ভব করায় তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁর প্রথম কীর্তি হল বারো হাজার গজ উর্দ্ধে ভ্রমণ—যা তাঁর কোনো পূর্বসূরী পারেন নি। দ্বিতীয় কীর্তি: বেলুনে চেপে সারা আমেরিকার ওপর দিয়ে উড়ে

গেছেন নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত। জন ওয়াইজ গিয়েছিলেন মাত্র সাড়ে এগারোশ মাইল। তৃতীয় কীর্তিঃ পনেরোশ ফুট ওপর থেকে আছাড় খেয়ে শুধু বুড়ো আঙুল মচকে বেঁচে যাওয়া—অনন্যসাধারণ কীর্তি নিঃসন্দেহে—কেননা, মাত্র সাতশ ফুট ওপর থেকে আছাড় খেয়ে অক্কা পেয়েছিলেন রোজিয়ার দি বেলুনিস্ট!

এ-কাহিনী লেখবার সময়ে কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের উৎসাহী বেলুনবাজরা। ফিলাডেলফিয়ার টার্নার ইয়ার্ডে কে না দেখেছে বিরাট বেলুনটাকে! উচ্চচাপে বাতাস ঠেসে আগেই পরখ করা হয়েছিল বেলুনের বায়ুচাপ সইবার ক্ষমতা কতখানি। সেই কারণেই বেলুনটাকে শুধু বেলুন না বলে রাক্ষুসে বেলুন বলা উচিত।

নাদারের বেলুনের সাইজ ছিল ছ'হাজার কিউবিক মিটার, জন ওয়াইজের বিশহাজার, গিফার্ডের পঁচিশ হাজার। সবাইকে টেক্কা মেরেছে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অতিকায় বেলুন—চল্লিশহাজার কিউবিক মিটার তার মোট আয়তন। চাট্টিখানি কথা নয়! সুতরাং সাঙ্গপাঙ্গসহ আঙ্কল প্রুডেন্ট যে অহংকারে ধরাকে সরাজ্ঞান করবেন, এ-আর আশ্চর্য কী!

এ রকম খানদানী বেলুনের খানদানী নাম হলেই বুঝি মানাতো। সারা আমেরিকায় একসেলসিয়র নামটার মত সম্ভ্রান্ত নাম আর নেই জেনেও বেলুনের নাম একসেলসিয়র করা হল না। অত্যন্ত সাদাসিদে, কিন্তু ভারী যুৎসই নাম দেওয়া হল বেলুনের—গোঅ্যাহেড! অর্থাৎ এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো! বাতাসের বাধা ঠেলে এগিয়ে চলো। কম্যাণ্ডারের হুকুম মাফিক চল এগিয়ে পবন পুত্রের মত সন্‌সনিয়ে!

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কেনা পেটেণ্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়েছে ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেশিন। বড়জোর ছ'হপ্তার মধ্যেই শূন্যপথে শুরু হবে গো-অ্যাহেডের অভিযান।

কিন্তু যান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে লেগেছে গোল। প্রপেলারের সাইজ কি হবে, এই নিয়ে মিটিং হয়ে গেছে রাতের পর রাত। সাইজ যদিও বা ঠিক হয়েছে, কিন্তু প্রপেলার পেছনে বসবে কি সামনে বসবে, এই নিয়ে হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে একশ জন বেলুনবাজ। তিসানদিয়ার ব্রাদার্স প্রপেলার বসিয়েছিলেন পেছনে, কিন্তু ক্যাপ্টেন ক্রেবস এবং রেনার্ড বসিয়েছিলেন সামনে। ক্লাবের মেম্বাররা দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল 'সামনে ওয়ালা'। আরেক দল 'পেছনওয়ালা। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থার। ক্লাব প্রেসিডেন্ট যে কাস্টিং ভোট দিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন, সে

গুড়েও বালি। কেননা, আঙ্কল প্রুডেন্ট নিজেও যে একটা দলে ভিড়ে গেছেন!

ফলে, সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। শেষকালে না গভর্নমেণ্টকে নাক গলাতে হয় সমস্যার সুরাহা করতে। কিন্তু প্রাইভেট ব্যাপারে মার্কিন সরকার নাক গলানো পছন্দ করে না। সুতরাং বেলুনে প্রপেলার লাগানো হবে কবে, তা কেউ বলতে পারছে না।

এই অবস্থায় ক্লাবমেম্বাররা রেগে টং হয়ে থাকবে, এ-আর আশ্চর্য কি। গলাবাজি, গালিগালাজ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর আরম্ভ হল ঘুসোঘুসি। হাত ব্যথা হয়ে যাবার পর শুরু হল ছড়ির মার। ছড়ির জবাবে শোনা গেল ঘন ঘন পিস্তল গর্জন। সপাং সপাং করে বেত পড়ছে পিঠে, সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম শব্দে গুলি ছুটছে শূন্যে। আটটা বাঁইত্রিশ মিনিটে ঘুরে গেল ঘটনার মোড়।

ঠিক পুলিশ কনস্টেবলের মত মন্থর চরণে প্রশান্ত বদনে তুমুল হট্টগোলের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্টের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ক্লাবের দারোয়ান। টেবিলের ওপর একটা ভিজিটিং কার্ড রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল হুকুমের প্রতীক্ষায়।

ঐ রকম চেঁচামেচি, গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি, বেত মারামারি ঘুসোঘুসির মধ্যে ক্রেমলিনের ঘণ্টাধ্বনিও কারও কানে যাবে না জেনে ষ্টিম হুইসল বাজিয়ে দিলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। বাষ্পচালিত বাঁশী রেলগাড়ীর সিটির মত তীব্র শব্দে কু-উ-উ-উ করে উঠল বটে। কিন্তু হট্টগোল কমল না।

নিরুপায় হয়ে মাথার টুপী খুলে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রেসিডেণ্ট। সদস্যদের হুঁশ ফিরল এতক্ষণে।

গোলমাল সামান্য কমতেই সঙ্গের সাথী নস্যির ডিবে বের করলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। বিরাট কৌটোর মধ্যে থেকে একটিপ নস্যি নাকে ঠেসে দিয়ে বললেন:

'কথা আছে।'

'বলে ফেলুন!' একসঙ্গে গর্জে উঠল নিরানব্বইটা কণ্ঠ। সেই প্রথম একমত হল সমস্ত সদস্য। অ্যাকসিডেণ্ট আর বলে কাকে।

'একটা অচেনা লোক মিটিংয়ে আসতে চায়।'

'আবদার আর কী! ঢুকতে দেওয়া হবে না বাইরের লোককে। কখনো না।'

'লোকটা আসতে চায় শুধু একটা জিনিষ প্রমাণ করবার জন্যে।'

'কী? কী? কী?'

'রামরাজ্য যেমন অসম্ভব, বেলুন চালনাও তেমনি অবাস্তব।'

'তাই নাকি ? তাই নাকি ? পথ ছাড়ুন তো লোকটার ? দেখি তার শ্রীমুখখানা !'

'নাম কি বদনচাঁদের ?' শুধোলেন ফিল ইভান্স।

'রোবার !' জবাব দিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'রোবার ! রোবার ! রোবার !' হল শুদ্ধ লোক যেন একসঙ্গে ফেটে পড়তে চাইল টগবগে ক্রোধে। এতক্ষণ ধরে জমানো উত্তেজনা দিয়ে আগন্তুককে আড়ং ধোলাই দেওয়ার জন্যে হাত যেন নিশপিশ করতে লাগল প্রত্যেকের।

(৪) আশ্চর্য সেই মানুষটা

'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা শুনুন ! আমার নাম রোবার ! কানাছেলের নাম পদ্মলোচন হয় ঠিকই, কিন্তু আমি তা নই। আমার নাম যা, আমিও তাই। বয়স আমার চল্লিশ, যদিও তিরিশের বেশী মনে হয় না। লোহাপেটা শরীর আমার, মনোবল অসীম, বাহুবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও চলে। হজম শক্তির কথা যদি তোলেন তো বলব অষ্টিচ পাখীরও এমন পেট নেই—পাথর খেয়ে পাথর হজম করতে পারি মশায়।'

তাজ্জব ব্যাপার তো ! হল শুদ্ধ লোক যে কান খাড়া করে শুনছে রোবারের উদ্ভট বক্তৃতা ! দাঙ্গাহাঙ্গামা যেন ফুসমন্তর বলে থেমে গেছে বক্তার সৃষ্টি ছাড়া বক্তৃতার ঢংয়ে। লোকটা পাগল, না ধাপ্পাবাজ ? অতগুলো ক্ষ্যাপালোককে কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মত উৎকর্ণ করে রাখাও তো সোজা কথা নয় ! কয়েক মিনিট আগেও যে ঘরে মত্ত প্রভঞ্জন দাপাদাপি জুড়েছিল, এখন সেখানে ফিসফাস করতেও কি ভুলে গেল সবাই ? তোবা ! তোবা !

রোবার কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেন নি নিজের সম্বন্ধে। সত্যিই 'রোবাস্ট' চেহারা রোবারের। সারা শরীরটা যেন জ্যামিতিক ছকে গড়া। গাঁট্টাগোট্টা গর্দানের ওপর দিব্বি গোল মাথা। এ মুণ্ডর সঙ্গে তুলনা চলে শুধু ষাঁড়ের মুণ্ডর। তবে নির্বোধ মুণ্ড নয়—রীতিমত ধীমান। চোখ তো নয়, যেন আগুনের টুকরো। ফুলকি ছিটোতে পারে যখন তখন। ডুমোডুমো মাংস-পেশীর মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি আর এনার্জি যে প্রচ্ছন্ন, তা আন্দাজ করাও একটু কঠিন বই কি। চুল ছোট, ভেড়ার লোমের মত কুঁচকানো, রঙটা ইস্পাতের রঙের মত লালচে ধূসর। কপাটের মত চওড়া বুক উঠছে নামছে—ঠিক যেন

কামারশালার হাপর। বিশাল ধড়ের উপযুক্ত হাত, পা এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ। গোঁফ নেই, জুলপী নেই, আছে কেবল বড় আকারের আমেরিকান 'গোটী' অর্থাৎ ছাগল-দাড়ি। চোয়ালের শক্তি যে মারাত্মক, তা হাড়ের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়। শোনা যায়, কুমীরের চোয়ালের জোর নাকি চারশো অ্যাট্‌-মস্ফিয়ারের* সমান হতে পারে। সে তুলনায় ভাল জাতের কুকুরের চোয়ালের জোর মাত্র একশ। এই থেকে একটা অদ্ভুত অংক কষা হয়েছে। অংকটা এই: এক কিলোগ্রাম কুকুরের যদি আট কিলোগ্রাম চোয়াল-শক্তি থাকে, তাহলে এক কিলোগ্রাম কুমীরের থাকবে বারো কিলোগ্রাম, সেই অনুপাতে এক কিলোগ্রাম রোবারের চোয়াল-শক্তি দশের নীচে নামবে না কিছুতেই। অর্থাৎ রোবার মানেই কুকুর আর কুমীরের মাঝামাঝি একটা জীব।

কোন দেশের মানুষ রোবার? কোন মাটিতে জন্মেছেন এমন আশ্চর্য পুরুষ? বলা মুশকিল। কথার টান থেকে শুধু একটা জিনিসই ধরা যায়: রোবার তরতরে ইংরেজী বলেন। ইয়াঙ্কিদের মতই জড়িয়ে-মড়িয়ে কথা বলেন না।

রোবার কিন্তু বলেই চলেছেন: 'মাননীয় নাগরিকরা শুনে রাখুন, আমার মনের শক্তি দেহের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেয়। মাংসপেশীর চাইতে একরত্তিও কম শক্তি ধরেনা আমার স্নায়ুগুলী। আমি কাউকে ডরাইনা, কোন কিছুর ধার ধারি না। আমার ইচ্ছাশক্তি প্রচণ্ড—যা করব মনে করি, তা করে ছাড়ি। সারা আমেরিকা, সারা দুনিয়াটাও ব্যাগড়া দিয়ে আটকাতে পারবে না আমাকে। আমার মাথায় আইডিয়া গজালে কাউকে তার ভাগ দিই না, কারো প্রতিবাদ সহ্য করি না। এক কথায়, পায়ের তলায় আমি ঘাস গজাতে দিই না। খুঁটিয়ে বলা বা কাজ করা আমার স্বভাব। মাননীয় নাগরিকরা নইলে আমাকে ঠিক বুঝতে পারবেন না। যদি কারো মনে হয় আমি নিজের কথাতেই সাতকাহন হচ্ছি, তিনি তা মনে করতে পারেন স্বচ্ছন্দে—আমার কিছু আসে যায় না। কথার মাঝে কথা বলার আগে যা বলতে এসেছি, সেটা শুনে নিয়ে একটু ভাবুন যদিও আমার কথা শুনে পুলকিত হবার মত লোক এখানে কেউ নেই।'

সামনের সারিতে গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হয়ে গেল। ঠিক যেন সমুদ্র ফুঁসতে শুরু করেছে। ঝড় উঠল বলে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট নিজেও সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে। তাই খেঁকিয়ে উঠলেন—'আরে মশায় যা বলবার বলে ফেলুন।'

---

*ভূপৃষ্ঠের সকল পদার্থের ওপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ, তার মাপ। সমতল-ভূমিতে এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মোটামুটি ১৪,৭২ পাউণ্ড অর্থাৎ এক অ্যাটমস্ফিয়ার।

শ্রোতাদের অবস্থা বুঝে নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে রোবার যা বললেন, তা এই :

'বলছি, শুনুন কান খাড়া করে ! একশ বছর ধরে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে বিস্তর ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্ট করার পরেও এখনো অনেকের মনে অদ্ভুত একটা বিকার রয়ে গেছে। এখনও তাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রপেলার লাগিয়ে যেমন জাহাজ চালানো সম্ভব, ঠিক তেমনি বেলুন চালানোও সম্ভব। প্রপেলার লাগিয়ে শান্ত আবহাওয়ায় বেলুনকে নাড়ানো গেছে যৎসামান্য—বিকার কিন্তু মন থেকে এখনো যায় নি। এখনো তাঁরা বিশ্বাস করেন, কলে চালানো বেলুনে চেপে আকাশপথে টো-টো করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুনুন মশায়, একশ জন বেলুনিস্ট শুনে রাখুন আপনাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে—বাস্তব কোনোদিন হবে না। আপনারা মিথ্যের পেছনে ছুটে চলেছেন, লক্ষ লক্ষ ডলারকে জলে নয়—মহাশূন্যে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন ! অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে খামোকা লড়ে মরছেন !'

একী আশ্চর্য ব্যাপার ! এতখানি ধৃষ্টতার পরেও বেলুনিস্টরা আঙুল পর্যন্ত নাড়াচ্ছে না কেন ? তবে কি তারা দেখছে বক্তার স্পর্ধা কতখানি উঠতে পারে ?

রোবার বলে চলেছেন : 'বেলুন ! দু পাউণ্ড শূন্যে তুলতেও যাকে এক কিউবিক গজ গ্যাস খরচ করতে হয়, সেই বেলুন দিয়ে বাতাসের বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায় ? বাতাসে ভর করে যাকে ভাসতে হয়, বাতাসের উল্টোদিকে সে যাবে কি করে ? আমরা কি জানি না, ঝিরঝিরে সমীরণ মানেই নৌকোর পালে যে বায়ুচাপ পড়ে তা চারশ হর্স পাওয়ারের সমান ? আমরা কি ভুলে গেছি 'টে ব্রীজ' দুর্ঘটনার সময়ে প্রতি বর্গ গজে ঝড় যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তা সাড়ে আট হানড্রেডওয়েটের* সমান ? প্রকৃতির এই খেয়ালখুশীর মধ্যে ওড়বার জন্যে বেলুন সৃষ্টি হয় নি।

'প্রকৃতি যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনুকরণেই পাখীর মত ডানা লাগাতে হবে, অথবা উড়ুক্কু মাছের মত পাখনা লাগাতে হবে, অথবা স্তন্যপায়ী জীবের মত—'

'স্তন্যপায়ী জীব !' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন সদস্য।

'আজ্ঞে হ্যাঁ ! স্তন্যপায়ী জীব। বাদুড়, বাদুড় ! বাদুড় ওড়ে ঠিকই, মশাই কি ভুলে গেছেন বাদুড় নিজেই মানুষের মত স্তন্যপায়ী ? আপনি বোধহয় কখনো বাদুড়ের ডিমের ওমলেট খান নি ?'*

---

*আমেরিকান মতে এক এক হানড্রেডওয়েট একশ পাউণ্ডের সমান।

*স্তন্যপায়ী জীবরা ডিম পাড়ে না—অর্থাৎ বাদুড়ের ডিম যা ঘোড়ার ডিমও তাই—দুটোই অসম্ভব।

অপমানিত ভদ্রলোক স্রেফ গিলে ফেললেন অপমানটা।

রোবার বললেন—'তবে কি আকাশে ওড়া শিকেয় তুলে রাখব? মোটেই না। আমরা সমুদ্র জয় করেছি জাহাজ, পাল, দাঁড়, চাকা, প্রপেলার দিয়ে। আমরা আকাশকেও জয় করব বাতাসের চাইতে ভারী মেশিন দিয়ে। বাতাসের চাইতে ভারী না হলে বাতাসের চাইতে শক্তিমান হবে কি করে উড়ন্ত যান?'

আর রোখা গেল না একশজন বেলুনবাজকে! একসঙ্গে একশটা কণ্ঠে যেন একটা বন্দুক গর্জে উঠল! 'কী! এতবড় স্পর্ধা! বেলুনিস্টদের ঘাঁটিতে বসে বেলুনিস্টদের যুদ্ধে আহ্বান করা! বাতাসের চাইতে 'ভারী' মেশিন দিয়ে বাতাসে ওড়ার বারফট্টাইয়ের নিকুচি করেছে। তবে রে—'

চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না রোবারের। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে পাথরের মত চেয়ে রইলেন। ভাবখানা যেন চুপ না করলে কথা বলে আর লাভ কী?

হাতের ইঙ্গিতে শত বন্দুক নির্ঘোষকে স্তব্ধ করলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

রোবার বললেন—'ফের বলছি, উড়ন্ত যন্ত্রই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ। বাতাসই সেই থাম যার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়বে ফ্লাইং মেশিন। একটা বাতাসের থামকে সেকেণ্ডে পঁয়তাল্লিশ মিটার গতিবেগে ওপরে টেনে তুললে থামের ওপর বুটপরে হাঁটা যাবে অনায়াসে—বুটটার শুকতলার মাপ অবশ্য এক বর্গমিটারের আটভাগের একভাগ হওয়া উচিত। থামটাকে যদি সেকেণ্ডে নব্বই মিটার বেগে তুলতে পারেন, তাহলে খালিপায়েই থামের ওপর বিচরণ সম্ভব। প্রপেলার দিয়ে বাতাসকে যদি এই গতিবেগে ওপরে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাহলেই তো কেল্লা ফতে!'

রোবার নতুন কিছুই বলেন নি। অনেকদিন থেকেই এডিসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আকাশে ওড়ার এই অতি-সহজ কথাটি বারবার বলেছেন সবাইকে। হালে পানি না পেলেও একদিন কিন্তু এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই আকাশ বিজয় সম্ভব হবে।

এই কথাটিই অকাট্যযুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন রোবার তুমুল হট্টগোলের মধ্যে। কেউ তাঁকে কথা বলতে দেবেন না—তিনিও না বলে ছাড়বেন না। বেলুনিস্টদের মুখের ওপরেই তিনি শুনিয়ে দিলেন—'বেলুন দিয়ে হবে ঘোড়ার ডিম। পণ্ডশ্রমই সার হবে। জন ওয়াইজ সাড়ে এগারোশ মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকার ডাঙার ওপর, সাহস হয়নি আটলাণ্টিক পেরোতে। তারপর থেকে কি করেছেন আপনারা? কিসসু না! যেখানে ছিলেন, সেই-খানেই দাঁড়িয়ে আছেন। এক পাও এগোন নি।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট যে কি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন, তা শুধু তিনিই জানেন। রাগে ফুলতে ফুলতে এখন বললেন :

'মশায় নিশ্চয় ভুলে যান নি আতসবাজীর বেলুন দেখে ফ্রাঙ্কলিন কি বলেছিলেন ? বলেছিলেন, আজকের শিশু কাল বড় হবে। শিশু আর শিশু নেই, বড় হয়েছে বইকি।'

'বড় হয়েছে বলবেন না মিস্টার প্রেসিডেন্ট। বলুন, মোটা হয়েছে।'

সবনাশ ! রোবার দেখছি এবার সটান ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটকে ঠুকতে আরম্ভ করেছেন। এই ক্লাবই রাক্ষুসে বেলুন বানিয়ে বুক ফুলিয়ে দেখাচ্ছে সবাইকে—'দেখ গে তোমরা, আমাদের কাণ্ডটা দেখ।' রোবার কিনা সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে পেটমোটা বলে ! এতবড় স্পর্ধা ! 'ঘাড় ধরে দাও বার করে !' 'প্ল্যাটফর্ম থেকে ছুঁড়ে দিন না—বাতাসের চেয়ে ভারী কিনা হাতে নাতে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রোবারের একটা নার্ভও কাঁপল না হুমকি আর গলাবাজিতে।

শুধু বললেন—'বেলুনিস্টরা শুনুন, 'ফ্লাইং মেশিনই আসছে ভবিষ্যতে। বেলুন নয় বলেই পাখী উড়তে পারে—পাখী নিজেই তো একটা যন্ত্রবিশেষ !'

তেলেবেগুনে জলে উঠে বললেন ব্যাট ফিন 'ওড়ে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রবিদ্যার আইন মানে না মোটেই !'

'তাই নাকি ? আরে মশায়, আকাশে ওড়ার স্বপ্ন মানুষ যেদিন থেকে দেখছে সেদিন থেকে সে পাখীর মতই উড়তে চেয়েছে—পাখীর ওড়াকেই নকল করতে চেয়েছে। প্রকৃতির যন্ত্রবিদ্যাকে অনুকরণ করুন মশাই—ভুল হবে না। অ্যালবেট্রস ডানা ঝাপটায় মিনিটে দশবার, পেলিক্যান সত্তরবার—'

'একাত্তরবার' কে যেন বলে উঠল ভীড়ের মধ্যে।

'মৌমাছি ঝাপটায় সেকেণ্ডে একশ বিরানব্বইবার—'

'একশ তিরানব্বইবার !' আবার শোনা গেল সেইকণ্ঠ।

'মাছি ডানা ঝাপটায় সেকেণ্ডে তিনশ তিরিশ—'

'সাড়ে তিরিশ।'

'মশার ক্ষেত্রে অনেক মিলিয়ন*—'

'অনেক মিলিয়ার্ড*।

রোবার কিন্তু বাধা পেয়েও থামলেন না—ডানা ঝাপটানির কত গরমিলই তো রয়েছে—'

*মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ, মিলিয়ার্ড মানে এক হাজার মিলিয়ন

'কোনো গরমিল নেই!' শোনা গেল আর একটা স্বর।

'এই গরমিল থেকেই সমস্যার সমাধান বের করে নেওয়া যায়। লুসি দেখিয়েছেন ফড়িংয়ের ওজন যদিও দু'গ্রাম, কিন্তু ওজন তুলতে পারে তার দু'শ গুণ বেশী অর্থাৎ চার'শ গ্রাম। আকাশে ওড়ার সমাধান কিন্তু সেই দিনই হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, আমরা জানি, ডানার মাপ যা হবে, সেই অনুপাতে জীবটার ওজন আর আকার কম থাকবে। প্রকৃতির এই কলকব্জা—'

'যা কোনোদিন উড়বে না!' এবার বাধা দিলেন সেক্রেটারী স্বয়ং।

'উড়ছে, উড়বে,' তিলমাত্র না দমে বললেন রোবার। 'এই জাতীয় মেশিনকেই ষ্ট্রীওফোর্স, হেলিকপটার্স, অর্থপটার্স। স্প্রিং দিয়ে—'

'যা বলেছেন! পাখীর কিন্তু স্প্রিং নেই!' বললেন ইভান্স।

'পেনড কিন্তু দেখিয়েছেন, পাখী স্প্রিংয়ের মতই লাফিয়ে ওঠে, হেলিকপ্টারের মতই সটান ওঠে নামে। ভবিষ্যতের ইঞ্জিনেও থাকবে এই জাতীয় প্রপেলার—'

'স্প্রিংয়ের কেরামতি।
পাগলামি, না, বজ্জাতি!'

সুর করে গেয়ে উঠল একজন সদস্য। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো ধরল বাকী সকলে:

'স্প্রিংয়ের মত কেরামতি।
পাগলামি, না বজ্জাতি!'

বেতাল গানের সেই গিটকিরি শুনে অতিবড় সুরকারও মূর্চ্ছা যেতেন নির্ঘাৎ!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল কোরাস গান। সেই ফাঁকে বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—'অনেকক্ষণ কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আপনাকে।'

বেড়ালের ডাক আর চীৎকার শোনা গেল প্রেসিডেন্টের কথার সমর্থনে।

'মনে রাখবেন শুধু আমেরিকায় নয়, বিদেশী ইঞ্জিনীয়াররাও আকাশে ওড়ার এই তত্ত্বকথাকে বাতিল করে রেখেছেন পরপর অনেকগুলো দুর্ঘটনার পর। কনস্টানটিনোপলে ফ্লাইং সারাসেন, লিসবনে সন্ত ভোলাডোর, ১৮৫২ সালে লিটার্ন, ১৮৬৪ সালে গ্রুফ মারা গেছেন হঠকারিতার ফলে। পৌরাণিক ইকারাসের বৃত্তান্ত—'

রোবার বললেন—'যে সব নাম আপনি বললেন, তাঁদের চাইতেও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা শহীদ হয়েছেন যে তত্ত্ব প্রমাণ করতে, সে তত্ত্বকে বাতিল করা মূর্খতা।'

বলে গড় গড় করে অনেকগুলো অতি খটমট নাম আউড়ে গেলেন—প্রতিটি নামই পূজো করার মত।

অম্লানবদনে আবার বললেন ষণ্ডামার্কা আগন্তুক।—'আপনার বেলুন দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগবে দশ বছর। উড়ুক্কু যন্ত্রে লাগবে এক সপ্তাহ!'

ঝাড়া তিন মিনিট প্রতিবাদ আর প্রত্যাখ্যানের ঝড় বয়ে গেল হল ঘরে। তারপর বললেন ইভান্স:

'মিস্টার পাখী ওরফে মিস্টার ব্যোমচারী, ব্যোমযান নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বকবক করলেন। ব্যোমযানে কোনোদিন চেপেছেন?'

'চেপেছি বইকি।'

'আকাশ জয় করেছেন?'

'তা তো করবই।'

'হুরের ফর রোবার দি কনকারার! জয় হোক আকাশ রাজা রোবারের!'

'ঠিক বলেছেন—রোবার দি কনকারার! নামটা গ্রহণ করলাম! এ-নাম আমাকেই মানায়!'

'আমার কিন্তু সন্দেহ আছে!' বললেন জেম চিপ।

কপাল কুঁচকোলেন রোবার—'আমি তামাশা করছি না। কার মনে এখনো এত সন্দেহ জানতে পারি কি? নাম কি আপনার?'

'চিপ। নিরামিষাশী।'

'দেখুন মশায়, শাকান্ন-ভোজীদের পেটের নাড়িভুঁড়ি একটু বেশী লম্বা হয়—এক ফুট বেশী লম্বা তো বটেই। আপনার কানটাকেই যদি সেই অনুপাতে টেনে লম্বা করি—'

'ছুঁড়ে নামিয়ে দিন!'

'রাস্তায় ঘাড়ধাক্কা দিন!'

'ছিঁড়ে ফেলুন!'

'শূন্যে ছুঁড়ুন!'

একসঙ্গে ফেটে পড়ল সব কজন বেলুন-ভক্ত। ছুটে এল প্ল্যাটফর্মের দিকে। ঝড়ে শুকনো পাতা উড়ে যায় যেভাবে, সেইভাবে শূন্যে উঠতে নামতে লাগল শ'দুই হাত। হাতের তলায় নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হলেন রোবার। ঘনঘন বংশীধ্বনি করতে লাগল ষ্টীম হুইসল। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না। সারা ফিলাডেলফিয়া সেদিন ভেবেছিল, নির্ঘাৎ দারুণ আগুন লেগেছে কোথাও! পুকুর পুকুর জল ঢেলেও সে আগুন নিভবে না।

হঠাৎ কেঁচোর মত কুঁচকে সরে এল মারমুখো জনতা। দু'পকেটে হাত ভরে কি যেন টেনে বের করছেন রোবার। দাঁড়িয়ে আছেন উন্মত্ত সদস্যদের সামনে।

দুহাতে ঝকঝক করছে দুটো আমেরিকান রিভলবার! আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই শুরু হবে বুলেট বৃষ্টি!

রিভলবার দেখেই ক্ষণেকের জন্যে থমকে গিয়েছিল পাগলা জনতা, সেই ফাঁকে বললেন রোবার—'দূর মশাই, আপনারা আমেরিকান, না, কচু! দেখছি আমেরিগো আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি—করেছেন ক্যাবট। আপনারা, বেলুনিস্টরা, আমেরিকান নন—ক্যাবট!"

বলেই, চার পাঁচবার ফাঁকা আওয়াজ করলেন। কারো গায়ে গুলি লাগল না; কিন্তু তালতাল ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রোবার। ধোঁয়া কেটে গেল, কিন্তু রোবারকে আর দেখা গেল না। রোবার দি কনকারার যেন উড়ে চম্পট দিয়েছিল, যেন আকাশ থেকে ব্যোমযান নেমে এসে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে তাঁর রাজত্বে!

(৩) অদৃশ্য হলেন আরও ক'জন

এই প্রথম নয়; এর আগেও মিটিং করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে এসে হুজ্জৎ করেছেন বেলুনিস্টরা। ওয়ালটন স্ট্রীটে লোক চলা দায় হয়েছে, আশে-পাশের বাড়ীর বাসিন্দারা তিতিবিরক্ত হয়ে পুলিশ ডেকে এনেছে। আলোচনার নামে ঐ রকম ভীষণ গলাবাজি প্রতিবেশীরা সহ্য করবে কেন? পুলিশ এসে সবাইকে ঠেঙিয়ে রাস্তা সাফ করেছে। বেলুন নিয়ে তাদের কোনো মাথা-ব্যথা নেই, বেলুনিস্টদের সমীহ করারও দরকার মনে করে না। কিন্তু এ রকম যাচ্ছেতাই রকমের চেঁচামেচি এর আগে কখনো শোনা যায় নি। পুলিশের হস্তক্ষেপও এভাবে কোনোদিন দরকার হয় নি।

এক্ষেত্রে অবশ্য বেলুনিস্টদের লম্ফঝম্ফ খুবই যুক্তিসঙ্গত। বুকে বসে দাড়ি উপড়ানোর মতই কোত্থেকে একটা উদ্ধত লোক তাদের মিটিংয়ে ঢুকে উল্টো-পাল্টা কথা বলে গেছে। তাদেরই ক্লাবে ঢুকে অপমান করেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বিটলে শয়তানটা! একশ জনের বিশ্বাস 'বাতাসের চেয়ে হাল্কা' না হলে বাতাসে ওড়া যাবে না; আর একজন এসে বলে কিনা 'বাতাসের চেয়ে ভারী' নাহলে বাতাসে ওড়া যাবে না! লোকটার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য

যেই এক'শ জন হাত তুলেছে, অমনি যেন জাদুমন্ত্র বলে সে মিলিয়ে গেল বাতাসের মধ্যে! ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো!

সুতরাং টগবগ করে ফুটছে একশ জন বেলুন ভক্ত। এতবড় অপমান সহ্য করা কি সম্ভব? বিহিত করতেই হবে! এ-অপমান সারা আমেরিকার অপমান! বেল্লিক লোকটা কিনা আমেরিকানদের কচুর সঙ্গে তুলনা করে? আমেরিগোর বংশধর ক্যাবট-বংশধর বলে গাল পাড়ে? ইতিহাসেও এরকম অপমানের নজির নেই!

পাঁই পাঁই করে ছুটল বেলুনিস্টরা অলিতে গলিতে, ছোট রাস্তায়, পার্কে ময়দানে। ওয়ালনাট স্ট্রীটের তাবৎ বাড়ির বাসিন্দাদের টেনে তোলা হল ঘুম থেকে। সবার বাড়ী সার্চ করা হল। অসময়ে উৎপাত করবার জন্যে প্রতি-বেশীদের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রোবারের টিকি দেখা গেল না। রোবার যেন ইনস্টিটিউটের গো-অ্যাহেড বেলুনে চেপেই হাওয়া হয়ে গিয়েছেন। ঝাড়া একটি ঘণ্টা আঁতিপাতি করে খুঁজেও যখন তাঁর ছায়াও আবিষ্কার করা গেল না, তখন একশজন বেলুনিস্ট ঠিক করল দুই আমেরিকা জুড়ে এবার শুরু হবে তল্লাসি—রোবারকে সাজা না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না কেউই।

রাত এগারোটায় শান্ত হল ওয়ালনাট স্ট্রীট এবং আশপাশের অঞ্চল। শুরু হল ফের নিদ্রাদেবীর আরাধনা। ক্ষুব্ধ সদস্যরা ফিরে গেল যে-যার ঘরে। ফোর্বস গেলেন তাঁর চিনির কারখানায় দুই মেয়ের হাতে তৈরী গ্লুকোজ মেশানো চা খেতে। এক ফুট বেশী পৌষ্টিক নালী অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ির অপমান হজম করে নিরামিষাশী চিপ গেলেন নিরামিষ খানা হজম করতে।

দু'জন গণ্যমান্য বেলুনিস্ট কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চাইলেন না। বিষয়টা নিয়ে আরো আলোচনা করার জন্যে দুজনেই ঠিক করলেন আর একটু রাত করে ঘরে ফিরবেন। যদিও কস্মিনকালে এঁরা একমত হতে পারেন নি কোনো আলোচনায়—আলোচনা করতেও ছাড়েন নি। এঁরা ক্লাব প্রেসিডেন্ট আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ক্লাব সেক্রেটারী ফিল ইভান্স।

ক্লাবের দরজায় মনিবের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল ফ্রাইকোলিন। বেলুন নিয়ে দুই কর্তার মধ্যে খিটিমিটি লাগে লাগুক। তার কাজ হল আঙ্কল প্রুডেন্টকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তা যখন সম্ভব হল না, তখন সে পিছু নিল প্রুডেন্ট এবং ইভান্সের।

শুরু হল আলোচনার নামে ঝগড়া। আলোচনার আর এক নাম যদি দ্বৈতসঙ্গীত হয় তো ওঁদের দুজনের আলোচনার নাম হওয়া উচিত দ্বৈরথ যুদ্ধ!

বীরবিক্রমে দুজনে লেগে গেলেন দুজনকে ধুপোকাৎ করতে! পুরোনো রেষারেষিটা মাথা চাড়া দিল রোবারকে কেন্দ্র করে।

'আমি যদি ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হতাম তো এ-কেলেংকারী হতে দিতাম না।' বললেন ইভান্স।

'ধরুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। কি করতেন?' বললেন প্রুডেন্ট।

'কি আবার করতাম? মুখ খুলতেই দিতাম না—অপমান করা তো দূরের কথা!'

'আমার তো মনে হয় মুখ খোলার আগে মুখটা বন্ধ করাও যেত না।'

'আমেরিকায় ও কথা মানায় না, মশায়, আমেরিকায় নয়!'

কথায় কথা বেড়ে চলল, বাড়তে লাগল রাত। ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে ক্রমশঃ বাড়তে লাগল কথার উত্তাপ। ফলে, দুজনের কারোরই হুঁশ রইল না চলেছেন কোন দিকে। বাড়ী পেছনে পড়ে রইল—শহরের বাইরে এসে পড়লেন ঝগড়া করতে করতে। জায়গাটা নির্জন, জনহীন, নিস্তব্ধ।

মহা ফাঁপরে পড়ল বেচারী ফ্রাইকোলিন। জনহীন জায়গা তার মোটেই পছন্দ নয়, বিশেষ করে রাত বারোটার পর। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছাই কিছু দেখাও যায় না। চাঁদের মুখ পুড়েছে বললেই চলে। নখের কণার মত একফালি চাঁদ কি তালতাল অন্ধকার তাড়াতে পারে?

পেছনে পেছনে কেউ আসছে কী? এদিক ওদিক তাকালো ফ্রাইকোলিন। ছায়ামূর্তির মত পাঁচজনকে দেখা যাচ্ছে না? অন্ধকারে গা মিশিয়ে প্রেতচ্ছায়ার মত নিঃশব্দ চরণে ও কারা আসছে পেছনে পেছনে?

সুট করে এগিয়ে গেল ফ্রাইকোলিন। মনিবের আরো কাছে পৌঁছেও কিন্তু আলোচনার মাঝে কথা বলার সাহস হল না। ছাড়া ছাড়া কথা ভেসে আসছিল কানে। মানে হয় এত বকবকানির?

শহরের বাইরে চলে এসেছেন দুই ঝগড়াটে বেলুনিস্ট। তখনো কিন্তু হুঁশ নেই কারো। লোহার পুল পেরিয়ে এলেন এবার। অর্থাৎ নদী রইল পেছনে, সামনে ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে নিরেট অন্ধকারের মত গাছপালার জমায়েৎ। তেপান্তরের মাঠ পৃথিবীতে অনেক আছে। কিন্তু এমনটি বুঝি নেই।

পথিমধ্যে দুচার জন পথচারী চোখে পড়ল। এক কথায় তাদের রাতজাগা পাখী বললেই চলে। বারোমাস বাড়ী ফেরে গভীর রাতে।

এবার বেশ আঁৎকে উঠল ফ্রাইকোলিন। দূর থেকে স্পষ্ট দেখল, লোহাপুল পেরিয়ে আসছে জনা পাঁচ ছয় মুখকো ছায়া মূর্তি। শরীরী বিভীষিকা যেন কালো প্যান্থারের মত শব্দহীন সঞ্চারে আসছে···আসছে···আসছে!

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্রাইকোলিনের। মনে হল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই বুঝি খুলে পড়ে যাবে সন্ধিস্থল থেকে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল গেঁড়িগুলির চোখের মত। অবাক হবার কিছু নেই। ক্রাইকোলিন যে পয়লা নম্বরের ভীতু। সাহস জিনিসটা ওর কুষ্ঠীতে লেখা নেই।

খাঁটি সাউথ ক্যারোলিনা নিগ্রো বলতে যা বোঝায়, ক্রাইকোলিন তাই। মগজটা উজবুকের, ধড়টা নিবীর্যের। বয়স মোটে একুশ! জন্মসূত্রে ক্রীতদাস সে নয়। গোলামগিরি এর আগে কখনো করতে হয় নি। দাঁত বার করে হাসা তার স্বভাব, লোভ প্রচণ্ড এবং হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে আর কিছু চায় না। কাপুরুষ অনেকরকম হয়, কিন্তু এমন চমকপ্রদ কাপুরুষ আর দুটি হয় না। আঙ্কল প্রুডেন্টের দাসত্ব করছে বছর তিনেক। এই তিন বছরে বহুবার তাকে বুটের ঠোক্করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার অদম্য বাসনা হয়েছে মনিবের—সামলে নিয়েছেন প্রতিবারেই শুধু ওর ভবিষ্যৎ ভেবে। কে চাকরি দেবে এমন আপোগণ্ডকে? আঙ্কল প্রুডেন্ট নিজে ডাকাবুকো দুর্মদ দুর্দান্ত। ঠিক উল্টো তাঁর ভৃত্যটি। তাঁর কত দুরন্ত অ্যাডভেনচার যে পণ্ড হয়েছে এই অনামুখো চাকরের জন্যে তার ইয়ত্তা নেই। তবে একটা গুণ আছে ক্রাইকোলিনের। সে পেটুক নয় এবং হদ্দ কুঁড়ে বলতে যা বোঝায়, তা নয়।

খাস চাকর হিসেবে ক্রাইকোলিন বেচারীর ভবিষ্যৎটা যে মোটেই উজ্জ্বল নয় তাও কি এরপর বলে দিতে হবে? আঙ্কল প্রুডেন্টের চাকরী না নিয়ে যদি বোস্টনে স্নেফেলের চাকরী করত, তাহলে সে বেঁচে যেত। সুইজারল্যাণ্ড গিয়ে বসে থাকত ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে। আঙ্কল প্রুডেন্ট চান প্রতিদিন নতুন নতুন বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে—তাল মিলিয়ে চলা ক্রাইকোলিনের কর্ম নয়।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ওর দোষগুণ জানতেন বলেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। ক্রাইকোলিনের আরও একটা গুণ ছিল। নিগ্রোর ছেলে হলে কি হবে, নিগ্রোদের মত গা-জ্বালানো ইংরেজী বলত না সে। ব্যাকরণের ব-ও থাকে না নিগ্রোদের ইংরেজীতে। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের পিণ্ডি না চটকে নিগ্রোরা যেন ইংরেজী বলতে পারে না। ক্রাইকোলিন আদর্শ কাপুরুষ হতে পারে, আদর্শ নিগ্রো নয়।

এ-হেন ক্রাইকোলিনের বুকের ভেতরটা ধড়াশ ধড়াশ করে উঠল রাত বারোটায় শহরের বাইরে মূর্তিমান আতংকের মত ছায়ামূর্তিগুলো দেখে। পশ্চিমদিকে গাছপালার মগডালে হেলে পড়েছে নখের কণার মত ফালি চাঁদ। ছিটেফোঁটা যে-টুকু আলো পাতার মধ্যে দিয়ে ঠিকরে আসছে, তাতে ছায়ামূর্তিগুলোকে আরো অস্পষ্ট, আরো কুটিল মনে হচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়ে এদিক

ওদিক তাকাল ক্রাইকোলিন। দুশমনের দল আরো কাছে এগিয়ে এসেছে! ওদের মতলব আঁচ করে রক্ত হিম হয়ে গেল কাপুরুষ ক্রাইকোলিনের।

চেঁচিয়ে উঠল ভাঙা গলায়—'মাস্টার আঙ্কল'!

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টকে এই নামেই ডাকে ক্রাইকোলিন। প্রেসিডেন্ট নিজেও পছন্দ করেন সম্বোধনটা।

দুই তাকিকের তর্ক তখন চরমে উঠেছে। কথার তোড় তো নয়, যেন মেল ট্রেন ছুটছে—সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে হাঁটার বেগ। যেন ছুটে চলেছেন দুই ঝগড়াটে বেলুনিস্ট। দেখতে দেখতে লোহাপুল আর নদী রইল অনেক পেছনে। সামনে এক জঙ্গল গাছপালা। চাঁদের মরা আলো মগডালে আটকে যাচ্ছে। তারপরেই ধু-ধু প্রান্তর। টিলা নেই, গাছ নেই, কিছু নেই, ঠিক যেন একটা সেকেলে অ্যাম্ফিথিয়েটার—উন্মুক্ত রঙ্গালয়।

কথার কচকচানি নিয়ে তন্ময় হয়ে না থাকলে দুই বেলুনিস্ট জিনিসটাকে দেখতে পেতেন। ফাঁকা মাঠ কিন্তু মোটেই ফাঁকা নেই। রাতারাতি যেন কিম্ভুতকিমাকার ময়দার কল গজিয়ে উঠেছে তেপান্তরের মাঠে; ঘনায়মান অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে কতকগুলো পাল আর ডানার সমষ্টি। রহস্যজনক বস্তুটা নিথর নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মত!

শুধু প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী নয়, ক্রাইকোলিন পর্যন্ত দেখতে পেল না দিগন্ত-বিস্তৃত ফেয়ার মন্ট পার্কের অদ্ভুত রহস্যকে। ক্রাইকোলিন বেচারার অবশ্য দোষ নেই। সে সামনে দেখবে কি, পেছনে আগুয়ান আতংকদের চোখে চোখে রাখতেই ব্যস্ত। ভয়ের চোটে প্রাণটা উঠে এসেছে গলার কাছে, হাঁটু এমন অবশ হয়ে গেছে যে হাঁটতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে মাঠের মধ্যে। গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে কুলকুল করে। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে সজারুর কাঁটার মত। এল! এল! এসে গেল পেছনে খুনে ডাকাত চোরের দল।

ভির্মি যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেও কোনমতে শেষ শক্তি দিয়েও চেঁচিয়ে উঠল বিকল গলায়—'মাস্টার আঙ্কল!'

'আচ্ছা, আপদ তো!' খেঁকিয়ে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—ডাকাত পড়ল নাকি? চেঁচাচ্ছিস কেন অমন করে?'

এর বেশী কিছু বলবার সময় পেলেন না আঙ্কল প্রুডেন্ট। ঝগড়া করবেন, না কথা বলবেন?

বংশীধ্বনি শোনা গেল পেছনে। দপ করে সার্চলাইট জ্বলে উঠল সামনের

প্রান্তরে। ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ইসারায় কথা বলাবলি হয়ে গেল দুদলের মধ্যে।

সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছজন লোক লাফিয়ে পড়ল তিনজনের ওপর। প্রেসিডেন্টের ওপর দুজন, সেক্রেটারীর ওপর দুজন আর ফ্রাইকোলিনের ওপর দুজন। শেষের দুজনের অবশ্য দরকার ছিল না। আত্মরক্ষার কোনো ক্ষমতাই ছিল না অপদার্থ নিগ্রো তনয়ের। তবে হ্যাঁ, লড়ে গেলেন বটে প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী।

তবে পারলেন না। পারবেন কি করে? কথা বলে আর পা চালিয়ে এমনিতেই বেদম হয়ে পড়েছিলেন দুজনে। তার ওপর আততায়ীরা চোখের পলক ফেলবারও সময় দিল না। বাঘের মত ঘাড়ে পড়েই চক্ষের নিমেষে মুখের ভেতর কাপড় ঠুসে বেঁধে ফেলল চোখ, হাত আর পা! ঘাড়ে ফেলে বয়ে নিয়ে গেল মাঠের মধ্যে দিয়ে। আততায়ীরা কেউই কিন্তু চোর ছ্যাঁচোড় নয়। রীতিমাফিক গোছাগোছা ডলার ছিল প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারীর পকেটে, কিন্তু কেউ তো পকেটে হাত পুরল না! তবে এরা কারা?

মিনিট খানেকের মধ্যেই তক্তার মত কিসের ওপর যেন শুইয়ে দেওয়া হল এবং পিছমোড়া করে বাঁধা হল বন্দীদের, পিঠের তলায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল পাটাতন।

দড়াম করে বন্ধ হল দরজার পাল্লা। পরক্ষণেই ভেসে এল খিল তুলে দেওয়ার আওয়াজ। না, আর কোন সন্দেহ নেই। সত্যি সত্যিই তাহলে খাঁচায় বন্দী হলেন ডানপিটে বেলুনিস্টরা!

ঠিক তার পরেই কানে ভেসে এল অদ্ভুত একটা শব্দের ঢেউ। গুন্-গুন্-গুন্-গুন্ করে কোথায় যেন ভ্রমর গুঞ্জন হচ্ছে···ফর-ফর-ফর-ফর শব্দে যেন বাতাস ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে···ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দে যেন এলাহি কাণ্ডকারখানা চলেছে!

নিস্তব্ধ রাতে এছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

পরের দিন ভোর থেকেই হইচই পড়ে গেল ফিলাডেলফিয়ায়। আগের রাতে ধূমকেতুর মত একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছিল ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটে। নাম তার রোবার—রোবার দি কনকারার! বেলুনিস্টদের বাঁদর নাচ নাচিয়ে লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

তারপর থেকেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বেলুনিস্টদের পালের গোদা দুজনকে। প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী নিখোঁজ হয়েছেন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ফিলাডেলফিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও ত্রজনকে পাওয়া গেল না। ফিলাডেলফিয়ার, পেনসিল-ভানিয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সব কটা খবরের কাগজ অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বাজার গরম করল যথাসাধ্য। কিন্তু টিকি খুঁজে পাওয়া গেল না নিখোঁজ তিনজনের! একী কাণ্ড! ধরিত্রী কি তাহলে সহসা দু'ফাঁক হয়ে গিলে নিয়েছেন ডাকাবুকো বেলুনিস্টদের?

(৬) প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারীর সাময়িক সন্ধি

চোখ, মুখ, হাত পা বাঁধা অবস্থায় পুঁটলীর মত গড়াগড়ি যেতে কার ভাল লাগে? আঙ্কল প্রুডেণ্ট, ফিল ইভান্স, ফ্রাইকোলিনেরও কষ্ট হচ্ছিল খুবই। মালগাড়ীর কম্পার্টমেণ্টে পুলিন্দার মত তাঁদের ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাও বোঝবার উপায় নেই। এ-অবস্থায় যে কোনো তেজী মানুষের রক্ত ফুটতে থাকে। আঙ্কল প্রুডেণ্ট আর ফিল ইভান্সও রাগে ফুলছেন। বিশেষ করে রগচটা প্রেসিডেণ্টের মেজাজ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা না লিখলেও চলে। বিপাক আর বলে কাকে! প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, বেলুন ক্লাবের পরবর্তী মিটিংয়ে আর বুঝি হাজির থাকা গেল না।

ফ্রাইকোলিনের অবস্থা অবশ্য আরো শোচনীয়। চোখ বন্ধ, মুখও বন্ধ। তবে কি সে মরে গিয়েছে? ফ্রাইকোলিনের বারবার মনে হচ্ছিল, পরলোক এসে গিয়েছে। যমদূতেরা এল বলে!

ঘণ্টাখানেক আড়ষ্টভাবে পড়ে রইলেন বন্দীরা। কেউ এল না। কুশল জিজ্ঞাসা দূরের কথা, ধড়ে প্রাণগুলো টিঁকে আছে কিনা, তা দেখতেও এল না। মড়ার মত কাঁহাতক পড়ে থাকা যায়? মাথায় রক্ত চড়ে গেল প্রেসিডেণ্টের। কিন্তু মুখ খোলা নেই যে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবেন, চোখ খোলা নেই যে চোখের আগুনে ভস্ম করবেন। কিন্তু, কান তো খোলা আছে। সুতরাং কান পেতেই শোনা যাক কি চলেছে আড়ালে আবডালে।

কিন্তু সে গুড়েও বালি। ফর-র-র-র জাতীয় উদ্ভট একটা শব্দ ছাড়া কোনো শব্দও যে ছাই শোনা যাচ্ছে না! আচ্ছা ফ্যাসাদ তো!

ফিল ইভান্স ইতিমধ্যে মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর কব্জির বাঁধনও আলগা করে এনেছিলেন। আরও কিছুক্ষণ কসরৎ করায় সরে গেল দড়ির গিঁট,মুক্ত হল হাত।

বাঁধন তো খসল, কিন্তু কব্জি তো অবশ হয়ে গিয়েছে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ

হয়ে আসায়। জোরে জোরে ঘষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার পর ফিল ইভান্স চোখের পটি খুললেন, মুখের কাপড় সরালেন। ছুরী দিয়ে গোড়ালীর দড়িও কাটলেন। যে আমেরিকানের পকেটে ছুরি থাকে না তাকে আমেরিকান বলা যায় না। ছুরীর মহিমা বোঝা গেল সেইদিন।

চোখের বাঁধন খুলেও কিন্তু প্রায় অন্ধ হয়েই রইলেন ফিল ইভান্স। ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপরে, ছ'ফুট উঁচু একটা ঘুলঘুলি দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অতি-ক্ষীণ একটা আলোক-রশ্মি।

চির প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত-পায়ের বাঁধন ছুরী দিয়ে ঘচাঘচ করে কেটে দিলেন ইভান্স। হোক প্রতিদ্বন্দ্বী, জব্দ করার সময় এটা নয়।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। টান মেরে খসিয়ে আনলেন চোখের আর মুখের বাঁধন।

'ধন্যবাদ' বললেন ব্যথা-কাতর গলায়।

'ফিল ইভান্স ?'

'আঙ্কল প্রুডেন্ট ?'

'আমা কিন্তু এখন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টও নই, সেক্রেটারীও নই। কেউ কারো শত্রুও নই।'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিলেন ফিল ইভান্স। 'আমাদের দুজনের শত্রু এখন একজন। নাম তার—'

'রোবার !'

'হ্যা, রোবার।'

শত্রু সম্বন্ধে আর দ্বিমত রইল না দুজনের মধ্যে।

'এবার ফ্রাইকোলিনের দড়ি কাটা যাক', বললেন ফিল ইভান্স।

'না, না। মুখ খুললেই কাঁদুনি গেয়ে মাথাটা গরম করে দেবে। কাজের কথাগুলো আগে সেরে নিই।' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'কি কথা ?'

'প্রাণে বাঁচার কথা।'

'অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা ?'

'হ্যা, অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা।'

কিডন্যাপার লোকটা যে রোবার স্বয়ং তাতে কোনো সন্দেহই নেই। রোবার না হয়ে অন্য কেউ হলে এতক্ষণে পকেট সাফ হয়ে যেত, আঙুলের দামী আংটি উধাও হত, ঘড়ি টড়ি খুলে নিত। টুঁটি কাটত এবং লাশগুলো ভাসিয়ে দিত নদীর জলে। রোবার বলেই পুঁটুলি পাকিয়ে ফেলে রেখে

দিয়েছেন—কোথায় ? সেই রহস্যের সমাধান আগে দরকার। প্রাণে বাঁচার কথা পরে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন—'মিটিং থেকে বেরিয়ে যদি চোখদুটো খোলা রাখতাম, তাহলে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। রোবার নিশ্চয় একা যান নি মিটিংয়ে, দোরগোড়ায় স্যাঙাতদের মোতায়েন করে গিয়েছিলেন। আমরা ঝগড়া নিয়ে তন্ময় ছিলাম বলে তাদের দেখিনি। ফিলাডেলফিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলেও ওরা সুবিধে করতে পারত না। অবিবেচকের মত ফেয়ার মণ্ট পার্কে এসে ওদের কাজটাই সহজ করে দিয়েছি। দূরদর্শী রোবার তাই এত সহজে কব্জায় আনতে পারল আমাদের।'

'ঠিক বলেছেন। সিধে বাড়ী না গিয়ে গুখুরির কাজ করেছি', সায় দিলেন ফিল ইভান্স।

'গুখুরির কাজ করাটাই তো ভুলের লক্ষণ।' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

ঠিক সেই সময়ে পাঁজর ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল অন্ধকার কোণ থেকে।

'ওকী।' শুধোলেন ইভান্স।

'কিছু না!' স্বপ্ন দেখছে ফ্রাইকোলিন।' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'ফেয়ারমণ্ট পার্কে আমাদের পিছমোড়া করে বাঁধার পর এখানে এনে ফেলতে ওদের ঠিক দু'মিনিট লেগেছে। অর্থাৎ, আমরা ফেয়ারমণ্ট পার্কের মধ্যেই রয়েছি।'

'পার্কের বাইরে নিয়ে গেলে টের পেতাম বইকি।'

'ঠিক বলছেন। গাড়ী ছাড়া নিয়ে যাবেই বা কি করে। ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া সে রকম যানবাহনই বা কোথায়।'

'যা বলেছেন! নৌকোয় তুললে দুলুনি টের পেতাম।'

'ঠিক কথা তাহলে, আমরা এখনো খোলামাঠে রয়েছি। চম্পট দেবার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। পরে এসে রোবারকে একহাত নেওয়া যাবে'খন।'

'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর চড়াও হওয়ার ঠেলাটা বুঝিয়ে দেওয়া যাবে'খন।'

'চড়া দাম আদায় করব কিন্তু।'

'তা আর বলতে? কিন্তু লোকটা কে? দেশ কোথায়? ইংরেজ না, জার্মান না ফরাসি?'

'স্কাউণ্ড্রেল। তার বেশী কিছু নয়', বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'উঠে পড়ুন এবার। আর দেরী কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত সামনে বাড়িয়ে আঙুলের ডগাগুলি বুলিয়ে চললেন দুজনে

মসৃন দেওয়ালের ওপর। ভেবেছিলেন, ছেঁদা কি ফাটল হাতে ঠেকবে। কিন্তু জোড় পর্যন্ত নেই কোথাও! অবাক কাণ্ড তো!

দরজা থাকলেও খাঁজ থাকবে দেওয়ালে। কিন্তু কিচ্ছু নেই এ কি রকম দেওয়াল? নাঃ এ-দেওয়াল ভেদ করে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই! বড়সড় একটা ফুটো বানাতে হবে দেওয়ালের গায়ে। সম্ভব হবে তো?

'ফর-ফর-ফর-ফর শব্দটার কি আর শেষ নেই?' শব্দটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল ফিল ইভান্সকে। 'কিসের আওয়াজ এটা?'

'হাওয়ার।'

'পার্কে যখন ঢুকি, তখন তো হাওয়া ছিল না।'

'ছিল না ঠিক, কিন্তু এ-শব্দটা হাওয়ার।'

ছুরীর ফলা দিয়ে দেওয়াল কাটতে গেলেন ফিল ইভান্স, কিন্তু কাটা তো দূরের কথা, আঁচড় কাটতেও পারলেন না। কয়েক মিনিটের মেহনৎই সার হল। ছুরীর ডগা ভোঁতা হয়ে ভেঙে উড়ে গেল—ফলা হল করাত।

'কাটছে?' শুধোলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'উঁহু।'

'দেওয়াল কি লোহার চাদরের?'

'না। হলে ধাতুর ঠনঠন শব্দ পেতাম।'

'তবে কি লোহাকাঠের?'

'লোহারও নয় কাঠেরও নয়।'

'তবে কিসের?'

'বলা সম্ভব নয়, ইস্পাতও হার মানছে, এইটুকু শুধু বলতে পারি।'

ধাঁ করে ক্ষেপে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। দমাদম কিল, চড়, ঘুসি, লাথি মারতে লাগলেন দেওয়ালে। এমনভাবে অন্ধকার আঁকড়াতে লাগলেন, যেন টুঁটি টিপেছেন রোবারের।

'প্রুডেন্ট, মাথাটা ঠাণ্ডা করুণ। নিজে একবার ছুরী নিয়ে দেখুন দিকি।'

দেখলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। কিন্তু অমন দারুণ ছুরীও হার মানল দেওয়ালের কাছে। আঁচড়ও পড়ল না। ক্রিস্ট্যালের দেওয়াল নাকি?

সুতরাং দেওয়াল ফুটো করে চম্পট দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বেরোতে গেলে দরজা দিয়েই বেরোতে হবে। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কী? কিন্তু জবু থবু হয়ে বসে থাকা ইয়াঙ্কিদের রক্তে নেই। তাই গলা ফাটিয়ে রোবারের বাপান্ত করা হল। ঊর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি পর্যন্ত চটকানো হয়ে গেল—অশ্রাব্য সেই গালিগালাজ রোবারের

কানে গেলেও নিশ্চয় নির্বিকার ছিলেন তিনি। তাঁর অটল চরিত্রের নমুনা ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের মিটিংয়ে কে না দেখেছে!

আচম্বিতে ককিয়ে উঠল ফ্রাইকোলিন! যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে, এমনিভাবে তেউড়ে গেল সারা শরীর। সর্বনাশ! পেট খেঁচে ধরেছে নাকি? হাত-পায়ের শির টেনে ধরলেও অবশ্য এমনি হয়। মায়া হল আঙ্কল প্রুডেন্টের। ছুরী বার করে কেটে দিলেন হাতপায়ের দড়ি।

না কাটলেই বুঝি ভাল করতেন। মুখের ন্যাকড়া খসে পড়তেই তেড়েমেড়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথার স্রোত। হা-হুতাশ থেকে আরম্ভ করে নাকে কান্না পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। শুধু ভয় পায় নি, ক্ষিদেও পেয়েছে তার। ফ্রাইকোলিনের মগজ দুর্বল হতে পারে, উদর নয়। বর্তমান যন্ত্রণার উৎসটি কোথায়, পেটে, না মাথায়—ঠিক ধরা গেল না।

'ফ্রাইকোলিন!' ধমকে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'মাস্টার আঙ্কল। মাস্টার আঙ্কল!' হাঁউমাউ করে উঠল নিগ্রো-তনয়।

'না খেয়ে মরবার সম্ভাবনা আছে এখানে জানি। তবুও আমরা দুজন অন্ততঃ মরব না।'

'আমাকে খাবেন নাকি?' আঁতকে উঠল ফ্রাইকোলিন।

'এরকম অবস্থায় পড়লে সব নিগ্রোকেই খাবার হতে হয়। বাঁচতে যদি চাস তো এখন চুপচাপ থাকবি যাতে তোর কথা আমার মনেই না থাকে।'

'কথা বললেই হাড় খাব মাস খাব চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।' হুমকি দিলেন ফিল ইভান্স।

ওরে বাবা! সাধের শরীরটা দিয়ে কর্তাদের পেট ভরানোর কোন বাসনাই ছিল না ফ্রাইকোলিনের। সুতরাং উঁ-আঁ, গোঁ-গাঁ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না তার মুখে।

সময় যায়, দরজা খুলে বা দেওয়ালে সিঁধ কেটে বেরোনোর আশা দুরাশাই থেকে যায়। কিসের দেওয়াল এটা? ধাতুর নয়, কাঠের নয়, পাথরের নয়। ছোট কুঠরিটা আগাগোড়া বিচিত্র সেই বস্তু দিয়ে নির্মিত। মেঝেতে পা ঠুকে কিন্তু খটকা লাগল। আওয়াজটা যেন কেমনতর। ফাঁপা নয়। নিরেটও নয়। কোনো বস্তু নিরালম্ব হয়ে শূন্যে ভাসলে পা ঠোকার আওয়াজ এমনি শোনায়। পায়ের তলার মেঝে যেন জমিতে ঠেকে নেই! সব চাইতে গোলমেলে ব্যাপার হল বিদঘুটে ঐ আওয়াজটা। ফর-র-র-র শব্দটা মেঝের মধ্যে দিয়ে, দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেন তরঙ্গাকারে বয়ে চলেছে! তাজ্জব ব্যাপার তো!

'আঙ্কল প্রুডেন্ট !' ডাক দিলেন ফিল ইভান্স।

'কি হল ?' সাড়া দিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'আমাদের জেলখানাটা এক জায়গায় আছে তো ? নড়ে নি ?'

'কি করে বলব ?'

'জেলখানায় ঢোকবার সময়ে ঘাসের গন্ধ, পার্কের গাছপালার রজন-রজন গন্ধ নাকে আসছিল। কই এখন তো সে গন্ধ পাচ্ছি না !'

'কথাটা খাঁটি। গন্ধ তো কই পাচ্ছি না।'

'কেন পাচ্ছি না ?'

'কিন্তু রাস্তা দিয়ে বা নদী দিয়ে জেলখানাকে বয়ে নিয়ে গেলে টের পেতাম নয় কি ?'

আবার গুঙিয়ে উঠল ফ্রাইকোলিন। মনে হল, এই বুঝি তার শেষ গোঙানি। তারপরেই অবশ্য আরও কয়েকটা গোঙানি শুনে বোঝা গেল, প্রাণটা এখনো বেরোয়নি।

ফিল ইভান্স বললেন—'আমার তো মনে হয় শেষ পর্যন্ত রোবারের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের।'

'আমারও তাই মনে হয়। তখন কয়েকটা কথা বলব তাঁকে।

'কি বলবেন ?'

'বলব যে প্রথম দিকে তাঁকে চোয়াড়ে মনে হয়েছিল, এখন অসহ্য লাগছে।'

হঠাৎ ফিল ইভান্স লক্ষ্য করলেন ঘুলঘুলি দিয়ে যেন ভোরের আলো আসছে। অর্থাৎ এখন ভোর চারটে। জুন মাসের এই সময়ে চারটে বাজতে না বাজতেই লাল হয়ে যায় ফিলাডলফিয়ার পূর্বদিগন্ত।

পকেটঘড়ি বাজিয়ে দেখলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। ছোট ঘড়ি, কিন্তু ঘড়ির মত ঘড়ি। তাঁর সহযোগীর কারখানায় তৈরী। ঘড়ি তো বন্ধ হয় নি—টিক টিক বেশ চলছে। অথচ ঘড়িতে পৌনে তিনটে বাজল কেন ?

'অদ্ভুত ব্যাপার তো !' ফিল ইভান্স অবাক হলেন 'পৌনে তিনটে মানে শেষ রাত—আকাশ তো এখনো অন্ধকার থাকা উচিত।'

'ঘড়ি বোধহয় স্লো হয়ে গেছে,' বিমূঢ়কণ্ঠে বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'হুইলটন ওয়াচ কোম্পানীর ঘড়ি স্লো চলবে ! বলেন কী !'

কারণ যাই হোকনা কেন, দেখতে দেখতে ফর্সা হয়ে এল আকাশ। ভোর যেন দ্রুত ছন্দে আসছে—ফিলাডেলফিয়ায় কিন্তু ঝট করে ভোর হয় না সময় নেয়, নীচের দিকে লঘিমা অঞ্চলেই বরং দেখা যায়, অন্ধকার যেন পালাবার পথ পায় না পূর্বদিগন্তে। মাথা গুলিয়ে গেল আঙ্কল প্রুডেন্টের ! এ আবার কি রহস্য !

'জানালায় উঠে দেখলে হয় না ?'

'উত্তম প্রস্তাব। ক্রাইকোলিন্, উঠে আয়! হাঁক দিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

উঠে দাঁড়ালো নিগ্রো ভৃত্য।

'দেওয়ালে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়া। ইভান্স. আপনি উঠে পড়ুন ওর কাঁধে।'

'চমৎকার প্ল্যান!'

মুহূর্তের মধ্যে ক্রাইকোলিনের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে উঠলেন ইভান্স। ঘুলঘুলির কাঁচ এমন কিছু মোটা নয়। জাহাজের পোর্টহোলে যেমন পেটমোটা কাঁচ থাকে, সেরকম নয়। সাদাসিদে কাঁচ।

নীচে থেকে হুঙ্কার দিলেন প্রুডেন্ট—'কাঁচটা ভেঙে ফেললেই তো হয়। ভালোভাবে দেখা যাবে।'

ছুরীর বাঁট দিয়ে জোরে ঘা মারলেন ইভান্স। নিরেট শব্দ শোনা গেল—কাঁচ ভাঙল না।

আরো জোর মারলেন ইভান্স। অটুট রইল কাঁচ।

'এ-কাঁচ ভাঙা যায় না!' বললেন ইভান্স।

সত্যি সত্যিই কাঁচটা যেন সীমেন্স পদ্ধতিতে তৈরী। নইলে অত চোট খেয়েও অটুট থাকে কি করে?

আলো আরো বেড়েছে। ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এবার দেখা যাচ্ছে।

'কি দেখছেন?' শুধোলেন প্রুডেন্ট।

'কিচ্ছু না।'

'সেকি কথা! গাছপালা?'

'না।'

'মগডাল?'

'না।'

'তাহলে কি ফাঁকা জায়গা থেকে সরে এসেছি?'

'পার্ক থেকেই সরে এসেছি বলতে পারেন।'

'বাড়ীর ছাদ চোখে পড়ছে?'

'না।'

'মিনার গম্বুজ মনুমেন্টের চূড়ো?' ক্রমশঃ রেগে উঠতে লাগলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'না।'

'বলেন কী। ফ্ল্যাগের ডাণ্ডা, গির্জের চূড়ো, চিমনীর মাথা?'

'আকাশ ছাড়া কিছু না।'

এই কথা বলতে না বলতে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়াল বিশালকায় এক পুরুষ।

রোবার!

'মাননীয় বেলুনিস্টরা, আপনারা মুক্ত। যেখানে খুশী যেতে পারেন।'

'যেখানে খুশী যেতে পারি?' সোল্লাসে বললেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট।

'নিশ্চয়—তবে অ্যালবেট্রসের চৌহদ্দির মধ্যে।'

কারাকক্ষ থেকে উল্কার মত ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ইভান্স ও প্রুডেণ্ট। চার হাজার ফুট নীচে পায়ের তলায় একটা সম্পূর্ণ অচেনা দেশ।

(৭) অ্যালবেট্রসের ডেকে

'মানুষ কবে পৃথিবীর পিঠে হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে নীলিমায় পা ভাসিয়ে আকাশের সীমাহীন শান্তির মধ্যে আস্তানা নেবে বলতে পারেন?'

এ প্রশ্ন করেছিলেন ক্যামিল ফ্লামারিওন। জবাবে শুনেছিলেন, মানুষ যেদিন যন্ত্রবিদ্যাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে শূন্যে ওড়ার বিদ্যাকে কব্জায় আনবে—সেইদিন। বছর কয়েকের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি আরো অনেক কাজে লাগবে—সেইদিন।

১৭৮৩ সালে মঁগলফিয়ের ভ্রাতার্স উদ্ভাবিত ফায়ার-বেলুন আকাশে ওড়ার অনেক আগে চার্লস নামে এক চিকিৎসক পাখীর অনুকরণে একটা যন্ত্র বানিয়েছিলেন। যন্ত্রের সাহায্যে পাখীকে নকল করে আকাশে ওড়ার সেই হল প্রথম প্রচেষ্টা।*

ডেডেলাসের ছেলে মাথা-পাগলা ইকারাসও ঠিক এই কাণ্ড করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। সূর্যের দিকে উড়তে গিয়ে রোদের তাতে তাঁর মোম দিয়ে জোড়া ডানার মোম গলে গিয়েছিল!

কিন্তু এ হল পৌরাণিক কাহিনী। আধুনিক যুগেও আকাশে ওড়ার জন্যে যন্ত্রবিদ্যার শরণাপন্ন হয়েছিলেন শেক্সপিয়ার দান্তে, লাওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি এবং

* শোনা যায়, পাঁচশ বছর আগে দান্তে নামে এক বিজ্ঞানী নকল পাখায় ভর দিয়ে একটা হ্রদের ওপর খানিকটা উড়েছিলেন।

ওইডট্ট। আড়াইশ বছর পরে দেখা গেল আবিষ্কারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে হুহু করে। ১৬৪২ সালে মার্ক্ ইস স্ত ব্যাকুইভিল ডানা লাগিয়ে সীন-য়ের ওপর উড়তে গিয়ে পড়ে গেলেন এবং হাতটা ভাঙলেন। ১৭৬৮ সালে দুটো প্রপেলার লাগানো একটা মেশিনের পরিকল্পনা করলেন পকটন; একটা প্রপেলার আকাশযানকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখবে, আর একটা সামনে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবে। ১৭৮১ সালে প্রিন্স অফ ব্যাডেনের স্থপতি মিরবেন নির্মাণ করলেন একটা অভিনব ব্যোমযান। ১৭৮৪ সালে স্প্রিং চালিত হেলিকপটার আবিষ্কার করলেন লনয় এবং বেনভেন্থ। ১৮০৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার জ্যাকুইস ডেগেন চেষ্টা করলেন আকাশে ওড়ার। ১৮১০ সালে একটা ইস্তাহার বিলি করে 'বাতাসের চাইতে ভারী' মেশিন বাতাসে ভাসানোর থিওরী প্রচার করলেন নানতেন-য়ের ডেনো। ১৮১১ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে বহু গবেষণা এবং আবিষ্কারের জন্য কীর্তিমান হলেন ডারব্লিনগার, ভিওয়াল, সার্তি, ডুবোচেট এবং কাগনিয়ার্ড স্ত ল্যাটুর। ১৮৪২ সালে ইংলণ্ডের হেনসন বাষ্পচালিত প্রপেলারের সাহায্যে আকাশে ওড়ার ফন্দী আঁটলেন। ১৮৪৫ সালে বেরোলো কসাস-য়ের আকাশে ওড়ার প্রপেলার। ১৮৪৭ সালে পাখীর ডানার মত ডানা লাগানো হেলিকপটার বানালেন ক্যামিল ভার্ট। ১৮৫২ সালে দুটো ঘটনা ঘটল, কলে চালানো প্যারাস্যুটে উঠে এক্স-পেরিমেণ্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন লেটুর, চার-চারটে ঘুরন্ত ডানাওয়ালা মেশিনে আকাশ বিহারের প্ল্যান ফাঁদলেন মাইকেল লুপ। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এলেন আরো অনেকে—তাঁদের ফিরিস্তি দিতে গেলে কলম আর থামতে চাইবে না। বহু উৎসাহী যন্ত্রবিদ নকসা আঁকলেন। মেশিন বানালেন, প্রাণ হারালেন। 'বাতাসের চাইতে ভারী' মেশিন দিয়ে আকাশে উড়তে যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের নিয়ে একটা সমিতি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল। সবশেষে এলেন রোবার।

বেলুন নিয়ে যাঁরা আকাশ জয় করতে চান, রোবার তাঁদের অনুকম্পা করেন। কিন্তু 'বাতাসের চাইতে ভারী' মেশিনে চেপে যাঁরা আকাশ বিহার করতে চান, রোবার তাঁদের খাতির করেন। এই থিওরীর প্রবক্তা যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেককে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এঁদের মধ্যে আছেন ইংরেজ, আমেরিকান, ইটালিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান, ফরাসি। বিশেষ করে ফরাসি উদ্ভাবকের ওপর রোবারের দুর্বলতা একটু বেশী মাত্রায়। কারণ, ফরাসিদের প্ল্যানটাকেই তো তিনি মনের মত করে উন্নত করেছেন, অ্যালবেট্রস-য়ের মত উড্ডুক্কু ইঞ্জিন বানিয়েছেন—স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়াও এখন তাঁর কাছে কিছুই নয়।

'যেন পায়রা উড়ছে রে!' সোৎসাহে বলেছিলেন একজন নভোচারী।

'দুদিন পরে দেখবে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে ঐ পায়রার দল।' সায় দিয়েছিলেন আর একজন সমর্থক।

'লোকোমোটিভ থেকে এরোমোটিভ! রেলগাড়ী থেকে আকাশগাড়ী।' মহানন্দে পাবলিসিটি দিয়েছিলেন আর একজন ব্যোমচারী।

বাতাস যে বাধা দেয়, এ-তত্ত্ব জানার জন্তে এক্সপেরিমেন্টের দরকার হয় না। একগজ ব্যাসের একটা প্যারাস্থটকেও বাতাস ঠেলে নামতে হিম সিম খেতে হয়। এমন নজীরও আছে যে ত্রিশংকুর মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে প্যারাস্থট!

অনেক অংক-টংক কষে অবশেষে দেখা গেল, বাতাসের বাধা কাটিয়ে উড়তে গেলে তিন ধরনের যন্ত্র বানানো যেতে পারে।

(১) হেলিকপটার বা স্পাইরালিফার; এ ধরনের মেশিনে খাড়াই খুঁটির ওপর প্রপেলার ঘুরবে।

(২) অরথপটার; পাখীর ওড়াকে নকল করে ওড়ার মেশিন।

(৩) এরোপ্লেন; ঘুড়ির মত চ্যাটালো মেশিন উড়বে প্রপেলারের জোরে।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রথম দুটো মেশিন নাকচ করলেন রোবার।

অরথপটার অর্থাৎ যান্ত্রিক পাখীর অনেক স্থবিধে আছে সন্দেহ নেই। ১৮৮৪ সালে মঁসিয়ে রেনার্ডের এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়েছে। কিন্তু অন্ধের মত প্রকৃতিকে নকল করারও কোনো মানে হয় না। রেলগাড়ী খরগোসের হুবহু নকল নয়; জাহাজ মাছের অবিকল অনুলিপি নয়। প্রথমটার নীচে আমরা চাকা লাগিয়েছি—পা লাগাইনি। দ্বিতীয়টার তলায় প্রপেলার লাগিয়েছি—পাখনা লাগাইনি। দুটোই ভাল কাজ দিচ্ছে। তাছাড়া, পাখীর ওড়ার যান্ত্রিক কৌশল আজও আমাদের কাছে রহস্য। ডক্টর মার্সির ঘোর সন্দেহ, উড়তে উড়তে যতবার ডানা গোটায় পাখীরা, ততবারই পালক ফাঁক হয়ে বাতাসকে বের করে দেয়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে পাখীর মত আকাশে ওড়া চাট্টিখানি কথা নয়। কেননা অদ্ভুত ঐ কায়দাকে নকল করা কি কলের পাখীর পক্ষে সম্ভব হবে?

পক্ষান্তরে, এরোপ্লেনের স্থবিধে অনেক। হাওয়ার রাজ্যে গিয়ে প্রপেলারকে কাৎ করে ঘোরালেই হল। বাতাসই চাপ মেরে এরোপ্লেনকে তুলে দেবে আকাশে।

রোবার অত ঘোর প্যাচের মধ্যে না গিয়ে সোজা পথ ধরেছেন। উনি দু'সিরিজ প্রপেলার চালাচ্ছেন। এক সিরিজ প্রপেলার অ্যালবেট্রসকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখছে; অন্য সিরিজটা ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ব্যোমযানকে অবিশ্রান্ত গতিবেগে!

অরথপটারকে আকাশে উঠতে হয় পাখীর মত ডানা ঝাপটে। হেলিকপটার ওঠে তেরচাভাবে বাতাস কেটে পাখনার সাহায্যে।

রোবারের ফ্লাইং মেশিনে সমন্বয় ঘটেছে এই দুই ধরনের ওড়ার কৌশল। অ্যালবেট্রস যন্ত্রবিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার। এ-যন্ত্রের মোট তিনটে ভাগ: প্লাটফর্ম, আকাশে ভাসা বা ছোটার ইঞ্জিন, আর কলকব্জা।

প্ল্যাটফর্ম—লম্বায় একশ ফুট, চওড়ায় বারো ফুট। অবিকল জাহাজের ডেকের মত। গলুইটা ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনে। তলায় মজবুত খোলের মধ্যে রয়েছে খাবার দাবারের ভাঁড়ার। মালপত্রের গুদোম, ইঞ্জিন ঘর, জলের ট্যাঙ্ক। ডেক ঘেরা রয়েছে হাল্কা খুঁটির ওপর লোহার জালতি দিয়ে—অনেকটা বুরুজের মত। ডেকের ওপর রয়েছে তিনটে বাড়ী। সেখানে থাকে কর্মচারীরা। মেশিনও বসানো আছে অনেকগুলো ঘরে। মাঝের বাড়ীতে বসানো মেশিন দিয়ে বাতাসে ভেসে থাকার প্রপেলার চালানো হয়। সামনের বাড়ীর মেশিন চালায় সামনের প্রপেলার, পেছনের বাড়ীর মেশিন চালায় পেছনের প্রপেলার। সামনের বাড়ীতে থাকে মেশিন যারা চালায়, তারা। পেছনের বাড়ীতে অনেকগুলো কেবিন। একটায় থাকেন ইঞ্জিনীয়ার। একটা সুসজ্জিত মস্ত ঘর আছে এ-বাড়ীতে। আর আছে একটা কাঁচের ঘর। এইখানে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী রাডারের সাহায্যে অ্যালবেট্রসকে চালনা করেন চালক। পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে আলো আসে সব কেবিনেই। সাধারণ কাঁচের চাইতে দশগুণ মজবুত কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকে প্রতিটি ঘুলঘুলি। খোলের তলায় বসানো আছে সারি সারি স্প্রিং—যাতে মাটিতে নামবার সময়ে বেশী ঝাঁকুনি না লাগে।

ইঞ্জিন—ডেকের ওপর রয়েছে সাঁইত্রিশটা খুঁটি। সমান মাপের তিরিশটা রয়েছে ডাইনে বাঁয়ে; মাঝখানের সাতটা একটু বেশী লম্বা। ঠিক যেন সাঁইত্রিশটা মাস্তল লাগিয়ে মেঘলোকে ভেসে চলেছে অ্যালবেট্রস। তবে মাস্তলের ডগায় পালের বদলে রয়েছে ডবল প্রপেলার। ডেকের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ঘুরছে প্রপেলারগুলো। সিলিং ফ্যানকে কড়িকাঠ থেকে না ঝুলিয়ে যদি মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে উল্টোভাবে ঘুরোনো যায়, তাহলে যা হয়, প্রপেলার-গুলো বনবন করে ঘুরছে সেইভাবে। সবকটা প্রপেলার কিন্তু একইভাবে যদি ঘুরতে থাকে, তাহলে গোটা আকাশ-যান ঐভাবে পাকসাট খেতে থাকবে। তাই এক-একটা খুঁটির জোড়া প্রপেলার ঘুরছে এক-একদিকে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নাই। ফলে খাড়াইভাবে উঠতে উঠতে যাতে টলমল করতে না পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রেখেছে অনুভূমিক বাতাসের বাধা। সংক্ষেপে চুয়াত্তরটা প্রপেলার বাঁই বাঁই করে ঘুরছে আকাশযানের ডেকে।

প্রপেলারগুলোর ব্লেড এমন কিছু বড় নয়—কিন্তু ঘূর্ণনবেগ অতি প্রচণ্ড। এ ছাড়াও রয়েছে দুটো বড় সাইজের প্রপেলার ডেকের সামনে আর পেছনে। এ প্রপেলারের ব্লেড অনেক বড়। আড়াআড়িভাবে খুঁটির গায়ে লাগানো প্রপেলার দুটো ঘুরছে অনেকটা টেবিল ফ্যানের মত। এরাই আকাশযানকে সামনে পেছনে চালাচ্ছে।

রোবার আসলে তিনজন পূর্বসূরীর আবিষ্কারকে মিলিয়ে মিশিয়ে বানিয়েছেন নিজের অ্যালবেট্রস। কসাস, লানডেলি আর পনটন এঁদের নাম। কিন্তু এঁদের কেউ-ই যা পারেনি, রোবার একা তা আবিষ্কার করেছেন : এতবড় আকাশ-যানকে চালাতে যে বিপুল শক্তির দরকার, তার উৎস বের করে ফেলেছেন অনেক মাথা খাটিয়ে।

কলকব্জা—যন্ত্রচালনার জন্যে চাই শক্তি। জল বা অন্য তরল পদার্থের বাষ্প অথবা উচ্চচাপে রাখা বাতাস অথবা অন্যান্য যান্ত্রিক গতির ধার ধারেন নি রোবার। লোকে ঘোড়া যুড়ে গাড়ী চালায়, উনি ইলেকট্রিক দিয়ে অ্যালবেট্রস ওড়াচ্ছেন। এমন একদিন আসবে যেদিন শিল্পজগতের প্রাণ ভোমরা হবে এই ইলেকট্রিসিটি। রোবার কিন্তু ইলেকট্রো-মোটর দিয়ে ইলেকট্রিক বানাচ্ছেন না। উনি আবিষ্কার করেছেন এমন কতকগুলো ব্যাটারী আর অ্যাকুমুলেটর যার নির্মাণ-রহস্য তিনি ফাঁস করতে নারাজ। অমিতশক্তিশালী এই ব্যাটারীতে কি অ্যাসিড ঢেলেছেন, আকুমুলেটর পজিটিভ আর নেগেটিভ প্লেটে কি ধাতু লাগিয়েছেন—সে গুপ্তরহস্য কেউ জানে না—জানবেও না। তবে তাঁর আবিষ্কৃত আশ্চর্য ব্যাটারীর ক্ষমতা যে অসাধারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কি তাঁর তৈরী অ্যাকুমুলেটর হেলায় টেক্কা মারতে পারে ফরে-সেলন-ভকমারকে। প্রচণ্ড এই ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে অতগুলো প্রপেলার ঘুরিয়ে, অ্যালবেট্রসকে সামনে পেছনে চালিয়েও প্রচুর বাড়তি কারেন্ট থেকে যায় হাতে। যে কোনো সঙ্কীণ পরিস্থিতিতেও ইলেকট্রিসিটির ঘাটতি অন্ততঃ কখনও ঘটবে না।

কিন্তু ঐ যে বললাম, পুরো তত্ত্বটা রোবারের নিজস্ব। তিনি ছাড়া কেউ জানে না। ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিও যদি ইলেকট্রিক উৎস আবিষ্কার করতে না পারেন, তাহলে আশ্চর্য এই আবিষ্কার মনুষ্য সমাজে চিরকালের মত অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

এ্যালবেট্রস কিন্তু বেশ মজবুতভাবে তৈরী। ভারকেন্দ্র এমন সুষ্ঠুভাবে নির্মিত যে উল্টে যাওয়া তো দূরের কথা, টলমল করারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

এবার আসা যাক ধাতুর ধাঁধায়। কি ধাতু দিয়ে অ্যালবেট্রসকে বানিয়েছেন

রোবার ? ফিল ইভান্সের ইস্পাতের ছুরীও ভেঙে গেছে আশ্চর্য কঠিন সেই ধাতুর কাছে। আঙ্কল প্রুডেন্টও ধাতুর স্বরূপ বলতে পারেন নি। জিনিসটা তাহলে কী ?

কাগজ ! স্রেফ কাগজ !

বেশ কয়েক বছর ধরে কাগজকে ইস্পাতের চাইতেও কঠিন করা যায় কি করে, এই নিয়ে চলছিল গবেষণা ; প্রগতিও হয়েছে অনেক। টুকরো-টাকরা কাগজকে ডেক্সট্রিন আর স্টার্চ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে জলের চাপে নিংড়ে নিয়ে ইস্পাতের চাইতেও কঠিন বস্তু বানানো সম্ভব হয়েছে। বিচিত্র এই বস্তু দিয়ে তৈরী হয়েছে কপিকল, রেললাইন, ওয়াগনের চাকা। দেখা গেছে, ইস্পাত দিয়ে তৈরী করলে এসব জিনিস এত শক্ত এবং এমন হাল্কা হয় না। মজবুত আর হাল্কা বলেই আকাশ রেলগাড়ীকে এই জিনিস দিয়ে আগাগোড়া বানিয়েছেন রোবার। বাডী, ডেক, খোল কেবিন—সমস্ত। আশ্চর্য এই বস্তু আগুনেও পোড়ে না। শূন্যপথে প্রচণ্ডবেগে ধাবমান উড়ুক্কু যানের যন্ত্রদেহ তো এই রকম অদাহ্য বস্তু দিয়েই গড়া দরকার। এমন কি ইঞ্জিন আর প্রপেলারের বিভিন্ন অংশও জিলেটিন মিশ্রিত শক্ত কাগজে তৈরী হয়েছে। জিনিসটা আঘাতে নুয়ে পড়ে কিন্তু ভেঙে যায় না। অধিকাংশ গ্যাস বা তরল পদার্থ, অ্যাসিড বা এসেন্স একে গলাতে পারে না। অথচ ইলেকট্রিক কারেন্টকে রুখে দিতে পারে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ইনসুলেটর, মানে, অন্তরক।

উড়োজাহাজে লোকজন সামান্যই। রোবার, নিত্য সহচর মেট টম টার্নার, একজন ইঞ্জিনীয়ার, দুজন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার, দুজন চালক, একজন রাঁধুনি—মোট আটজন। উড়োজাহাজকে যুদ্ধজাহাজ করতে গেলে অস্ত্র-শস্ত্র যা-যা দরকার, সবই আছে। আছে মাছ ধরার সরঞ্জাম, বিদ্যুৎবাতি, কম্পাস, সেক্সট্যাণ্ট, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, স্টর্মগ্লাস—ঝড়ের খবর আগেভাগে জানবার জন্যে, ক্ষুদে লাইব্রেরী, পোর্টেবল ছাপাখানা, টেলিস্কোপ, তিনইঞ্চি কামান, বারুদ, কার্তুজ, ডিনামাইট, রান্নার জন্য ইলেকট্রিক স্টোভ, কয়েক মাসের উপযুক্ত শুকনো মাংস, সব্জী ইত্যাদি। আর আছে বিখ্যাত সেই ট্রাম্পেটটা ! বাজিয়ে হলেন টম টার্নার।

রবারের একটা নৌকাও আছে। আটজনকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ভাসতে পারে নদীর জলে, লেকের জলে, শান্ত সমুদ্রে।

প্যারাসুট জাতীয় কিছুই কিন্তু রাখেন নি রোবার। কারণ প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়। অ্যালবেট্রস কখনো ভেঙে পড়বে না ; প্যারাসুটের দরকারও কোনোদিন হবে না। প্রপেলারের খুঁটিগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ। এক একটা প্রপেলার

খারাপ হয়ে গেলেও কিছু এসে যায় না। এমন কি ঘটনাচক্রে যদি অর্ধেক প্রপেলারও বিকল হয়, তাহলেও অ্যালবেট্রস ভেসে থাকবে।

অতিথিদের সমস্তই বুঝিয়ে বললেন রোবার। সবশেষে বললেন—'বিশাল এই বায়ুসমুদ্রের একছত্র অধিপতি আমি। দুনিয়ার এক সপ্তমাংশ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এই ইকারিয়ান বায়ুসমুদ্র। আফ্রিকা, ওশ্যানিয়া, এশিয়া, আমেরিকা, ইওরোপের চাইতেও বিশাল এই আকাশ সাগরের রাজা আমি একা—বাহন আমার এই অ্যালবেট্রস। একদিন আসবে যেদিন আমারই মত লক্ষ লক্ষ ইকারিয়ান বাসা বাঁধবে আকাশে মাটির মায়া ত্যাগ করে।'

(৮) বেলুনিস্টদের বিশ্বাস হল না

প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন সব কথা শোনার পর। কিন্তু রোবার পাছে তাঁদের বিস্ময় দেখে পুলকিত হন, তাই দুজনেই চোখেমুখে সবজান্তা ভাব ফুটিয়ে রাখলেন। অবাক হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না।

ফ্রাইকোলিন বেচারীর অবস্থা তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের। শূন্য-পথে হু-হু করে উড়ে যাওয়া তার ধাতে সইবে কেন ?

বোঁ-বোঁ করে প্রপেলার ঘুরছে সারি সারি খুঁটির ওপর। আরও উঁচুতে উঠতে হলে তিনগুণ বেগে ঘুরবে প্রপেলারের ব্লেড। সামনের আর পেছনের প্রপেলারের চারটে করে ব্লেড ঘুরছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। অ্যালবেট্রস সাঁ-সাঁ করে উড়ে চলেছে ঘণ্টায় এগারো 'নট' বেগে।

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়লেন আরোহীরা। নীচে দেখা যাচ্ছে ফিতের মত একটা নদী। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে একটা হ্রদ। লেকের বাঁ পাড় বরাবর পাহাড়ের সারি মিলিয়ে গেছে দিগন্তে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শুধোলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট—'জায়গাটার নাম জানতে পারি কী ?'

'আপনাদের শেখানোর বিদ্যে আমার নেই'। শুধোলেন রোবার।

'কোথায় যাচ্ছি জানতে পারি কী ?' বললেন ইভান্স।

'শূন্যে।'

'কতক্ষণ ?'

'যতক্ষণ না শেষ হয়।'

'পৃথিবী প্রদক্ষিণে চলেছি নাকি!

'তারও বেশী।'

'যদি ভাল না লাগে?' শুধালেন প্রুডেণ্ট।

'ভাল লাগাতে হবে।

কথাবার্তার ধরন থেকেই বোঝা গেল অতিথি আপ্যায়ণ করলেও কার্যতঃ কয়েদীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবেন আকাশ রাজা রোবার। অ্যালবেট্রস ঘুরে ফিরে দেখার অনেক সময় দিয়েছেন তিনি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, গরম মাথা যাতে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এবং মুখে না হোক মনেও স্রষ্টাকে তারিফ জানানো হয়। চাঁচাছোলা জবাব দিয়ে উনি চলে গেলেন অন্য প্রান্তে। কয়েদীরা ডেকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন নীচের নিসর্গ দৃশ্যের পানে।

হঠাৎ বললেন ফিল ইভান্স—'আমরা এখন সেণ্ট্রাল কানাডার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। নদীটা সেণ্ট লরেন্স। পেছনের শহরটা কুইবেক।'

কুইবেকই বটে। চাম্পলনের প্রাচীন ছাদ। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে বাড়ীঘর দোরের দস্তায় ছাওয়া ছাদ। অক্ষাংশ পালটেছে অ্যালবেট্রস। তাই সাত তাড়াতাড়ি ভোরের আলো দেখা গেছে দিগন্তে।

'ঠিক বলেছেন।' সায় দিলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। 'নর্থ অ্যামেরিকার জিব্রাল্টারই বটে। ঐ তো গির্জের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। কাস্টম হাউসের গম্বুজে বৃটিশ ফ্ল্যাগ উড়ছে!'

দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল কানাডা নগরী। মেঘলোকে প্রবেশ করল অ্যালবেট্রস। তলার দৃশ্য ঢেকে গেল মেঘের আস্তরণে। চুয়াত্তরটা প্রপেলার দিয়ে যেন কচাকচ করে মেঘ কেটে উড়ে চলল দানব-পাখী অ্যালবেট্রস।

মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী দাঁড়িয়ে আছেন দেখে পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন রোবার।

শুধোলেন—'এখন কি মনে হয় মশায়দের? বাতাসের চেয়ে ভারী মেশিনে বাতাসে ওড়া সম্ভব তো?'

প্রতিবাদ করার মত মুখ নেই বেলুনিস্টদের। তাই নিরুত্তর রইলেন।

টিটকিরি দিলেন রোবার— কি হল! মুখে কথা নেই যে! বুঝেছি, ক্ষিদে পেয়েছে। আসুন, ব্রেকফাস্ট তৈরী।'

ক্ষিদের চোটে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাচ্ছিল প্রুডেণ্ট এবং ইভান্সের! রাগ করে না খেয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। এক পেট খেলেই তো আর

ক্রীতদাস হতে হচ্ছে না। মাটিতে নামবার পরেই রোবারকে আচ্ছা শিক্ষা দেওয়া যাবে'খন!

পেছনের বাড়ীর ছোট্ট খাবার ঘরে টেবিল ভর্তি খাবার দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন বেলুনিস্টরা। আপ্যায়নে ত্রুটি নেই কোথাও। অনেক রকম শুকনো খাবার দাবার ছাড়াও ভারী মুখরোচক একটা সুপ রাঁধা হয়েছে গুঁড়ো ময়দার সঙ্গে গুঁড়ো মাংস মিশিয়ে এবং সামান্য চর্বি দিয়ে জলে সেদ্ধ করে। আর আছে শূয়োরের মাংসর ফ্রাই আর চা।

ফ্রাইকোলিনও বাদ গেল না। অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সামনে খাবার দাবার ধরা হল বটে, কিন্তু সুপ ছাড়া গলা দিয়ে কিছু নামল না। খাবে কী? খাবার অবস্থা থাকলে তো খাবে! দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে নিদারুণ ভয়ে! কুলকুল করে ঘাম দিচ্ছে। ঘনঘন ফিট হচ্ছে। ওরে বাবা! যদি জাহাজ ভেঙে যায়! চার হাজার ফুট ওপর থেকে আছাড় খেলে তো মাংসর আচার হতে হবে নিগ্রো-পুত্রকে!

ঘণ্টাখানেক পরে ডেকে বেরিয়ে এলেন দুই বেলুনিস্ট, কিন্তু রোবারকে দেখতে পেলেন না। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরে কলকব্জার তদারক করছে। কাঁচের ঘরে বসে ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশ মত অক্লেশে আকাশযান চালাচ্ছে একজন চালক। বাদবাকী কর্মচারীরা বোধহয় ব্রেকফাস্ট খেতে ব্যস্ত।

কিন্তু এ কোথায় চলেছে অ্যালবেট্রস? চার হাজার ফুট নীচে স্বর্গালোকে ঝকঝক করছে মেঘলোক! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

'চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না', বললেন ইভান্স।

করবেন না,' খ্যাকে করে উঠলেন প্রেডেন্ট। চাইলেন পশ্চিম দিগন্তে।

'আর একটা শহর।' বললেন ইভান্স।

'চেনেন নাকি?'

'মন্ট্রিয়েল বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'মন্ট্রিয়েল! বলেন কী? সবে তো দু'ঘণ্টা হ'ল কুইবেক ছেড়ে এলাম!'

'তার মানে ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগে উড়ছে অ্যালবেট্রস!

এত জোরে উড়ছে এরোনফ, অথচ আরোহীরা তা বুঝতে পারছেন না। কারণ আর কিছুই নয়। হাওয়া স্রোতে গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে অ্যালবেট্রস— তাই গতিবেগ টের পাওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ার উল্টো দিকে যেতে গেলে ঠেলাটা টের পাওয়া যেত।

ভুল হয়নি ফিল ইভান্সের। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল

মন্ট্রিয়েল শহর। দেখা গেল ভিক্টোরিয়া সেতু, চওড়া রাস্তাঘাট, দোকান, প্রাসাদোপম ব্যাংক, গির্জে এবং পার্ক মধ্যস্থ রয়াল পাহাড়।

শহর পরিচিতির জন্য রোবারের কাছে ছুটতে হল না। ইভান্সের কানাডা দেশটা দেখা ছিল বলে। তাই মন্ট্রিয়েলের পরেই দেখা গেল ওটাবা। অত উঁচু থেকে জলপ্রপাতের সগর্জন সফেন ধারাবর্ষণ দেখে মনে হল যেন বিশাল কড়ায় জল ফুটছে, ধোঁয়া উঠছে! অবর্ণনীয় সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

'দেখুন! দেখুন! পার্লামেণ্ট হাউস!'

পাহাড়ের ডগায় ঠিক যেন একটা ন্যুরেমবার্গ খেলনা সাজানো রয়েছে। লণ্ডনের পার্লামেণ্ট অনুকরণে তৈরী ওটাবার পার্লামেণ্ট হাউসের থামের সারিও দেখার মত। পলিক্রোম স্থাপত্য দেখে তারিফ না করে পারা যায় না।

আরও ঘণ্টা দুয়েক গেল। ডেকে এসে দাঁড়ালেন রোবার এবং সহযোগী টম টার্নার। ঠিক তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলেন রোবার। সামনের আর পেছনের ইঞ্জিন-হাউসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার দুজনকে হুকুম চালান করলেন টম টার্নার। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যালবেট্রসের মুখ ঘুরিয়ে দিল চালক। হু-হু করে বৃদ্ধি পেল গতিবেগ। আরো জোরে ঘুরতে লাগল প্রপেলার।

দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে গতিবেগ। আকাশ পর্যটকরা এমন গতিবেগের কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ভূপৃষ্ঠের কোনো ইঞ্জিনীয়ারও এই স্পীড তুলতে পারেন নি। টর্পেডো-বোটের গতিবেগ ঘণ্টায় বাইশ নট, রেলগাড়ির ঘণ্টায় ষাট মাইল, আইস-বোটের ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল, প্যাটারসন কোম্পানী নির্মিত খাঁজকাটা চাকাওয়ালা মেশিনের ঘণ্টায় আশি মাইল, ট্রেনটন এবং জার্সি সিটির লোকমোটিভের ঘণ্টায় চুরাশি মাইল।

কিন্তু আলবেট্রসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় একশ বিশ মাইল অথবা সেকেণ্ডে ১৭৬ ফুট। সেকেণ্ডে ১৭৬ ফুট গতিবেগে যখন ঝড় আসে তখন শেকড়শুদ্ধ গাছ উপড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ-সেই গতিবেগ। বার্তাবহ পায়রা এই গতিবেগে উড়তে পারে। এই গতিবেগকে ছাড়িয়ে যেতে পারে শুধু দুজাতের পাখী; সোয়ালো (সেকেণ্ডে ২২০ ফুট) এবং সুইফট (সেকেণ্ডে ২৭৪ ফুট)।

এক কথায় রোবার মিথ্যে বড়াই করেন নি। পুরোদমে অ্যালবেট্রস চালিয়ে তিনি ২০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ আটদিনেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীটাকে এক চক্কর ঘুরে আসতে পারেন!

আশ্চর্য কিছু নয়! যে আকাশযান ইউরোপ আমেরিকার তাবৎ লোকের

চক্ষু চড়কগাছ করে ছেড়েছে, এরোনফ ইঞ্জিনীয়ারদের বোকা বানিয়ে রেখেছে, তার অসাধ্য কিছু আছে কী? মেট টম টার্নার ট্রাম্পেট শুনিয়েছেন বিশ্ববাসীদের রোবার ফ্ল্যাগ উড়িয়েছেন ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকার বিখ্যাত মনুমেণ্টগুলোর চূড়োয়। আকাশ রাজা তাঁর রাজত্ব করতে পারেন না এমন কিছু থাকতে পারে কী?

এতদিন লোক জানাজানি এড়িয়ে গিয়েছিলেন আকাশরাজা। তাই রাতে আলো জ্বেলে চলেছেন, নয়তো দিনের বেলা মেঘের আড়ালে ঘাপটিমেরে থেকেছেন। কিন্তু আত্মগোপনের তার দরকার আছে কী? ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে আত্মপ্রকাশ করা মানেই আকাশ-ভ্রামণিকদের চ্যালেঞ্জ করা। এখন দেখুক না বিশ্ববাসী আকাশরাজা রোবারের আশ্চর্য কীর্তি। দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে থাকুক!

ফের বেলুনিস্টদের কাছে এসে দাঁড়ালেন রোবার। প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন যেন মোটেই ভ্যাবাচাকা পাননি তারা। রোবার অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দুই অ্যাংলো-স্যাক্সনের করোটির মধ্যে ঠাসা একগুঁয়েমি নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনেও হল না।

বললেন আগের মতই নির্বিকার কণ্ঠে—'দেখুন মশায়, আমি বাতাসের ওপর ভর দিয়ে বাতাসে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। পেরেছি কিনা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি বাতাসের চাইতে বলবান হতে চেয়েছিলাম, নইলে বাতাসকে জয় করব কি করে? দেখতেই পাচ্ছেন, বাতাসের বাধা আমার কাছে এমন কিছুই নয়। দাঁড়, পাল নিয়ে এ-স্পীড তোলা যায় না। রেলগাড়ির মত লাইনের ওপর ছুটেও এত জোরে ছোটা যায় না। আমি বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি, ঠিক যেভাবে সাবমেরিন জলের মধ্যে ডুবে থাকে। এই বাতাসকেই প্রপেলারের ধাক্কায় টেনে আর ঠেলে এগিয়ে চলেছে অ্যালবেট্রস। বাতাসের চাইতে কোনো হাল্কা যন্ত্রের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বেলুনের পক্ষে।'

শ্রোতারা চুপচাপ দেখে মুচকি হাসলেন রোবার। বললেন—'ভাবছেন বেলুনের মত কি আর সোজা ওপরে উঠতে পারবে আলবেট্রস? দোহাই আপনাদের, গো-অ্যাহেড বেলুনকে আলবেট্রসের সঙ্গে পাল্লায় নামাতে যাবেন না যেন!'

শুনেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় বাঁকালেন প্রতিপক্ষ দুজন। রোবার যেন এই জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। মুখে কিছু বললেন না, শুধু ইসারা করলেন। তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল সামনের আর পেছনের প্রপেলার। মাইলখানেক ভেসে গিয়ে স্থির হয়ে ভাসতে লাগল অ্যালবেট্রস।

আবার ইসারা করলেন রোবার। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেল খুঁটির ওপর বসানো প্রপেলারের গতিবেগ। সে কী শব্দ? ঠিক যেন সাইরেন বাজছে কানের পর্দা ফাটানো শব্দে। ফর-র-র-র শব্দটাই সহসা বেড়ে গিয়ে এমন তীক্ষ্ণ তীব্র ডাক ছাড়বে কে জানত! শব্দ আরো বাড়ল। বাতাস যেন ফালাফালা হয়ে গেল আতীক্ষ্ণ আওয়াজে। সোজা ওপরে উঠছে অ্যালবেট্রস শূন্যবিহারী ভরতপক্ষীর মত গান গাইতে গাইতে।

'মাস্টার! মাস্টার' ককিয়ে উঠল ফ্রাইকোলিন। 'ভেঙ্গে যাবে যে!'

ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন রোবার। মিনিট কয়েকের মধ্যে অ্যালবেট্রস উঠে এল ৮,৭০০ ফুট উচ্চতায়। সত্তর মাইল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ব্যারোমিটারের পারা নেমে গেছে ৪৮০ মিলিমিটারে।

এবার নীচে নামতে লাগল অ্যালবেট্রস। ওপরে ওঠা মানেই অক্সিজেন কমে আসা। রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ায় বিপদে পড়েছেন অনেক নভোচারী। সুতরাং কোনো ঝুঁকির মধ্যে গেলেন না রোবার। যে উচ্চতায় শরীরের ওপর ধকল পড়ে না, অ্যালবেট্রসকে নামিয়ে আনলেন সেই উচ্চতায়। তারপর সামনের পেছনের প্রপেলার চালিয়ে উড়ে চললেন দক্ষিণ-পশ্চিমে।

'বলুন এবার, যদি কিছু বলার থাকে বলে ফেলুন!'

এই বলে রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন আকাশরাজা রোবার।

মাথা যখন তুললেন, দেখলেন দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে শুধোলেন—'ইঞ্জিনীয়ার রোবার, আপনি কি তত্ত্বে বিশ্বাসী, তা নিয়ে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। একটা কথাই শুধু বলার আছে।'

'বলুন।'

'ফিলাডেলফিয়ার ফেয়ারমণ্ট পার্কে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন কি অধিকারে? কি অধিকারে আটকে রেখেছিলেন জেলখানায়? কি অধিকারে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলেছেন আপনার উড়ুক্কু যন্ত্রে?'

'মঁসিয়ে বেলুনিস্ট, কি অধিকারে আমার ওপর চড়াও হয়েছিলেন আপনাদের ক্লাবে? প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম সেদিন পরমায়ুর জোর ছিল বলে। কিন্তু কেন? কি অধিকারে?'

'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করার নাম জবাব দেওয়া নয়। বলুন কি অধিকারে?' এবার বললেন ফিল ইভান্স।

'জবাব কি দিতেই হবে ?

'যদি দয়া হয় আপনার।'

'অধিকারটা জোরের। জোর যার মুলুক তার !'

'সে তো মানব-বিদ্বেষ !'

'হোক। কিন্তু সত্যি।'

'অধিকার কতক্ষণ খাটাতে চান ?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন প্রুডেন্ট।

'সে কী কথা! নীচে তাকালেই যাঁরা এমন আশ্চর্য দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছেন, এ প্রশ্ন তো তাঁদের মুখে মানায় না!' শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ রোবারের।

ঠিক সেই সময়ে লেক অনটারিওর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে অ্যালবেট্রস। কুপার কবিতার ছন্দে সুন্দর রচনা দিয়েছেন এই অঞ্চলের।

এরপর নদী বরাবর উড়ে চলল অ্যালবেট্রস লেক ঈরীর দিকে।

আচম্বিতে শোনা গেল গুরুগম্ভীর গর্জন। ঠিক যেন তুফানের হুহুংকার! তারপরেই দেখা গেল শূন্যে উৎক্ষিপ্ত আর্দ্র কুয়াশা। বাতাসও বেশ ঝিরঝিরে! শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে!

বহু নীচে শুধু জল আর জল। হাজার হাজার রামধনু ঝলসে উঠছে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণের ফলে।

প্রকৃতির রূপসজ্জায় এত আড়ম্বর ? সত্যিই অতুলনীয়!

জলপ্রপাতের সামনে সুতোর মত ঝুলছে একটা পায়ে চলা সেতু প্রপাতের এ-পাড় থেকে ও-পাড় পর্যন্ত। তিন মাইল লম্বা ঝুলন্ত ব্রীজের ওপর দিয়ে গুটগুট করে ট্রেন চলেছে কানাডার তীর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তীরে।

এবার আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না ফিল ইভান্স। সোল্লাসে বললেন—নায়গারা জলপ্রপাত! আঙ্কল প্রুডেন্ট সর্বশক্তি দিয়ে চোখমুখ প্রশান্ত রাখার চেষ্টা করলেন—বিপুল বিস্ময় যাতে কোন মতেই প্রতিভাত না হয় হাবভাবে—সে চেষ্টার কসুর করলেন না।

মিনিট খানেক পরেই যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার মধ্যবর্তী নদী পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস—উড়ে গেল পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর।

(৯) গাছ নেই, গাছ নেই·····শুধু ঘাস জমি

পেছনের বাড়ীর একটা কেবিনে শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্সের। দুটো ফার্স্ট ক্লাশ ব্যর্থ, পরিষ্কার চাদর, কম্বল এবং রাতের পোশাক। এ রকম বহাল তবিয়তে আটলাণ্টিক-গামী জাহাজেও যাওয়া যায় না। আরামের কোন ত্রুটি নেই। তবুও শয্যায় শুয়ে উশখুশ করতে লাগলেন বেলুনিস্টরা। ঘুমোবেন কি করে ? মন তো নিশ্চিন্ত নয় ! রাশিরাশি উদ্বেগ খচখচ করছে মনের মধ্যে। কোথায় চলেছেন রোবার তাঁদের নিয়ে ? কোন অ্যাডভেঞ্চারে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁদের। নতুন কোন এক্সপেরিমেণ্টের বলি হতে হবে নাকি তাঁদের ? কবে ফুরোবে এক্সপেরিমেণ্ট ? সবচেয়ে বড় কথা, রোবারের মতলবটা কি ? কি করতে চান তাঁদের নিয়ে ?

ফ্রাইকোলিনের ঠাঁই হয়েছিল রাঁধুনির কেবিনের পাশের কেবিনে। ঘুমোতে বেশী সময় লাগেনি তার। পড়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিবানিশি কাঠ হয়ে থাকার চাইতে ঘুমিয়ে পড়া ভাল—এই ফিকিরেই বোধহয় চটপট দুচোখের পাতা এক করেছিল সে। কিন্তু একী জ্বালা। ঘুমের মধ্যেও উড়ে এল কাতারে কাতারে আতঙ্ক ! এই বুঝি উড়োজাহাজ ডিগবাজী খাচ্ছে। এই বুঝি সে আছড়ে পড়ছে ! দুঃস্বপ্নের ঠেলায় দফারফা হল ঘুমের !

সত্যি কথা বলতে গেলে কিন্তু আকাশ ভ্রমণের মত আরামপ্রদ ভ্রমণ আর হয় না। সন্ধ্যের দিকে বাতাসের টান আরো কমে এসেছে। প্রপেলারগুলো ঘুরেই চলেছে ফর-ফর করে। মাঝে মাঝে নীচ থেকে ভেসে আসছে রেলগাড়ীর বংশীধ্বনি, নয়তো জন্তুজানোয়ারের হাঁকডাক। মাথার ওপর দিয়ে সঞ্চরমান খেচরযান দেখে ভয়ে মরে চেঁচাচ্ছে ভূচর প্রাণীরা।

১৪ই জুন পাঁচটার সময়ে অ্যালবেট্রসের ডেকে বেরিয়ে এলেন প্রুডেণ্ট এবং ইভান্স। দেখলেন কাঁচের খুপরিতে ঠায় বসে চালক। সামনে একজন দাঁড়িয়ে নজর রেখেছে দিগন্তে।

কিন্তু অত দেখবার কি আছে ? সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে কি ? পাছে কোনো বেলুন-টেলুনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, এই ভয়ে যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন কিনা দেখা হচ্ছে ? মোটেই না। রোবার জানেন, অ্যালবেট্রসের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণামটা কি। মাটির বাসনের সঙ্গে লোহার বাসনের ঠোকাঠুকি লাগলে যা হয়

এক্ষেত্রেও হবে তাই। সুতরাং সংঘর্ষ নিয়ে দুর্ভাবনা নেই অ্যালবেট্রসের বেলুন ফেঁসে যাবে, অ্যালবেট্রস অক্ষত থাকবে।

কিন্তু ডুবোপাহাড়ের ভয়ে জলযানকে যেমন হুঁসিয়ার থাকতে হয়, পাহাড়-চূড়োর ভয়ে আকাশযানকেও তেমনি সতর্ক থাকতে হয়েছে। এ-অঞ্চলে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। দৈবাৎ যদি কোনো পাহাড়ের চূড়ো বেশী উঁচু হয়, তাহলে অ্যালবেট্রসকে সামান্য ঘুরে যেতে হবে বই কি। ইঞ্জিনীয়ার শুধু হুকুম দিয়েছেন কতখানি উঁচু দিয়ে যেতে হবে। কোথায় পাহাড় আছে, তা তো বলেন নি। সেই জন্যেই সজাগ রয়েছে একজন সামনের গলুইতে।

নীচে একটা প্রকাণ্ড সরোবর দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ পাড়ে এসে পৌঁচেছে আকাশযান। নিশ্চয় রাতারাতি লেক ঈরী পেরিয়ে এসেছে অ্যালবেট্রস! এবার লেক মিচিগান শুরু হল বলে।

সবিস্ময়ে বললেন ইভান্স—'দিগন্তে কতকগুলো ছাদ দেখতে পাচ্ছেন? শিকাগো এসে গেল।'

কথাটা ঠিক। এই সেই সুবিখ্যাত শহর যার নাভিকেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে সতেরোটা রেলপথ। পশ্চিমের বাণী বললেই চলে শিকাগোকে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমপ্রান্তস্থ সবকটা স্টেটের পণ্যসম্ভার এসে পৌঁছোচ্ছে এই শিকাগোয়।

কেবিন থেকে একটা অত্যুৎকৃষ্ট টেলিস্কোপ জোগাড় করেছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে চিনতে পারলেন শিকাগোর মূল ভবনগুলো। গির্জে আর পাবলিক বিল্ডিং। সূর্যালোকে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলছে বিপুলাকার শেরম্যান হোটেলের কয়েকশ বাতায়ন।

প্রুডেন্ট বললেন—'এই যদি শিকাগো হয়, তাহলে বুঝতে হবে আরো টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের যাতে সহজে ফিরতে না পারি।'

কথাটা সত্যি। প্রুডেন্ট ভেবেছিলেন, রোবারকে দেখলেই বলবেন এক্ষুণি যেন তাঁদের পূর্বদিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কোথায় রোবার? পাত্তা নেই ডেকে। হয় ঘুমোচ্ছেন, নয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

গতকাল রাতে যে গতিবেগে উড়ছিল অ্যালবেট্রস, এখনো তা অব্যাহত। প্রতি সত্তর মিটার আরোহণে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমে। সে-হিসেবে ঠাণ্ডাও তেমন কিছু নয়। সুতরাং ইঞ্জিনীয়ারের প্রতীক্ষায় খোস-মেজাজে প্রপেলার অরণ্যে ঘরঘর করতে লাগলেন দুই বেলুনিস্ট। দুরন্ত প্রপেলারগুলোকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছিল যেন অর্ধ-স্বচ্ছ চাকতি! সশব্দে চাকতিগুলো ঘুরছে মাথার ওপর!

আড়াই ঘণ্টাও গেল না, ইলিনয় স্টেটের উত্তর সীমান্ত বরাবর উড়ে গেল অ্যালবেট্রস। এল মিসিসিপির ফাদার অফ ওয়াটার্স। ডবল-ডেকার ষ্টীম-বোটগুলোকে ক্যানোর মত পুঁচকে দেখাচ্ছে। এরপর দিগন্তে ভেসে উঠল আওয়া স্টেট। বেলা এগোরাটায় দেখা গেল আওয়া সিটি।

পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে। এ-অঞ্চলে এ ধরনের খাড়াই পাহাড়ের নাম 'ব্লাফ'। দক্ষিণ থেকে উত্তর পশ্চিমে উধাও হয়েছে পাহাড়ের শ্রেণী। উচ্চতা এমন কিছু নয়। নিরাপদ উচ্চতায় উড়ছে অ্যালবেট্রস।

ব্লাফ শেষ হল। এবার এল বৃক্ষহীন তৃণভূমি। শুধু মাঠ আর মাঠ। তেপান্তরের মাঠ বলতে যা বোঝায়, তাই। নেব্রাসকা আর পশ্চিম আওয়া থেকে রকি মাউন্টেনের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধূ-ধূ ঘাসজমিতে রয়েছে বহু গ্রাম। পশ্চিমমুখো হাওয়ার পথে দেখা গেল, এক গ্রাম থেকে আরেকটা গ্রামের দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে অর্থাৎ কমে আসছে গ্রামের সংখ্যা। গাছ নেই, শুধু প্রান্তর।

উল্লেখ করার মতো কোনো ঘটনা সারাদিন ঘটল না। সামনের গলুইতে মুখ থুবড়ে চোখ বুঁজে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পড়ে রইল ফ্রাইকোলিন। পাছে পড়ে যায়, এই ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিল বেচারা। বেলুনিস্ট দুজন কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ভার্টিগো অর্থাৎ উঁচুতে উঠলে মাথা ঘুরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা এখানে নেই। ভার্টিগো কাহিল করে তখনি যখন আশপাশে উঁচু কিছু দেখা যায়। যেমন বহুতল বাড়ী। কিন্তু বেলুনের দোলনা থেকে নীচের খাদ দেখলে মাথা ঘুরবে কেন? সবই হাস্যকর ছোট দেখায়, অত উঁচু থেকে মাথার ওপর আকাশ আর চারদিকে বাটির মত গোলাকার দিগন্ত রেখা দেখে বরং মজা লাগে। ভয় করেনা।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অ্যালবেট্রস উড়ে এল ওমাহার ওপর। নেব্রাসকা সীমান্তে দেখা যাচ্ছে ওমাহা সিটি। প্যাসিফিক রেলপথের সদর ঘাঁটি এখানে। নিউ-ইয়র্ক থেকে সানফ্রানসিসকো পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে সাড়ে চারহাজার মাইল লম্বা রেলপথে ট্রেন ছোটানো বড় সহজ কথা নয়। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল মিশৌরীর হলদে জল—শহরের ইটকাঠের বাড়ী—নর্থ আমেরিকার কোমর ঘিরে আছে যেন লোহার বেল্ট—মাঝে মাঝে রয়েছে বাকল। ওমাহার বাসিন্দারা হতভম্ব হয়ে গেল মাথার ওপরে কিম্ভূতকিমাকার উড়ুক্কু যন্ত্রযান দেখে।

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পত্র-পত্রিকা এবার নিশ্চয় ছেয়ে যাবে নীল আকাশের বিচিত্র বিস্ময়ের গরম গরম খবরে। এতদিন সারা দুনিয়ার আক্কেল গুড়ুম করে ছেড়েছে যে গগন-প্রহেলিকা, ঐ তো সে নিজেই উড়ছে দিনদুপুরে

লক্ষলক্ষ চোখের দৃষ্টিপথে! ধাঁধার উত্তর সশরীরে আবির্ভূত হয়েছে মাথার উপর!

এক ঘণ্টার মধ্যেই—ওমাহা পেরিয়ে প্ল্যাট নদী টপকে তেপান্তরের মাঠে এসে পড়ল অ্যালবেট্রস। প্যাসিফিক রেলপথের সুদীর্ঘ রেললাইন নদীর অববাহিকা দিয়ে চলে গেছে ধু-ধু প্রান্তরের মাঝে।

দেখেশুনে ত ফের মাথা গরম হয়ে গেল আঙ্কল প্রুডেন্টের। রোবারের স্পর্ধা তো কম নয়! কোথায় নিয়ে চলেছেন কয়েদীদের?

'ঠিক উল্টোদিকে চলেছি দেখছি।'

'আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের ধার ধারছে না লোকটা!'

'রোবার হুঁশিয়ার! কেলেংকারী করে ছাড়ব আমি।'

'আমিও।' সায় দিলেন ইভান্স। 'কিন্তু আপাততঃ মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন, আঙ্কল প্রুডেন্ট!'

'ঠাণ্ডা রাখব।'

'যখন দরকার হবে, তখনকার জন্যে মেজাজটাকে শিকেয় তুলে রাখুন।'

পাঁচটা বাজল। পাইন আর সিডার গাছ দেখা যাচ্ছে নীচে। ব্ল্যাক মাউণ্টেন পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস। নেব্রাসকার ব্যাড ল্যাণ্ডস অর্থাৎ ছন্নছাড়া অঞ্চল দিয়ে উড়ে চলেছে ব্যোমযান। তুলনা হয়না নেব্রাসকার এই ভয়াল ভয়ংকর অথচ আশ্চর্য সুন্দর অঞ্চলের। যেন একটা বিরাট লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেছে ফিকে হলদে আর লালচে পাহাড় পর্বতের মধ্যে। যেন বহু উঁচু থেকে বড় বড় পাহাড়গুলোকে তুলে কেউ আছাড় মেরেছে মাটিতে। ভেঙে ছড়িয়ে গেছে ফিকে হলদে লালচে পাহাড়ের টুকরো। দূর থেকে পাহাড় ভাঙা টুকরোগুলো দেখে গা ছমছম করে উঠে—ফ্যানটাসটিক সেই দৃশ্য না দেখলে বোঝানো যায় না। খণ্ডবিখণ্ড পাহাড়-ভাঙার মধ্যে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মধ্যযুগের শহর, কেল্লা বুরুজ। কল্পনা করলে দেখা যাচ্ছে আরো অনেক কিছু। শুধু কল্পনা কেন, কামান বন্দুক দাগার জন্যে ছেঁদাওলা মিনার, গলিত সীসে শত্রুদের মাথায় ঢেলে দেওয়ার জন্যে কার্নিশের ফাঁক—কি নেই সেই প্রলয় দৃশ্যের মধ্যে! আরো ভাল করে তাকালে মনে হবে যে কড়া রোদে ছারখার হয়ে যাচ্ছে রাশিরাশি কংকাল···হাড়গোড়ের স্তূপ জমে রয়েছে বুঝি পাহাড়-পর্বতের আনাচে কানাচে—প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর দূরবিস্তৃত শ্মশানভূমিতে ম্যামথ, গণ্ডার, জল-হস্তীর কংকালও আছে—আছে ফসিল মানব। লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়ে রুদ্রদেবতা ভূপৃষ্ঠে যা কিছু সাজিয়ে রেখেছেন, আজও তা ঝকঝক করছে সূর্যালোকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নভোচারীদের পায়ের তলায়!

সন্ধ্যে হল। নদীর অববাহিকা পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস।

রাতটা শান্তিতে কাটল। ট্রেনের বাঁশি অথবা জাহাজের ভোঁ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না। লম্বা লম্বা ঘাস সরিয়ে জলের সন্ধানে মোরগদের ছুটোছুটির আওয়াজ অবশ্য শোনা গেল। কিন্তু সে আওয়াজ প্রপেলারের ফর-র-র-র আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল। মোষের হাঁকডাকও শোনা গেল মাঝে মাঝে। সেই সঙ্গে শেয়াল, বুনো বেড়াল, কিওট নেকড়ের পাঁচমিশেলী তর্জন-গর্জন।

ভেসে এল নানারকম সুগন্ধী গাছের সুবাস। পিপারমেন্টের তীব্র গন্ধ, কড়া মদে মিশানোর জন্য অ্যাবসিনথের হাল্কা সৌরভ, চির-হরিৎ পাইন, ফারের তেজালো গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে ম-ম করে রেখেছে রাতের বাতাস।

সবশেষে শোনা গেল রক্ত জমানো একটা চীৎকার। কিওট নেকড়ের নৈশ গর্জন নয় কিন্তু—হুংকার ছাড়ছে জনৈক রেডস্কিন (নর্থ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান)। বন্যশ্বাপদের গজরানির সঙ্গে রেডস্কিনদের এই হুংকার গুলিয়ে ফেলা নেহাৎ আনাড়ির পক্ষেও সম্ভব নয়।

(১০) আরও পশ্চিমে—কিন্তু কোথায়?

পরের দিন পনেরোই জুন ভোর পাঁচটায় ডেকে বেরিয়ে প্রথমেই রোবারের খোঁজ করলেন ফিল ইভান্স। তিনি নেই। গতকাল সারাদিন টিকি দেখা যায়নি। এখনও নিপাত্তা। টম টার্নারকে গিয়ে পাকড়াও করলেন ইভান্স।

টম টার্নার ভদ্রলোক জাতে ইংরেজ। বয়স পঁয়তাল্লিশ। চওড়া কাঁধ। খাটো-পা। লোহাপেটা শরীর। মাথাটি প্রকাণ্ড—দেখলেই বোঝা যায় বুদ্ধিতে ঠাসা।

সটান জিজ্ঞেস করলেন ইভান্স—'মিস্টার রোবারের দেখা পাওয়া যাবে আজ?'

'জানি না।'

'বাইরে গেছেন কিনা জানতে চাইনি কিন্তু।'

'হয়ত গেছেন।'

'ফিরবেন কবে?'

'কাজ শেষ হলে।'

বলে, কেবিনে ঢুকে গেলেন টম টার্নার।

প্রশ্ন করলে যখন এই ধরনের কাটখোট্টা জবাব আসে, তখন আর খামোকা মুখ ব্যথা করে লাভ কি? কম্পাস দেখলেন ইভান্স। এ্যালবেট্রস তখনো দক্ষিণ পশ্চিমেই চলেছে।

সারা রাত ধরে ব্যাড ল্যাণ্ডস অর্থাৎ ছন্নছাড়া অঞ্চলের ভয়াল সুন্দর এখ্‌তিয়ার পেরিয়ে এসেছে নভোযান। নীচে আবির্ভূত হয়েছে আরেক ভূ-দৃশ্য।

ওমাহা এখন ছশ মাইল পেছনে। কলোরাডোর সুগন্ধি অঞ্চলও অনেক পেছনে। পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে খাড়াই পাহাড়ের ডগায় রেডইণ্ডিয়ানদের দুর্গ। ঠিক যেন জ্যামিতিক রেখায় আঁকা খাড়া পাঁচিল। হেথায় সেথায় দু'একটা গ্রাম।

বহুদূরে ধোঁয়ার মত দেখা যাচ্ছে আরেকটা পাহাড়ের সারি: রকি-মাউণ্টেন।

এই প্রথম শীত-শীত করছিল প্রুডেন্ট এবং ইভান্সের। ঠাণ্ডা বেড়েছে আবহাওয়ার জন্যে নয়—কেন না সূর্য দিব্বি ঝকমক করছে মাথার ওপর। এ-শৈত্য উঁচুতে ওঠার দরুন! পাহাড় চূড়োর বাধা টপকে আসতে হয়েছে তো, তাই অ্যালবেট্রসকে ১০,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে যেতে হয়েছে। মাঝের ডেক-হাউসে ঝোলানো ব্যারোমিটারে পারা নেমে এসেছে ৫৪০ মিলি মিটার। একটু আগে অবশ্য ১৩,০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে হয়েছিল আকাশযানকে। কারণটা পেছনে ফেলে আসা তুষার-ঢাকা পাহাড় শ্রেণী দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু এ-কোন অঞ্চল অতিক্রম করছে অ্যালবেট্রস? কিছুতেই চিনতে পারলেন না বেলুনিস্টরা। সারা রাত ধরে প্রচণ্ড বেগে উত্তর দক্ষিণ করেছিল অ্যালবেট্রস। দিকভ্রম তো হবেই।

অনেক আলোচনার পর অবশ্য নিজেরাই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। খুব সম্ভব পাহাড় পরিবৃত এই জেলাটাকেই ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ন্যাশন্যাল পার্ক নাম দিয়েছিল। নামের উপযুক্ত জায়গা বটে। অদ্ভুত সুন্দর বাগিচা। পার্কের মত পার্ক। টিলার বদলে পাহাড়, ঝিরঝিরে জলের ধারার বদলে নদী। পুকুরের বদলে লেক, ফোয়ারার বদলে উষ্ণ প্রস্রবণ।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই যেন বাতাসের ওপর দিয়ে পিছলে ইওলো স্টোন রিভারের ওপর এসে গেল অ্যালবেট্রস। ডানদিকে পড়ে রইল মাউন্ট স্টিভেনসন—উড়ে চলল ইওলো স্টোন লেকের পাড় বরাবর। গাঢ় রঙের

আয়েম কাঁচ ছড়িয়ে আছে সারা অঞ্চলে। হরেক রকম কাঁচ এবং ক্ষুদে ক্রিস্টালের ওপর রোদ ঠিকরে যাচ্ছে আশ্চর্য রোশনাই ছড়িয়ে। নীল দর্পণের সেই আশ্চর্য প্রতিফলন মন ভরিয়ে তোলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এত বড় লেক দুনিয়ায় খুব কমই আছে। লেক ঘিরে ছুটোছুটি করছে হাজার হাজার পেলিক্যান, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, ঈগল পাখী। কোথাও কোথাও ঢালু পাড়ে সবুজ গাছের জটলা, পাইন আর লার্চের জড়াজড়ি। কেল্লার পাঁচিলের মত খাড়াই পাড়ের তলদেশে অসংখ্য সাদা ফোয়ারা মাটি ফুঁড়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে আকাশের দিকে। যেন অতিকায় চৌবাচ্চা লুকোনো রয়েছে মাটির তলায়—পাতালের আগুনে অহরহ টগবগ করে ফুটছে সেখানকার জল।

এই সুযোগে জাল ফেলে লেক থেকে বেশ কিছু ট্রাউট মাছ ধরতে পারত রাঁধুনি। ইওলো স্টোন লেকে এই মাছটাই পাওয়া যায় লাখে লাখে। কিন্তু অত উঁচু দিয়ে উড়লে কি জাল ফেলা সম্ভব?

মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল লেক পেরোতে। আর একটু যেতেই পায়ের তলায় দেখা গেল উষ্ণ প্রস্রবণের এলাকা। একমাত্র আইসল্যাণ্ড ছাড়া এ-দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন বেলুনিস্টরা। বেজায় উঁচুতে ধেয়ে উঠছে জলের ধারা—এই বুঝি ভিজে গেল অ্যালবেট্রসের তলা। ঐ তো 'ফ্যান'—রশ্মির আকার ছড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা; 'ফোটরেস'-য়ের ফোয়ারায় জলপ্রপাতের গর্জন শোনা যাচ্ছে; 'ফেথফুল ফ্রেণ্ড'য়ের মাথায় শত রামধনু ঝলমল করছে; 'জায়াণ্ট' বিশ ফুট জায়গা জুড়ে দুশ ফুট ওপর পর্যন্ত ছুঁড়ে দিচ্ছে জলের পিচকিরি।

সুমহান এই দৃশ্য দেখে নিশ্চয় চোখ পচে গেছে রোবারের, তাই তাঁকে ডেকে দেখা গেল না। এ দৃশ্যের জুড়িদার হবার মত দৃশ্য বিশ্বে আর কোথাও বুঝি নেই। তবুও তিনি বেরিয়ে এলেন না। তবে কি মাননীয় কয়েদীদের জাতীয় বাগিচা দেখানোর জন্যেই ব্যোমযানকে তিনি চালিয়ে এনেছেন এখানে? বুকের পাটা তো তাঁর কম নয়। সোজা উড়ে চলেছেন রকি মাউণ্টেনের দিকে! ব্যাপার কী? রকি মাউণ্টেনও টপকাবেন নাকি?

তখন সকাল সাতটা। রোবার নিশ্চয় বাহাদুরি দেখানোর জন্যে সব চাইতে উঁচু শিখরেরও ওপরে তুলবেন অ্যালবেট্রসকে। কিন্তু তার দরকার ছিল না। বহু গিরিপথ রয়েছে রকি মাউণ্টেনে, রয়েছে বিস্তর উপত্যকা। প্যাসিফিক রেলপথও 'ব্রীজার গ্যাপ' দিয়ে মর্মন অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এমনি একটা ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই পর্বত শ্রেণী পেরিয়ে যাওয়া যেত।

রোবার কিন্তু শেষকালে এই রকমেই একটা গিরিপথ বেছে নিলেন। দুপাশের খাড়াই পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে ব্যোমযান যাতে গুঁড়িয়ে না যায়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখল চালক। পাকা হাত তার। পাহাড় বাঁচিয়ে এমন কায়দায় অ্যালবেট্রসকে উড়িয়ে নিয়ে চলল যেন ঘোড়া ছোটাচ্ছে রয়াল ভিক্টোরিয়া রেসের মাঠে! সাবাস! সাবাস! অত শত্রুতা সত্ত্বেও অ্যালবেট্রসের আশ্চর্য উড়ে যাওয়া দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না বেলুনিস্টরা। নিখুঁত নভোযান বলতে যা বোঝায়, অ্যালবেট্রস তাই।

আড়াই ঘণ্টা লাগল রকি মাউণ্টেন পেরোতে। আবার ঘণ্টায় বাষট্টি মাইল বেগে উড়ে চলেছে অ্যালবেট্রস দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। বেশ কয়েক'শ গজ নেমে এসেছে যন্ত্রযান। নীচে জমি দেখা যাচ্ছে। এমন সময়ে ট্রেনের হুইসল শুনে চমকে উঠলেন প্রুডেণ্ট এবং ইভান্স।

সল্টলেকের দিকে চলেছে প্যাসিফিক রেলওয়ে ট্রেন।

ঠিক এই সময়ে যেন গোপন সংকেত পেয়ে ঝুপ করে ট্রেনের একটু ওপরেই নেমে এল অ্যালবেট্রস—উড়ে চলল ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। হৈ-হৈ পড়ে গেল ট্রেন-যাত্রীদের মধ্যে। জানলা দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল সারি সারি উৎসুক মুখ। তারপর পা-দানিতে দাঁড়িয়ে গেল কাতারে কাতারে লোক। অনেকে তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে উঠে এল ছাদে অভিনব যানকে ভাল করে দেখবার জন্যে। তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল গোটা ট্রেন থেকে। রোবারকে কিন্তু দেখা গেল না উল্লাস-রোলের জবাব দিতে।

যেন খেলা জুড়ল অ্যালবেট্রস। সার্কাস দেখাতে লাগল শূন্যপথে। কখনো ধাঁ করে নেমে আসে সামনে, কখনো পেছিয়ে যায় একদম পেছনে, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। সেইসঙ্গে উড়তে লাগল রোবারের নিজস্ব পতাকা—সোনালী সূর্য। রেলগার্ড জবাব দিল তারকালাঞ্ছিত যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে।

বেলুনিস্টরা অবশ্য এই সুযোগে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেলেন সমানে।

'আমি আঙ্কল প্রুডেণ্ট, ফিলাডেলফিয়ায় থাকি?'

'আমি ফিল ইভান্স, ওঁর সহযোগী!'

কিন্তু কে তাঁদের কথা শোনে? ওঁরা যত চেঁচান, ট্রেন যাত্রীরাও তত জয়ধ্বনি করতে থাকে। সমুদ্রনির্ঘোষের মত সেই বিপুল হর্ষধ্বনি ছাপিয়ে কয়েদীদের কথা কারো কানে পৌঁছালো না। কেউ জানতেও পারল না। লোপাট বেলুনিস্টরা অসহায় ভাবে উড়ে চলেছেন তাঁদের সামনে!

জনা তিন চার কর্মচারী এসে দাঁড়াল ডেকে। একজন একটা দড়ি ঝুলিয়ে

ধরল ট্রেনের সামনে। ব্যঙ্গচ্ছলে দ্রুতগতি জাহাজ যেন ধীরগতি জাহাজকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে! বিদ্রূপ দিয়ে হর্ষধ্বনির জবাব দিলেন রোবার। কেন না পরক্ষণেই বৃদ্ধি পেল অ্যালবেট্রসের গতিবেগ। দেখতে দেখতে পেছনে হারিয়ে গেল শুঁয়োপোকার মত গুড়গুড়ে ট্রেনটা।

বেলা একটার সময়ে একটা বিশাল চাকতি দেখা গেল। সূর্যের আলো যেন একটা মস্ত পুকুরে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে দিকে দিকে।

'নিশ্চয় মর্মন রাজধানী—সল্টলেক সিটি,' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

সল্টলেক সিটিই বটে। মস্ত পুকুরটা আসলে ট্যাবরন্যাকলের ছাদ। এ-ছাদের তলায় একসঙ্গে দশ হাজার সন্ত উপাসনা করতে পারেন। গম্বুজটা অনেকটা অবতল কাঁচের প্যাটার্নে তৈরী। ফলে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে যায় দিকে দিকে।

ছায়ার মত মিলিয়ে গেল বিশাল দর্পণ, দক্ষিণ পশ্চিমে বিপুল বেগে ছুটছে অ্যালবেট্রস, অথচ গতিবেগ টের পাওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাওয়ার চেয়েও জোরে ছুটছে যে! অচিরে দেখা গেল নেভাদার রুপো অঞ্চল।

ফিল ইভান্স বললেন—'আজ রাতেই কিন্তু সোনার সানফ্রানসিকোয় পৌঁছোচ্ছি।'

'তারপর?' শুধোলেন প্রুডেন্ট।

সন্ধ্যে ছটার সময়ে গিরিপথ দিয়ে উড়ে এল অ্যালবেট্রস। নীচে পাতা রয়েছে প্যাসিফিক রেললাইন। আর ১৮০ মাইল গেলেই সোনার দেশ ক্যালিফোরনিয়ার রাজধানীর সানফ্রানসিসকো।

এই গতিবেগে গেলে ঠিক আটটায় পৌঁছানো যাবে শহরে।

ঠিক এই সময়ে ডেকে আবির্ভূত হলেন রোবার। দৌড়ে গেলেন বেলুনিস্টরা।

আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন—'ইঞ্জিনীয়ার রোবার, আমেরিকার মাটি এখনো শেষ হয়নি। রসিকতাটা এবার শেষ করলে হয় না?...'

'আমি রসিকতা করি না।' জবাব দিলেন রোবার।

বলেই হাত তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে জমির কাছে নেমে গেল অ্যালবেট্রস। সেইসঙ্গে কমে গেল গতিবেগ। বেলুনিস্টদের কিন্তু আর বাইরে রাখা হল না। ঘরে পুরে বন্ধ করে দেওয়া হল দরজা।

বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—ওর টুঁটি যদি না ছিঁড়তে পারি তো আমার নাম—'

'পালাতেই হবে!' বললেন ফিল ইভান্স।

'আলবৎ ! প্রাণ যায় যাক !'

সহসা কর্ণরন্ধ্রে ভেসে এল বিরামবিহীন একটা শব্দ ! সৈকতভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ।

প্রশান্ত মহাসাগর !

(১১) প্রশান্ত মহাসাগরের কি শেষ নেই ?

মন স্থির করে ফেলেছিলেন প্রুডেণ্ট এবং ইভান্স। আর নয়, চম্পট দিতে হবে। আট জনের সঙ্গে লড়া তো দুজনের পক্ষে সম্ভব নয়। নইলে গায়ের জোরে কাবু করে জেতা যেত। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন তক্কে তক্কে থাকতে হবে। মাটিতে অ্যালবেট্রসকে নামতে হবেই। তখন চম্পট দেবেন তিনজনে। ইভান্সের ভয় কেবল প্রুডেণ্টকে নিয়ে। যা রগচটা, পাকা ঘুঁটি না কাঁচিয়ে দেন ! কখন কি কাণ্ড করে বসেন বলা যায় না !

অ্যালবেট্রস এখন উড়ে চলেছে নর্থ প্যাসিফিকের ওপর দিয়ে। সুতরাং পালানোর প্রশ্ন এখন মাথায় থাকুক।

রাতটা মনে হল বেজায় লম্বা। ভোরের আলো ফুটতেই দুজনে বেরিয়ে এলেন ডেকে। কর্কটক্রান্তির কাছাকাছি এসেছে উড়ুক্কুযান। ষাট অক্ষাংশে রাত নেই বললেই চলে। দিন বেজায় লম্বা।

রোবার ডেক-হাউস ছেড়ে বেরোননি। কে জানে ইচ্ছে করেই ভেতরে ঢুকে বসে আছেন কিনা। সকালের দিকে একবার বেরোলেন বটে, কয়েদী যুগলের পানে মাথা হেলিয়ে সামান্য অভিবাদন জানিয়ে গটগটিয়ে চলে গেলেন গলুইয়ের দিকে।

এতক্ষণ পরে কেবিন থেকে টলতে টলতে বেরোলো ফ্রাইকোলিন, না ঘুমিয়ে চোখ তার টকটকে লাল, চাহনিও মাতালের মত। পা ফেলার ধরন দেখে মনে হল শক্ত জমির ওপর পা পড়ছে না। নিয়মিত ছন্দে ধীরে সুস্থে ফর-ফর করে ঘুরছে প্রপেলারগুলো। প্রথমেই সেদিকে চোখ তুলল ফ্রাইকোলিন। তারপর যেন বাতাসের ওপর হাঁটতে হচ্ছে, এমনি অদ্ভুতভাবে হেঁটে কোনমতে পৌঁছালো রেলিংয়ের ধারে। উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল। হেঁট হয়ে দেখতে চায় কোন দেশের মাথায় এসেছে অভিশপ্ত অ্যালবেট্রস।

প্রথমে রেলিং ধরে নিজেকে সামলে নিল ফ্রাইকোলিন। তারপর টেনেটুনে দেখল রেলিংটা বিলক্ষণ মজবুত কিনা, ভার সইতে পারবে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে

আস্তে আস্তে শরীরটাকে রাখল রেলিংয়ের উপর—মাথা বাড়ালো এবং এতক্ষণ পরে খুলল বন্ধ চোখের পাতা।

পরক্ষণেই সে কী চিৎকার! তীরের মত ছিটকে এল রেলিংয়ের ধার থেকে! বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছুটতে লাগল কেবিনের দিকে।

গলা দিয়ে বেরোলো বেসুরো চীৎকার—'সমুদ্র! সমুদ্র!'

বেচারী! সাতশ ফুট নীচে বিশাল জলধি দেখলে কার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! নেহাত চুলগুলো ভেড়ার লোমের মত কুঁচকোনো—নইলে খাড়া হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে।

ছুটতে ছুটতে ফ্রাইকোলিন আছড়ে পড়ল যার দুবাহুর মধ্যে, সে অ্যালবেট্রসের পাচক। নাম, ফ্রাঁসোয়া তাপেজ, জাতে ফরাসি। কি করে যে সে রোবারের চাকরীতে বহাল হল, সে রহস্য বেলুনিস্টরা আবিষ্কার করতে পারেননি। শুধু জেনেছেন, লোকটা ঈয়াঙ্কি ঢঙে ইংরেজি বলতে পারে।

ফ্রাইকোলিনের কোমর ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধমকে উঠল তাপেজ—'সিধে হয়ে দাঁড়াও!'

'মাস্টার তাপেজ!' ফ্যালফ্যাল করে ঘুরন্ত প্রপেলারগুলোর দিকে চেয়ে রইল ফ্রাইকোলিন।

'হুকুম হোক।'

'যন্তরটা এর আগে ভেঙে-টেঙে যায়নি তো?'

'যায়নি, তবে যাবে।'

'কেন? কেন?'

'সব জিনিসই তো একদিন ভাঙবে।'

'নীচে সমুদ্র রয়েছে যে।'

'ভালই তো, সমুদ্রে পড়া যাবে।'

'ডুবে যাবো যে!'

'ডোবা ভাল—থেঁৎলে যাওয়া খারাপ।'

শুনেই চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনে অন্তর্হিত হল ফ্রাইকোলিন।

সারাদিন মোটামুটি গতিবেগে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল অ্যালবেট্রস। বেলুনিস্টরা কেবিন ছেড়ে বেরোননি। রোবার একা একা ধূমপান করেছেন ডেকে দাঁড়িয়ে, নয়তো পায়চারী করেছেন মেট-কে নিয়ে। অর্ধেক প্রপেলার বন্ধ রয়েছে। তবুও কিন্তু ঘন বাতাসের দৌলতে উড়ে চলেছে অ্যালবেট্রস।

কর্মচারীদের ইচ্ছে হয়েছিল বোধহয় জাল ফেলে মাছ ধরার। কিন্তু মাছের

মতই মাছ দেখা গেল। তিমি মাছ। পেটের কাছটা হলদে। লম্বায় আশি ফুট। পাকা তিমি শিকারীরাও হুঁশিয়ার হয় এ জাতীয় তিমি বধের সময়ে। এদের শক্তি সত্যি সত্যিই প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর সমান। অ্যালবেট্রসের ডেকে অবশ্য তিমি শিকারের সব সরঞ্জামই আছে। সাধারণ হারপুন, ফ্লেচার ফিউজ তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে জ্যাভেলিন-বম্ব।

কিন্তু অযথা প্রাণী হত্যা করে কোনো লাভ আছে কি? নেই। কিন্তু কয়েদীদের কাছে অ্যালবেট্রসের শক্তির নমুনা দেখাতে হবে না? সুতরাং রোবার হুকুম দিলেন—মারো তিমি!

'তিমি! তিমি!' চীৎকার শুনে ডেকে ছুটে এসেছিলেন বেলুনিস্টরা। ভেবেছিলেন তিমি শিকারী জাহাজ দেখা গেছে। তা যদি হয় তো টুপ করে জলে লাফিয়ে সাঁতরে উঠতে হবে সে জাহাজে।

কিন্তু কোথায় জাহাজ! পাঁতিপাঁতি করে দেখলেন বেলুনিস্টরা। জাহাজ নয়, ডাঙা নয়—ধূ ধূ সমুদ্র ছাড়া কিচ্ছু নেই।

কর্মচারীরা জড়ো হয়েছে ডেকে। 'বলুন, স্যার?' শুধোলেন টম টার্নার।'

'মারো।,' বললেন রোবার।

ইঞ্জিনরুমে অ্যাসিস্টাণ্টদের নিয়ে তৈরী হয়ে রয়েছে ইঞ্জিনীয়ার। সমুদ্রের আরো কাছে নেমে এল অ্যালবেট্রস—পঞ্চাশ ফুট নীচে ফুলে ফুলে উঠছে প্রশান্ত তরঙ্গ।

জল পৃষ্ঠে ভেসে উঠেছে তিমির দল! নাকের ফুটো দিয়ে তোড়ে জল ছাড়ছে ফোয়ারার মত। গলুইয়ের কাছে জ্যাভেলিন-বম্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন টম টার্নার। এ-বম্ব ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরী। ঠিক যেন একটা ধাতুর চোঙা ছুটে যাবে সেকেলে বন্দুকের নল থেকে। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ গেঁথে যাবে তিমির গায়ে, ফেটে যাবে চোঙার বোমা। সঙ্গে সঙ্গে তিমুখো হারপুন ঢুকে যাবে তিমির মাংসের মধ্যে!

গলুইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রোবার। বাঁ হাত নেড়ে তিনি ইসারা করছেন চালককে—ডান হাত নেড়ে টম টার্নারকে। তিনি একাই যেন অ্যালবেট্রসের প্রাণ। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় পালিত হচ্ছে তাঁর ইসারা-আদেশ—যেন পুতুল নাচ নাচাচ্ছেন রোবার।

'তিমি! তিমি!' ফের চেঁচিয়ে উঠলেন টম টার্নার। সামনের দিকে ফের ভেসে উঠেছে একটা প্রাগৈতিহাসিক দানব।

থেমে গেল অ্যালবেট্রস। ষাট ফুট তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল নিথর নিশ্চলভাবে।

টিপ করলেন টম টার্নার। ঘোড়া টিপলেন। সাঁ করে উড়ে গিয়ে গেঁথে গেল জ্যাভেলিন-বম্ব। ফাটল সশব্দে। তুমুখো হার্পুন ঢুকে গেছে ভেতরে!

'হুঁশিয়ার।' চীৎকার করলেন টম টার্নার।

শুরু হল মরণ দৌড়! এমন খেলা কে না দেখতে চায়? উৎকণ্ঠায় ঝুঁকে পড়েছিলেন বেলুনিস্টরা। মারাত্মক চোট খেয়ে জল তোলপাড় করে ডুব দিয়েছে তিমিটা। জল আছড়ে এসে পড়েছে অ্যালবেট্রসের ডেকে। হু-হু করে হারপুনে বাঁধা দড়ি ছুটে যাচ্ছে কাটিম থেকে। ভাগ্যিস আগে থেকে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল! নইলে ঐরকম বিদ্যুৎবেগে দড়ি ছুটলে আগুন ধরে যেত দপ করে।

দড়ির টানে ছুটে চলেছে অ্যালবেট্রস। প্রপেলার বন্ধ আছে। ছুরি নিয়ে তৈরী রয়েছেন টম টার্নার—গভীর জলে ডুব দিয়ে হ্যাঁচকা টান মারলেই দড়ি কেটে দেবেন।

আধ ঘণ্টায় ছ মাইল পেরিয়ে আসার পর দেখা গেল নেতিয়ে পড়ছে তিমি। রোবার প্রপেলার ঘোরাতে নির্দেশ দিলেন। উল্টো টান শুরু হল। কাছে টেনে আনা হচ্ছে তিমিকে।

অ্যালবেট্রসের মাত্র পঁচিশ ফুট তলায় এসে গেছে তিমি। ল্যাজের অবিশ্রান্ত ঘায়ে উত্তাল জলরাশি উঠে আসছে ডেকের ওপরেও।

আচমকা উল্টে গিয়ে গোঁৎ মারল তিমিটা। এত তাড়াতাড়ি দড়ি কাটবারও সময় পেল না টম টার্নার। হ্যাঁচকা টানে অ্যালবেট্রস নিমেষ মধ্যে নেমে এল জলের কাছে—

'গেল! গেল! গেল!' শেষ মুহূর্তে কুড়ুলের কোপে দড়ি কেটে দিলেন টম টার্নার। এক লাফে ছশ ফুট ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। মিনিট কয়েক পরেই মরা তিমিটা ভেসে উঠল জলের ওপর। চতুর্দিক থেকে উড়ে এল পালে পালে পাখী। অ্যালবেট্রস কিন্তু শিকার নিয়ে মাথা ঘামালো না—সটান উড়ে গেল পশ্চিমদিকে।

১৭ই জুন ভোর ছটায় দিগন্তে ভেসে উঠল অ্যালাসকা উপদ্বীপ আর সারি সারি অ্যালুইসিয়ান দ্বীপ।

এখানকার সীল মাছের কারবারে লাল হয়ে গিয়েছে রুশো-আমেরিকান কোম্পানী। সীলের চামড়া চড়া দামে বিকোয় গায়ে দেবার জন্যে। লম্বায় এক-একটা সীল ছ'সাত ফুট, ওজনে ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড। রঙটা বেশ খোলতাই, হলদে-বাদামী-লালের অপূর্ব সংমিশ্রণ। হাজার হাজার সীল লাইন দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে নীচে।

অ্যালবেট্রসকে দেখে তাদের হৃৎকম্প হল না। কিন্তু আতংকে আকাশ ফাটা চেঁচামেচি আরম্ভ করল হাঁস, মাছরাঙা, বক, সারসের দল। আকাশ দানবকে দেখে ত্রাহি ত্রাহি রব ছেড়ে কেউ গোঁৎ মারল জলের তলায়, কেউ উড়ে গেল দিশেহারা হয়ে।

এরপর বারশো মাইল পেরোতে লাগল ঝাড়া চব্বিশটা ঘণ্টা। সারা দিনরাত ধরে বেরিং সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে পৌছালো কামচটকা উপদ্বীপে।

বেলুনিস্ট দুজন মুষড়ে পড়েছিলেন অ্যালবেট্রসের বিরাম বিহীন ওড়া দেখে। রোবার নিশ্চয় চীন অথবা জাপানের দিকে চলেছেন। চীনেম্যান আর জাপানীদের হাতে প্রাণগুলো সঁপে দিতেও রাজী ইভান্স এবং প্রুডেণ্ট—কিন্তু অ্যালবেট্রসে আর একদণ্ড নয়। ভূমিস্পর্শ করিলেই লম্বা দিতে হবে।

কিন্তু ভূমিস্পর্শ করবার তো কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পাখী হলে ক্লান্ত হত, বেলুন হলে গ্যাস ফুরোতো। কিন্তু অ্যালবেট্রসের ভাঁড়ার ঘরে খাবার রয়েছে কয়েক সপ্তাহের মত। ইলেকট্রিক শক্তি খরচ করেও শেষ করা যায় না। সুতরাং স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামবে কেন অ্যালবেট্রস ?

১৮ই জানুয়ারী কামচটকা উপদ্বীপ পেরিয়ে গেল ব্যোমযান। দিনের বেলা দেখা গেল ক্লোটিস্থ আগ্নেয়গিরি।

উনিশ তারিখে উত্তর এবং দক্ষিণ জাপানের মধ্যকার প্রণালী ডিঙিয়ে গেল অ্যালবেট্রস। পায়ের তলায় এসে গেল সাইবেরিয়ান নদী—আমুর।

কুয়াশার আবির্ভাব ঘটল ঠিক তখনি। সে কী কুয়াশা! সামনে যাওয়া অসম্ভব। অগত্যা উর্দ্ধে উঠতে হল এরোনফকে। সিধে গেলেও ক্ষতি ছিল না। পর্বত সঙ্কুল হলে পাহাড়ে ধাক্কা লাগবার ভয় ছিল। কিন্তু দিব্বি চ্যাটালো এখানকার জমিজায়গা। তবে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না সাংঘাতিক গাঢ় ঐ কুয়াশায়। ডেকের সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল কুয়াশার দাপটে।

তাই ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। কুয়াশার উচ্চতা ১৩০০ ফুট। অ্যালবেট্রসকে উঠতে হল তার ওপরে। আবার দেখা গেল রোদ্দুর ঝলমলে আকাশ। অত উঁচু থেকে পালানোর কথা ভাবা যায় কী? দমে গেলেন বেলুনিস্টরা।

রোবার একবার কাছে এসেছিলেন। বেলুনিস্টদের খোঁচা মেরে বলে গেছলেন।

'মশাইরা, কলে চলা জাহাজ বা পালতোলা জাহাজ হলে কি কুয়াশা থেকে এত সহজে বেরোতে পারত? নির্ঘাৎ দেরী হত। এক ইঞ্চি এগোতে হলেও

হর্ন বা হুইসল বাজাতে হত। গতিও কমাতে হত। কিন্তু অ্যালবেট্রসকে কিস্‌স্থ করতে হল না। নিঃশব্দে পুরোদমে বেরিয়ে এল কুয়াশার রাজ্য ছেড়ে। কুয়াশা অ্যালবেট্রসকে কাবু করতে পারে না। গোটা আকাশে তার অবাধ বিহার আটকায় কে?

বলে, মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা না করে, তামাক পাইপ টানতে টানতে চলে গেলেন অন্যদিকে। পাইপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে হারিয়ে গেল আকাশে।

ফিল ইভান্স বললেন—'আঙ্কল প্রুডেন্ট, এ তো বড় অবাক কথা! অ্যালবেট্রসকে হারানোর ক্ষমতা কি কারো নেই? কাউকেই ডরায় না আশ্চর্য এই যন্ত্র?'

'দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!' রাগে গরগর করে উঠলেন ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট!

পুরো তিন দিন মৌরসী পাট্টা গেড়ে রইল কুয়াশা। জাপানের পাহাড় ফুজিয়ামাকে ডিঙোনোর জন্যে আরো ওপরে উঠতে হল নভোযানকে।

কুয়াশার পর্দা সরে যাবার পর পায়ের তলায় দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড শহর। প্রাসাদ, ভিলা, বাগান, পার্ক ঝলমল করছে সূর্যালোকে। রোবার কিন্তু চেয়েও দেখলেন না।

অগুন্তি শকুন আর কুকুরের চীৎকার এবং বধ্যভূমিতে নিহত অপরাধীদের মড়া পচা গন্ধ নাকে আসতেই বোঝা গেল শহরটার নাম কি।

বেলুনিষ্ট দুজন রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়লেন বটে, কিন্তু রোবার কুয়াশার দিকে চেয়ে ভাবছিলেন, ফের কুয়াশার মধ্যে ঢুকবেন কিনা।

মুখ না ফিরিয়েই বললেন—'লুকোছাপার দরকার দেখি না। শহরটা জাপানের রাজধানী—টোকিও।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের তখন দম আটকে আসছে পচাগন্ধে। কথা বলবেন কী?

'টোকিওর এ চেহারা সত্যিই বড় অদ্ভুত', বললেন রোবার।

'অদ্ভুৎ হলেও—' বললেন ফিল ইভান্স।'

'পিকিংয়ের মত ভাল নয়, তাই তো? আমার নিজের মতও তাই। ঠিক আছে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন শীগগিরই, 'বললেন রোবার।' 'নিজেরাই দেখেশুনে বলুন কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ!'

'উফ! সহ্য করা যাচ্ছে না!'

দক্ষিণ পশ্চিমে উড়ছিল অ্যালবেট্রস। চার পয়েন্ট বেঁকে গেল গতিমুখ, অর্থাৎ উড়ে চলল পুব দিকে।

(১২) হিমালয়ের বুক চিরে

কুয়াশা পরিষ্কার হল রাত থাকতেই। ভোরের আলোয় দেখা গেল আর এক আপদ। ঝড় আসছে! যে সে ঝড় নয়—টাইফুন!

হু-হু করে নেমে গেল ব্যারোমিটারের পারদ, অদৃশ্য হল বাষ্পকণা, চাই চাই মেঘ ঝুলতে লাগল তামার মত আকাশে, ঠিক বিপরীত দিগন্তে স্লেট রঙের প্রান্তরে দেখা গেল লম্বা লম্বা টকটকে লাল রেখা, উত্তর দিক রইল দিব্বি পরিষ্কার। হঠাৎ যেন পুকুরের মত শান্ত হয়ে গেল সমুদ্র—সূর্যাস্তের গাঢ় লোহিত বর্ণ রাঙিয়ে তুলল জলরাশি।

কপাল ভাল তাই টাইফন হানা দিল দক্ষিণ দিকে। লাভের মধ্যে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তিন দিনের জমা কুয়াশাপুঞ্জ।

কোরিয়ান প্রণালীর একশ পঁচিশ মাইল পেরিয়ে আসা গেল এক ঘণ্টার মধ্যেই। চীন উপকূলে টাইফুন তাণ্ডব নাচ জুড়তেই অ্যালবেট্রস এসে পৌঁছলো পীত সাগরে। বাইশ, তেইশ, চব্বিশ তারিখে দিগন্তে বিলীন হল পিচীলি উপসাগর, পীহো উপত্যকা—এগিয়ে চলল পূর্বতম চীন সাম্রাজ্য সিলেসটিয়লে এমপ্যায়ারের দিকে।

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন দুই সতীর্থ। বহু নীচে দেখা যাচ্ছে বিরাট শহর। দীর্ঘ প্রাকারের একদিকে মাঞ্চু নগরী আরেকদিকে চৈনিক নগরী। বলয়াকারে গড়ে ওঠা বারোটা শহরতলী ছাড়িয়ে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখার মত বিরাট চওড়া রাজপথ, রোদ্দুর ঝলমলে মন্দিরের সবুজ হলদে ছাদ, গন্যমান্য ম্যাণ্ডারিনদের অট্টালিকা পরিবেষ্টিত মাঠ; এর পরেই মাঞ্চু টাউনের ঠিক মাঝখানে ১৮০০ একর অর্থাৎ তিনমাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে পীত নগর। ঝকমক করছে পীত নগরের প্যাগোডা, রাজকীয় উদ্যান, টাউনের মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছে কমলার পাহাড়। পীতনগরের মাঝখানে অনেকটা চৈনিক গোলকধাঁধার মত গড়ে উঠেছে লোহিত সাগর—সম্রাটের প্যালেস—সারি সারি সুউচ্চ শিখরের আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য।

অ্যালবেট্রসের পেটের তলায় যেন একযোগে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। যেন অগুন্তি আকাশে-বীণা অশ্রুতপূর্ব কনসার্ট বাজাচ্ছে। কয়েক শ' ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। এক-একটি ঘুড়ির এক-একরকম চেহারা। তালপাতার

ঘুড়ির ওপায় পাতলা কাঠের ধনুক কঞ্চি লাগানো। ঘুড়ি যত ফর-ফর করে উড়ছে, হাওয়ার ধাক্কায় ততই বাজছে কঞ্চির বাঁশি। কয়েক শ' ঘুড়ির থেকে উত্থিত হচ্ছে কয়েক শ' সুর। কোথায় লাগে সাত বুলবুলের গান! সুরের ইন্দ্রজাল রচিত হয়েছে শূন্যে—যেন সঙ্গীত সমৃদ্ধ অক্সিজেন সেবন করে গলা ছেড়ে গান ধরেছে ঘুড়ির দঙ্গল!

রোবারের কি খেয়াল হল। অ্যালবেট্রসকে নামিয়ে আনলেন উড়ন্ত ঘুড়িগুলোর মাথার ওপর। কনসার্ট বাজনায় ঝালাপালা হয়ে গেল কান।

শহরবাসীরা কিন্তু হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল। একসঙ্গে টমটম জাতীয় জোরালো চৈনিক বাজনা বেজে উঠল শহরের সর্বত্র—যেন হঠাৎ জগঝম্প আরম্ভ হলো চৈনিক আবাসে। গুড়ুম গুড়ুম করে ধমকে উঠল হাজার হাজার বন্দুক, মুহুর্মুহু গজরাতে লাগল শ'য়ে শয়ে তোপ। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—আকাশ দানোকে আকাশেই ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। পটকা ফাটিয়ে ভূত তাড়ানোর মতই চৈনিক প্রচেষ্টা।

চৈনিক জ্যোতির্বিদরা কিন্তু এক পলকেই বুঝেছিলেন, এতদিনে রহস্য নিজেই হাজির হয়েছে মাথার ওপর। এত দিন যা ধোঁকা দিয়ে এসেছে পৃথিবীর তাবৎ লোককে। ঐ তো সেই উড়ুক্কু বিস্ময়! সাধারণ মানুষ অবশ্য অতশত বুঝল না। এমন কি উচ্চপদস্থ—রাজকর্মচারী যাঁরা সেই ম্যাণ্ডারিনরাও ধরে নিলেন অপদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে দিন দুপুরে! বুদ্ধের রাজত্বে এ কি উৎপাত? বাজাও ঢোল, দাগো তোপ!

নীচের হট্টগোল নিয়ে তিলমাত্র বিচলিত হয় নি অ্যালবেট্রসের কর্মচারীরা। ঘুড়ির সুতোগুলো পটাপট কেটে দিতেই গোঁৎ খাওয়া ঘুড়ি থেকে উত্থিত হল বেসুরো আওয়াজ। ভাসতে ভাসতে নীচে নামতে নামতে যেন নাকে কাঁদতে লাগল ঘুড়ির দল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে এল শ'য়ে শ'য়ে ঘুড়ি—নিস্তব্ধ হল আকাশ।

ঠিক তখনি মুখর হল টমটার্নারের ট্রাম্পেট। দুমদাম বন্দুক নির্ঘোষের আওয়াজ ছাপিয়ে দিকে দিকে ভেসে গেল সুরের ঢেউ?

আচম্বিতে একটা গোলা এসে ফাটল অ্যালবেট্রসের কয়েক ফুট তলায়। আর ঝুঁকি নেওয়া যায় না। নাগালের বাইরে উঠে গেল আকাশযান।

পরের ক'দিনে এমন কিছু ঘটল না যাতে পালানোর সুযোগ পাওয়া যায়। সামনে দক্ষিণ পশ্চিমে উড়ে চলেছে এরোনফ—অর্থাৎ গন্তব্যস্থান নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ। পিকিং থেকে রওনা হওয়ার বারো ঘণ্টা পরে চীনের প্রাচীর দেখতে পেলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স। তারপর লীভ

মাউন্টেনকে পাশ কাটিয়ে হোয়াংহো উপত্যকার ওপর দিয়ে তিব্বত আর চীনের সীমান্ত পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস।

তিব্বত দেশটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হলেও সমতলভূমি আছে বিস্তর, কিন্তু সবুজের সমারোহ যেন খুব কম। এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে তুষার কিরীট শোভিত পর্বত চূড়া, জল বিধৌত অনুর্বর উপত্যকা। হিমবাহ-পুষ্ট খরস্রোতা নদী, সূর্যকরোজ্জ্বল লবণ উপত্যকা, হ্রদ পরিবেষ্টিত গহন অরণ্য। সব কিছুর ওপর দিয়ে তীব্র বেগে বইছে হিম বাতাস।

ব্যারোমিটারে দেখা গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেরো হাজার ফুট উর্দ্ধে ভাসছে অ্যালবেট্রস। দারুণ ঠাণ্ডা—তাপমাত্রা আর একটু নামলেই জল শুদ্ধ জমে যাবে! একে হাড় কাঁপানো শীত, তার ওপর অ্যালবেট্রসের প্রচণ্ড গতিবেগ—সারা গা গরম জামা কাপড়ে মুড়েও দাঁড়িয়ে থাকা গেল না ডেকে! কেবিনে আশ্রয় নিলেন বেলুনিস্টরা।

বাতাস এখানে খুবই পাতলা। সুতরাং ব্যোমযানকে ভাসিয়ে রাখতে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে প্রপেলারগুলো। আওয়াজ তো নয়, যেন ঘুমপাড়ানি গান।

নীচ থেকে দেখলে সে সময় মনে হত ঠিক যেন একটা বার্তাবহ কবুতর সাঁ-সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে মেঘলোক দিয়ে। দেখতে দেখতে পায়ের তলায় মিলিয়ে গেল গারলক—পশ্চিম তিব্বতের অন্যতম শহর।

২৬শে জুন দূর থেকে দেখা গেল একটা আকাশ ছোঁওয়া বাধা—পথ যেন বন্ধ। মেঘলোক ফুঁড়ে উঠে গেছে বরফ ছাওয়া শিখর। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে যেন পাঁচিল তুলে রেখেছেন প্রকৃতি স্বয়ং।

সামনের কেবিনে দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে সুমহান সেই দৃশ্য দেখে অভিভূত কণ্ঠে বললেন ফিল ইভান্স 'হিমালয়! রোবার ভারতবর্ষে ঢুকতে চান নিশ্চয়—তাই ঘুরে যাচ্ছেন।'

সত্যিই তাই, পাহাড়-প্রাকার যেন কাছে এসেও দূরে সরে যাচ্ছে।

'মন্দের ভাল', বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। 'বিরাট এই উপমহাদেশে সটকান দেওয়ার একটা না একটা সুযোগ পাবোই।'

'যদি পূর্বে বর্মা বা পশ্চিমে নেপাল দিয়ে যান, তাহলেই গেছি', বললেন ফিল ইভান্স।

'যেতে দিলে তো।'

'বটে!'

শ্লেষকঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল পেছনে।

পরের দিন আটাশে জুন জাও প্রদেশের মাথায় এসে পৌছালো অ্যালবেট্রস। শুধু পাহাড় আর পাহাড়—একদিকে নেপাল। উত্তরদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশের পথ আটকে রয়েছে পর্বতমালা। এরোনফ এখন উড়ছে দুটো উত্তুরে গিরিসংকটের মাঝখান দিয়ে। একটা কুয়েন-লাঙ। আর একটা কারাকোরাম। ডুবো পাহাড় বাঁচিয়ে মস্ত জাহাজ যেভাবে এঁকে-বেঁকে চলে, সুউচ্চ শিখরের বাধা কাটিয়ে ঠিক সেইভাবে চলেছে আকাশযান। হিমালয়ের এই অঞ্চল থেকেই বইছে পশ্চিমে সিন্ধু আর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র।

প্রকৃতির একী সাজ! দু'শ কি তার ও বেশী পাহাড় চূড়ো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; সতেরোটা চূড়ো পঁচিশ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু। উনত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে অ্যালবেট্রসের সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে মাউণ্ট এভারেস্ট। ডাইনে ছাব্বিশ হাজার আটশ ফুট উঁচু ধবলগিরি। এভারেস্টের পরেই ধবলগিরির স্থান উচ্চতার দিক দিয়ে।

রোবার গোঁয়ার নন। এত উঁচু চুড়ো টপকানোর মত আহম্মক তিনি নন। হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ তিনি জানেন। তাই বাইশ হাজার ফুট উঁচু ইবি গানিম গিরিপথের দিকেই চালিয়ে নিয়ে গেলেন আকাশযানকে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। সেকী উত্তেজনা: নিঃসীম উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে থাকা যে এত যন্ত্রণাদায়ক, তা কে জানত! উচ্চতা এমন কিছু বেশী নয় যে কেবিনে গিয়ে নাকে অক্সিজেনের নল লাগাতে হবে। কিন্তু শৈত্য নামক দৈত্যের অত্যাচার যে আর সওয়া যায় না!

গলুইয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রোবার। ওভারকোটে আবৃত তাঁর বলিষ্ঠ আকৃতি। টম টার্নার চাকা ধরেছেন—হুকুম দিচ্ছেন রোবার। ব্যাটারীর ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে—ঠাণ্ডায় অ্যাসিড জমে গেলেই কেলেংকারী। কিন্তু না, অ্যাসিড জমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জোরালো কারেণ্ট প্রচণ্ড বেগে ঘোরাচ্ছে প্রপেলার। তীক্ষ্ণ, তীব্র শব্দে বাতাস বুঝি ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। তেইশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছে অ্যালবেট্রস।

পাহাড়! পাহাড়! চারিদিকে কেবল পাহাড়! পাহাড় ঝলঝল করছে। পাহাড় জলজল করছে। পাহাড় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। শ্বেত শুভ্র পাহাড়ের এমন সমারোহ বিশ্বের আর কোথাও কি দেখা যায়? লেক নেই। কিন্তু দশ হাজার ফুট নীচে নামছে হিমশৈল। গাছপালা নেই—অথচ ঈষৎ সবুজের ছিটে দৈবাৎ দেখা যাচ্ছে হেথায় সেথায়। আরো নীচে পান্নার মত ঝকঝক করছে পাইন দেবদারুর জঙ্গল। এখানে কিন্তু দানবিক ফার্ণ নেই। নেই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত পরাশ্রয়ী লতা। নেই জন্তু, বুনো ঘোড়া, তিব্বতী গাই

ইয়ক। অনেক নীচে ঢালু পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে দু-একটা গ্যাজেল হরিণ। ঊর্দ্ধ বিহারী কাক ছাড়া কোনো বিহঙ্গও নেই।

অবশেষে ফুরালো গিরিপথ। নীচে নামছে অ্যালবেট্রস। পাহাড়ের পর আরম্ভ হল জঙ্গল। তারপরেই দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি।

অতিথিদের সামনে এসে দাঁড়ালেন রোবার।

বললেন—'জেণ্টেলমেন, ভারতবর্ষ!'

(১৩) ক্যাসপিয়ানের ওপর দিয়ে

ভূস্বর্গ হিন্দুস্থানের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছিল না ইঞ্জিনীয়ার রোবারের। হিমালয় টপকেছিলেন কেবল প্রতিপক্ষদের চক্ষু চড়কগাছ করার জন্যে; বাতাসের চাইতে ভারী মেশিনের কেরামতি কতখানি—তা দেখানোই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়রে! যাঁরা দেখতে চান না তাঁদের কি কিছু দেখানো যায়? মনে মনে অত্যাশ্চর্য উড়োজাহাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেও মুখে তো কিছুই প্রকাশ করছেন না দুই বেলুনিস্ট। তাঁদের মাথায় ঘুরছে কেবল একটাই চিন্তা—কি করে পালানো যায় অ্যালবেট্রস থেকে। দিনরাত পালাই-পালাই করলে ভূস্বর্গ-দৃশ্যই বা দেখবেন কখন! পায়ের তলায় পাঞ্জাবের অমন সুন্দর ভূ-প্রকৃতি এসে চলে গেল, কিন্তু কোনদিকে নজর নেই আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্সের।

হিমালয়ের সানুদেশ বরাবর অঞ্চলের নাম তরাই অঞ্চল। জলাভূমির ওপর ভাসছে ম্যালেরিয়া বাষ্প। জ্বর এখানে সংক্রামক ব্যাধি। অ্যালবেট্রস কিন্তু রোগের ডিপো নিয়ে চিন্তিত নয়। চীন আর তুর্কিস্তানের সঙ্গে ভারতের মাটি যেখানে মিলেছে, তাড়াহুড়ো না করে সেই দিকেই উড়ে চলল আকাশযান। ২৯শে জুন পায়ের তলায় যেন একটা ভারী সুন্দর ছবির পট মেলে ধরা হল। কাশ্মীর উপত্যকা।

এক কথায় ভূস্বর্গ। মর্ত্যে যদি কোথাও নন্দন কানন থাকে তবে তা এই উপত্যকা। হিমালয়ের ছোট বড় পাহাড়ের মধ্যে যেন একটা আশ্চর্য উদ্যান—প্রকৃতির নিজস্ব নিকেতন। হিডাসপেস নদীর অববাহিকায় এককালে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতবর্ষ আর গ্রীকদেশ। পুরু আর আলেকজাণ্ডারের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী রক্তাক্ত করে তুলেছিল এখানকার মাটি।

হিডাসপেস এখনো আছে ; কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি যে দুটি বিজয়নগরী প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেলেন তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।*

সকাল নাগাদ এরোনফ এসে পৌঁছলো শ্রীনগরের ওপর। শ্রীনগরকে কাশ্মীর বললেই চিনতে সুবিধে হয়। নদীর দুপাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জমজমাট শহর। দেখে মুগ্ধ হলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। অত উঁচু থেকে কাঠের সেতুগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সরু সরু সুতো ; ভিলা আর বারান্দাগুলো যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ছিপছিপে পপলারের ছায়া পড়েছে ছোট-ছোট পাহাড়ে, ঘরবাড়ীর ছাদে ঘাস গজিয়েছে—উঁচু থেকে মনে হচ্ছে যেন উই ঢিবি। মাকড়শার জালের মত অগুন্তি খালে ভাসমান নৌকোগুলোকে দেখাচ্ছে বাদামের খোলার মত ; মাঝিরা ছোট হয়ে গেছে পিঁপড়ের মত; প্রাসাদ,মন্দির, গুমটিঘর কেল্লা দেখে মনে হচ্ছে যেন সঁ ভ্যালেরিনের ঢালু পাহাড়ে প্যারিস কেল্লা।*

ফিল ইভান্স বললেন—'ইউরোপে যদি থাকতাম, একে ভেনিস বলতাম।'

অমনি বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—ইউরোপে যদি থাকতাম, আমেরিকা সটকান দেওয়ার পথও পেতাম।'

নদীপুষ্ট হ্রদের ওপর দিয়ে না গিয়ে হিডাসপেস নদীর উপত্যকা বরাবর উড়ে চলল অ্যালবেট্রস।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল! নদীপৃষ্ঠের ঠিক তিরিশ ফুট ওপরে নেমে এসেছিল অ্যালবেট্রস। নিশ্চলভাবে ভেসে ছিল আধঘন্টার জন্যে। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে টম টার্নার রবারের পাইপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন নদীর জলে। ইলেকট্রিক পাম্পে করে জল তুলে নিয়ে ভরছিলেন চৌবাচ্চা। এই না দেখেই পা চুলবুল করে উঠল আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা কি যায়? মাত্র তিরিশ ফুট নদী নীচে···ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল···দুজনেই সাঁতার কাটেন মাছের মত। একবার তীরে গিয়ে উঠল রোবারের ক্ষমতা নেই ফের তাঁদের পাকড়াও করেন। কেননা, মাটি থেকে ছফুট ওপরে না থাকলে অ্যালবেট্রসের প্রপেলার ঘুরবে না। সুতরাং···

মুক্তির পন্থা বিদ্যুৎ চমকের মতই ঝলসে উঠল দুই বেলুনিস্টদের মগজে। পরিনামটা কি, তাও ভাবলেন। পরমুহূর্তে জ্যা মুক্ত তীরের মত ধেয়ে গেলেন রেলিংয়ের দিকে। কিন্তু পারলেন না। খপ করে কাঁধ খামচে ধরলো অনেকগুলো সাঁড়াশীর মত বলিষ্ঠ হাত।

---

*কাশ্মীর উপত্যকার এই ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বর্ণনা জুল ভের্ণের মূল কাহিনী থেকে হুবহু অনূদিত হল।

আটজোড়া চক্ষু নজর রেখেছিল ওঁদের ওপর। পালানো অসম্ভব!

এবার কিন্তু এত সহজে পা এলিয়ে দিলেন না বেলুনিস্ট দু'জন! আঁচড়ে কামড়ে ঘুসি লাথি মেরে হাত ছাড়িয়ে পালানোর কত চেষ্টাই না করলেন। কিন্তু অ্যালবেট্রসের রক্ষীরা কেউ শিশু নন।

রোবার বললেন—'আকাশ রাজা রোবার নামটা আপনাদেরই দেওয়া। সেই আকাশ রাজার সঙ্গে আকাশ বিহারী হওয়ার সুযোগ পেয়ে যে একবার ধন্য হয়, তাকে আজীবন এখানেই থাকতে হবে।'

সতীর্থকে প্রাণপণ জাপটে রইলেন ইভান্স, নইলে খুনোখুনি কাণ্ড করে ছাড়তেন প্রেসিডেন্ট। দুজনে কেবিনে গিয়ে ফুঁসতে লাগলেন খাঁচায় পোরা বাঘের মত। ঠিক করলেন, প্রাণ যায় যাক, পালাতেই হবে।

জল নেওয়া শেষ হতেই পশ্চিম মুখে উড়ে চলল অ্যালবেট্রস। মোটামুটি গতিবেগে সারাদিন উড়ে পেরিয়ে গেল কাবুলিস্তান। মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল রাজধানীর চেহারা, পেছনে পড়ে রইল হেরাত রাজ্য—অর্থাৎ কাশ্মীর এখন সাতাশ মাইল পেছনে।

এ-দেশ নিয়ে কম টক্কর লাগেনি দেশে-দেশে। রাশিয়া থেকে ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বে আসবার পথ গেছে এই দেশের ওপর দিয়ে। দেখা গেল রাস্তা দিয়ে চলেছে সারি সারি গাড়ী ঘোড়া, সেপাই। চলেছে রসদ গাড়ী বোঝাই হয়ে, চলেছে মানুষ কুচকাওয়াজ করে। শোনা যাচ্ছে কামান আর গাদা বন্দুকের নির্ঘোষ। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের যে ব্যাপারে নিজের আত্মসম্মান বা মানবিকতা জড়িত, সে ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ রোবার। তাই তিনি নির্বিকার ভাবে চলে এলেন সবার মাথার ওপর দিয়ে। আকাশকে যিনি আস্তানা বানিয়েছেন মর্ত্যের ব্যাপার নিয়ে তাঁর চিন্তা হবে কেন? হেরাত ইংলিশ পকেটে থাকুক, কি মস্কোর ট্যাঁকে উঠুক—তা নিয়ে আকাশ রাজার কোনো আগ্রহ নেই।

ঠিক এই সময়ে বালির ঝড় তেড়ে এল চারিদিক আঁধার করে। এ-তল্লাটে এ-ঝড়ের নাম তেবাদ। ঝড় মানেই জ্বর। অনেক রকম জ্বরের জীবাণু ভেসে আসে ধুলোর সঙ্গে। দেখতে দেখতে গাড়ী ঘোড়া মানুষ সেপাই সব ঢাকা পড়ে গেল বালির ঘোমটায়।

ধুলোর খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্যে ওপরে উঠতে হল অ্যালবেট্রসকে। প্রপেলারে ধুলো ঢুকে গেলে আর রক্ষে নেই। তাই দেখতে দেখতে ছ'হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল আকাশযান।

অদৃশ্য হয়ে গেল পারস্য সীমান্ত। স্পীড খুব বেশী নেই, কেননা পাহাড়

বলতে সে রকম কিছু নেই। যা আছে, তা নেহাতই ছোটখাট। কিন্তু রাজধানীর কাছাকাছি আসতেই টপকাতে হল দেমাভেন্দ গিরিচূড়াকে। তার মানে, বাইশ হাজার ফুট উঁচু বরফ ছাওয়া শিখর আর এলব্রুজ পর্বতমালার পাদদেশে তেহারান শহরকে ফেলে আসতে হল পেছনে। ধুলোর ঠুলিতে ঢাকা শহরের কিছুই অবশ্য দেখা গেল না; বালুকা-আবর্তের মাঝে মুখ তুলে রয়েছে কেবল দেমাভেন্দ পাহাড়।

দোসরা জুলাই ভোর ছটায় অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যে দেখা গিয়েছিল শাহ-প্রাসাদ, পোর্সিলেন টালি বাঁধানো দেওয়াল, সাজানো সরোবরের নীল আভা—ঠিক যেন ঝকঝকে পান্না মরকতের আশ্চর্য রোশনাই।

চকিতের মত নীল সৌন্দর্য দেখিয়েই অ্যালবেট্রস উড়ে গেল উত্তরে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এসে পৌঁছালো পারস্যের উত্তর সীমান্তে ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি।

ক্যাসপিয়ান সাগর। পাড়ে অবস্থিত রাশিয়ার দক্ষিণ ঘাঁটি—আস্ত্রদা শহর।

বালির ঝড় বিদায় নিয়েছে! ইউরোপীয় ছাঁচের বাড়ীর ছাদ দেখা যাচ্ছে। মাঝে একটি গির্জে।

সাগরের কাছে গোঁৎ খেয়ে নেমে এল অ্যালবেট্রস। সন্ধ্যে নাগাদ উড়ে চলল উপকূলের ওপর দিয়ে। এককালে এ-অঞ্চল তুর্কিস্তানের দখলে ছিল, এখন রাশিয়ার। তেসরা জুলাই ক্যাস্পিয়ানের তিনশ ফুট ওপরে ভাসতে লাগল অ্যালবেট্রস।

ধারে কাছে ডাঙার চিহ্ন দেখা গেল না।

এশিয়ার মাটি বা ইউরোপের মাটি দুটোই আপাততঃ দৃষ্টি পথের বাইরে। হাওয়ায় এশিয়ার পাল মেলে উড়ছে খানকয়েক নৌকো। দিশি নৌকো। অদ্ভুত গড়ন। দু মাস্তুলওয়ালা কেশেবি, এক মাস্তুলওয়ালা হার্মাদ-নৌকো কায়ুক, তিমিল এবং মাছ ধরা আর বাজার হাট করার জন্যে ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকো। হেথায় সেথায় কলে চলা স্টীমারের চিমনির ধোঁয়া আকাশে উঠছে। রাশিয়ান জল পুলিসের লঞ্চ।

সেইদিনই সকালবেলা রাঁধুনিকে বলছিলেন টম টার্নার—'হ্যা, হ্যা, ক্যাসপিয়ানের ওপরে আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকব।'

'ভালই হল। কিছু মাছ ধরব ঠিক করেছি', বলল তোপাজ।

'বেশ তো।'

ক্যাসপিয়ান সাগর লম্বায় ছশ পঁচিশ মাইল, চওড়ায় দুশ মাইল। মাছ ধরার জন্যে নিশ্চয় স্থির হয়ে দাঁড়াবে যন্ত্রযান। এই তো চাই!

ফিলিস ইভান্সের কানেই ভেসে এল টম টার্নারের কথা। গলুইতে দাঁড়িয়ে ক্রাইকোলিনের কাকুতি মিনতি শুনতে হচ্ছিল তাঁকে। ঘ্যানর ঘ্যানর জুড়েছে নিগ্রো—ডাঙায় নিয়ে যেতে হবে তাকে।

জবাব দিলেন না ইভান্স। সটান গেলেন প্রুডেন্টের কাছে। বললেন আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার প্রোগ্রাম।

'ফিল ইভান্স', বললেন প্রুডেন্ট—স্কাউণ্ড্রেল রোবার আমাদের নিয়ে কি করতে চায়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি ?

'নেই। মুক্তির আশা দুরাশা বললেই চলে। ওর মর্জি হলে মুক্তি পাব, নইলে নয়।'

'চলুন তাহলে পালাই।'

'অ্যালবেট্রস কিন্তু মেশিন হিসেবে খাসা।'

'হতে পারে। কিন্তু মেশিনটা যে বদমাসের, তার কাছে আমাদের ইচ্ছের কোনো দাম নেই। জোর করে সে কয়েদ করে রেখেছে আমাদের। মেশিন যদি ভেঙে চুরমার না করি তো আমার নাম—'

'চুরমার পরে করবেন, আগে পালান তো।'

'একশবার। আগে পালানো যাক, তারপর ফিরে এসে দেখা যাবে'খন কার মুরোদ কতখানি। রোবার নিশ্চয় ক্যাসপিয়ান পেরিয়ে ইউরোপে ঢুকবেন হয় উত্তরে রাশিয়া দিয়ে, নয় পশ্চিমে দক্ষিণ দেশ টপকে, আটলান্টিকে পৌঁছোনোর আগেই সটকাতে হবে। তৈরী থাকতে হবে প্রতি মুহূর্তে।'

'কিন্তু পালাবেন কি ভাবে ?'

'দড়ি বেয়ে। রাত্রে নিশ্চয় সাগরের কাছাকাছি ভাসবে অ্যালবেট্রস। ডেকে অনেক দড়ি পড়ে রয়েছে। কয়েকশ ফুট লম্বা কাছি পাওয়া যাবে।'

'তা পাওয়া যাবে। যত ঝুঁকিই থাকুক না কেন—'

'থাকুক ঝুঁকি, দুজনেই এখন মরিয়া! দেখেছেন তো রাতের বেলা চাকা ধরে একজনই দাঁড়িয়ে থাকে ডেকের পেছনে, অন্ধকারে গা ঢেকে ডেকের সামনের দিকে গিয়ে যদি দড়ি ঝুলিয়ে দিই—'

'সাবাস! এই তো বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন। কাজের সময়ে মাথা গরম করলে কি চলে! এই মুহূর্তে যদি নামতে পারতাম, আশপাশের কোন একটা জাহাজে ঠাঁই মিলত, অ্যালবেট্রস এখুনি নীচে নামবে মাছ ধরতে।'

'এখন ? পাগল হয়েছেন! চোখে চোখে রেখেছে সবাইকে। ছিভাসপেস নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে কি রকম ক্যাঁক করে চেপে ধরেছিল মনে নেই ?' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'তা যদি বলেন তো রাতেও নজর থাকতে পারে আমাদের ওপর।'

'গোল্লায় যাক অ্যালবেট্রস! নিপাত যাক অ্যালবেট্রসের মালিক!'

দুজনের মনের অবস্থা তখন এমনই ভয়ংকর যে দুম করে কিছু একটা করে ফেলাও বিচিত্র নয়। রোবারের ব্যঙ্গ, কুকুর ছাগলের মত ব্যবহার, যখন তখন খাঁচায় পুরে রাখা, ক্যাটকেটে কথাবার্তা এবং নিজেদের শক্তিহীনতা—সব মিলে মিশে বেলুনিস্টদের মরিয়া করে তুলবে এ আর আশ্চর্য কী!

সেইদিনই আর একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটল ফ্রাইকোলিনকে নিয়ে। ফলে তুমুল কথা কাটাকাটি হয়ে গেল রোবারের সঙ্গে অতিথিদের। ফ্রাইকোলিন সহসা পায়ের তলায় থৈ-থৈ সাগর দেখে ভড়কে গিয়েছিল। ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। মনিবদের পা জড়িয়ে ধরছিল, মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

'ছেড়ে দিন! আমাকে ছেড়ে দিন! আমি পাখী নই, পাখীর মত উড়তে চাই না। আমাকে যেতে দিন। উ-হু-হু-হু!'

আঙ্কল প্রুডেন্ট যথারীতি উচ্চবাচ্য করছিলেন না, কানও দিচ্ছিলেন না। উল্টে উসকে দিচ্ছিলেন যাতে তার বিকট কান্নায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে রোবারের।

টম টার্ণার তখন মাছধরার উদ্যোগপর্ব নিয়ে ব্যস্ত। রোবারের হুকুমে ঘরে পুরে রাখা হল ফ্রাইকোলিনকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে গিয়েও কমল না তার দাপাদাপি, বরং বাড়লো; দেওয়ালে দমাদম লাথি, তুরুক নাচ এবং আকাশফাটা বিকট চীৎকারে কানের পোকা পর্যন্ত বেরিয়ে গেল সবার।

তখন ঠিক দুপুর বেলা। জল থেকে মাত্র পনেরো বিশ ফুট ওপরে ভাসছে অ্যালবেট্রস। দৈত্যদানোর যন্ত্র,নাকি? নাকি ভূতের কল? আঁৎকে উঠে জল তোলপাড় করে চম্পট দিল খানকয়েক জাহাজ। জল থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে অমন কিম্ভূতকিমাকার মেশিন দেখলে কার বুক না শুকোয়?

কয়েদীদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। হঠাৎ রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়লেও রবারের বোট নামিয়ে ফের তুলে আনতে কতক্ষণ। সুতরাং মাছধরার সময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে জাল ফেলা ভাল। ফিল ইভান্স তাই গেলেন মাছ ধরতে, রেগে টং হয়ে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

ক্যাস্পিয়ান সাগর আসলে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মাটি বসে যাওয়ার দরুণ সৃষ্টি হয়েছে। ভল্গা, উরাল, জেম্বা, কৌর, কৌমা এবং আরও অনেক জলধারা এসে পড়েছে সেখানে। জল উবে যায় বলে কূল ছাপিয়ে আশপাশের জমি ভেসে যায় না। নইলে কেলেংকারী কাণ্ড ঘটত। জল বেরোবার কোনো পথ তো নেই। কৃষ্ণ সাগর বা আরাল সাগরের চাইতে অনেক নিম্নভূমিতে রয়েছে

ক্যাস্পিয়ান সাগর। সে-সব সাগরের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগও নেই। দক্ষিণের প্রস্রবণ থেকে ক্রমাগত ন্যাপথা ক্যাস্পিয়ান সাগরে মিশছে বলে এখানকার জল বেজায় তেতো। তবুও কিন্তু এই তেতো জলেই মাছ আছে বহুকোটি। কিছু মাছ নাকি তিক্ত জলেই বাড়ে ভালো।

টাটকা মাছ খাওয়ার লোভে ফুর্তি আর ধরে না অ্যালবেট্রস কর্মচারীদের।

হারপুন দিয়ে অনেকটা হাঙরের মত বড় একটা মাছ গেঁথে হেঁকে উঠলেন টম টার্নার—'হুঁশিয়ার!'

সাত ফুট লম্বা স্টারজিয়ন মাছ। রাশিয়ানদের কাছে এ মাছের নাম অবশ্য বেলোগা। স্টারজিয়নের ডিমে নুন, ভিনিগার আর সাদা মদ মিশিয়ে সালো চাটনী তৈরী হয়। নদীর স্টারজিয়ন সমুদ্র-স্টারজিয়নের চাইতে বেশী সুস্বাদু হলেও অ্যালবেট্রসের পেটুকদের কাছে এই মাছই মনে হল অমৃত সমান।

সব চাইতে বেশী মাছ পড়ল টানা জালে। এক-একবার জাল ফেলে ধরা হল রাশিরাশি কার্প, স্যালমন, পাইক, ব্রীম। বড় দরের জেলেরা স্টারলেট মাছ জ্যান্ত চালান দেয় অ্যাসট্রাখান, মস্কো এবং পিটার্সবার্গে। মাঝারি সাইজের স্টারলেট মাছ জালে পড়ল বিপুল পরিমাণে। গামলা গামলা জ্যান্ত স্টারলেট নিয়ে সে কি ফুর্তি রাঁধুনির।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল মাছের ভাঁড়ার উপচে পড়ছে, সুতরাং ফের শুরু হল উত্তরে ওড়া।

আগাগোড়া চেঁচিয়ে, লাফিয়ে, অ্যালবেট্রসের প্রত্যেকের কান ঝালাপালা করে দিল ফ্রাইকোলিন। একি উৎপাত! একি উপদ্রব!

শেষকালে ধৈর্য ফুরোলো রোবারের। গরম স্বরে বললেন—'কালা আদমীটা কিছুতেই থাকবে না দেখছি।'

'ওর আর কি দোষ বলুন। কষ্ট হলে চেঁচাবে না? সে অধিকার নিশ্চয় ওর আছে', বললেন ফিল ইভান্স।

'তা আছে। আমারও অধিকার আছে আমার কান দুটোকে একটু রেহাই দেওয়ার', বললেন রোবার।'

ঠিক এই সময়ে ধাঁ করে ডেকে বেরিয়ে এসে হুংকার ছাড়লেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—ইঞ্জিনীয়ার রোবার!'

'আঙ্কল প্রুডেন্ট!'

দুজনে এগিয়ে গেছেন দুজনের দিকে। দুজনেই যেন ভস্ম করতে চাইলেন দুজনকে কটমটে চাহনি দিয়ে।

তারপর ভাঙ্গিল্যোর সঙ্গে দুকাঁধ ঝাঁকিয়ে হুকুম দিলেন রোবার—'ঝুলিয়ে দাও!'

হুকুমের মানেটা টম টার্নারকে বলতে হল না। কেবিন থেকে টেনে হিঁচড়ে আনা হল ফ্রাইকোলিনকে। যে দড়ি বেয়ে রাতের অন্ধকারে সটকান দেওয়ার প্ল্যান এঁটেছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, সেই দড়ির ডগাতেই বাঁধা হল একটা কাঠের গামলা। গামলায় ফ্রাইকোলিনকে বসিয়ে বাঁধা হল আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর দড়ি নামিয়ে গামলা সমেত নিগ্রোতনয়কে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একশ ফুট নীচে।

ফ্রাইকোলিনের অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল হুকুম শুনে। ফাঁসি দেওয়া হবে নাকি? তারপর দেখল তা নয়—দুলন্ত ঝুলন্ত বালতির মধ্যে তাকে বসে থাকতে হবে অ্যালবেট্রসের একশ ফুট নীচে। হু-হু করে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে উড়ছে অ্যালবেট্রস—সন্ সন্ করে বাতাস আছড়ে পড়ছে চোখে মুখে—যন্ত্রযানের অনেক পেছনে হেলে পড়েছে বালতি।

এ-অবস্থায় সে হার্টফেল করেনি এই যথেষ্ট। কিন্তু নিদারুণ আতংকে অবশ হয়ে গেল স্বরযন্ত্র। বোবা হয়ে গেল ফ্রাইকোলিন।

অনেক বাধা দিয়েছিলেন বেলুনিস্টরা। কিন্তু তাঁদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুকুম তামিল করল ষণ্ডামার্কা কর্মচারীরা।

'একী বর্বরতা! একী কাপুরুষতা!' চেঁচাতে লাগলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'তাই নাকি' বললেন রোবার।

'এর বদলা আমি নেব, মিঃ রোবার!'

'যখন খুশী নিতে পারেন, মিঃ প্রুডেন্ট!'

'আপনার চ্যালাচামুণ্ডাগুলোকেও বাদ দেব না'।

'শুরু করুন, শুরু করুন! দেরী কেন!'

কর্মচারীরা মারমুখো ভঙ্গীতে ঘিরে ধরল আঙ্কল প্রুডেন্টকে। হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরিয়ে দিলেন রোবার।

ফের বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রুডেন্ট—'ঝাড়েবংশে নিপাত করব সবকটাকে—পালের গোদাটাকেও বাদ দেব না।'

ফিল ইভান্স বৃথা রুখতে চেষ্টা করলে সতীর্থকে—পারলেন না।

'কবে মিঃ প্রুডেন্ট?' টিটকিরি দিলেন রোবার।

'ছাল ছাড়িয়ে নেব!'

'যথেষ্ট হয়েছে', কড়াগলায় এবার বললেন রোবার। 'আর একটা কথা বললে আপনাকেও চাকরের সঙ্গে ঝুলতে হবে নীচে!'

রোবার এককথার মানুষ। আঙ্কল প্রুডেন্ট কি সেইজন্যই বোবা হয়ে গেলেন?

মোটেই না। প্রচণ্ড ক্রোধে কথা আটকে গিয়েছিল তাঁর—কাজ করছিল না বাকযন্ত্র।

ফিল ইভান্স তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন কেবিনে। দেখা গেল আবহাওয়া কেমন জানি পালটে যাচ্ছে। থমথমে হয়ে উঠছে বায়ুমণ্ডল। যেন চাপা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে ইথারে। লক্ষণ দেখেই বোঝা গেল কি ঘটতে চলেছে।

ঝড় আসছে। ফের চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত। বায়ুমণ্ডলের ইলেকট্রিক সঞ্চয় আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছে না। যতখানি ইলেকট্রিক ধরে রাখবার ক্ষমতা আবহমণ্ডলে রয়েছে, তার বেশী ইলেকট্রিক পুঞ্জীভূত হয়েছে আকাশে বাতাসে। তাই বেলা আড়াইটে নাগাদ যেন লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হল গোলক জুড়ে। রোবার সে-দৃশ্য কখনো দেখেন নি। সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন।

উত্তরদিকে প্রথম দেখা গেল লক্ষরশ্মির নিখুত খেলা। ঝড় উঠেছে সেখানে, আধা-আলো আধা-আঁধারে ঠাসা রহস্যময় বাষ্প পেঁচিয়ে ঘূর্ণীর আকারে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে। এ আলো ইলেকট্রিকের আলো। মেঘের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রায় পুঞ্জীভূত হয়েছে ইলেকট্রিক চার্জ, এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ছুটে যাচ্ছে বাড়তি বিদ্যুৎ রশ্মি·· ঢেউয়ের ওপর প্রতিফলিত হয়ে লক্ষকোটি রোশনাই স্বর্গীয় সুষমা ঢেলে দিচ্ছে দিকে দিকে। আকাশের ভ্রুকুটি যত বাড়ছে, আলোর নাচ ততই তুঙ্গে উঠছে।

ঝড়ের মুখোমুখি পৌঁছেছে অ্যালবেট্রস। মোলাকাৎ ঘটবেই।

ক্রাইকোলিন কোথায় ? হাওয়ার টানে ঝুলছে বহু পেছনে।

কর্মচারীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে ডেকে। ঝড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে প্রস্তুতি চাই বইকি, তিন হাজার ফুট নীচে দেখা যাচ্ছে সাগরের জল।

আচম্বিতে অযুত করতালির শব্দ শোনা গেল। মেঘ উড়ে এসে হাততালি দিচ্ছে অ্যালবেট্রসকে ঘিরে। নিমেষ মধ্যে মেঘলোক বুঝি অট্টহেসে উঠল উড়ন্ত যন্ত্রকে জাপটে ধরে। আগুনে ছেয়ে গেল ডেক।

ফিল ইভান্স ছুটে গেছিলেন রোবারের অনুমতি নিয়ে ক্রাইকোলিনকে টেনে তোলার জন্যে। রোবার অবশ্য আগেই হুকুম দিয়েছেন। দড়ি ধরে টেনে তোলা হচ্ছে ওপরে, আচমকা অবর্ণনীয় শৈথিল্য দেখা প্রপেলারের ঘূর্ণনবেগে। ঢিলে দিচ্ছে চুয়াত্তরটা প্রপেলার···ঝিমিয়ে পড়ছে···ঘুরতে আর চাইছে না মাঝের ডেক হাউসে ছুটে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার রোবার।

'পাওয়ার···আরো পাওয়ার চাই···ঝড়ের ওপরে উঠতে হবে যে এখুনি !

'অসম্ভব, স্যার।'

'কেন ? কি হয়েছে ?'

'কারেন্ট আসছে না! কখনো আসছে, কখনো থেমে যাচ্ছে! তাই বুঝি অত জোরে নীচের দিকে পড়ছে অ্যালবেট্রস? সর্বনাশ!

ঝড়বিদ্যুতে ভাঙার টেলিগ্রাফ তারের যে দশা হয়, একই দশা হয়েছে, শূন্যপথে অ্যাকুমুলেটরের। কিন্তু টেলিগ্রাফ তারের বেলায় এ দুর্দৈব সাময়িক অসুবিধে ঘটায় খবর দেওয়া নেওয়ায়, অ্যালবেট্রসের বেলায় ঘনিয়ে আসছে সমূহ বিপদ। মৃত্যুর বুঝি আর দেরী নেই।

হাঁক দিলেন রোবার—'নীচে নামাও অ্যালবেট্রস—বেরিয়ে যাও ইলেকট্রিক এলাকার বাইরে—তাড়াতাড়ি। ভয় পেওনা! মাথা ঠাণ্ডা রাখো!'

কোয়ার্টার ডেকে উঠে দাঁড়ালেন রোবার—সঙ্গীরা গেল যে যার জায়গায়।

বেশ কয়েক ফুট নেমে এসেছে অ্যালবেট্রস। মেঘের এলাকা এখনো ছাড়িয়ে আসা যায় নি। এখনো আতসবাজীর খেলা চলছে যেন ডেকময়। হাজার হাজার ফুলঝুরি রংমশাল একযোগে জ্বলছে নিভছে নাচছে ছুটছে! প্রপেলার-গুলোর ঘূর্ণনবেগ আরো কমে এসেছে! বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে হু-হু করে সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে অ্যালবেট্রস।

বোধহয় আর একটা মিনিটও দেরী নেই। জলে আছড়ে পড়বে আকাশ-রাজার অজেয় বাহন। জলে একবার তলিয়ে গেলে আর কি ইঞ্জিন কাজ করবে? না। কখনই না। হঠাৎ মাথার ওপর আবির্ভূত হল ইলেকট্রিক মেঘ। সমুদ্র আর মাত্র ষাট ফুট নীচে। দু তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই জলের তলায় তলিয়ে যাবে ডেক।

চরম সংকটেও সুবর্ণ সুযোগকে লুফে নিলেন রোবার, মাঝের ডেকহাউসে ধেয়ে গিয়ে খামচে ধরলেন লিভার। এতক্ষণ আশেপাশের ইলেকট্রিক চার্জ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল অ্যাকুমুলেটরকে। কিন্তু ইলেকট্রিক মেঘের আবির্ভাবে মুহূর্তের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত হয়েছে অ্যাকুমুলেটরে, লিভারে চাপ দিতে না দিতেই প্রপাতের মতই প্রবলবেগে ছুটে এল ইলেকট্রিক প্রবাহ···চকিতের মধ্যে বৃদ্ধি পেল প্রপেলারের ঘূর্ণনবেগ···নিম্নমুখী পতন তো বন্ধ হলই, ঈষৎ কাৎ হয়ে সামনের প্রপেলার চালিয়ে, দ্রুতবেগে ঝড়ের এলাকা ছাড়িয়ে ছুটে চলল অ্যালবেট্রস।

কিন্তু ফ্রাইকোলিন এখন কোথায়? কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ডুবসাঁতার দিতে হয়েছিল ফ্রাইকোলিনকে। ডেকে টেনে তোলার পর দেখা গেল বেচারী ভীষণ ভিজে গিয়েছে। যেন এইমাত্র সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এল!

এরপর কি আর কথা বলা যায়? ফ্রাইকোলিনের নাকে কান্নাও আর শোনা গেল না। একেই বলে বেড়াল ভেজা!

চৌঠা জুলাই ক্যাসপিয়ানের উত্তর তট পেরিয়ে গেল অ্যালবেট্রস।

(১৪) পুরোদমে এরোনফ

এই ঘটনার পরের দু'দিন আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স দুজনেই খুব ভেঙে পড়লেন। দুজনেরই মনে হল বৃথা চেষ্টা, উড়ন্ত এই কেল্লা থেকে পালানো সম্ভব নয়। অথচ ওদের ওপর থেকে পাহারা সরিয়ে নিয়েছিলেন রোবার। হয়ত অষ্টপ্রহর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছিল না ওঁর পক্ষে। যদিও রোবার জেনে গিয়েছিলেন, বেলুনিস্টরা আর একদণ্ডও থাকতে চান না তাঁর অ্যালবেট্রসে।

কিন্তু থাকতে মন না চাইলেও, পালানো অত সোজা নয়, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিলে প্রাণটা গেলেও যেতে পারে; আর একশ বিশ মাইল বেগে উড়ন্ত আকাশযান থেকে লাফ দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

এই হল অ্যালবেট্রসের চূড়ান্ত গতিবেগ। পুরোদমে উড়ে চলেছে অ্যালবেট্রস, সোয়ালো পাখীও এত জোরে উড়তে পারে না। সোয়ালোর গতিবেগ ঘণ্টায় একশো বারো মাইল।

প্রথমদিকে হাওয়া বইছিল উত্তর পূর্বে; ফলে পশ্চিমদিকে উড়তে সুবিধেই হচ্ছিল অ্যালবেট্রসের, কিন্তু বাতাস পড়ে যেতেই হল মুস্কিল। প্রচণ্ডবেগে ওড়ার ঠেলায় ডেকে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একবার তো বাতাসে উড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেলেন দুই বেলুনিস্ট। ডেক হাউস ছিল বলে রক্ষে। ডেকহাউসের গায়ে আছড়ে পড়ে বেঁচে গেলেন সে যাত্রা।

তাঁদের দুরবস্থা দেখে চালক অ্যালার্ম ঘণ্টা বাজাতেই চারজন কর্মচারী ডেকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল তাঁদের দিকে।

সমুদ্রে যারা হামেশা যাতায়াত করেন, তাঁরা জানেন ঝড় ঠেলে এগানোর বিপদ কী। অ্যালবেট্রস কিন্তু নিজের ঝড় নিজেই সৃষ্টি করেছে তুলনাহীন গতিবেগে উড়তে গিয়ে।

চালকের চোখে পড়েছিলেন বলেই বেলুনিস্ট দুজন সেদিন প্রাণে বেঁচে গেলেন। স্পীড কমিয়ে দিতে হল—নইলে কেবিনে ফিরতে পারতেন না কেউই। ডেক-হাউসের মধ্যে গিয়ে নিঃশ্বেস নিয়ে বাঁচলেন দুজনে।

যে-যন্ত্র এই রকম অতুলনীয় স্পীডে উড়তে পারে, তুলনাহীন ধকল সইবার মত মজবুত করেই নিশ্চয়ই গড়া হয়েছে তার কাঠামো। শুধু কাঠামো কেন, কি বিপুল শক্তি থাকলে এতবড় মেশিনকে এতখানি গতিবেগে ঝড়ের মত উড়িয়ে

নিয়ে যাওয়া যায়, তা ভাবলেও যে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। ঘুরন্ত প্রপেলারগুলো এত জোরে ঘুরছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন ঘুরছে না—স্রেফ দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস কেটে পবনদেবের মতই সন সন করে উড়ে চলেছে আকাশ-রাজার আশ্চর্য সৃষ্টি।

ক্যাস্পিয়ানের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আস্ত্রাখান শহরটিকে দেখা গিয়েছে ইউরোপের প্রবেশ পথে। এ-শহরের অন্য নাম 'মরু-নক্ষত্র'। কোন্ কবি এ নাম দিয়েছিলেন, তা জানা নেই। মরুভূমি-তারকার সে গৌরব এখন আর নেই। এককালে ছিল প্রথম শ্রেণীর শহর; এখন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীর। পলকের মধ্যে দেখা গেল মান্ধাতা আমলের পাঁচিল, কেল্লার বুরুজ পরিখা-প্রাকার, শহরের ঠিক মাঝখানে পুরোনো আমলের সৌধ শ্রেণী, মসজিদের পাশে হালফ্যাসানের চার্চ, পাঁচ-গম্বুজওয়ালা বড় গির্জে, গম্বুজগুলোয় নকল তারা বসানো—ঠিক যেন আকাশের টুকরো; ভলগা এখানে সাগরে পড়েছে। চওড়ায় একমাইলেরও বেশী।

এরপর থেকেই আকাশপথে বুঝি ফ্যানটাসটিক হিপোগ্রিফের* সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামল অ্যালবেট্রস। ডানার এক-এক ঝাপটায় হিপোগ্রিফ যদি যায় এক-এক লীগ,+ অ্যাবেট্রেস যায় মিনিটে দু'মাইল!

চৌঠা জুলাই সকাল দশটায় কিছুক্ষণের জন্যে ভলগা উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এরোনফ। ডন নদীর দুপাশে বিস্তার্ণ এলাকা জুড়ে অনাবাদী জমি—লাঙলের ছোঁয়াও পড়েনি। অত জায়গা ভাল করে দেখবার সময় নেই, সময় নেই শহর গ্রামের চেহারা দেখবার। সন্ধ্যে নাগাদ ক্রেমলিনের ফ্লাগকে সেলাম না ঠুকেই মস্কোর ওপর দিয়ে ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল এরোনফ। আস্ত্রাখান থেকে প্রাচীন রুশরাজধানী—বারোশো মাইল নক্ষত্র বেগে পেরিয়ে এল মাত্র দশ ঘণ্টায়।

মস্কো থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ রেলপথে সাড়ে সাতশো মাইল। মাত্র আধদিনের যাত্রাপথ ঘড়ির কাঁটা ধরে পাড়ি দিল অ্যালবেট্রস, মেলট্রেনের মতই কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটোর সময়ে পৌছোলো সেণ্ট পিটার্সবার্গ।

---

*হিপ্রোগ্রিফ হল এক ধরনের ভয়াবহ কাল্পনিক জন্তু। ডানাওলা ঘোড়ার মাথায় গ্রিফিনের মাথা বসানো। গ্রিফিনও এক ধরনের কাল্পনিক জন্তু—ধড় আর পা সিংহের মত চক্ষু আর ডানা ঈগলের মত।

+ফরাসি মাপজোকের হিসেবে এক লীগ মানে ২'২৪ মাইল (ওয়েবস্টার অভিধান)।

এরপর যাত্রাপথে পড়ল ফিনল্যাণ্ড উপসাগর, অ্যাবো দ্বীপপুঞ্জ, বাল্টিক, ষ্টকহোমের অক্ষাংশে সুইডেন, ক্রিষ্টিয়ানার অক্ষাংশে নরওয়ে। বারোশো মাইল পথ মাত্র দশ ঘণ্টায়! অ্যালবেট্রসের গতিবেগ পরখ করার ক্ষমতা মানুষের থাকুক আর না থাকুক, ভূপৃষ্ঠের আকর্ষণের সঙ্গে নিজের গতিবেগ মিশিয়ে ভূগোলক প্রদক্ষিণ করে আসা এ যন্ত্রের পক্ষে সত্যিই কিছু নয়।

নরওয়েতে এসে অবশ্য মন্থর গতি হতেই হল অ্যালবেট্রসকে। টেলার-মারকেনের গৌস্টা পর্বতের শিখর এমন ভাবে পাচিল তুলে দাঁড়ালো সামনে যেন পশ্চিমে বুঝি আর পথ নেই। গ্রাহ্য করল না অ্যালবেট্রস। পাহাড় লঙ্ঘন করেই দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে ফের উড়ে চলল উল্কা বেগে।

আশ্চর্য এই আকাশ দৌড়ের সময়ে ফ্রাইকোলিন কিন্তু মুখে চাবি এঁটে বসে রইল কেবিনের এক কোণে। শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া সর্বক্ষণ চেষ্টা করল চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকার।

তোপাজ অবশ্য মজা করতে ছাড়ল না ফ্রাইকোলিনকে নিয়ে। 'কি হে ছোকরা! কান্না কি উবে গেল? বড্ড লেগেছে নারে? মাত্র দুঘণ্টা বাদুড় ঝোলা হয়েই মাথা সাফ হয়ে গেল? এই স্পীডে হাওয়া-স্নান করলে তো গেঁটে বাত পর্যন্ত সেরে যেতো রে!'

'আমার তো মনে হচ্ছে আর একটু পরে সাতখানা হয়ে ভেঙে যাবে অ্যালবেট্রস!'

'যাক না। মাটিতে তো পড়ব না! এত জোরে গেলে আছাড় খাব কি করে?'

'তাই নাকি?'

'আরে হ্যাঁ!'

তোপাজ না জেনেই খানিকটা সত্যি অবশ্য বলেছে। জোরে ওড়বার জন্যে অবিকল কনগ্রীভ রকেটের মত হাওয়ার স্তরে ভর করে সাঁ—সাঁ করে পিছলে যাচ্ছে অ্যালবেট্রস।

'মাটিতে তাহলে পড়ব না বলছ?' শুধোয় ফ্রাইকোলিন।

'যতক্ষণ আয়ু থাকবে, ততক্ষণ পড়ব না!'

'ওয়ে বাবা!' আর একটু হলেই ফের কেঁদে উঠেছিল ফ্রাইকোলিন।

'ফ্রাই, হুঁশিয়ার, মালিক কিন্তু ফের ঝুলিয়ে দেবেন!'

কোঁৎ করে কান্নাটা গিলে ফেলল ফ্রাইকোলিন মাংসের টুকরোর সঙ্গে সঙ্গে। যুগপৎ কান্না আর মাংস নেমে গেল গলা দিয়ে।

এ-পরিস্থিতিতে কিছু করবার না থাকলেও কিছু না করে থাকবার পাত্র

নন আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। তাই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন অন্য কাজ নিয়ে। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যালবেট্রসের ডেক থেকে ঝম্পপ্রদান করা যখন নিরাপদ নয়, তখন অন্য ভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে বার্তা পাঠানো যায় না? তাদের জানানো যায় না কে গায়েব করেছেন বেলুনিস্টদের? কে তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন কাল্পনিক পাখীর মত? জাহাজ হলে বোতলে চিঠি পুরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেত। নীচে সমুদ্রে থাকলে বোতলে পোরা চিঠি অ্যালবেট্রসের ডেক থেকেও নিক্ষেপ করা যেত। কিন্তু তলায় নিরেট জমি। বোতল পড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। তাহলে?

বিদ্যুৎ চমকের মত মতলবটা এল নস্যির দাস আঙ্কল প্রুডেণ্টের মাথায়। ভদ্রলোক নস্যি নেন। আমেরিকানরা অবশ্য এর চাইতেও খারাপ নেশায় অভ্যস্ত। তিনি শুধু নস্যি নিয়েই খুশী। তাঁর নস্যি এখন ফুরিয়েছে। কিন্তু ডিবেটা আছে। অ্যালুমিনিয়ামের বেশ বড় সড় ডিবে। চিঠি লিখে ভেতরে পুরে ফেলে দিলে ডাঙার লোকের চোখে পড়বেই। পুলিশের হাতেও পৌঁছোবে। তখুনি জানাজানি হয়ে যাবে বেলুনিস্টদের নিয়ে কি নাজেহালটা না করছেন আকাশরাজা রোবার।

খবর লেখা হল কাগজে। ঠিকানা দেওয়া হল ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের। অনুরোধ করা হল, এ-বার্তা যাঁর হাতেই পড়ুক না কেন তিনি যেন দয়া করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন। ন্যাকড়ার পটি দিয়ে ঢাকনা এঁটে বন্ধ করা হল—যাতে অত উঁচু থেকে পড়ার দরুন খুলে না যায়।

ইউরোপের ওপর দিয়ে উল্কা বেগে ছুটলেও নস্যির ডিবে ঠিকই পৌঁছোবে লোকালয়ে, খাল-বিল-নদী-নালায় পড়বে না। সাগর-উপসাগর-হ্রদ-উপহ্রদেও তলিয়ে যাবে না—বেলুনিস্টদের দুরবস্থার কাহিনী পাঁচকান হবেই। মর্ত্যের মানুষ জানতে পারবে আকাশ রাজার কুকর্ম। নাই বা দাঁড়ানো গেল অ্যালবেট্রসের ডেকে। দাঁড়ালেই তো হাওয়ার ঠেলায় উড়ে যেতে হবে—নস্যির ডিবে তো পৌঁছোবে!

আকাশ তখন ফর্সা হচ্ছে। তাই ঠিক হল। ফের যখন অন্ধকার নামবে, রাত্রে যখন একটু কম জোরে চলবে অ্যালবেট্রস। তখন ডেকে গিয়ে মূল্যবান নস্যির কৌটোকে নিক্ষেপ করা হবে কোনো একটা শহরের মাথায়।

প্ল্যান তো হল। কিন্তু প্ল্যানমাফিক সুযোগ পাওয়া নিয়ে হল মুস্কিল। গোস্টার পর থেকেই অ্যালবেট্রস উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল উত্তর সাগরের ওপর। হাজার হাজার জলযান আঁৎকে উঠল

উড়ন্ত যান দেখে। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, বেলজিয়াম কারবারীদের সওদাগরী জাহাজে হইচই পড়ে গেল উদ্ভুট্ট বিস্ময় দেখে! নক্সির ডিবে ফেলতে হলে এমনি একটা জাহাজের ডেকে ফেলতে হয়। কিন্তু তা কি সম্ভব? ফসকে গিয়ে জল পড়লে? ধড়ফড় না করে বরং সবুর করাই ভাল। সুযোগ একটা মিলবেই।

সুযোগ অচিরে এল। সুবর্ণ সুযোগ।

রাত দশটায় ডানকার্ক ভেসে উঠল ফরাসি উপকূলে। অন্ধকার রাতে নিমেষের জন্যে দেখা গেল গ্রিসনেজ লাইট হাউস—প্রণালীর উল্টো দিকে ডোভার। এখান থেকে তিন হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ফরাসি এলাকায় প্রবেশ করল অ্যালবেট্রস।

স্পীড কমল না। রকেটের মত ছিটকে গেল উত্তর ফ্রান্সের অগণিত শহর-গ্রামের ওপর দিয়ে। সোজা রেখায় ধেয়ে চলল প্যারিসের দিকে। ডানকার্কের পর একে-একে দিগন্তে বিলীন হল ডোলেন্স, অ্যামিয়েন্স, ক্রীল, সেণ্টডেনিস। রাত বারোটায় দিগন্তে আবির্ভূত হল 'আলোর-শহর' প্যারিস।

আলোর শহরই বটে। নিশুতি রাতে শহরবাসীরা সুপ্তিময় হলেও এ-শহর আলোয় আলো হয়ে থাকে।

কিন্তু মাথায় একী খেয়াল চাপল রোবারের? অদ্ভুত তো! ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে সহসা প্যারিসের মাথায় নেমে এলেন কেন? কেন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলেন শহরের নানান অঞ্চলে?

মাত্র কয়েকশ ফুট নীচে দেখা যাচ্ছে আলো ঝলমলে প্যারিস। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন রোবার। প্যারিসের হাওয়া বুক ভরে নেওয়ার জন্যেই বুঝি কর্মচারীরাও ভীড় করেছে ডেকে।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নন আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স। ডেক হাউস থেকে ওঁরাও গুটি গুটি এসে দাঁড়ালেন খোলা ডেকে। যেন হাওয়া খাচ্ছেন, এমনি ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন ডেকময়। আসলে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সবার অগোচরে ডিবে নিক্ষেপ করতে হবে তো। কেউ দেখে ফেললেই কেলেংকারী।

অতিকায় ফড়িংয়ের মত যেন জোড়া ডানা মেলে গদাইলস্করি চালে বিপুলায়তন প্যারিসের ওপর টহল দিতে লাগল অ্যালবেট্রস। বুলেভার্ডে তখন সারি সারি এডিসন আলো জ্বলছে। ঝলমলে রাজপথে গাড়ী ঘোড়ার ভীড়। প্যারিস অভিমুখী রেলপথগুলিতেও ট্রেনের ভীড়। সমস্ত শহর থেকে যানবাহন চলার গুম গুম শব্দ রাত্রি নিশীথে ঠেলে উঠছে আকাশপানে।

বুলেভার্ডের ওপর দিকে অ্যালবেট্রস ভেসে চলল গজেন্দ্রগমনে। বুলেভার্ড ভ্রমণ সাঙ্গ হলে একে-একে এসে দাঁড়াল উঁচু-উঁচু মনুমেন্টগুলোর ওপর। দূর থেকে দেখে মনে হল প্যানথিয়নের বল গড়িয়ে দিতে চায় অ্যালবেট্রস, অথবা ইনভ্যালিডস-য়ের ক্রুশ ছিনিয়ে নিতে চায়। ট্রোকাডেরোর জোড়া মিনারের ওপর অনেক দোল-দোল করার পর সরে এল চ্যাম্প স্ত মার্স-য়ের ধাতব চূড়োর মাথায়। এই চূড়োর রিফ্লেকটরেই ইলেকট্রিক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আলোর আলো করছে সারা শহরকে।

আকাশপথে নৈশ বিহার ফুরোলো এক ঘণ্টার মধ্যেই। আবার হাউই বেগে ছুটে চলার আগে যেন সামান্য পায়চারী করে দম নিয়ে নিল অ্যালবেট্রস।

রোবারের আরও একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল। নিজের কীর্তি দেখাতে চেয়েছিলেন প্যারিস জ্যোতির্বিদদের। কল্পনাতীত উল্কার চেহারা দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাক পণ্ডিতদের—এই ছিল বুঝি তাঁর অভিপ্রায়। তাই দু'দুটো সার্চ লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন অ্যালবেট্রসের ডেকে। অতি-তীব্র আলোক-বর্শা বুলিয়ে নিচ্ছিলেন বাগানে, প্রাসাদে, চত্বরে, ষাট হাজার বাড়ীর ওপব দিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

এত কাণ্ডের পর অ্যালবেট্রস চোখ এড়িয়ে যাবে, এতো হতে পারে না। শুধু দেখা নয়, কান দিয়েও টের পেল সবাই অ্যালবেট্রসের অস্তিত্ব। টম টার্নার ট্রাম্পেট বাজিয়ে শুনিয়ে দিলেন টায়ানটারাটারা বাজনা।

ঠিক সেই মুহূর্তে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়লেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। নস্যির ডিবেটা টুপ করে ফেলে দিলেন শহরের ওপর।

আর ঠিক তখনি ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে উল্কাবেগে ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। পেছন থেকে ভেসে এল রাজপথ ভর্তি জনসাধারণের তুমুল হর্ষধ্বনি। কল্পলোকের উল্কা দেখে আনন্দে আটখানা হয়েছে প্যারিসবাসীরা।

ভোর চারটে নাগাদ তেরচাভাবে গোটা ফ্রান্স পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস।

সকাল নটায় এল রোম। সেণ্ট পিটারের ছাদে ভীড় করে লোকে দেখল আশ্চর্য আকাশযানকে। দুঘণ্টা পরে পেছনে পড়ে রইল নেপলস উপসাগর। চকিতের জন্যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল ভিসুভিয়াসের আগ্নেয় শিলা। ভূমধ্যসাগরকে তির্যক রেখায় অতিক্রম করে অপরাহ্নে পৌঁছোলো তিউনিসিয়া উপকূলে।

আমেরিকা থেকে এশিয়া। এশিয়ার পর ইউরোপ! পুরো তেইশটা দিনও গেল না—আঠারো হাজার মাইলেরও বেশী পথ পাড়ি দিল অদ্ভুত উড়োজাহাজ অ্যালবেট্রস!

এবার শুরু হল আফ্রিকার জানা এবং অজানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ!

সুবিখ্যাত নস্যির ডিবে শেষ পর্যন্ত কার মাথায় গিয়ে পড়ল ?

কারও মাথায় নয়। তুশ নবীর বাড়ীর সামনে ক্ষ ত্ত রিভলি রাস্তায় আছড়ে পড়ল নস্যির আধার। রাস্তায় তখন লোকজন ছিল না। পরের দিন সকালে ঝাড়ুদার এল রাস্তা ঝাঁট দিতে। নস্যির ডিবে নিয়ে সে পৌঁছে দিল অফিসে।

দারোগা ভাবলেন নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু আছে ডিবের মধ্যে এবং ডিবের মত দেখতে হলেও জিনিসটা নিশ্চয় মারাত্মক ধরনের যন্ত্রবিশেষ। সুতরাং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিশ্চিন্ত হয়ে অতি সন্তর্পণে খোলা হল ঢাকনি।

পরক্ষণেই ঘটল বিস্ফোরণ। ডিবের মধ্যে নয়—দারোগার নাকের মধ্যে। গুঁড়ো নস্যি উড়ে গিয়ে হাঁচিয়ে ছাড়ল পুলিশ দারোগাকে। তারপর বেরোলো একটা চিরকুট। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল সবার চিরকুটের বাণী পড়ে :

'ইঞ্জিনিয়ার রোবার তাঁর উড়োজাহাজ অ্যালবেট্রসে কয়েদ করে রেখেছেন ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট প্রুডেন্ট এবং সেক্রেটারী ইভান্সকে।

'দয়া করে খবরটা বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতবর্গকে জানিয়ে দেবেন।

'প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স।'

বিশ্ববাসী সেই প্রথম জানতে পারল আকাশ-ট্রাম্পেটের মূল রহস্য। সেই প্রথম ফাঁস হয়ে গেল অত্যাশ্চর্য এরোনফের মালিকের নাম। আশ্বস্ত হলেন, বিশ্ব বৈজ্ঞানিকরা। ভূপৃষ্ঠ জুড়ে অগুন্তি মান মন্দিরে পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। চোখ টাটিয়ে গিয়েছিল তাঁদের আকাশের দিকে চেয়ে, মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছিল হরেকরকম কল্পকাহিনী শুনিয়ে।

(১৩) দাহোমেরু লড়াই

অ্যালবেট্রস আকাশবিহার সম্পর্কিত অনেকগুলো প্রশ্ন নিশ্চয় মগজের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে প্রত্যেকেরই। রোবার লোকটা আসলে কে ? তাঁর নামটাই কেবল জেনেছি আমরা, আর তো কিছুই জানি নি ? তিনি কি বরাবর আকাশে থাকেন ? সারা জীবন থাকবেন ? কখনো বিশ্রাম নেবেন না ? মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে কোন গোপন ঘাঁটি রাখেন নি ? অ্যালবেট্রসকে ঘষামাজা করার জন্যে কোনো গুপ্ত আস্তানা বানান নি ? তাও কি হয় ! অতি বড় দুঁদে ব্যোমচারীকেও মাটিতে নামতে হয়, বিশ্রাম

নিজেকে নিতে হয় এবং দিতে হয় ব্যোমযানকে। পাখীর বাসা থাকে, যান্ত্রিক পাখীর থাকবে না কেন ?

প্রশ্ন আরো আছে। বেলুনিস্টদের কেন কয়েদ করে রেখেছেন রোবার ? কি অভিপ্রায় তাঁর ? আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আটলান্টিক ভারত প্রশান্ত মহাসাগর দেখিয়ে কি ওঁদের মুক্তি দেবেন ? বিদায়-ভাষণে বলবেন— কেমন, বিশ্বাস হলো তো ? বাতাসের চাইতে ভারী যন্ত্র আকাশে টহল দিতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আর কি কোনো সন্দেহ আছে ?

এত প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের গুপ্ত রহস্য এখন ফাঁস করা কি সম্ভব ? আশা করা যায়, যথাসময়ে উত্তর মিলবে সব কটা প্রশ্নের।

রোবার যদি পাখী হন, তাহলে তাঁর গোপন বাসাটি নিশ্চয় উত্তর আফ্রিকার কোথাও নেই। কেননা দিন ফুরোনোর আগেই উনি চলে এলেন কেপ বন থেকে তিউনিস-এ। কখনো চলবেন ডুলকি চালে। কখনো হাউই বেগে ! মেদজেইদার মনোহর উপত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল ক্যাকটাস আর ফণীমনসায় ঢাকা হলদে স্রোতস্বিনী ! উড়ন্ত দানব দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হল হাজার হাজার কাকাতুয়ার। টেলিগ্রাফ তারে লাইন দিয়ে বসেছিল বেচারীরা। পালে পালে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ল আকাশে।

পরের দিন টেল মাউন্টেন টপকে আসার পর দেখা গেল সাহারার বালির ওপর জলজল করছে শুকতারা।

তিরিশে জুলাই সারাদিনে পায়ের তলায় এল আর গেল গেরিভাস গ্রাম আর গ্লিলেরো পাহাড়-চূড়া। এরপর শুরু হল মরুভূমি পেরোনোর পালা। কখনো দুলে দুলে ভেসে চলল মরুদ্বীপ ওয়েসিস-এর ওপর দিয়ে, কখনো নক্ষত্রবেগে পেছনে ফেলে গেল বেপরোয়া শকুনের পালকে। কত শকুন যে গুলি খেল এবং তা সত্ত্বেও প্রাণের পরোয়া না রেখে ডেকে লাফিয়ে পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই। ফ্রাইকোলিন বেচারী কাঠ হয়ে রইল শকুন বাহিনীর নৃশংস রূপ দেখে। শানিত চঞ্চু, তীক্ষ্ণাগ্র নখর এবং রক্ত জমানো চীৎকার শুনলে অতিবড় সাহসীর রক্তও জল হয়ে যায়, ফ্রাইকোলিনের আর দোষ কী।

এ-তো গেল আকাশের আতঙ্কদের আক্রোশ, মাটির আতঙ্করাও কম যায় কিসে ? জংলীদের গাদাবন্দুকের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল ব্যোম-যাত্রীদের। তাদের লম্ফঝম্প সবচাইতে বেশী দেখা গেল সেল পাহাড় টপকানোর সময়ে। পাহাড়ের মাথায় সাদা টুপী, ঢালু গায়ে সবুজ বেগুনী পলস্তারা চক্ষের পলকে হারিয়ে গেল পেছনে।

এর পরেই এল ভয়ংকর সুন্দর সাহারা মরুভূমি। নিমেষ মধ্যে লাফ দিয়ে কয়েক হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। কেননা সিমুম ঝড় বইছে সাহারায়। এ-ঝড়ে গরম বালি এমন বেগে ছুটে এসে নাক মুখ বন্ধ করে দেয় যে নিঃশ্বেসের অভাবে প্রাণ হারাতে হয় মরুযাত্রীদের। লাল বালির ওপর মেঘের মত ছুটছে সিমুম—ঠিক যেন মহাসাগরের ওপর ফুঁসছে টাইফুন।

এরপরেই দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হল হরেকরকম জমির চেহারা: চেটকার ধু-ধু সমতল কালচে ঢেউ তুলে গিয়ে পৌঁছেছে ওয়ান-মাসিন-য়ের টাটকা সবুজ উপত্যকায়। এক নজরে এতরকম জমি কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। সবুজ পাহাড়ের গাছপালা ঝোপঝাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঢেউ খেলানো ধূসর প্রান্তর—অনেকটা আবার বোরখার মত। মাঝে মাঝে যেন পটে আঁকা মরুদ্যান। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়াদি জল ধারা—খরস্রোতা প্রবাহিনী—ত।রে খেজুর গাছের জঙ্গল, পাহাড়ের ডগায় মসজিদ ঘিরে বিস্তর কুঁড়েবাড়ী।

রাত নামবার আগেই কয়েকশ মাইল পেরিয়ে আসা গেল। হু-হু করে পেছনে মিলিয়ে গেল বিস্তর বালু-পাহাড়; খেজুর জঙ্গলের মধ্যে বিশাল ওয়ার্গলা মরুদ্যান থেকে জল নেওয়ার জন্যেও দাঁড়ায় নি অ্যালবেট্রস।

শহরটা ছিমছাম সুন্দর এবং তিনভাগে ভাগ করা। এক অংশে সুলতানের প্রাচীন প্রাসাদ, আরেক অংশে কসবা অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ীঘরদোর। বাড়ীগুলো ইঁটের তৈরী—রোদে পুড়ে আপনা থেকেই ঝামা হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় অংশে উপত্যকার মাঝে সারি সারি ইঁদারা। কাশ্মীর থেকে নেওয়া জলে ট্যাঙ্ক বোঝাই থাকায় এখানেও দাঁড়াল না অ্যালবেট্রস—সাহারার মাঝে এসেও জলের দরকার হল না।

ওয়ার্গলা শহরে থাকে নিগ্রো, আরব আর মোজাবাইটরা। অ্যালবেট্রসকে দেখে সে কী উত্তেজনা তাদের মধ্যে। মুহুর্মুহু বন্দুক নির্ঘোষে কানের পর্দা ফাটে আর কি! গুলি অবশ্য শূন্যে উঠেই ফের নীচে নেমে পড়ল—অ্যালবেট্রস পর্যন্ত পৌঁছলো না।

রাত হল। নিথর নিস্তব্ধ নিশার আশ্চর্য রূপ দেখে মনে পড়ল ফেলিসিয়েন ডেভিডের কাব্যগ্রন্থ। রাতের মরুভূমির রহস্য-কথা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর অমর কবিতায়।

সে কী অন্ধকার! অন্ধকার বলে অন্ধকার! নির্মীয়মান ট্রান্স-সাহারা রেলপথের লোহার ফিতে পর্যন্ত দেখা গেল না। সম্পূর্ণ হলে এই রেললাইনের ওপর দিয়ে কু-ঝিক-ঝিক করে ট্রেন ছুটবে অ্যালজিয়ার্স থেকে টিমবাকটু পর্যন্ত—গিনি উপসাগরও আর দূরে থাকবে না।

অ্যালবেট্রস এবার প্রবেশ করল নিরক্ষীয় অঞ্চলে। কর্কট ক্রান্তির তলা দিয়ে উড়ে চলল ব্যোমযান। সাহারার উত্তর সীমান্ত থেকে ছশ মাইল ভেতরে এই পথেই ১৮৪৬ সালে প্রাণ দিয়েছিলেন মেজর লেইড। যে সড়ক ধরে মরক্কো থেকে সুদানে মালপত্র নিয়ে সারি সারি উটের গাড়ী চলেছে —অবলীলাক্রমে সে পথও পেরিয়ে গেল অ্যালবেট্রস। দেখতে দেখতে পেছনে মিলিয়ে গেল মরুভূমির সেই অংশ যেখানে মরুভূমির গান শোনা যায়; বালি যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে; নরম সুরে ভুতুড়ে কোঁপানি উঠে আসে বালির ফাঁক থেকে।*

বৈচিত্র্য দেখা গেল কেবল পঙ্গপাল হানা দেওয়ায়। মেঘের মত উড়ে এল পঙ্গপালের দল। স্তূপাকারে পড়ে রইল ডেকের ওপর। পঙ্গপালের ভার সইতে না পেরে শেষপর্যন্ত অ্যালবেট্রস মাটিতে আছাড় না খায়! সবাই মিলে কোদাল দিয়ে চেঁচে সাফ করে ফেলল ডেক। কিছু পঙ্গপাল সরিয়ে রাখল তোপাজ। মুখ কচলে মহা ফুর্তিতে বলল ফ্রাইকোলিন—'আহারে! কোথায় লাগে চিংড়ির কালিয়া!'

যাক, পঙ্গপালের রান্না অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও তো সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে পেরেছে ফ্রাইকোলিনের?

ওয়ার্গলা ওয়েসিস তখন এগারোশ মাইল পেছনে। সুদানের উত্তর সীমান্ত এসে গিয়েছে। বিকেল দুটোয় একটা মস্ত নদী দেখা গেল। নদীর তীরে ভারী সুন্দর একটা শহর। নাইগার নদী আর টিমবাকটু শহর।

এতদিন আফ্রিকান মক্কাকে দেখতে এসেছেন পর্যটকরা বালি মাড়িয়ে অশেষ মেহনৎ করে। এই প্রথম দুজন আমেরিকান আমেরিকা ফেরার পথে আকাশ থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে যেতে যেতে শুনলেন, শুঁকলেন এবং দেখলেন টিমবাকটুকে। শহরের শব্দলহরী, শহরের দুর্গন্ধ, শহরের সৌন্দর্য সবই একযোগে চড়াও হল তাঁদের চোখ, কান, নাকের ওপর।

কিন্তু আমেরিকার দিকে গেলেও আমেরিকার মাটি কি ছুঁতে পারবেন বেলুনিস্টরা? কে জানে!

সোমাই রাজাদের প্রাসাদের কাছেই মাংসের বাজার; সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয় অখুশী হলেও শুঁকতে হল বিকট গন্ধ। রোবার শুনিয়ে দিলেন ছানমাহাত্ম্য

* কান্নাটা আর কিছুই না—হাওয়ার খেলা। বালির ফাঁকে বন্দী হাওয়া মুক্তি নেওয়ার সময়ে শব্দ করে বেরোয়—মনে হয় যেন বালি কাঁদছে!

সম্বন্ধে দুচার কথা। এ-শহর যে-সে শহর নয়—সুদান-রাণী বললেই চলে। টাগানেট অঞ্চলের টুয়ারেগরা এখানকার অধিপতি।

বারোদিন আগে যেভাবে নির্বিকার কণ্ঠে হেঁকে বলেছিলেন রোবার—'জেণ্টেলমেন, ভারতবর্ষ!' আজও তেমনি সুরে শুধু বললেন—'জেণ্টেলমেন, টিমবাকটু!

তারপর অবশ্য খুলে বললেন—'টিমবাকটু জনসংখ্যা বারো কি তেরো হাজার। গুরুত্বপূর্ণ শহর। এককালে বিজ্ঞান আর শিল্পচর্চার জন্যে বিলক্ষণ নাম ডাক ছিল। দু'একদিন থেকে যাবেন নাকি?'

প্রস্তাবটা শ্লেষাত্মক। খোঁচা মেরে কথা বলা যেন স্বভাব রোবারের।

আরও বললেন—'এরোনফ দেখে শহরবাসীরা এমনিতেই খেপে গেছে। নিগ্রো, বারবার আর ফুলানিরা যখন দেখবে উড়োজাহাজ থেকেই নামছেন, আপনাদের অবস্থাটা তখন কি দাঁড়াবে কল্পনা করতে পারছেন? ছিঁড়ে খাবে!'

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন ফিল ইভান্স—'আপনার খাঁচায় থাকার চাইতে কালাআদমীদের খাঁচায় যেতে রাজি আছি। অ্যালবেট্রসের তুলনায় টিমবাকটু আমাদের কাছে স্বর্গ বললেও চলে।'

'সেটা রুচির প্রশ্ন,' জবাব দিলেন রোবার। 'আমি কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারে নামতে পারছি না শুধু আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে! অতিথিদের ভালোমন্দ আমাকেই তো দেখতে হবে।'

দুম করে ফেটে পড়লেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট—'মহাশয় শুধু খাঁচায় পুরেই খুশী নন অপমান করতেও চান?'

'আঙ্কল প্রুডেণ্ট, পরিহাস বোঝেন না?'

'আপনার অস্ত্রাগারে অস্ত্র-টস্ত্র আছে?'

'দেদার আছে!'

'দুটো রিভলবার পেলেই চলবে। একটা আপনি ধরবেন, আরেকটা আমি ধরব।'

'সে কি মশায়!' যেন চমকে উঠলেন রোবার। 'ডুয়েল লড়বেন! ডুয়েল মানেই তো দুজনের একজনকে মরতে হবে।'

'তাতো হবেই!'

'না, না, মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, অমন কাজও করবেন না। আমি চাই আপনি বেঁচে থাকুন।'

'অর্থাৎ নিজে বাঁচতে চান, কেমন? সাধু! সাধু!'

'সাধু কি শয়তান, সেটা আমি বুঝব। আপনার যথা অভিরুচি আপনি

চিন্তা করতে পারেন। যাকে খুশী গিয়ে নালিশ জানাতেও পারেন—যদি তাদের ক্ষমতায় কুলোয় এসে আপনাকে সাহায্যও করতে পারে। তবে কি জানেন, নালিশ করার সুযোগ ইহজীবনে নাও পেতে পারেন।'

'মিস্টার রোবার, ও পর্ব সেরে রেখেছি।'

'বটে! বটে! বটে!'

'ইউরোপ পেরিয়ে আসার সময়ে রেলিং টপকে চিঠি ফেলা কি খুব কঠিন কাজ, মিস্টার রোবার?'

'চিঠি ফেলেছেন নাকি?' প্রচণ্ড রাগে তৎক্ষণাৎ কার্ণেসের মত রাঙা হয়ে গেলেন রোবার।

'যদি ফেলি তো করবেন কি?'

'আপনাকে···আপনাকে···'

'বলুন, বলে ফেলুন?'

'চিঠি যেখানে গেছে, আপনাকেও সেইখানে ছুঁড়ে ফেলব।'

'তাহলে আর দেরী কেন মিস্টার রোবার? ছুঁড়ে দিন! চিঠি আমি সত্যিই ফেলেছি!'

এক পা এগিয়ে এলেন রোবার। ইসারা করতেই দৌড়ে এলেন টম টার্নার এবং আরো কয়েকজন স্যাঙাৎ। রোবারের কথার কখনো খেলাপ হয় না। বলেছেন যখন তখন কয়েদীদের ডেক থেকে ফেলবেনই।

পাছে সত্যি সত্যিই রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসেন, তাই শেষ মুহূর্তে প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন রোবার। দৌড়ে ঢুকে গেলেন কেবিনে।

'সাবাস!' সোল্লাসে মন্তব্য করলেন ফিল ইভান্স।

আঙ্কল প্রুডেন্ট শুধু বললেন—'রোবারের সাহস নেই আমাদের ছুঁড়ে ফেলার, কিন্তু আমার সাহস আছে। ও যা পারে নি, আমি তা করবই, ওকেই ফেলব অ্যালবেট্রসের ডেক থেকে।···'

নীচে তখন কাতারে কাতারে টিমবাকটু বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তা-ঘাটে খোলা মাঠে, এমন কি আকাশ রঙ্গালয়ের মত নির্মিত বাড়ীর ছাদেও। সবারই চোখ ওপর দিকে। সেই সঙ্গে চলছে তারস্বরে শাপশাপান্ত। আকাশ দানবের মুণ্ডপাত করছে সানকেরে এবং সারাহামার ধনিক গোষ্ঠী, পিণ্ডি চটকাচ্ছে রাগুইন্ডির গরীবরা। গালিগালাজ গায়ে জ্বালা ধরালেও রাইফেল বুলেটের চাইতে ভাল। তবে হ্যাঁ, ভূতলে অবতীর্ণ হলে এরোনফকে টুকরো টুকরো করে ছাড়ত উন্মত্ত জনসাধারণ। অ্যালবেট্রসের পাশে পাশে অনেকক্ষণ ধরে ডানা ঝটপটিয়ে কলকাকলীতে আকাশ মুখর করে উড়ে এল একদল সারস

পাখী, তিতির পাখী আর বক্রচঞ্চু পাখী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে পড়ল স্পাড বাড়ক্তেই।

সন্ধ্যে হল। আকাশ বাতাস বুঝি ঝালাপালা হয়ে গেল হাতীর বৃংহিত ধ্বনি আর শার্দুলের গরু গম্ভীর গর্জনে।

ভৌগোলিকের হাতে অ্যালবেট্রস পড়লে অনেক নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হত পৃথিবীর মানচিত্র। খুঁটিয়ে দেখানো যেত ভূমির উচ্চনীচ অবস্থা, নদীর গতিপথ, শহর গ্রামের সঠিক অবস্থান! আফ্রিকার মানচিত্রে অজ্ঞাত অঞ্চলকে ফাঁকা রাখা হত না, না-দেখা তল্লাটকে ফুটকি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত না।

এগারো তারিখে সকাল বেলা উত্তর গিনির পর্বতমালা পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস। দিগন্তে ধোঁয়ার মত মত দেখা গেল কঙ পাহাড়ের শ্রেণী—দাহোমের রাজ্য।

টিমবাকটু থেকে বেরোনোর পর থেকেই আঙ্কল এবং ফিল ইভান্স লক্ষ্য করেছেন অ্যালবেট্রস সোজা উড়ছে দক্ষিণ দিকে। অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে।

তার মানে পলায়নের কোনো সম্ভাবনাই আর থাকছে না। মুখ শুকনো হয়ে গেল দুই বেলুনিস্টের।

কিন্তু গতি কমে এল কেন অ্যালবেট্রসের? আফ্রিকা ছেড়ে যেতে কি মন চাইছে না রোবারের? না কি ফিরে যাবার মতলব আঁটছেন আকাশ রাজা? রোবারের নজর কিন্তু দেখা গেল পায়ের তলার দেশের ওপর।

আমরা জানি—রোবারও জানেন—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে শক্তিশালী দেশ যদি কোথাও থাকে, তবে তা এই দাহোমে রাজ্য। রাজ্যটা আকারে এমন কিছু বড় নয়—উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনশ ষাট লীগ। পুব থেকে পশ্চিমে একশ আশি লীগ। কিন্তু জন সংখ্যা প্রায় সাত আট লক্ষ।

দাহোমে বড় দেশ না হলেও দাহোমের কথা প্রায় বলতে শোনা যায় দেশে বিদেশে। দাহোমেতে ফি-বছর উৎসব উপলক্ষ্যে যে নিষ্ঠুর নরবলি অনুষ্ঠিত হয়, তার তুলনা নেই। শুধু নরবলি নয়—বহুবলি। স্বর্গতঃ রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের শূন্যস্থানে অভিষিক্ত পরবর্তী রাজাদের সম্মানার্থে বহুবলি দেওয়া হয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে। নরমুণ্ড ভেট পাঠানো হয় রাজাদের বা উচ্চ রাজকর্মচারীদের। মুণ্ডচ্ছেদের পর্বটি সারেন বিচারপতি মিঙ্গান স্বয়ং—একাজে তিনি নাকি বিশেষ পোক্ত।

অ্যালবেট্রস যেদিন দাহোমের আকাশে উড়ে এল, ঠিক সেই দিনই একজন রাজা পরলোকে গিয়েছেন। নতুন রাজার অভিষেক হবে রাজ সিংহাসনে!

হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলছে সারা রাজ্যে। কাতারে কাতারে লোক ছুটছে রাস্তাঘাট মাঠ চত্বর দিয়ে। প্রত্যেকেই ভীষণ উত্তেজিত, উদ্বেলিত এবং চঞ্চল। সবাই ছুটছে রাজধানী আরোমের অভিমুখে। প্রান্তরের বুকচিরে বাঁধানো রাস্তায় পিল পিল করছে জনগণ। রাস্তার দুধারে বিরাট মহীরুহ সারি। সাগুজাতীয় কাসাভা গাছ দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ বাগানে ; দেখা যাচ্ছে আমবন, তালবন, কোকো গাছ, কমলা গাছ, শুঁটি গাছ ছেয়ে রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। আশ্চর্য সুবাস ভেসে আসছে অ্যালবেট্রসের ডেকে ! দলে দলে উড়ছে কাকাতুয়া আর লাল-ঝুঁটি গাইয়ে পাখী কার্ডিনাল।

রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে টম টার্নারকে কি যেন বললেন রোবার। অ্যালবেট্রসের নীচের লোক দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল না। গাছের পাতা যেন চাঁদোয়া পেতে রেখেছে জনগণের মাথায়—অ্যালবেট্রস নিজেও উড়ছে পাতলা মেঘের আড়ালে।

বেলা এগারোটার সময়ে রাজধানী দেখা গেল। বারোমাইল লম্বা পরিখা আর সুউচ্চ প্রাচীর ঘিরে রেখেছে রাজধানীকে। সমতল ভূমিতে সারি সারি সাজানো বড় বড় গাছ। উত্তর দিকে রাজপ্রাসাদ। বধ্যভূমি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। রাজ প্রাসাদের বিশাল ছাদ থেকে বেতের ঝুড়িতে কয়েদীদের বেঁধে ছুঁড়ে ফেলা হয় নীচের ভূমিতে। সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত হিংস্র নৃশংস জনগণ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হতভাগ্যদের। নরশোণিত নিয়ে এমনি হোলি খেলার নজীর বিশ্বে আর কোথাও দেখা যায় না।

রাজ প্রাসাদের মধ্যেই একটা মস্ত চত্বর ! চার হাজার দুর্ধর্ষ রাজরক্ষী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

আমাজন নামে একটা নদী আছে ঠিকই, কিন্তু সত্যিই কি সেখানে আমাজন আছে ? নেই। আমাজন রয়েছে কিন্তু এই দাহোমে রাজ্যে !

আমাজন মানে হল পুরাকালীন যোদ্ধা রমণী, পুরুষ প্রকৃতি নারী। সেই আমাজনরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নীচে। কারো গায়ে নীল সার্ট, লাল বা নীল ওড়না, নীল সাদা ডোরাকাটা ট্রাউজার্স এবং সাদা টুপী। গজারোহিনীর কোমরে ভারী কৃপাণ, ছোট-ফলা ছুরী, মাথায় লোহার আংটায় আটকানো হরিণের জোড়া শিং। গোলন্দাজ-রমণীর পরনে নীল-লাল পরিচ্ছদ, অস্ত্র বলতে মান্ধাতা আমলের ব্লানডারবাস বন্দুক এবং ঢালাই লোহার কামান। আরেক দল সেনানীর পরণে নীল টিউনিক এবং সাদা ট্রাউজার্স—এরা রোমান চন্দ্রদেবী ডায়ান বললেই চলে—বিয়ে-থা এদের কপালে লেখা নেই। কুমারী যোদ্ধা বলতে যা বোঝায়—তাই।

অভিজ্ঞ এই আমাজনদের সঙ্গে রয়েছে হাজার পাঁচ ছয় পুরুষ। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট আর সার্ট। মাথার চুল ঝুটি বাঁধা। সব মিলিয়ে এই হল দাহোমে সৈন্যবাহিনী।

রাজধানী দাহোমে আজ জনশূন্য। শহরের বাইরে জঙ্গল ঘেরা প্রান্তরে গিয়েছে রাজপরিবার, রাজা এবং রাজরক্ষী বাহিনীর মেয়ে এবং পুরুষ-যোদ্ধারা। এই প্রান্তরেই আজ অভিষেক হবে নবীন নৃপতির। কিছুদিন আগে লুঠেরা বাহিনী আশেপাশের রাজ্যে লুঠতরাজ চালিয়ে ধরে এনেছে হাজার কয়েক নিরীহ মানুষকে। আজ তাদের জবাই করা হবে রাজার অভিষেক উপলক্ষ্যে।

প্রান্তরের আকাশে অ্যালবেট্রস আবির্ভূত হ'ল বেলা দুটো নাগাদ। মেঘ লোক থেকে ধীরে ধীরে নামতে লাগল দাহোমে বাসীদের মাথার ওপর।

দূর দূর গ্রাম থেকে মোট প্রায় হাজার ষোল লোক জড়ো হয়েছে প্রান্তরে। লোক এসেছে হোয়াইদা, কেরাপে, আর্ত্রা, টোম্বেরি থেকেও।

ভাবী রাজার বয়স বছর পঁচিশ। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। বসে আছে মস্ত ডালপালাওয়ালা একটা গাছের তলায় টিলার ওপর। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমাজন বাহিনী, পুরুষ যোদ্ধা এবং প্রজারা।

টিলার পদদেশে বসে জন পঞ্চাশ বাজনদার হরেক রকম বর্বর বাজনা বাজাচ্ছে ; বাজাচ্ছে ফোঁপরা হাতীর দাঁতের শিঙে, বাজাচ্ছে হরিণের চামড়ার জয়ঢাক, লাউয়ের খোলার বীণা, গীটার, লোহার ঘণ্টা. বাঁশের বাঁশি। বাঁশির তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ ছাপিয়ে উঠছে শিঙের ঘসঘসে শব্দকেও। এক সেকেণ্ড অন্তর শোনা যাচ্ছে গাদা বন্দুক আর ব্লানডারবাস বন্দুকের আওয়াজ, কামানের নির্ঘোষ। আওয়াজে চমকে চমকে উঠেছে ঘোড়া আর হাতীর দল—হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে গোলন্দাজ-রমণীরা বিস্ফোরণের ঠেলায় দুলে ওঠা কামান-গাড়ী সামলাতে। সব মিলিয়ে এমন একটা অট্টরোল-হট্টগোল-গণ্ডগোল আকাশ পানে ধেয়ে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ যার তুলনায় অনেক মোলায়েম।

মাঠের এককোণে পাহারাদাররা ঘিরে রেখেছে বলির জন্যে নির্দিষ্ট কয়েদীদের। একটু পরেই তারাও সঙ্গ নেবে মৃত রাজার। পূর্বতন রাজার অভিষেককালে তিনহাজার কয়েদীদের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল। বর্তমান রাজাই বা কম যাবে কেন? তিন হাজার নরবলি তো হবেই, তার বেশীও হতে পারে। সুতরাং পুরো একঘণ্টা ধরে নাচগান বক্তৃতা ভাঁড়ামো অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে ভালো নেচেছে আমাজন বাহিনী।

বহুবলির সময় এগিয়ে আসছে। রোবার দাহোমের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত। তাই চোখে চোখে রেখেছেন বলির পাঁঠার মত কম্পমান কয়েদীদের।

মিঙ্গান অর্থাৎ জল্লাদ কৃপাণ ঘোরাচ্ছে। কৃপাণ না বলে তাকে খাঁড়া বললে মানায়। একটা গুরুভার ধাতুর পাখী লাগিয়ে বেঁকানো ফলাকে এত ভারী করা হয়েছে যে এক কোপেই ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে যায়।

একা মিঙ্গানের পক্ষে তিনহাজার মুণ্ড কাটা তো সম্ভব নয়। তাই আরো একশ জন জল্লাদ দাঁড়িয়ে তার পাশে। পাইকারী হারে নরবলি দিয়ে হাত পাকিয়েছে প্রত্যেকেই।

অ্যালবেট্রস বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। মাটি থেকে শ'তিনেক ফুট ওপরে পৌঁছাতেই এই প্রথম নীচের লোকের চোখ পড়ল ওপরে।

এবার কিন্তু উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ এর আগে অ্যালবেট্রসকে দেখে ভয় পেয়েছে। দাহোমের বাসিন্দারা কিন্তু জয়ধ্বনি করে উঠল। তারা ধরে নিল স্বর্গোলোক থেকে স্বয়ং দেবদূত মর্ত্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন নবীন রাজাকে আশীর্বাদ করতে। হুল্লোড়, প্রার্থনা, স্তব শুরু হয়ে গেল উচ্চে কণ্ঠে—অলৌকিক হিপোগ্রিফকে স্বাগতম জানাতে যা-যা অনুষ্ঠান দরকার—তার কিছুই বাদ গেল না।

হট্টগোলের মধ্যেই নেমে এল মিঙ্গানের খড়্গ—ভূলুণ্ঠিত হল একটা মুণ্ড। একশজন জল্লাদের সামনে সার বেঁধে দাঁড় করানো হল একশজন কয়েদীকে এক-এক দফায় একশটা মুণ্ডু দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্যে।

আচম্বিতে বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল অ্যালবেট্রসের ডেকে। ধর্মাবতার মিঙ্গানের প্রাণবায়ু চম্পট দিল দেহপিঞ্জর ছেড়ে—লাশটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাঠের ওপর।

রোবার তারিফ করলেন হৃষ্টকণ্ঠে—'খাসা টিপ! সাবাস টম!'

আদেশের অপেক্ষায় বন্দুক টিপ করে দাঁড়াল তাঁর অন্যান্য সাগরেদরা।

কিন্তু মিঙ্গানের নিষ্প্রাণ দেহ বিভ্রম ঘুচিয়ে দিয়েছে জনগণের। নিমেষ মধ্যে তারা বুঝেছে, আকাশচারী বিভীষিকা তাদের শত্রু—মিত্র নয়। মার মার রব উঠেছে নীচে। দেখতে দেখতে এক ঝাঁক তপ্ত বুলেট ছুটে এল ওপরে।

গুলিবর্ষণ দেখে ঘাবড়ালেন না রোবার। অ্যালবেট্রসকে আরো নামিয়ে আনলেন। কৃষ্ণকায় মানুষগুলোর দেড়শ ফুট ওপরে এসে স্থির হল যন্ত্রযান। বেলুনিস্টরাও বিস্মিত হলেন। রোবারের ওপর তাঁদের আক্রোশ কমে গেল। নরহত্যা ভণ্ডুল করে দেওয়ার নেশা পেয়ে বসল তাঁদেরও।

বললেন সমস্বরে—'চালান গুলি। বাঁচান কয়েদীদের।'

'সেইটাই করা হচ্ছে।' ছোট্ট করে বললেন রোবার।

পরমুহূর্তে শুরু হল অগ্নিবর্ষণ। বেলুনিস্টদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল,

অ্যালবেট্রস-কর্মচারীদের হাতেও ম্যাগাজিন রাইফেল। বৃষ্টির মত গুলি ছড়িয়ে গেল নীচে। একটা গুলিও ফসকালো না। নরমেধ যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল নিমেষ মধ্যে।

আকাশ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছেছে দেখে চটপট হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়ে ফেলল হাজার হাজার বন্দী। সৈন্যবাহিনী তখন পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে ওপরে। সামনে প্রপেলার ফুটো হয়ে গেল, খোল ঝাঁঝরা হয়ে গেল ফ্রাইকোলিনের কানের পাশ দিয়ে।

রেগে আগুন হলেন টম টার্নার—'তবে রে! দাঁড়া! দেখাচ্ছি মজা' বলেই দৌড়ে গিয়ে অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে এলেন ডিনামাইটের বাক্স। হাতে হাতে বিলি হয়ে গেল কার্টিজগুলো। রোবারের নির্দেশ পেতেই অগ্নিসংযোগ করে একযোগে ছুঁড়ে দেওয়া হল টিলার ওপর। পরিণামটা হল ভয়ংকর। একই সঙ্গে ফাটলো অনেকগুলো বোমা ভূমির ঠিক ওপরেই।

ভয়ের চোটে রাজার প্রাণ তখন গলায় এসে ঠেকেছে। একি উৎপাৎ রে বাবা! সাঙ্গপাঙ্গসহ রাজা মহাশয় চোঁ চোঁ দৌড় মারল পাশের জঙ্গলে।

কয়েদীরাও সেই সুযোগে ভীড়ে মিশে হাওয়া হয়ে গেল প্রান্তর ছেড়ে!

উৎসব ভণ্ডুল হল। রোবার বেলুনিস্টদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—সমাজ কল্যাণে উড়ন্ত যন্ত্রের ভূমিকা।

আবার উর্দ্ধে উঠল অ্যালবেট্রস। হোয়াইদা ছাড়িয়ে গেল পেছনে।

এল আটলান্টিক!

(১৬) আটলান্টিকের ওপরে

হ্যাঁ, আটলান্টিক!

সত্যি সত্যিই আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে অ্যালবেট্রস! যা ভয় করেছিলেন বেলুনিস্টরা, তাই হল। রোবার কিন্তু নির্বিকার, নিরুদ্বিগ্ন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। আটলান্টিক পেরোনো যেন তাঁদের কাছে কিছুই নয়। নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে-যার জায়গায়।

কিন্তু চলেছেন কোথায় রোবার? একবার বলেছিলেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণের চাইতেও বেশী কিছু যদি থাকে, অ্যালবেট্রস তা পারে। সেইদিকেই কি চলেছে

অ্যালবেট্রস ? যেদিকেই যাক না কেন, যাত্রার শেষ নিশ্চয় আছে।- কোথায় কখন ? এরোনক বানিয়ে নিশ্চয় একটানা আকাশ বিহার করছেন না রোবার, ভূতলে নামতেই হয়েছে। খাবার-দাবার দিয়ে ভাঁড়ার বোঝাই করা দরকার, যন্ত্রপাতি দিয়ে উড়োজাহাজের কলকব্জা মেরামত করা দরকার। মেশিন চালু রাখার জন্যেও উপকরণের প্রয়োজন। নিশ্চয় কোথাও একটা গোপন ঘাঁটি আছে। মাঝে মাঝে সেখানে নেমে জিরেন নেয় অ্যালবেট্রস। লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন রোবার, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলে চলবে কি করে ?

কিন্তু সে জায়গাটা কোথায় ? কোথায় সেই গুপ্ত ঘাঁটি ? সেটা নিছক ঘাঁটি, না ছোট্ট কলোনী ? কর্মচারীর অদল বদলও তো দরকার—লোকজনের প্রয়োজন কি সেই কলোনী থেকেই মেটান ?

সব চাইতে বড় হেঁয়ালী—এত দামী মেশিন তৈরীর টাকা কোত্থেকে পেলেন রোবার ? যদিও তিনি নবাবী চালে থাকেন না তবুও কেন অ্যালবেট্রস নির্মাণ রহস্য ভাঙতে নারাজ ? কে এই রোবার ? কোথায় তাঁর নিবাস ? কি তাঁর পূর্ব পরিচয় ? কেউ জানেন না। রোবার নিজেও কাউকে বলবেন না। হেঁয়ালী তাই হেঁয়ালীই থেকে যাচ্ছে।

বেলুনিস্টরা কিন্তু এতগুলো ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে মাথার চুলগুলো শুধু ছিঁড়তে বাকী রেখেছিলেন। ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে গেল, সমাধান পাওয়া গেল না। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়েছে তাঁদের বর্তমান অবস্থা। জানেন না কোন চুলোয় চলেছেন, কেন চলেছেন, কবে যাত্রা শেষ হবে, কবে মাটিতে নামবেন এবং নেমে কি দৃশ্য দেখবেন। এতগুলি না জানা রহস্যের সঙ্গে রোবার-রহস্য তালগোল পাকিয়ে তাঁদের ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খেঁকি করে ছাড়বে, এ আর আশ্চর্য কী !

আটলান্টিকের ওপর সন্-সন্ করে দিব্বি উড়ে চলেছে অ্যালেবেট্রস। ভূগোলক যেখানে আকাশে মিশেছে, বলয়াকার সেই বৃত্ত ছাড়া কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। ডাঙার চিহ্ন নেই ধারে কাছে। উত্তর দিগন্তে অদৃশ্য হয়েছে আফ্রিকা।

কেবিন থেকে একবার বেরিয়েছিল ফ্রাইকোলিন। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি দেখে আঁতকে উঠে ফের কেবিনে সেঁধিয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের সাড়ে চোদ্দ কোটি বর্গমাইল জুড়ে রয়েছে কেবল জল আর জল। এর চারভাগের একভাগ জুড়ে আছে একা আটলান্টিক মহাসাগর। এতবড় জলধি পেরোতে গেলে যে স্পীডে যাওয়া দরকার, আলবেট্রস কিন্তু সেই স্পীডে

ছুটছে না। মিনিটে দু'মাইল বেগে ইউরোপ পেরিয়েছিল, কিন্তু আটলান্টিক পেরোচ্ছে মিনিটে এক মাইল বেগে। যেন কোন তাড়াহুড়ো নেই রোবারের। কেন, এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

তেরোই জুলাই বোঝা গেল দক্ষিণ গোলার্ধে চলেছেন রোবার। বিশেষ একটি রেখা অতিক্রম করল অ্যালবেট্রস। সমুদ্রগামী জাহাজ হলে এই উপলক্ষ্যে নেপচুন *উৎসব হত। আলবেট্রসের ডেকে তা হল না বটে, তবে রাঁধুনি এক বোতল জল ঢেলে দিল ফ্রাইকোলিনের ঘাড়ে।

আঠারোই জুলাই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল সমুদ্রবক্ষে। ষাট মাইল বেগে দ্যুতিময় ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটছে দিকে দিকে। একটা ঢেউ থেকে আরেকটা ঢেউয়ের তফাৎ আশি ফুট। দূর থেকে মনে হল যেন জোড়া আলোর পরিখা ছুটে চলেছে ভীমবেগে। রাত হল। আলোকরশ্মি অ্যালবেট্রস পর্যন্ত পৌঁছালো। জোরালো আলোয় প্রতিফলিত উড়ন্তযানকে মনে হল যেন জলন্ত বিভীষিকা। আগুন সমুদ্রে এর আগে রোবার কখনো আসেননি। এ-আগুনে আলো আছে —আঁচ নেই।

প্রখর দ্যুতির উৎস নিশ্চয় ইলেকট্রিসিটি। কিছু কিছু মাছের গা দিয়ে আলো বেরোয় ঠিকই, কীটাণুদের দৌলতেও ফসফরাস দ্যুতিতে উজ্জ্বল থাকে সমুদ্র, কিন্তু এ-আলো সে-আলো নয়। আবহমণ্ডলে ইলেকট্রিকের চার্জ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলেই আলোর খেলা শুরু হয়েছে তরঙ্গে তরঙ্গে।

সকাল হল। মামুলী জাহাজ হলে পথভ্রষ্ট হত এতক্ষণে। কিন্তু হাওয়া আর ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে শক্তিমান পক্ষী অ্যালবেট্রসের মতই উড়ে চলল যন্ত্রযান অ্যালবেট্রস। পেট্রল পাখীর মত ঢেউ ঘেঁসে উড়ল না বটে, ঈগল পাখীর মত উড়ে চলল মেঘের কোল ঘেঁসে।

সাতচল্লিশ সমাক্ষ রেখা পেরানোর পর দেখা গেল দিনের দৈর্ঘ্য মাত্র সাতঘণ্টায় এসে ঠেকেছে। দিন আরো ছোট হবে মেরু অঞ্চলের দিকে গেলে।

দুপুর একটা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র একশ ফুট ওপরে ভাসছে অ্যালবেট্রস। বাতাস শান্ত। তবে আকাশের নানান জায়গায় ঘন কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় কালো পাহাড়ের মত ঝুলছে মেঘ রাশি। মাঝে মাঝে ঝোলা মেঘ থেকে লম্বা লম্বা শুঁড়ের মত কি যেন নেমে আসছে। নীচের জলরাশি

*রোমদেশের পুরাণে যাঁর নাম নেপচুন, হিন্দু পুরাণে তাঁর নাম বরুণ-সাগরদেবতা।

ছুঁতে না ছুঁতেই জলকে পাহাড়ের মত টেনে তুলছে ওপর দিকে। মেঘ যেন কোলাকুলি করতে চাইছে সমুদ্রের সঙ্গে।

আচম্বিতে জল স্তম্ভ ঠেলে উঠল আকাশ পানে। ঠিক যেন একটা মানবিক সূর্য ঘড়ি। ওপরের মেঘের বিচিত্র চাঁদোয়া ছুঁচোলো আকারে নামছে নীচের দিকে, নীচের জলরাশি ছুঁচোলো আকারে উঠছে ওপর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে জলস্তম্ভের মধ্যে হারিয়ে গেল অ্যালবেট্রস। জল ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। আশে পাশে কুচকুচে কালির মত কালো আরো বিশটা জলস্তম্ভ ফুঁসতে লাগল অ্যালবেট্রসকে ঘিরে। ভাগ্য ভাল, জলস্তম্ভর জল যেদিকে পাক খাচ্ছে, অ্যালবেট্রসের চুয়াত্তরটা প্রপেলার পাক খাচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে। তা যদি না হত, যদি দু তরফেই ঘূর্ণন বেগ হত একই দিকে, তাহলে নিমেষ মধ্যে পাকসাট খাইয়ে অ্যালবেট্রসকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলত জলস্তম্ভ, তার ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে অ্যালবেট্রস। ঘূর্ণনবেগ ক্রমশঃ বাড়ছে।

বড ভয়ংকর বিপদে পডেছে অ্যালবেট্রস। প্রপেলার শক্তির চাইতেও বড় শক্তি জলস্তম্ভের। তাই বেরোতে পারছে না। ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে! ঘোরার বেগে, কেন্দ্রাতীত শক্তির ঠেলায়, ডেকের ওপর দিয়ে হড়কে গিয়ে রেলিংয়ে ঠেকছে সাগরেদরা। প্রাণপণে রেলিং চেপে ধরে রয়েছে প্রত্যেকেই —মুঠো ফসকালে ছিটকে যাবে বাইরে। পরিত্রাণ বুঝি আর নেই!

মাথা ঠাণ্ডা রাখো! গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রোবার।

ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা—সব দরকার। আর দরকার ধীর, স্থির চিন্তা।

কেবিন থেকে বেরোতে গেলেন দুই বেলুনিস্ট—বেঁচে গেলেন অল্পের জন্যে। আর একটু হলেই দুজনেই ছিটকে যেতেন রেলিংয়ের ওপারে।

অ্যালবেট্রস ঘুরছে, জলস্তম্ভও ঘুরছে; ঘুরতে ঘুরতে তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছে। উড়ন্ত চাকাও সেই গতিবেগ প্রত্যক্ষ করলে বুঝি ঈর্ষান্বিত হত। এই গতিবেগ ছুটতে ছুটতে যদিও বা জলস্তম্ভের মধ্যে থেকে ছিটকে যায় অ্যালবেট্রস, চুরমার হয়ে যাবে পাশের জলস্তম্ভে আছড়ে পড়ে।

'কামান! কামান!' হেঁকে উঠলেন রোবার।

আদেশের তাৎপর্য চকিতে বুঝলেন টম টার্নার। উনি ডেকের মাঝামাঝি ছিলেন—কেন্দ্রাতীতবেগ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে পৌঁছোলেন কামানের সামনে। ব্রীচ খুলে কার্টিজ ঠেসে দিয়ে কামান দাগলেন।

ধসে পড়ল জলস্তম্ভ। সেইসঙ্গে উধাও হল জলস্তম্ভের মাথায় ছাদের মত ধরা মেঘের চাঁদোয়া।

'জিনিসপত্র ভাঙেনি ? হাড়গোড় আস্ত আছে ?' জানতে চাইলেন রোবার।

'সব ঠিক আছে। কিন্তু আবার লাট্টু খেলা শুরু হলে কেউ আস্ত থাকবে না!' জবাব দিলেন টম টার্নার।

পুরো দশ মিনিট জলস্তম্ভের মধ্যে থেকে লাট্টুর মত বনবনিয়ে ঘুরেছে অ্যালবেট্রস। অসাধারণ মজবুত বলেই সুনিশ্চিত ধ্বংসকেও এড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রযান।

যত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই হোক না কেন, অ্যাটলান্টিক অতিক্রমের একঘেয়েমি কি যায় ? দিন ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। শীতও বাড়ছে। রোবার আর বাইরে বেরোচ্ছেন না। কেবিনে বসে সারাদিন তিনি হিসেব করছেন, ম্যাপে দাগ দিচ্ছেন, অ্যালবেট্রসের গতিপথ স্থির করে দিচ্ছেন। ব্যারোমিটার থার্মোমিটার, ক্রনোমিটার দেখে নানারকম তথ্য লিখে রাখছেন লগ-বুকে।

আপাদমস্তক গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে ডেকে এসে দাঁড়াল বেলুনিস্টরা। অনেক আশা নিয়ে তাকালেন দিগন্তের পানে কিন্তু কোথায় স্থল ? শুধু জল আর জল।

শেষে একটা ফন্দী করলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। ফ্রাইকোলিনকে দিয়ে রাঁধুনির পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এমন আবোল তাবোল বকতে লাগলো চতুর রাঁধুনি যে কিছুই জানা গেল না—রোবার নাকি আর্জেন্টাইন গণতন্ত্রের প্রাক্তনমন্ত্রী। পরক্ষণেই বললে, আরে না। রোবার আসলে নৌবাহিনীর বড়কর্তা। আবার একদিন বলল, হুঁ হুঁ বাবা, জানো না তো রোবার কে ? উনি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট। এরপর কোনদিন শোনা গেল, তিনি স্পেনের অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ। পরক্ষণেই বললে, দূর, দূর, যা বলেছি, তার কোনোটাই ঠিক নয়। রোবার আসলে ইণ্ডিজ-য়ের বড়লাট। আর একটু উঁচুতে উঠতে চেয়েছিলেন বলে সটান আকাশে উঠে বসেছেন। টাকার উৎস ? দেদার! দেদার! কুবের সম্পদ আছে তাঁর। উড়োজাহাজ নিয়ে দেশদেশান্তরে বোম্বেটে-গিরি করে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছেন রোবার। কোনোদিন আবার শোনা গেল অন্যকথা। অ্যালবেট্রস বানিয়ে ফতুর হয়ে গেছেন রোবার। তাই পাওনাদারদের ফাঁকি দিতে আকাশে পালিয়ে এসেছেন। মাটিতে নামবেন কবে ? নামবেনই না। তবে হ্যাঁ, চাঁদে যাওয়ার মতলব মাথায় এলে একেবারে চাঁদের মাটিতেও নামতে পারেন।

'ফ্রাই! ফুর্তি করো! ফুর্তি করো! দেখেশুনে একটা চাঁদের সুন্দরী বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করার এই তো সুযোগ!'

'আমার বয়ে গেছে চাঁদে যেতে!' ঠোঁট উলটে বলেছে ফ্রাইকোলিন।

'কেন ? ক্রাই, কেন ?'

মনিরের কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেছে ক্রাইকোলিন ! শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট ! ধড়িবাজ রাঁধুনির পেট থেকে কোনো কথাই বার করা যাবে না। পালানোর আশাও দুরাশা, ফিল ইভান্সকেও একদিন তাই বললেন প্রুডেন্ট। ফিল ইভান্সও ভেঙে পড়েছিলেন মনে মনে। বেশ বুঝেছিলেন, পাষণ্ড রোবারের মর্জি না হলে মুক্তি নেই। তবে কী আজীবন থাকতে হবে ডেকে ? কখনোই না। দরকার হলে প্রাণও বিসর্জন দেবেন দুজন। তার আগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে উড়িয়ে দেবেন নারকীয় যন্ত্র অ্যালবেট্রসকে ! অতুলনীয় ব্যোমযান অ্যালবেট্রসের পরমায়ু মাত্র কয়েক মাসের বেশী হতে না দেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চয় আছে দুই বেলুনিস্টের ? প্রাণ যাবে ? যাক না কেন ! রোবারের ওপর চরম প্রতিহিংসা তো নেওয়া যাবে ! ডিনামাইট ? বোমা ? বিস্ফোরক ? সেটাও কোনো সমস্যা নয়। বারুদখানায় হানা দিলেই হল। কিন্তু বারুদখানায় ঢোকাই তো মুস্কিল !

দুই বেলুনিস্টের মানসিক অবস্থা মারাত্মক। দুজনেই মরিয়া হয়ে গিয়েছেন। আশ্চর্য আবিষ্কার অ্যালবেট্রসকে ধ্বংস করতেও বদ্ধপরিকর তাঁরা। সৌভাগ্যক্রমে এত কথার বিন্দুবিসর্গ জানানো হল না ক্রাইকোলিনকে। জানলে আর রক্ষে থাকত না। প্রাণের ভয়ে ফাঁস করে দিত গোপন ষড়যন্ত্র !

তেইশে জুলাই ম্যাগেলান প্রণালীর প্রবেশ পথে দেখা গেল জমির রেখা। এখানকার রাত ষোল ঘণ্টা লম্বা—তাপমাত্রা হিমাংকের ছ'ডিগ্রী নীচে !

উপকূল বরাবর উড়ে গিয়ে অনেক পাহাড় গ্রাম পেছনে ফেলে ঘণ্টা কয়েক পরে অ্যালবেট্রস এসে পৌঁছালো পোর্ট ফেমিনের ওপর। চোখের সামনে ভেসে উঠল অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যাবলী। এবড়ো খেবড়ো পর্বতমালায় চির তুষারাচ্ছাদিত শিখর দেশ, গহন অরণ্য, অন্তবর্তী সাগর, অন্তরীপের ফাঁকে বন্দী উপসাগর এবং দ্বীপপুঞ্জের সারি সারি দ্বীপ। বরফ দিয়ে ছাওয়া একটা বিরাট অঞ্চল পড়ে আছে কেপ ফরওয়ার্ড থেকে কেপ হর্ন পর্যন্ত।

পাহাড় দ্বীপ প্রণালী ডিঙিয়ে অ্যালবেট্রস এসে পৌঁছালো টিয়েরা দেল ফুয়েগোতে অর্থাৎ আগুন দেশে। ছমাস পরে ভরাট গ্রীষ্মে, এ-অঞ্চলে দিনগুলো হবে পনেরো ষোল ঘণ্টা লম্বা। পাল্টে যাবে জমির চেহারা। যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের যাদুমন্ত্রবলে গজিয়ে উঠবে সবুজ উপত্যকা। হাজার হাজার পশুপাখী বিচরণ করবে সেখানে পেটভরে খাওয়ার লোভে, দেখা দেবে অরণ্য, সুবিশাল মহীরুহ—বার্চ, বীচ, সাইপ্রেস, ফার্ণ। প্রান্তরে ছুটোছুটি করবে অস্ট্রিচ পাখী, গুয়ানাকো উট, ভিকোনিয়া লামা (উট আর মেষের মাঝামাঝি জন্তু);

আসবে পেঙ্গুইন বাহিনী আর লক্ষ লক্ষ পাখী। অ্যালবেট্রসকে উড়তে দেখেই পেছন পেছন ছুটে এল পালে পালে গুলেমট সামুদ্রিক পাখী, পাতিহাঁস, রাজহাঁস। দেখতে দেখতে ভরে গেল যন্ত্রযানের ডেক। রাঁধুনি তাপাজে মহানন্দে কুড়িয়ে নিল কয়েকশ পাখী। কাজ বাড়ল ক্রাইকোলিনের। এত পাখীর পালক ছাড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। রাঁধুনিও তৈলাক্ত পক্ষীর মুখরোচক রান্না রেঁধে কেরামতি দেখানোর সুযোগ পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেল যেন।

সেইদিনই বেলা তিনটের সময়ে সূর্য যখন ডুবছে, তখন একটা ভারী সুন্দর বনের ধারে বিশাল একটা সরোবর দেখা গেল, লেকের জল জমে একদম বরফ হয়ে গিয়েছে। বরফ জুতো পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুতবেগে পিছলে যাচ্ছে কঠিন বরফ প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

অ্যালবেট্রসকে মূর্তিমান আতংকের মত সহসা উড়ে আসতে দেখে পিলে চমকে উঠল বেচারীদের। যে যেদিকে পারল টেনে লম্বা দিল। যে পারল না, সে জন্তুজানোয়ারের মাটির গর্তে ঢুকে ভাবল খুব ফাঁকি দিয়েছি আকাশের আতংককে।

অব্যাহত রইল অ্যালবেট্রসের উত্তর দিকে যাওয়া! বীগল প্রণালী ক্লাভারিন দ্বীপ আর উলাসটানদ্বীপ পেরিয়ে এসে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে। দাহোমে থেকে এই পর্যন্ত একটানা ৪,৭০০ মাইল উড়ে টপকে গেল ম্যাগেলান দ্বীপপুঞ্জের শেষ দ্বীপ—তারপরেই দেখা গেল সাগর ফেণায় চিরবিধৌত ভয়ংকর হর্ণ অন্তরীপকে।

(১৭) বিধ্বস্ত জাহাজের খালাসীরা

পরের দিন চব্বিশে জুলাই ; দক্ষিণ গোলার্ধে চব্বিশে জুলাই মানেই উত্তর গোলার্ধে চব্বিশে জানুয়ারী।

দিনের আলো যেন ক্রমশঃ কমছে, বাড়ছে রাতের ঠাণ্ডা। হিমাংকের আরো নীচে নামছে তাপমাত্রা। সুতরাং যান্ত্রিক পন্থায় কৃত্রিম উত্তাপে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা হল। অ্যালবেট্রসে জামাকাপড়ের অভাব নেই। কাজেই পশম বস্ত্রে শরীর গরম রেখে দুই বেলুনিস্ট ডেকে দাঁড়িয়ে কেবলই গুজগুজ ফুসফুস করতেন —কি করে পালানো যায়—এই ছিল তাঁদের শলা পরামর্শের একমাত্র বিষয়। টিমবাকটু অঞ্চলে তুমুল কথা কাটাকাটির পর থেকে বেলুনিস্টদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন রোবার।

রান্নাঘর থেকে পারতপক্ষে বেরোতো না ক্রাইকোলিন, তাপাজে তাকে জামাই আদরে রেখেছে শুধু একটা সর্তে—অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ করতে হবে ক্রাইকোলিনকে। ক্রাইকোলিন দেখলে তাতে সুবিধে অনেক। যখন তখন বাইরের দৃশ্য চোখে পড়বে না। অষ্ট্রিচ পাখীর মতই তাই নিজেকে নিরাপদ মনে করত সে। এরই নাম অষ্ট্রিচের মত মূর্খ!

কিন্তু অ্যালবেট্রস চলেছে কোথায়? এখন শীতের মরসুম। এ সময়ে দক্ষিণ মেরু যাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষা। ব্যাটারীর অ্যাসিড না হয় জমবে না—কিন্তু কর্মচারীরা তো বেঘোরে মারা পড়বে। গরমকালে মেরু অভিযানের প্ল্যান করলেও রোবার খুব ঝুঁকি নিতেন। আর এই ভরাট শীতে মেরু অভিযানের প্ল্যান করলে তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্তে এসে একী উদ্ভট খেয়াল? যদিও এ-অঞ্চল খাস যুক্তরাষ্ট্র নয়—কিন্তু আমেরিকা তো! মতলব কি গোঁয়ার রোবারের? আর দেরী কেন? এবার ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলেই তো হয় তাঁর সাধের যন্ত্রযানকে!

চব্বিশে জুলাই রোবার কি নিয়ে খুব পরামর্শ করছিলেন টম টার্নারের সঙ্গে। ঘনঘন ব্যারোমিটার দেখছিলেন। কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছেন, তা জানার চাইতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের দিকেই যেন দুজনের বেশী নজর রয়েছে মনে হল।

আঙ্কল প্রুডেন্ট এমন কথাও বললেন যে রোবার নাকি খাবার দাবার কত আছে, সে খবর নিয়েছেন। তবে কি উনি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন?

'ফিরে যাবে! কোথায়?' শুধোলেন ফিল ইভান্স।

'যেখানে খাবার দাবার তোলা যাবে অ্যালবেট্রসে।'

নিশ্চয় কোনো নির্জনদ্বীপে। প্রশান্ত মহাসাগরে পাণ্ডব বর্জিত দ্বীপের অভাব নেই। গিয়ে দেখবেন হয়ত পালের গোদার মতই হুবহু আরো অনেক স্কাউণ্ড্রেল ঘরদোর তুলে বসে আছে সেখানে।'

'আমারও তাই মনে হয়, ফিল! রোবার এখন চলেছে পশ্চিমদিকে। গোপন ঘাঁটি এসে গেল বলে।'

বেলুনিস্টরা আঁচ করেছিলেন ঠিকই। কেপহর্ণে যদি বরফ দেখা যায়—আরও দক্ষিণে বরফের পাহাড় দেখা যাবে। যত মজবুত জাহাজই হোক না কেন, এসময়ে আর এগোতে সাহস করে না। দুর্ভেদ্য সেই বাধা টপকে যেতে হলে অ্যালবেট্রসকে উঠতে হবে অনেক ঊর্ধ্বে—ঠিক যেভাবে হিমালয় টপকে ছিল—সেইভাবেই মেরু মহাদেশও পেরিয়ে যাবে হয়ত। কিন্তু এই শীতে কি অতটা ঝুঁকি নেবেন রোবার?

দক্ষিণ দিকে শখানেক মাইল যাওয়ার পর পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাল অ্যালবেট্রস। রকম সকম দেখে মনে হল প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অজ্ঞাত দ্বীপ চোখে পড়েছে। নীচে দেখা যাচ্ছে ধূ-ধূ জলময় প্রান্তর। এশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এই জলধির একস্থানে সহসা দেখা গেল দুধ সাগর। দুধ সাগরের নাম হয়েছে জলের রঙ দুধের মত দেখায় বলে। সূর্য-রশ্মির বিচিত্র খেলায় জল যেন দুধ হয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন ধবধবে বরফের চাদর পাতা। অত উঁচু থেকে জলের দুলুনি দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে —হঠাৎ বুঝি জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। বরফ-প্রান্তর অথবা দুধ সাগরের মূল রহস্য অবশ্য কোটি কোটি দ্যুতিময় কণিকার একত্র সমাবেশ। এর ওপর পড়েছে সূর্যরশ্মি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তা সচরাচর ভারত মহাসাগরের এলাকা পেরোলে আর দেখা যায় না।

হঠাৎ ব্যারোমিটারের পারা নেমে এল। সকালের দিকে পারা ছিল অনেক ওপরে। ভয়াবহ এই লক্ষণ দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেনের চুল খাড়া হতে পারে, উড়োজাহাজের ক্যাপ্টেন কিন্তু পরোয়াও করলেন না। বেশ বোঝা গেল, সম্প্রতি সাংঘাতিক ঝড় ঝঞ্ঝা দাপাদাপি করে গিয়েছে বলেই ব্যারোমিটার নাচানাচি করছে অমন অদ্ভুত ভাবে।

দুপুর একটা নাগাদ টম টার্নার দৌড়ে এসে বললেন রোবারকে—'উত্তর দিকে কালো ফুটকিটা দেখেছেন। পাহাড় নয় তো?'

'উঁহু। ওদিকে ডাঙা নেই।'

'তাহলে জাহাজ-টাহাজ হবে নিশ্চয়।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স যেই শুনলেন জাহাজ দেখা গিয়েছে দিগন্তে, অমনি আকুল ভাবে তাকালেন সেদিকে।

দূরবীন চাইলেন রোবার। চোখে লাগিয়ে অনেকক্ষণ দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন।

বললেন—'নৌকো। লোক রয়েছে।'

'জাহাজ ডুবির নৌকো কি?' টম শুধোলেন।

'তাছাড়া আর কি! জাহাজ ডুবেছে—নৌকোয় চেপে বসেছে প্রাণের দায়ে—জানে না ডাঙা কোন দিকে। ক্ষিদে তেষ্টায় অবস্থা নিশ্চয় সঙীন। ঠিক আছে, আমার কাজ আমি করব। কেউ অন্ততঃ বলতে পারবে না অ্যালবেট্রস দুর্গতদের ফেলে পালিয়েছে!'

নীচের দিকে নামতে লাগল এরোনফ। শ তিনেক গজ বাকী থাকতেই সামনের প্রপেলার চালিয়ে বেগে ছুটে গেল কালো ফুটকির দিকে।

নৌকোই বটে। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে অসহায় ভাবে। হাওয়া নেই, তাই পাল জড়িয়ে গিয়েছে মাস্তলে। জনাকয়েক মৃতপ্রায় লোক ধুঁকছে শুয়ে শুয়ে।

ঠিক মাথার ওপর এসে আরো নীচে নামল অ্যালবেট্রস। নৌকোর গায়ে লেখা রয়েছে জাহাজের নাম—জঁানেত নানতেস।

হেঁকে উঠলেন টার্নার—'হ্যালো! কে ওখানে?'

মাত্র আশি ফুট নীচে ভাসমান নৌকোর মানুষ ক'জনের কানে ডাক পৌঁছোলো নিশ্চয়—কিন্তু কেউই সাড়া দিল না। মারা গিয়েছে নাকি?

রোবার হুকুম দিলেন—'কামান দাগো!'

কামান-নির্ঘোষ ঢেউয়ের ওপর নাচতে নাচতে ধেয়ে গেল দূর দিগন্তে। নৌকোর শায়িত একজন মুমূর্ষু মাথা তুলল অতিকষ্টে। দুই চোখ তার কোটরে বসে গেছে। মুখ তো নয়—যেন কংকাল। ওপরে চোখ পড়তেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

ফরাসি ভাষায় বললেন রোবার—'ভয় পেওনা। আমরা সাহায্য করতে এসেছি! কে তোমরা?...

'জঁানেত জাহাজের নাবিক। আমি এদের মেট। পনেরো দিন হল জঁানেত ডুবে গেছে। জল খাবার দুটোই ফুরিয়ে গিয়েছে।'

বাকী চারজন মুমূর্ষুও মাথা তুলল এতক্ষণে। অনাহারে অবসাদে কংকালসার চেহারা তাদের। দেখলে মায়া হয়। অতিকষ্টে অস্থিচর্মসার হাত বাড়িয়ে ধরল অ্যালবেট্রসের পানে। নীরবে যেন বলতে চাইল—বাঁচান! বাঁচান!

এক বালতি জল দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলেন রোবার। পাঁচজনেই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালতির ওপর। যেন নাক মুখ দিয়ে জল খেতে লাগল ব্যাকুল ভাবে। কি করুণ দৃশ্য। চোখে জল এসে গেল অ্যালবেট্রস আরোহীদের।

'রুটি! রুটি!' চীৎকার উঠলো নৌকো থেকে।

ঝুড়ি ভর্তি খাবার আর পাঁচ বোতল কফি নামিয়ে দেওয়া হল দড়ি বেঁধে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ঝুড়ির খাবার নিয়ে।

ক্ষিদে তেষ্টা শান্ত হলে শুধোলো মেট—'আমরা এখন কোথায়?'

চিলি উপকূল আর কোনেস দ্বীপপুঞ্জ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।

'ধন্যবাদ! শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে। চললাম—'

'দরকার হবে না। আমরা গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছি!'

'কে আপনারা?'

'আমরা? যারা আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে ব্যাকুল—আমরা তারা।'

মেট বুঝলেন প্রশ্ন করা আর সমীচীন নয়। উদ্ধার কর্তা অজ্ঞাত থাকতে চান—পূর্ণ হোক তাঁর মনোবাঞ্ছা। কিন্তু নৌকাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কি স্লাইং মেশিনের আছে?

আছে। একশ ফুট লম্বা দড়ির ডগায় নৌকো আটকে স্বচ্ছন্দ গতিতে অ্যালবেট্রস উড়ে গেল পূর্বদিকে। রাত দশটায় দেখা গেল ডাঙা। দৈব ঘটনা কাকে বলে, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেল নৌকোর পাঁচজনে। রাখে ঈশ্বর মারে কে? পরমায়ু ছিল বলেই তো আকাশ থেকে নেমে এল খাদ্য, পানীয় এবং শেষ পর্যন্ত স্থল?

কোনোস দ্বীপপুঞ্জের প্রণালীর মোহানায় পৌঁছে দড়ি খুলে দিতে বললেন রোবার।

দেখতে দেখতে ভাসমান নৌকো পড়ে রইল পেছনে—নক্ষত্র গতিতে আকাশে মিলিয়ে গেল আকাশযান। সজল নয়নে অন্তর থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল পাঁচজনে—কল্যাণ কামনা করল আকাশ রাজার।

এরোনফ ছাড়া আর কোনো যন্ত্র কি পারত এইভাবে দুর্গতদের মুখে আহার-পানীয় জুগিয়ে ডাঙায় টেনে নিয়ে যেতে? পারত কি বেলুন বাতাস-হীন আকাশে ইচ্ছে মত উড়তে? মানুষের মঙ্গল করার এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, পণ করলেন দুই বেলুনিস্ট—অ্যালবেট্রসের প্রশংসা মুখ দিয়ে বের করবেন না। চোখ কানের প্রমাণকেও গ্রাহ্য করবেন না!

(১৮) আগ্নেয়গিরির মাথায়

সমুদ্র ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে নামছে ফুঁসছে দুলছে। লক্ষণ অতি বিপজ্জনক। ঝাঁ করে ফের নেমে গেল ব্যারোমিটারের পারা কয়েক মিলিমিটার নীচে। দমকা হাওয়া আসছিল এতক্ষণ গোঁ-গোঁ শব্দে—আচমকা নিথর হল হাওয়া। এ-অবস্থায় জলযান মাত্রই গোটা তিনেক পাল তুলে দেয়। স্টর্ম-গ্লাস অস্থির হয়ে উঠেছে। ঝড় আসছে।

রাত একটায় ভীমবেগে ধেয়ে এল ঝড়ো বাতাস। ঝড়ের সঙ্গে টক্কর দিয়ে এগোতে গিয়ে গতিবেগ কমে গেল অ্যালবেট্রসের। ঘণ্টায় বারো থেকে পনেরো মাইল কি একটা স্পীড?

সাইক্লোনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে তৈরী হওয়া দরকার। এ-অঞ্চলে যদিও সাইক্লোন বড় একটা দেখা যায় না—তাহলেও সাবধানের মার নেই।

এ-জাতীয় ঝড়ের এক-এক জায়গায় এক-এক নাম। আটল্যান্টিকে যা হারিকেন, চীন সাগরে তা টাইফুন, সাহারায় সিমুম, পশ্চিম উপকূলে টর্নেডো। নাম যাই হোক না কেন, ধর্ম একই। অর্থাৎ সবকটাই ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণন বেগ পরিধির দিকে যা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী হয় কেন্দ্রের দিকে। ঘূর্ণাবর্তের মধ্যিখানটাই নাকি একমাত্র শান্ত অঞ্চল।

রোবার এ-তত্ত্ব জানেন। আরও জানেন যে সাইক্লোনকে ফাঁকি দিতে হলে সাইক্লোনের এখতিয়ারের বাইরে চম্পট দেওয়াই সব চাইতে ভালো পন্থা। উঁচুতে উঠলেই টান কম অনুভূত হবে। এতদিন এই পন্থাতেই ঝড়কে ফাঁকি দিয়েছেন—এখন কিন্তু আর একটা ঘণ্টা কেন, একটা মিনিটও সময় নেই হাতে।

ঝড়ের প্রতাপ বাড়ছে। ঢেউ ভীষণ ভাবে আছড়ে পড়ছে—ফেণায় ফেণা হয়ে যাচ্ছে চারিদিক। যেন সাদা ধুলোয় ছেয়ে যাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠ। প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসছে সাইক্লোন।

'উঁচুতে!' বললেন রোবার।

'চালাও ওপরে!' হাঁক দিলেন টম টার্নার।

যেন খাড়াই ঢাল বেয়ে নক্ষত্রবেগে ওপরে উঠতে লাগল অ্যালবেট্রস। আচম্বিতে ব্যারোমিটার নীচে নেমে গেল।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল অ্যালবেট্রস!

একী বিপর্যয়? উড়ন্ত যন্ত্রযান সহসা থ হয়ে গেল কেন? হাওয়ার টানে নিশ্চয়। ঢেউয়ের উল্টো দিকে যেতে গেলে জলযানের প্রপেলারে যে বিপর্যয় দেখা যায়—উড্ডুক্কু যানের প্রপেলারও সেই বিপদে পড়েছে। হাওয়া আর কাটছে না!

কিন্তু হার মানবার পাত্র নন রোবার। চুয়াত্তরটা প্রপেলার সর্বোচ্চ গতিবেগে ঘুরে চলল বনবনিয়ে—কিন্তু চূড়ান্ত গতিবেগেও নড়তে পারল না অ্যালবেট্রস। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হাওয়া তাকে টেনে রাখল অবহেলে। সাইক্লোনের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারবে কি যন্ত্রযান?

ধীরে ধীরে নীচের দিকে পড়ছে অ্যালবেট্রস। সাইক্লোন কল্পনাতীত শক্তি দিয়ে একটু একটু করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংস বিন্দুতে!

ঝড় যদি এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে সর্বনাশের আর দেরী নেই! যে ঝড় বাড়ী ধ্বসিয়ে দিয়ে, গাছ উপড়ে নিয়ে যায়, ছাদ উড়িয়ে নিয়ে ফেলে বহুদূরে—তার পাল্লায় পড়ে শেষকালে কি খড়কুটোর মত উড়ে যেতে হবে অ্যালবেট্রসকে?

গুরুগম্ভীর গর্জনের জন্যে কথা শোনা যাচ্ছে না! ইসারায় কথা বলছেন রোবার এবং টম টার্নার। আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং এবং ফিল ইভান্স ঝড়ের রুদ্রমূর্তি দেখে ভাবছেন, সাইক্লোন তাঁদের হয়েই কি ধ্বংস করবে আশ্চর্য যন্ত্রযানকে? সেই সঙ্গে চির রহস্যে আবৃত রাখবে আবিষ্কারকের গুপ্ত কথা এবং যন্ত্রযানের নির্মাণ প্রণালী?

ওপরে ওঠা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সাইক্লোনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছোনো দরকার। কিন্তু কিভাবে? ঘূর্ণাবর্তের ভীষণ গণ্ডী পেরিয়ে প্রশান্ত অঞ্চলে পৌছোনোর যান্ত্রিক শক্তি কি আছে যন্ত্রযানের?

সহসা আকাশের মেঘ যেন মাথায় ভেঙে পড়ল! ঘনীভূত বাষ্প বৃষ্টির আকারে নামল নীচে···নিছক বৃষ্টি নয়··মুষলধারে বৃষ্টি। রাত তখন দুটো। ব্যারোমিটার এতক্ষণ ঝুলছিল বারো মিলিমিটারের ওপরে। এখন দাঁড়াল ২৭.৯১ মিলিমিটারে।

সাইক্লোন জাতীয় তুফান সাধারণতঃ হামলা চালায় উত্তর অক্ষাংশের তিরিশ সমাক্ষ রেখা আর দক্ষিণ অক্ষাংশের ছাব্বিশ সমাক্ষ রেখার মাঝের অঞ্চলে। কিন্তু এ অঞ্চল তো ঝড়ের অঞ্চল নয়! তবে কেন এই অকস্মাৎ উৎপাত? এই ঝড়ো ঝঞ্ঝাট?

কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের কোনো জবাবদিহি হয় না। তাই বুঝি ঘূর্ণাবর্ত সহসা রূপান্তরিত হল টানা ঝড়ে। সাংঘাতিক হারিকেন! ১৮৮২ সালের ২২শে মার্চ কানেকটিকাট শহরের যে প্রভঞ্জনের প্রলয়-রূপ দেখা গিয়েছিল, এ-ঝড় তার চাইতে কোনো অংশে কম যায় না। ঘণ্টায় তিনশ মাইল বেগে ছুটন্ত ঝড় যেন পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে লাগল মুহুর্মুহু!

ঝড় থেকে বাঁচতে হলে অ্যালবেট্রসকে হয় ঝড়ের আগে ছুটতে হবে, নয় ঝড়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই পাগলা হাওয়ার সামনে যাওয়ার বা ওপরে ওঠার ক্ষমতা যন্ত্রযানের নেই। তাই গা ভাসানো ছাড়া পথ রইল না। কিন্তু এ-কোথায় চলেছে ঝড়? গতিমুখ যেন সটান দক্ষিণ দিকে! দক্ষিণ মেরুর মধ্যে ঢুকবেন না বলেই তো এত কাণ্ড করে সরে এসেছিলেন রোবার। মত্ত প্রভঞ্জন অসহায় অ্যালবেট্রসকে লুফে নিয়ে ছুটে চলেছে সেই দক্ষিণ মেরুর দিকেই।

সর্বশক্তি দিয়ে হাল ধরেছেন টম টার্নার। যন্ত্রযানকে সিধে রাখার জন্যে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে তাঁর। ভোর হল—মাঝ দিগন্তে ঈষৎ আলোর আভা দেখা গেল—হর্ন অন্তরীপের পনেরো ডিগ্রী নীচে পৌছে গেল অ্যালবেট্রস। আর বারোশ মাইল গেলেই দক্ষিণমেরু বলয় পেরিয়ে যাবে যন্ত্রযান।

জুলাই মাসের এ-সময়ে এ-অঞ্চলে রাতের দৈর্ঘ্য হয় সাড়ে উনিশ ঘণ্টা।

সূর্য সামান্য উঁকি দেয় দিগন্তে—পরক্ষণেই ডুব দেয় ফের। বোধহয় জ্যোতিহীন উত্তাপহীন মরামুখ দেখতে লজ্জা পায়! মেরুতে পৌঁছোলে একশ উনআশি ঘণ্টা লম্বা হয়ে যাবে রাতটা। আঁধার ঘেরা সেই তিমির রাজ্যের দিকেই বিরাম-বিহীন ভাবে ছুটে চলেছে অ্যালবেট্রস।

দিনের বেলা দেখা গেল দক্ষিণ মেরু পৌঁছোতে আর মাত্র চোদ্দশ মাইল বাকি।

নিরুপায় অ্যালবেট্রসকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে হচ্ছে ভূগোলকের দুর্গম এই অঞ্চলে। দুর্গম গিরি কান্তার মরুও জয় করা যায়—যায় না শুধু দক্ষিণ মেরুকে—সংক্ষেপে যার নাম কুমেরু। ভূগোলক মেরু অঞ্চলে ঈষৎ চ্যাটালো বলে অ্যালবেট্রসের ওজনও যেন কমে গিয়েছে। এখন আর ভেসে থাকার জন্যে চুয়াত্তরটা প্রপেলার না চালালেও চলে। চালালেও ঝড় ধার ধারছে না। দেখতে দেখতে মাতাল হাওয়ার মাতলামি এত বেড়ে গেল যে রোবার কমিয়ে দিলেন প্রপেলারের ঘূর্ণন বেগ। নইলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা কষতে গিয়ে জখম হতে পারে অ্যালবেট্রস।

এমন বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রয়েছে রোবারের। কর্মচারীরা তাঁর হুকুম তামিল করছে নীরবে—যেন এক রোবার বহু রোবার হয়ে সাগরেদদের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বেলুনিস্ট। হাওয়ায় গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে বলে গায়ে ঝাপটা তেমন লাগছে না—ডেক থেকে উড়ে যাওয়ার ভয় নেই! ঠিক যেন বেলুনের মত হাওয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে অ্যালবেট্রস!

দক্ষিণ মেরু জায়গাটা আসলে কী? মহাদেশ, না দ্বীপপুঞ্জ? নাকি আদ্দিকালের সমুদ্র? দারুণ গ্রীষ্মেও যে সমুদ্রের বরফ গলে না—একি সেই অঞ্চল? জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি যে দক্ষিণ মেরুতে যখন শীত, তখন কক্ষ পথে পৃথিবীর বিশেষ অবস্থানের জন্যে দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর চাইতে বেশী ঠাণ্ডা।

সাধে কি দক্ষিণ মেরুর নাম হয়েছে কুমেরু, আর উত্তর মেরুর নাম হয়েছে সুমেরু!

সারাদিনে ঝড়ের হাহাকার কমবার লক্ষণ দেখা গেল না। অচিরে মেরুবৃত্ত পেরিয়ে এল অ্যালবেট্রস।

দিন আরো ছোট হচ্ছে। সুদীর্ঘ রাত্রি শুরু হল বলে। একটানা রাতে চাঁদ আর মেরুজ্যোতি ছাড়া আলোর নিশানা দেখানোর মত কেউ নেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার এই অঞ্চলে। চাঁদও এখন নখের মত। তার মানে যে অঞ্চলে মানুষের

পা পড়েনি আজও, তার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সুযোগ পেয়েও ভূ-প্রকৃতি দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে না। দক্ষিণ মেরুর রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।

ডেকের ওপর যতটা ঠাণ্ডার প্রকোপ টের পাওয়া যাবে আশা করা গিয়েছিল, ততটা ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে না। হারিকেন তো নয় যেন—সামুদ্রিক স্রোত। আপন উত্তাপে উত্তপ্ত করে রেখেছে স্রোতে বহমান বস্তুকেও।

অজ্ঞাত অঞ্চলের বিন্দুবিসর্গ দেখা যাচ্ছে না, এ-পরিতাপ কি কম? চাঁদের হাসি দেখা গেলে মেরুর রূপও দেখা যেত। বছরের এ-সময়ে বরফ-মুকুটে ঢাকা থাকে দক্ষিণ মেরু। সে-রকম বরফ চাদরও দেখা যাচ্ছে না—সাদাটে চমকও চোখে পড়ছে না—শ্বেত-তুহিনের চিকিমিকিও চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে না। এ-অবস্থায় জমির চেহারা কি রকম, সমুদ্র আছে কিনা, দ্বীপ থাকলেও তার অবস্থান কি—কে বলবে? জল বিজ্ঞান বা শৈল বিজ্ঞানের চর্চাও তো অসম্ভব। হ্রদ, নদী, সাগর কে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, অথবা পাহাড় পর্বতের দখল কদ্দুর—কিছুই তো বলা সম্ভব নয়! কোনটা বরফের পাহাড় আর কোনটা পাথরের পাহাড়—না দেখলে কি বলা যায়?

মাঝরাত পেরোতেই মেরুজ্যোতি অন্ধকারকে ঝলসে দিল। মহাশূন্য থেকে ঝরে পড়ল রূপোলী জ্যোতি—যেন আধখানা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দেবলোকের হাতপাখা। মাথার ওপর হারিয়ে গেল মেরুজ্যোতির ইলেকট্রিক ঝিলিমিলি—জলজ্বল করতে লাগল সাদার্ন ক্রসের চারটে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

প্রকৃতির এই আলোর খেলার তুলনা হয় না—তুলনা হয় না সু-মহান সেই দৃশ্যের। ঝলমলে আলোয় সমস্ত কিছুই শ্বেতশুভ্র রূপ নিয়ে ভেসে উঠল বিস্মিত চোখের সামনে—ছেদহীন দুগ্ধধবল জমাট পিণ্ড—আলাদা করে কিছুই বোঝা গেল না।

দক্ষিণ মেরুর খুব কাছে আসার ফলে পাগলামি শুরু করেছে কম্পাসের কাঁটা। ঠিক কোন দিকে চলেছে যন্ত্রযান বোঝা যাচ্ছে না। একবার কিন্তু রোবারের মনে হল স্যার জেমস আবিষ্কৃত ম্যাগনেটিক পোল অর্থাৎ চৌম্বক-মেরু পায়ের তলায় এসেই মিলিয়ে গেল চকিতে। ঘণ্টাখানেক পরে অনেক হিসেব কষে চেঁচিয়ে উঠলেন রোবার—'দক্ষিণ মেরু! অ্যালবেট্রস এখন দক্ষিণ মেরুর ওপরে!'

বরফের সাদাটুপী ছাড়া কিছুই কিন্তু দেখা গেল না। বরফের আস্তরণের তলায় ঢাকা রইল দক্ষিণ মেরুর আদ্দিকালের রহস্য। মিনিট কয়েক পরেই নিভে গেল মেরুজ্যোতি। দক্ষিণ মেরু রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত।

এই সুযোগে বোমা ফাটিয়ে এরোনফ ধ্বংস করে গায়ের জ্বালা মিটোতে

পারতেন আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। কিন্তু বারুদখানা এখনো তাঁদের নাগালের বাইরে ;

হারিকেন এখনো ফুঁশছে। সামনে যদি কোনো পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়ায়, নিমেষ মধ্যে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হবে অ্যালবেট্রস। উর্ধে ওঠা তো দূরের কথা, জমির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় যাওয়ার শক্তিও আর নেই অ্যালবেট্রসের।

দক্ষিণ মেরুর অজ্ঞাত এই অঞ্চলে পাহাড় পর্বত থাকবে না। এ-তো হতে পারে না। প্রধান মধ্যরেখা পেরিয়ে আসবার পর অ্যালবেট্রসের গতি পূর্বদিকে মোড় নিতেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পেল। বহুদূরে দেখা গেল দুটি দ্যুতিময় বিন্দু। রস পাহাড়ের দুই আগ্নেয়গিরি—এরেবাস আর টেরর-য়ের দিকে সটান ধেয়ে চলেছে অ্যালবেট্রস ? তবে কি আগুনের আঁচে প্রজাপতির মতই দপ করে নিমেষে ছাই হবে অ্যালবেট্রস ?

নিঃসীম উদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত হল একটি ঘন্টা। এরেবাস আগুন-পাহাড়টা মনে হল সোজা ছুটে আসছে অ্যালবেট্রসের দিকে—হারিকেনের গতিপথ থেকে সরে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। আগুন লক্ষ শিখায় শূন্যে ধেয়ে উঠেছে জ্বালামুখ থেকে! রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে মাকড়শার জালের মত অগুন্তি লকলকে শিখা। পাশ কাটিয়ে যাবার পথ কোথায় ? আগুন নাচছে, আগুন লাফাচ্ছে, আগুন দুলছে, আগুন খলখল হাসি হাসছে। আগুনের আভায় প্রদীপ্ত অ্যালবেট্রসের মানুষ কজনকে মনে হচ্ছে যেন এ-জগতের মানুষ নয়—ভিনগ্রহের অমানুষ। নিবাত নিষ্কম্প দেহে তারা বোবা উদ্বেগে প্রতীক্ষা করছে ভয়ংকর সেই মুহূর্তের—আগুন নিমেষ মধ্যে ছেয়ে ফেলবে তাদের দশদিক থেকে। আগুনের বেড়াজালে বন্দী হবে অজেয় অ্যালবেট্রস।

কিন্তু যে-হারিকেন তাদের নির্বিঘ্নে উড়িয়ে এনেছে পাহাড় সমুদ্র ও বরফের ওপর দিয়ে ; সেই হারিকেনই তাদের নির্বিঘ্নে উড়িয়ে নিয়ে গেল আগুনের ওপর দিয়েও। ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়ল লেলিহান শিখা—গনগনে উনুনের ওপর দিয়ে যেন সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল অ্যালবেট্রস। প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত চলছে তখন। লাভা গড়াচ্ছে, পাথর আর ছাই ছিটকোচ্ছে—কিন্তু—এ-সবের মধ্যে দিয়েই আশ্চর্যভাবে ছিটকে গেল যন্ত্রযান—গায়ে টুসকিও লাগল না। অ্যালবেট্রসের দুরন্ত প্রপেলারের দৌলতে কেন্দ্রাতীত বেগ কেন্দ্র থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল আগ্নেয়শিলা এবং ভস্মকে।

একঘণ্টা পরে পেছনে দেখা গেল দু'দুটো ভীষণাকৃতি মশাল টিমটিমে আলোকবিন্দু হয়ে বিলীন হচ্ছে দিগন্তে। সুদীর্ঘ মেরুরাত্রে এই দুই করাল আগুন পাহাড়ের আলোর দৌলতেই কিন্তু অমানিশার রাজত্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাত ছটা। ভিলকভারি ল্যাণ্ডের উপকূলে খালেনি দ্বীপ দেখা গেল। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জমাট বরফ দিয়ে লাগোয়া থাকায় বোঝা গেল না কোনটা আয়ল্যাণ্ড আর কোনটা মেনল্যাণ্ড।

এরপরেই মেরুবৃত্তের বাইরে নিক্ষিপ্ত হল অ্যালবেট্রস—বেরিয়ে এল একশ পঁচাত্তর মধ্যমায়। ভাসমান হিমশৈলের ওপর দিয়ে, ছোট বড় বরফ পাহাড়ের মাথা দিয়ে সহস্র সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েও ঝড় উড়িয়ে নিয়ে এসেছে যন্ত্রযানকে গোটা দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে। কতবার আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—কিন্তু কিছুই হয়নি। হবে কি করে? অ্যালবেট্রসকে মানুষ চালায়নি, চালিয়েছেন স্বয়ং ভগবান। হাল ধরেছেন পরম কারুণিক নিজে—তাই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। দুনিয়ার পাইলট তিনি—তাই নির্বিঘ্নে থেকেছে অ্যালবেট্রস!

উত্তর মুখে ধেয়ে চলেছে অ্যালবেট্রস। ষাট সমাক্ষরেখায় পৌছে দেখা গেল নিস্তেজ হয়ে আসছে দামাল হাওয়া—যেন এতক্ষণে দম ফুরোচ্ছে দমবাজ প্রভঞ্জনের। আবার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে অ্যালবেট্রসকে। আবার আলোকিত ভূপৃষ্ঠ দেখা যাচ্ছে। সকাল হল বেলা আটটায়।

মিনিটে তিনশ মাইল বেগে অ্যালবেট্রস পেরিয়ে এসেছে দক্ষিণ মেরু। চারহাজার সাড়ে তিনশ মাইল পথ মাত্র উনিশ ঘণ্টায় পাড়ি দিয়েছে ঝড়—অ্যালবেট্রসকে এনে ফেলেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা জানা যাচ্ছে না। ম্যাগনেটিক পোলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে কম্পাস বিগড়ে যাওয়ায় দিকভ্রম তো হবেই। সূর্যের মুখও দেখা যাচ্ছে না পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের উৎপাতে।

জখম হয়েছে অ্যালবেট্রসের সামনের আর পেছনের প্রপেলার। অর্থাৎ যে দুটি প্রপেলার দিয়ে সামনে বা পেছনে ছোটা যায়—সেই দুটিই বিগড়েছে। এ-অবস্থায় ঘণ্টায় আঠারো মাইল গতিবেগ তুলতেই বেশ হিমসিম খেতে হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারকে। বেশী জোরে যেতে গিয়ে যদি প্রপেলার একেবারেই বিকল হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে বেকায়দায় পড়বে অ্যালবেট্রস। রোবার ঠিক করলেন, শূন্যে ভাসন্ত অবস্থাতেই প্রপেলার সারাতে হবে—তবেই অধিক গতিবেগ পেরিয়ে যাওয়া যাবে মহাসাগর।

সাতাশে জুলাই সাতটা নাগাদ উত্তরদিকে ডাঙা দেখা গেল। কিসের ডাঙা? মহাদেশের, না, দ্বীপের? কাছে আসতে দেখা গেল একটা দ্বীপ। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার দ্বীপের মধ্যে এটা কোন দ্বীপ? জানা সম্ভব নয়—দিকভ্রষ্ট অ্যালবেট্রসের কম্পাস পর্যন্ত বিকল হয়েছে। রোবার কিন্তু

ঠিক করলেন দিনের আলোয় ঐ দ্বীপের মাথায় দাঁড়িয়েই প্রথম যন্ত্র মেরামত করবেন—রাত নামলেই যাত্রা শুরু করবেন।

হাওয়া পড়ে গেছে। মেরামতের অনুকূল পরিবেশ। হাওয়ার টান বেশী হলে আবার কোথায় ভেসে যাবে অ্যালবেট্রস, তা কি কেউ বলতে পারে?

দেড়শ ফুট লম্বা রশির প্রান্তে নোঙর বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল নীচে। দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই বালি ঘসটে গিয়ে নোঙর আটকে গেল পাথরের খাঁজে। বেশ বড়সড় ছুটো পাথরের ফাঁকে শক্তভাবে আটকে যেতেই ঈষৎ ঊর্ধ্বে উঠল অ্যালবেট্রস। টান-টান হয়ে গেল নোঙরের দড়ি। অনড় অটলভাবে দাঁড়িয়ে গেল যন্ত্রযান।

ফিলাডেলফিয়া থেকে আকাশে ওঠবার পর এই প্রথম মর্ত্যের সঙ্গে দড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়ল অ্যালবেট্রস।

(১৯) মাটি

উঁচু থেকে মাঝারি সাইজের মনে হচ্ছিল দ্বীপটাকে। কিন্তু দ্বীপের অক্ষরেখা কত? কোন মধ্যরেখায় এর অবস্থান? প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ? না অস্ট্রেলেশিয়ার? ভারত মহাসাগরেরও তো হতে পারে। সূর্য দেখা দিলে দ্বীপের অবস্থান বের করে নেওয়া যেত। কম্পাসের ওপরেও তো আর ভরসা করা যায় না!

দেড়শ ফুট ওপর থেকে দ্বীপটাকে তিন মাথাওয়ালা তারকার মত মনে হচ্ছে। কাগজে আঁকা তারকার পাঁচটা খোঁচ থাকে—এর মাত্র তিনটে। পরিধি মাইল পনেরো।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটা উপদ্বীপ। পাহাড়ের শ্রেণী। বালুচরে জোয়ার ভাঁটার জলের দাগ নেই। তবে কি এ সাগর প্রশান্ত মহাসাগর? একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরেই জোয়ার ভাঁটা আসে যায় চুপিসারে চিহ্ন না রেখে।

উত্তর পশ্চিম কোণে দশ ফুট উঁচু পর্বত। চূড়োটা শঙ্কুর মত ছুঁচালো।

দ্বীপের বাসিন্দা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যদিও বা থাকে এরোনকের কালান্তক মূর্তি দেখেই নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়েছে পাহাড়ের আড়ালে।

অ্যালবেট্রস নোঙর ফেলেছে দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে। সামনেই একটা পাহাড়ি নদী বইছে ঝিরঝির করে পাথরের আনাচে কানাচে। নদীর ওদিকে উপত্যকা

জুড়ে হরেকরকম গাছ। পাট্রিজ আর বাস্টার্ড পাখীর কলকাকলীতে কান পাতা দায়। এ-দ্বীপে মানুষ না থাকলেও থাকার উপযুক্ত। জমি যদি বন্ধুর না হত, যদি অ্যালবেট্রসকে অবতরণ করানোর মত চ্যাটালো হত, তাহলে রোবার নিশ্চয় নেমে আসতেন।

সূর্যের প্রতীক্ষায় ঠুঁটো হয়ে বসে থেকে লাভ কী? সঙ্গীদের নিয়ে মেরামতি কাজ আরম্ভ করে দিলেন রোবার! দিনের আলো থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করতে হবে। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল পাখাগুলো খুব একটা জখম হয়নি। অর্ধেক প্রপেলার এখনো ঘুরছে। অ্যালবেট্রসকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তবে ঝড়ের ধাক্কায় চোট খেয়েছে চালক প্রপেলার দুটো। পাখা বেঁকে গেছে। খুলে সিধে করতে হবে। সেইসঙ্গে দেখতে হবে যে-কলকব্জা পাখাকে ঘুরোচ্ছে, সেইগুলোও চোট খেয়েছে কিনা।

সামনের চালক প্রপেলারটাকে আগে মেরামত করা দরকার। দিনের আলো ফুরানোর আগে এটাকে চালু করতে পারলে বেরিয়ে পড়া যাবে রাতের আঁধারে। সঙ্গীসাথী নিয়ে সোৎসাহে সামনের প্রপেলার খুলতে লাগলেন রোবার।

ডেকের ওপর পায়চারী করছেন দুই বেলুনিস্ট। ফ্রাইকোলিনের বুক কাঁপুনি আর নেই। মাটি থেকে মাত্র দেড়শ ফুট ওপরে স্থির ভাবে ভাসমান যন্ত্রের ডেকে দাঁড়ালে ভয় করবে কেন?

সূর্য উঁকি দিতেই হাতের কাজ থামিয়ে হিসেব করতে বসলেন রোবার। দ্বীপের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা বের করার পর ম্যাপের সঙ্গে মিলোনো হল। এ দ্বীপ নিশ্চয় চ্যাথাম দ্বীপ,—পিট দ্বীপ তো বটেই।

টম টার্নারকে বললেন রোবার—'কাছাকাছি এসে পড়েছি।'

'কত কাছে?'

'এক্স আয়ল্যাণ্ড থেকে ছেচল্লিশ ডিগ্রী দক্ষিণে। তার মানে আর আটাশ শো মাইল।'

'তাহলে তো প্রপেলার সারাতেই হবে' বললেন টার্নার। 'পথে বাতাস বাড়তে পারে। খাবার দাবারও কমে এসেছে—ভাঁড়ার ফুরানোর আগেই তো এক্স-আয়ল্যাণ্ডে পৌঁছতে হবে।'

'ঠিক কথা। আজ রাতেই রওনা হতে হবে। শুরু করি একটা প্রপেলার চালিয়ে—কাল দিনের আলোয় সারিয়ে নেব আর একটা।'

'দুই ভদ্রলোক আর ওঁদের চাকরটার কি ব্যবস্থা করবেন?'

'সঙ্গে নিয়ে যাব। এক্স আয়ল্যাণ্ডের কলোনীতে ঠাঁই নিতে কি খুব আপত্তি করবেন ভদ্রলোকরা?'

কিন্তু কোথায় এই এক্স-আয়ল্যাণ্ড? প্রশান্ত মহাসাগরে কত দ্বীপই শাঃ গজাচ্ছে তলাচ্ছে—কে কার হিসেব রাখে! অগুন্তি অজানা দ্বীপের অন্যতম দ্বীপ এই এক্স আয়ল্যাণ্ড। নিরক্ষরেখা আর কর্কটক্রান্তি বৃত্তের মাঝামাঝি কোন অজ্ঞাত অঞ্চলে তার অবস্থান। তাই বীজগণিতের রাশি এক্স এর নামে তার নাম দিয়েছেন রোবার। এ দ্বীপ দক্ষিণ প্যাসিফিকের উত্তরে—জাহাজ চলাচলের বাইরে রহস্যদ্বীপে পঞ্চাশজনের ছোট্ট কলোনীর পত্তন করেছেন রোবার। টাকার কুমীর তিনি। তাই সেখানে বানিয়েছেন উড়োজাহাজ তৈরীর এমন একটা বিপুলায়তন কারখানা যেখানে শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন অ্যালবেট্রস মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিতে পারে। শুধু মেরামত নয়, দরকার হলে নতুন নতুন উড়োজাহাজও বানিয়ে নিতে পারেন। যন্ত্রযানেব বিবিধ যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ বিপুল পরিমাণে মজুদ করা আছে কারখানায়। আর আছে পঞ্চাশ জনের উপযুক্ত কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার দাবার।

ঘূর্ণ অন্তরীপ ঘুরে এই দ্বীপেই আসতে চেয়েছিলেন রোবার। কিন্তু বাদ সাধল হারিকেন ঝড়! টেনে নিয়ে গেল দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে—এনে ফেলল একই অক্ষাংশরেখায়—যে অক্ষাংশ থেকে ঝড় ওঁকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল। নেহাৎ প্রপেলাব আর ঘুরছে না—নইলে কোন্‌কালে এক্স-আয়ল্যাণ্ড পৌঁছে যেতেন উনি।

তাই ঝটপট রওনা হতে হবে। মেট ঠিকই বলেছেন। পথে আবার হাওয়া প্রতিকূল হতে পারে। খাবার দাবারও ফুরিয়ে আসছে। যন্ত্রপাতির যা অবস্থা, তাতে ঘুটুর ঘুটুর করে গেলে তিন চার দিন তো লাগবেই সুদীর্ঘ পথ পেরোতে।

তাই চ্যাথাম দ্বীপে নোঙর আটকেছেন রোবার। সারাদিন খেটে খুটে একটা প্রপেলার চালু করবেন। যেতে যেতে সারাবেন আর একটা। হাওয়া যাতে টেনে অন্যদিকে না নিয়ে যায়। তাই নোঙর ফেলার দরকার হয়েছে। রওনা হওয়ার সময়ে যদি দেখা যায় নোঙর আর খুলতে চাইছে না পাথরের খাঁজ থেকে, ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে দিলেই চলবে।

তাই আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে যন্ত্রপাতি নিয়ে মেরামত শুরু করল অ্যালবেট্রস কর্মীরা।

ওরা ব্যস্ত রইল সামনের ডেকে, বেলুনিস্ট দুজন ব্যস্ত রইলেন পেছনের ডেকে। অত্যন্ত গোপন পরামর্শ শুরু হয়েছে দুজনের মধ্যে। মরণ বাঁচন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দুই মরিয়া আমেরিকান।

আঙ্কল প্রুডেন্ট বলছিলেন—'ফিল ইভান্স, আমার মত আপনিও নিশ্চয় জীবনপণ করেছেন?'

'করেছি।'

'রোবারেরও কাছে আর কিছু আশা করা যায় কী?'

'না।'

ফিল ইভান্স, 'আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আজ রাতেই যদি রওনা হয় অ্যালবেট্রস—এ-রাত আর ভোর হতে দেব না। আজ রাতেই ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করব রোবারের যান্ত্রিক পাখীকে—সেই সঙ্গে রোবার আর তার সাঙ্গ-প্যাঙ্গদের!'

'যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই ভাল।' সায় দিলেন ফিল ইভান্স।

দুজনেই মরিয়া; প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজেরাও যে মৃত্যুবরণ করবেন—তা নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই। নির্বিকার কণ্ঠে শুধোলেন—'যোগাড় যন্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে তো?'

'হয়েছে। কাল রাতে অ্যালবেট্রস নিয়ে যখন নাকানি চোবানি খাচ্ছিল রোবার আর তার দলবল—আমি তখন বারুদখানায় গিয়েছিলাম। ডিনামাইটের একটা কার্টিজ সরিয়ে এনেছি।'

'আঙ্কল প্রুডেন্ট, তাহলে আর দেরী কেন?'

'সবুর করুন। রাত নামুক। কেবিনে যাবেন—চমকে দেবো একটা জিনিস দেখিয়ে।'

সন্ধ্যে ছটার সময়ে যথারীতি খেয়ে দেয়ে কেবিনে ঢুকলেন দুই বেলুনিস্ট—যেন সারারাত না ঘুমোনো পুষিয়ে নেবেন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে।

রোবার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা জানতে পারলেন না কি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারলেন না পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে নিশ্চিত ধ্বংস!

প্ল্যানটা আঙ্কল প্রুডেন্টের। দাহোমেতে যে বারুদ এবং ডিনামাইটের সংহার মূর্তি দেখা গিয়েছিল—বিস্ফোরণের সেই উপকরণই বারুদখানা থেকে সরিয়ে এনেছেন তিনি সবার অলক্ষ্যে—অ্যালবেট্রসকে শূন্যপথে ধ্বংস করবেন বলে।

বিস্ফোরণের আয়োজন দেখে পুলকিত হলেন ফিল ইভান্স। একটা ধাতব পাত্রে ঠাসা পাউণ্ড দুয়েক ডিনামাইট—অ্যালবেট্রসকে ফুটি ফাটা করার পক্ষে যথেষ্ট। যদিও বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু আস্ত থাকে বিস্ফোরণের পর—দেড়শ ফুট ওপর থেকে আছাড় খেলে তাও ছাতু হবে। বিস্ফোরক বোঝাই আধারটা কেবিনের কোণে বসিয়ে রাখলে কারো চোখে পড়বে না—কিন্তু ডেক সমেত অ্যালবেট্রসের কাঠামো, খোল সব বিধ্বস্ত হবে।

কিন্তু সব চাইতে কঠিন কাজটাই এখনো বাকী। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পলতেটা আস্তে আস্তে জ্বলে এবং সময় মত বিস্ফোরণ ঘটে। আগে বা পরে ফাটলে চলবে না—ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চিহ্ন হতে হবে উড়ুক্কুযানকে।

আঙ্কল প্রুডেণ্ট অনেক মাথা খাটিয়ে এ-সমস্যারও সমাধান করেছিলেন। উনি জানতেন একটা প্রপেলার চালু হয়ে গেলেই উত্তরমুখো যাত্রা শুরু হবে অ্যালবেট্রসের। কর্মচারীরা একটু পরে ফিরে আসবে আর একটা প্রপেলার সারাতে। ওরা ডেকে থাকলেই মঙ্গল—কাজ সারতে হবে সেই ফাঁকে। কেবিনে থাকলে প্ল্যানমাফিক কাজ করা মুস্কিল হবে। তাই ধীরে জ্বলে এমনি একটা পলতে বানানোর ফন্দী এঁটেছিলেন।

ফিল ইভান্সকে বললেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট—'বারুদখানা থেকে খানিকটা গান পাউডার এনেছি। ন্যাকড়ায় মুড়ে এমন একটা পলতে বানাব যা পুড়বে আস্তে আস্তে। বারোটার সময়ে আগুন ধরালে ডিনামাইট ফাটবে রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।'

'খাসা প্ল্যান!' বললেন ফিল ইভান্স।

দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ গুমরে গুমরে থাকার ফলে দুজনেই দুটি চাপা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছেন। পাঁচ সপ্তাহের পুঞ্জীভূত আক্রোশ আজ ফেটে পড়তে চলেছে—সীমাহীন ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে আর বুঝি দেরী নেই। সর্বনাশা এই পরিকল্পনা আত্মঘাতী পরিকল্পনা হোক—অ্যালবেট্রস তো ধ্বংস হবে—সমুচিত শাস্তি দেওয়া যাবে সপারিষদ আকাশ রাজাকে। ক্রোধ তাঁদের দুজনকেই উন্মাদ করে দিয়েছে—নইলে এরকম প্ল্যান ভাবতেও পারতেন না।

ফিল ইভান্স বললেন—'ফ্রাইকোলিনের জান নেওয়ার অধিকার কি আছে আমাদের?'

আঙ্কল প্রুডেণ্ট জবাব দিলেন—'আমাদের জান যখন যাচ্ছে, তারও যাবে।'

যুক্তিটা নিশ্চয় মনঃপুত হত না বেচারী ফ্রাইকোলিনের।

শুরু হল পলতে তৈরী। হাতের তেলোয় রগড়ে বারুদটা খুব মিহি করে দিলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। তারপর ঈষৎ আর্দ্র করে ন্যাকড়ার মাঝে রেখে পলতে পাকিয়ে নিলেন। জ্বালিয়ে দেখলেন, এক ইঞ্চি পলতে পুড়তে পাঁচ মিনিট সময় লাগছে। অর্থাৎ এক গজ পুড়তে তিন ঘণ্টা লাগবে। সুতরাং এক গজ পলতে তৈরী হল। সুতো জড়িয়ে পাকানো হল। ডিনামাইট কার্টিজের ক্যাপে লাগাতে লাগাতেই বাজল রাত দশটা। এত কাণ্ড ঘটে গেল। কিন্তু কেউ উঁকিও দিল না কেবিনে। সবাই তো প্রপেলার নিয়ে ব্যস্ত ডেকের ওপর।

সুষ্ঠুভাবে প্রপেলার মেরামত করার জন্যে পাখাগুলোকে খুলে নামানো হয়েছিল ডেকের ওপর। পাখাগুলোই কেবল দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে—ভেতরের কলকব্জার ক্ষতি হয়নি। ব্যাটারী, অ্যাকুমুলেটর এবং অন্যান্য মেশিন ভালই রয়েছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। রোবার পরামর্শ করলেন টম টার্নারের সঙ্গে, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গিয়েছে। এখনো ঘণ্টা তিনেকের কাজ বাকী। কিন্তু একটু জিরেন দেওয়ার দরকার কর্মচারীদের। রাতের আঁধারে ইলেকট্রিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করাও সম্ভব নয়। প্রপেলারকে যথাস্থানে বসাতে গেলে অনেক সূক্ষ্ম তার জোড়া লাগাতে হবে—দিনের আলোয় সুবিধে অনেক। তাই ঠিক হল, রাতটা সবাই বিশ্রাম করুক। কাল সকালে কাজ শুরু হবে নব উদ্যমে।

আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স কিন্তু কিছুই জানতে পারলেন না। ওঁরা জানেন, সারারাত কাজ হবে এবং রাত ফর্সা হওয়ার আগেই যন্ত্রযান ফের রওনা হবে।

অন্ধকার রাত। চাঁদ নেই। ঘন মেঘে ছাওয়া থাকায় তারার আলো পর্যন্ত আসছে না। বাতাসের বেগ বেড়েছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে আসছে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে। অ্যালবেট্রস কিন্তু অনড়—নোঙরের দড়ি টান-টান অবস্থায় খাড়া উঠে এসেছে ওপরে খুঁটির মত।

আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স কিন্তু কল্পনা করে নিলেন অ্যালবেট্রস ফের পাড়ি জমিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। কেবিনে বসে তাঁরা গুজগুজ ফুসফুস্ নিয়ে মত্ত রইলেন। কানে ভেসে আসছে খাড়াই প্রপেলারের ফর-ফর ধ্বনি —ডেকের অন্যান্য শব্দ চাপা পড়ে গেছে সেই আওয়াজে। অধীর আগ্রহে চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছেন বেলুনিস্ট দুজন।

রাত বারোটার আর সামান্য দেরী। আঙ্কল প্রুডেণ্ট বললেন—'সময় হয়েছে।'

কেবিনের মধ্যেই বার্থের তলায় একটা বাক্স ছিল—ডালাটা টেনে খোলা যায়—ঠিক যেন একটা ক্ষুদে সিন্দুক। পলতে সমেত ডিনামাইট রাখা হল তার মধ্যে—যাতে পটপট আওয়াজ বা বারুদ পোড়ার গন্ধ বাইরে না যায়। আঙ্কল প্রুডেণ্ট পলতেতে আগুন দিয়ে ডালা টেনে বন্ধ করে দিলেন। বাক্স চালান করলেন বার্থের তলায়।

বললেন—'কাজ শেষ। চলুন বাইরে যাই!'

বাইরে গিয়ে অবাক হলেন দুজনে। এ কী! ডেক যে খাঁ-খাঁ করছে।

রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন ফিল ইভান্স—'আরে গেল যা! অ্যাল-বেট্রস তো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে। কাজ এখনো শেষ হয়নি!'

হতাশ হয়ে বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট—'ধুত্তোর! পলতে নিভিয়ে রাখতে হবে দেখছি!'

'মোটেই না। চলুন পালাই।'

'পালাবো?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ! দড়ি বেয়ে পঞ্চাশ গজ নামতে পারব না?'

'আলবৎ পারব, ফিল ইভান্স; না পারলে জানবেন আমাদের মত গর্দভ আর পৃথিবীতে নেই। হাতের সুযোগ কখনো পায়ে ঠেলে?'

এই বলে প্রথমে কেবিনে ফিরে গেলেন দুজনে। দরকারী জিনিসপত্র সঙ্গে নিলেন—কে জানে কদ্দিন থাকতে হবে চ্যাথাম আয়ল্যাণ্ডে—তৈরী হয়ে যাওয়াই ভাল। তারপর গেলেন ফ্রাইকোলিনের খোঁজে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এক হাত দূরেও চোখ চলে না। হাওয়ার বেগ বেড়েই চলেছে। নোঙরের দড়িও আর সিধে নেই—হেলে পড়েছে। সড়াৎ করে দড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না।

ডেকের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন দুজনে। ডেক হাউসের দিকে…অন্ধকারে গা মিশিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই…চারিদিক স্থির নিস্তব্ধ। পোর্টহোল দিয়ে আলোকরশ্মিও দেখা যাচ্ছে না। এরোনফ শুধু নীরব নয়—নিদ্রিতও বটে।

ফ্রাইকোলিনের কেবিনের কাছে পৌঁছেছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, এমন সময় বাধা দিলেন ফিল ইভান্স—'রাতের পাহারাদার!'

ডেক হাউসের কাছেই একজন ঢুলছে। চেঁচিয়ে উঠলেই কেঁচে যাবে পালানোর প্ল্যান। লোকটার ধারে কাছে ছড়ানো রয়েছে ইঞ্জিন মেরামতের তেলকালি মাখা ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং দড়ি।

চোখের পলকে দুজনে লাফিয়ে পড়লেন আধঘুমন্ত লোকটার ওপর। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরোলো না—মুখে ন্যাকড়া গুঁজে বেঁধে ফেলা হল হাত আর পা। তারপর পিছমোড়া করে বাঁধা হল রেলিংয়ের গায়ে। নিঃশব্দে সমাধা হল ধ্বস্তাধ্বস্তি পর্ব।

কান পেতে রইলেন বেলুনিস্টরা। কিন্তু না, কারো ঘুম ভাঙেনি। কেবিনের মধ্যে বিরাজ করছে নিথর নৈঃশব্দ। ফ্রাইকোলিনের কেবিনের সামনে গিয়ে শোনা গেল তাপাজের নাসিকাগর্জন।

কিন্তু দরজা ঠেলতে হল না! আশ্চর্য ব্যাপার তো! পাল্লা ভেজানো রয়েছে। ভেতরে ফ্রাইকোলিন নেই!

'নেই ফ্রাইকোলিন!' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

'সে কী কথা! যাবে কোথায়?'

গলুইয়েতে হয়ত ঘুমোচ্ছে ক্রাইকোলিন, এই ভেবে দুজনে গেলেন সামনের ডেকে! কিন্তু সেখানেও কেউ নেই!

'ছোকরা তাহলে আগেই ভেগেছে?' বললেন ফিল ইভান্স।

'অত গবেষণা করার সময় নেই। চলুন, আমরা তো ভাগি।'

বিনা দ্বিধায় পলাতকরা দড়ি ধরে সর সর করে নেমে এলেন মাটিতে।

সে কী আনন্দ দুজনের! যেন কত যুগ পরে মাটির সঙ্গে ছোঁয়া লাগল পদযুগলের। আর তো শূন্য পথে খেলনা হয়ে উড়তে হবে না!

আনন্দ ঈষৎ স্তিমিত হতেই দুজনে তাকালেন পাহাড়ি নদী যেদিক থেকে নেমে আসছে—সেইদিকে। আচম্বিতে একটা ছায়ামূর্তি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সামনে। নিগ্রো ক্রাইকোলিন। মনিবদের মতের তোয়াক্কা না রেখেই সে পলায়নের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। একাই নেমে এসেছে বিজন দ্বীপে। মাটির মানুষ মাটি ছাড়া কি থাকতে পারে? বকাঝকা করবার তখন সময় নেই। আঙ্কল প্রুডেন্ট এগোলেন দ্বীপের মধ্যে মাথা গোঁজবার মত আশ্রয়ের অন্বেষণে। বাধা দিলেন ফিল ইভান্স।

বললেন—'আঙ্কল প্রুডেন্ট, আমরা আর রোবারের খাঁচায় বন্দী নই। খাঁচায় পোরার আক্কেলসেলামী তাকে অবশ্য দিতে হবে এক্ষুণি জীবন দিয়ে। তবে কি জানেন ফের যদি লোকটা পণ করে আমাদের খাঁচায় পোরার—'

'তার পণের নিকুচি করেছে—'

আঙ্কল প্রুডেন্টের কথা শেষ হল না।

আচমকা হই চই শোনা গেল অ্যালবেট্রসের ডেকে। টনক নড়েছে রোবারের বন্দীরা যে সটকান দিয়েছে—জানাজানি হয়ে গেছে নিশ্চয়।

'এদিকে আসুন। এদিকে আসুন!' চীৎকার শোনা গেল আর্তকণ্ঠে। রাতের পাহারাদার বোধহয়। মুখের পুঁটলি সরিয়ে ফেলে চেঁচাচ্ছে। দুপদাপ করে অনেকগুলো পদশব্দ ছুটে গেল ডেকের ওপর! পর মুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল সার্চলাইটের বৃত্তাকার আলোয় উদ্ভাসিত হল দ্বীপের অনেকখানি এলাকা।

'ঐতো! ঐতো!' চেঁচিয়ে উঠলেন টম টার্নার। পলাতকদের দেখতে পেয়েছেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হুকুমজারী করলেন রোবার। কমে এল ফর-ফর শব্দটা। খাড়াই প্রপেলারের গতি কমিয়ে নীচে নামছে অ্যালবেট্রস। নোঙরের দড়ি টেনে তোলা হচ্ছে ওপরে!

ঠিক সেই সময়ে সব শব্দ ছাপিয়ে উঠল ফিল ইভান্সের কণ্ঠ:

'ইঞ্জিনীয়ার রোবার। কথা দিন আমাদের ঘাঁটাবেন না। মুক্তি দিয়ে যান দ্বীপের মাটিতে!'

'না! না! কক্‌খনো না! হুংকার দিলেন রোবার এবং সেই সঙ্গে গুড়ুম করে ছুটে এল বন্দুকের গুলি—ফিল ইভান্সের কাঁধের চামড়া উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল তপ্ত বুলেটটা।

'তবে রে জানোয়ার!' বাঘের মত গর্জন করে ধেয়ে গেলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট —হাতে তাঁর উন্মুক্ত ছুরিকা। ওঁর লক্ষ্য পাথরের ফাঁকে আটকানো নোঙরে বাঁধা দড়ি। এদিকে মাথার ওপরে নেমে এসেছে এরোনফ—আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট বাকী।

ছুরির কয়েক কোপে দ্বিখণ্ডিত হল রজ্জু। জোর হাওয়ার টানে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের দিকে ভেসে গেল অ্যালবেট্রস।

(২০) অ্যালবেট্রসের ধ্বংসাবশেষ

রাত তখন বারোটা বেজে বিশ মিনিট। পাঁচ ছ'বার বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল অ্যালবেট্রসের ডেকে। চাকরসহ দুই বেলুনিস্ট গা বাঁচালেন পাথরের আড়ালে বসে পড়ে। আর কোন ভয় নেই। এবার ওরা নিরাপদ।

পিট আয়ল্যাণ্ড থেকে দূরে সরে যেতে যেতে তেরছা ভাবে তিন হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। ওঠার দরকার ছিল। নইলে সমুদ্রে আছড়ে পড়ত যন্ত্রযান।

রাতের পাহারাদারের চীৎকার শুনে ছুটে গিয়েছিলেন রোবার এবং টম টার্নার। হাত-পায়ের বাঁধন খোলা হতেই টম টার্নার দৌড়েছিলেন পেছনের কেবিনে। কেবিন ফাঁকা। তাপাজে ছুটল ফ্রাইকোলিনের কেবিনে। সে-কেবিনও ফাঁকা!

কয়েদীরা পলাতক হয়েছে দেখে রাগে ফেটে পড়লেন রোবার। পলায়ন মানেই তাঁর গুপ্ততত্ত্ব ফাঁস হয়ে যাওয়া। ডেক থেকে চিঠি ফেলা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হন নি তিনি। অত উঁচু থেকে অতটুকু চিঠি কোথায় গিয়ে পড়বে, তার কি ঠিক আছে? কিন্তু এখন যা ঘটল—!

কিছুক্ষণ পরে সামলে নিলেন রোবার। বললেন—'পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধনরা! পিট আয়ল্যাণ্ড থেকে বেরোনো অত সোজা নয়। আমি ফিরব দু'একদিনের মধ্যে। অ্যালবেট্রসের ডেকে আবার তোলবার পর—'

কথাটা ঠিক। পলাতকদের অবস্থা সঙীন হবে শীগগিরই। প্রপেলার সারানো হলেই ফিরে আসবে অ্যালবেট্রস। তারপর ?

কিন্তু প্রপেলার সারিয়ে ফিরে আসতে আসতে দিন গড়িয়ে যাবে। এদিকে যেভাবে ভেসে চলেছে যন্ত্রযান—ভোরের আলোয় পিট আয়ল্যাণ্ডকে আর চোখেও দেখা যাবে না। অথচ মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যেই ঘটবে প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ! খোলের গায়ে লাগানো ডিনামাইট ফাটবে টর্পেডোর মত—শূন্য পথেই ধ্বংস করবে যন্ত্রযানকে।

ইঞ্জিনীয়ার বললেন—'টম, সব কটা আলো জেলে দাও।'

'জ্বালছি !'

'ডাকো সবাইকে।'

'ডাকছি।'

বৃথা সময় নষ্ট করে কি লাভ ? ভোরের জন্যে অপেক্ষা না করে ভোরের আগেই সেরে ফেলা যাক প্রপেলার বসানোর কাজ! শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদের আর কোন প্রশ্নই নেই এখন। রোবারের মনের জ্বালা যেন ভাগ করে নিল তাঁর সব সাগরেদই! লাগাও প্রপেলার! চালাও হাত! পাকড়াও পলাতকদের!

সামনের চালক-প্রপেলার চালু হয়ে গেলেই অ্যালবেট্রস মুখ ফেরাবে দ্বীপের দিকে। আর একটা নোঙর আটকাবে পাথরের খাঁজে। তারপর মজাটা টের পাইয়ে দেওয়া হবে বাছাধনদের!

এক্স-আয়ল্যাণ্ডে যাওয়া হবে তার পরে—আগে নয়।

কিন্তু হু-হু করে বেলুনের মত অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে অ্যালবেট্রস। দ্বীপে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স—আহারে! বিস্ফোরণের দৃশ্যটাও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে না!

রোবারের মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায়। এরকম বেগে ভেসে গেলে মুস্কিল হবে ফেরবার সময়ে। ভাবলেন, সমুদ্রের কাছাকাছি নামলে হয়ত হাওয়ার টান কম হবে। এই ভেবে, অ্যালবেট্রসকে নামিয়ে আনলেন সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র তিনশ ফুট ওপরে! আকাশ থেকে আলো ঝলমলে মূর্তিমান আতঙ্ক স্বরূপ অ্যালবেট্রসকে সে রাতে অমন ভাবে নামতে দেখলে সমুদ্রগামী যে কোনো জাহাজ আঁৎকে উঠত!

নীচে নামবার পর রোবার বুঝলেন, ভুল হয়েছে। হাওয়ার জোর কমল না—বরং বাড়ল। আবার যন্ত্রযানকে টেনে তুললেন ওপরে। আবার নামলেন। বার কয়েক এক্সপেরিমেণ্ট করে যখন দেখলেন, কিছুতেই গতিবেগ কমানো যাচ্ছে না—তখন সটান উঠে গেলেন দশ হাজার ফুট ওপরে। স্থির না থাকলেও

গতিবেগ কমে গেল অত উঁচুতে। ভোরের আলোয় নিশ্চয় ওপর থেকে পিট আয়ল্যাণ্ডকে দেখতে পাওয়া যাবে এবং ফিরতে অসুবিধে হবে না।

দ্বীপের জংলীরা পলাতকদের পাকড়াও করেছে কিনা, তা নিয়ে মোটেই ভাবছিলেন না রোবার। দ্বীপে জংলী আছে কিনা, জানা নেই। থাকলেও ফিরে আসার পর অ্যালবেট্রস যখন তার শক্তির নমুনা দেখাবে—জংলীর দল পালাবার পথ পাবে না। পলাতকদের কয়েদ করবেনই রোবার—এক্স আয়ল্যাণ্ডে একবার নিয়ে গিয়ে ফেলবার পর পালানোর সাধ জন্মের মত ঘুচে যাবে!

রাত একটার সময়ে প্রপেলারের বাকী কাজ শেষ হল। এখন শুধু পাখাগুলোকে যথাস্থানে বসিয়ে এঁটে দিলেই ফের রওনা হওয়া যাবে ফেলে আসা দ্বীপের দিকে। যেতে যেতে পেছনের প্রপেলার মেরামত করা যাবে'খন।

পলতেটার কি হল? পরিত্যক্ত কেবিনে তো পট-পট করে জলেই চলেছে পলতে! তিনভাগের একভাগ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গুট গুট করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এগিয়ে চলেছে ডিনামাইটের দিকে!

মেরামতি নিয়ে তন্ময় হয়ে না থাকলে হয়ত অ্যালবেট্রসের মুষ্টিমেয় কর্মচারীদের একজনের কানেও পট-পট শব্দটা যেত! নয়ত বারুদ পোড়া বিশ্রী গন্ধও নাকে আসত! টম টার্নারকে জানালেই খোঁজ-খোঁজ পড়ে যেত তখুনি! কেবিনের বাক্স থেকে জলন্ত পলতে সমেত বিধ্বংসী যন্ত্রটিও বেরিয়ে পড়ত এবং যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত অ্যালবেট্রসের মত পরমাশ্চর্য মেশিনকে ধ্বংসের কবল থেকে ফিরিয়ে আনার!

কিন্তু কাজ নিয়ে তন্ময় হয়ে রইল সবাই। মাত্র বিশ গজ দূরে কেবিনের মধ্যে মৃদু শব্দে পুড়ে চলল পলতে। কেউ এল না কেবিনের দিকে। আসার দরকার পড়লে তো আসবে?

রোবার নিজেই হাত লাগিয়েছেন। তেলকালি মেখে নিখুঁত ভাবে কাজ করে চলেছেন। রোবার শুধু ভালো ইঞ্জিনীয়ার নন, ভালো মেকানিক-ও বটে। রাত, ফর্সা হওয়ার আগেই ফেরাতে হবে অ্যালবেট্রসকে—এছাড়া আর কোনো কথা তাঁর মনে নেই। পলাতকদের ফের কয়েদ করতেই হবে। নইলে যে বিশ্বশুদ্ধ জেনে যাবে তাঁর গোপন কথা! খুঁজে পেতে এক্স আয়ল্যাণ্ডের হদিশও বের করে ফেলবে। সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় অ্যালবেট্রস কর্মীরা যা সৃষ্টি করেছে—অতিমানবিক অথচ শান্তিপূর্ণ সেই জীবনধারা ছারখার হয়ে যাবে।

রাত সোয়া একটার সময়ে রোবারের কাছে এসে বললেন টম টার্নার—'হাওয়া পড়ছে মনে হচ্ছে।'

'ব্যারোমিটার কি বলে?' আকাশপানে চেয়ে বললেন রোবার।

'যেখানে ছিল সেখানেই আছে। মেঘ জমছে পায়ের তলায়।'

'বৃষ্টি হতে পারে। হোক না বৃষ্টি—আমরা থাকছি বৃষ্টির ওপরে। কাজ চলুক।'

'বৃষ্টি হলেও মুশলধারে হবে না। মেঘের চেহারা সেরকম নয়। বাতাসও মনে হচ্ছে একদম থেমে গেছে।'

'থামুক। এখন আর নীচে নামব না। আগে চালু করি প্রপেলার—তারপর যা খুশী করা যাবে'খন।'

রাত দুটোর পরেই শেষ হল কাজ। প্রপেলার যথাস্থানে বসেছে। কারেণ্ট এসেছে। পাখা মোটামুটি বেগে ঘুরছে। মুখ ফিরিয়ে চ্যাথাম দ্বীপের দিকে উড়ে চলল অ্যালবেট্রস।

রোবার বললেন—'টম, আড়াই ঘণ্টা হল হাওয়ার টানে ভেসে এসেছি। এর মধ্যে হাওয়া দিক পালটায় নি। তার মানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছে যাবো।'

'ঠিক বলছেন। সেকেণ্ডে চল্লিশ ফুট বেগে যাচ্ছি যখন, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছে যাবো দ্বীপে।'

'রাত থাকতেই পৌঁছোনো চাই। যদি পারি, অ্যালবেট্রসকে মাটিতেও নামাবো। ওরা ভাবতেও পারবে না আমরা ফিরে আসছি—দু'একদিন যদি থাকতেও হয় দ্বীপে—'

'থাকব।' জংলীদের সঙ্গে লড়বার দরকার হলে—'

'লড়ে যাবো!' বললেন রোবার। 'লড়াইটা হবে অবশ্য অ্যালবেট্রসের খাতিরে'।

কর্মচারীরা আদেশের প্রতীক্ষায় বসেছিল। রোবার তাদের কাছে গিয়ে বললেন—'এখনো বিশ্রাম নয়। যতক্ষণ না ভোর হচ্ছে—কারও হাতের কামাই নেই।'

তারাও তো তাই চায়। সামনের প্রপেলার মেরামত হয়েছে এবার হোক পেছনের প্রপেলার। এর অবস্থাও শোচনীয়। ঝড়ের উৎপাতে পাখাগুলো দুমড়ে বেঁকে গেছে।

কিন্তু প্রপেলার খুলে ডেকে নামাতে গেলে মিনিট কয়েকের জন্যে যন্ত্রযানকে থামাতে হবে; পেছন দিকেও হটতে হবে। তাই হল। উল্টোদিকে ঘুরতে লাগল ইঞ্জিন। পিছু হটছে অ্যালবেট্রস। এমন সময়ে টম টার্নারের নাকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ভেসে এল।

বারুদ পোড়া গন্ধ! বাক্সর মধ্যে পলতে জ্বলছে…ফাঁক দিয়ে খানিকটা

গ্যাস বেরিয়ে এসেছে কেবিনে…কেবিন থেকে বাইরে…উড়োজাহাজ উল্টো-দিকে চলতেই হাওয়ায় ভেসে এসেছে গন্ধ !

বাতাসে নাক তুলে শুঁকলেন টম টার্নার। হাঁক দিলেন তক্ষুনি—'কে, আছো ?…'

'কি হ'ল ?' শুধোলেন রোবার।

'গন্ধ পাচ্ছেন না ? বারুদ পোড়া গন্ধ ?'

'তাই তো বটে !'

'গন্ধ আসছে কিন্তু পলাতকদের কেবিন থেকে।'

'ঠিক, ঠিক,—'

'স্কাউণ্ড্রেলগুলো আগুন ধরিয়ে যায় নি তো ?'

'তার চেয়ে গুরুতর যদি কিছু হয় ?' বলতে বলতে লাফিয়ে উঠলেন রোবার, 'ভাঙো দরজা !'

সবে এক পা এগিয়েছেন মেট, এমন সময়ে বুক-কাঁপানো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দিকবিদিক—থর থর করে উঠল অ্যালবেট্রস। কেবিন টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল শূন্যে। আলো নিভে গেল। সহসা বন্ধ হল ইলেকট্রিক কারেণ্ট অন্ধকার…অন্ধকার…কালির মত কালো অন্ধকার। বেশীর ভাগ খাড়াই প্রপেলার বন্ধ হয়ে এসেছে, গলুইয়ের দিকে ঘুরছে সামান্য কয়েকটা।

ঠিক তখনি দুটুকরো হয়ে গেল অ্যালবেট্রসের খোল—প্রথম ডেক হাউসের পেছন থেকেই ভাঙন ধরল—সামনের চালক-প্রপেলারের ইঞ্জিন থাকে এইখানে—ডেকের বাকী অংশ খসে পড়ল শূন্যে।

তৎক্ষণাৎ বাকী কটা খাড়াই প্রপেলারও থেমে গেল। হু-হু করে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে পড়তে লাগল অ্যালবেট্রস।

আটজন মানুষ আঁকড়ে রইল খসে পড়া যন্ত্রযানের ধ্বংসাবশেষ…যত জোরে পড়া উচিত, তার চেয়েও ভীষণ বেগে গোঁৎ খেয়ে নামছে ভাঙা অ্যালবেট্রস, কেননা সামনের চালক-প্রপেলার সোজা নীচের দিকে মুখ করে ঘুরছে বন-বন করে। অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষকে সটান চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দশ হাজার ফুট নীচে !

কিন্তু আশ্চর্য কঠিন রোবারের স্নায়ু। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে বিকার নেই তাঁর চিত্তে, কাঁপুনি নেই নার্ভে ! অসাধারণ মানুষ সন্দেহ নেই ! ভাঙা ডেক হাউস বেয়ে তরতর করে উঠে গিয়ে লিভার চেপে ধরলেন—সঙ্গে সঙ্গে উল্টো-দিকে ঘুরতে লাগল প্রপেলারের পাখা। অর্থাৎ ভাঙা অংশকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে চাইল প্রপেলার !

কিন্তু একটা প্রপেলার দিয়ে পতন রোধ করা যায় না, শূন্যে ভাসাও যায় না।

তবে পতনের বেগ কমে এল বইকি। মাধ্যাকর্ষণের টানে পতনশীল বস্তুর গতিবেগ যে হারে বেড়ে চলে, সেরকমই কিছুই ঘটল না। দশহাজার ফুট ওপর থেকে উল্কার মত পড়তে শুরু করলে দম আটকেই শূন্যপথে মৃত্যু হত আটজনের। অত জোরে নামলে নিঃশ্বেস নেওয়া সম্ভব হয় না।

বিস্ফোরণের আশি সেকেণ্ড পরে অ্যালবেট্রসের শেষ ভগ্নাবশেষটিও আছড়ে পড়ল ঢেউয়ের মাথায়!

(২১) আবার ইনষ্টিটিউটে

ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের তুমুল কথাকাটাকাটির পরের দিন, জেরোষ্ট জুন সকালবেলা সারা ফিলাডেলফিয়া শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়—সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দিল, তা লিখে বোঝানো যায় না—বরং কল্পনা করা অনেক সহজ।

ভোর থেকেই মুখে মুখে শোনা গেল শুধু এক গল্প! রাস্তাঘাটে দোকান বাজারে গুলতানি চলল গতরাতের যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা নিয়ে। এরকম কেলেংকারী যে শেষ পর্যন্ত ওয়েলডন ইনষ্টিউটে ঘটবে ভাবা যায় নি। রোবার নামে একটা লোক নাকি উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল মিটিংয়ে; নিজেকে ইঞ্জিনীয়ার বলে জাহির করেছিল; অথচ কেউ তার পরিচয় জানে না; নিবাস কোথায়, দেশ কোথায়, মাতৃভাষা কি, বাপ ঠাকুর্দার নাম কি—কেউ বলতে পারল না; অজ্ঞাত পরিচয় লোকটা দুম করে মিটিংঘরে ঢুকে নাকি যাচ্ছেতাই অপমান করে গেছে বেলুনিস্টদের, টিটকিরি দিয়েছে বেলুনবিহারীদের, খোঁচা মেরেছে, বাতাসের চাইতে ভারী মেশিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে; লোকটার কথা তো নয় যেন হুল ফুটোনো। শেষকালে আর সইতে পারেনি বেলুনিস্টরা—তেড়ে মারতে গিয়েছে দাম্ভিক হামবড়া ঠিকুজী কুষ্ঠিহীন লোকটাকে।

সমস্ত কাহিনীটা বেশ রঙ চড়িয়ে বলা হল বন্ধুবান্ধদের। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এক কাহিনী সহস্র কাহিনী হয়ে খেপিয়ে তুলল ফিলাডেলফিয়ার প্রতিটি মানুষকে। টি-টি পড়ে গেল শহরময়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কোত্থেকে কে এসে হুট করে ক্লাবে ঢুকে বুকে বসে দাড়ি উপড়ে গেল তার কোনো বিহিত হল না? এত বড় স্পর্ধা আগন্তুকের বেলুন ক্লাবে বসেই বেলুন আর বেলুনিস্টদের পিণ্ডি চটকায়?

হট্টগোল তুলকালাম অবস্থায় পৌঁছালো তেরোই জুন সন্ধ্যায় যখন জানা গেল ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী নাকি আগের দিন ক্লাব থেকে বাড়ী ফেরেননি!

সেকী কথা! বাড়ী না ফেরার কারণটা নেহাতই অকস্মাৎ? না প্ল্যানমাফিক? অত গবেষণার দরকার কী? তেড়ে ফুঁড়ে বললে একদল। বাড়ীতে না ফিরলেও মিটিংয়ে আসবেনই, আগের রাতে মিটিংয়ের কেলেংকারী নিয়েপরের রাতেও তো আলোচনা হবে। প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী না এসে থাকতে পারবেন না।

আরো অবাক কাণ্ড, পেনসিলভানিয়ার দুই বিখ্যাত বেলুনিস্ট নিজেরাই শুধু অন্তর্হিত হননি—সেই সঙ্গে যেন বেমালুম বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে ভৃত্য ফ্রাইকোলিন। মনিব অদৃশ্য, চাকরও অদৃশ্য। সুতরাং রাতারাতি নামী পুরুষ হয়ে গেল ফ্রাইকোলিন। একজন নিগ্রোকে নিয়ে ইতিপূর্বে এভাবে আলোচনা ককৃখনো হয় নি।

পরের দিনও কোন খবর এল না। মালিক এবং চাকর—দুজনেই নিখোঁজ। উদ্বেগ চরমে উঠল। উত্তেজনা বেড়ে চলল। কাতারে কাতারে লোক ছেঁকে ধরল ডাক ও তার বিভাগ খবরের আশায়। কিন্তু খবর পাওয়া গেল না।

কিন্তু গেলেন কোথায় তাঁরা? ওয়েলডন ইনস্টিটিউট মিটিং কক্ষ থেকে দুজন-কেই উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদ করতে করতে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। দাসানুদাস ফ্রাইকোলিন যথারীতি লেগেছিল পেছনে আঠার মত। এমনকি শাকাহারভোজী জেম চিপও দুই কর্তার সঙ্গে করমর্দন করে যাবার সময়ে বলে গেছেন—কাল দেখা হবে! তার পরেই তিন জনকে দেখা গেছে ওয়ালনাট স্ট্রীট বরাবর ফেয়ারমণ্ট পার্কের দিকে পা চালাতে।

চিনি-উৎপাদক উইলিয়াম ফোবর্সও হাত মিলিয়েছিলেন ফিল ইভান্সের সঙ্গে। যাবার সময়ে বলেছিলেন ইভান্স 'বিদায়! বিদায়!'

আঙ্কল প্রুডেন্টের আকস্মিক অন্তর্ধানে খুবই ভেঙে পড়েছে ফোবর্স-য়ের দুই-অনিন্দ্যাসুন্দরী কন্যা—মিস ডল এবং মিস ম্যাট।

তিনদিন গেল, চারদিন গেল, পঞ্চম দিনও অতিবাহিত হল, ফুরিয়ে গেল ষষ্ঠদিন—পূর্ণ হল একটা সপ্তাহ। তবুও কানাঘুসো পর্যন্ত শোনা গেল না তাঁদের গোপন ঠিকানা নিয়ে। তিন-তিনটা জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল না তন্নতন্ন করে খোঁজার পরেও। কর্পূর যেমন চিহ্ন না রেখে উড়ে যায়—এঁরাও যেন সেইভাবেই উবে গেছেন। পার্ক খোঁজা হল, এমনকি ঝোপঝাড়ের ভেতর পর্যন্ত দেখা হল, গাছগাছালির মগডাল পর্যন্ত তল্লাস করা হল—কিন্তু নেই! কোথাও নেই। খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে

গেল ব্লাডহাউণ্ডের মত হুঁদে গোয়েন্দারা। সবার কাছ থেকেই এল একই রিপোর্ট—নেই! নেই! নেই! অথচ পার্কের ঘাস অদ্ভুতভাবে দুমড়ে গেছে! প্রচণ্ড চাপে ঘাস যেন নুয়ে পড়েছে—আর মাথা তুলতে পারছে না! দেখে সন্দিগ্ধ হল রহস্যসন্ধানীরা—কিন্তু সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কারো মাথায় এল না। ফাঁকা মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে ঠিকই, যেন তিন মূর্তিকে গায়ের জোরে কাবু করেছে একদল নিশাচর বদমাস। কিন্তু তারপর আর কোনো চিহ্ন নেই! ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো!

পুলিশ আদাজল খেয়ে লেগে গেল। যথারীতি শম্বুক গতিতে বদমাসদের ধরে ধরে জেরা করে করে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়ল। কোথাও কোন সূত্র না পেয়ে নদীর জল ঘোলা করে জাল ফেলল, ডুবুরী নাবালো, তলা থেকে আগাছা আবর্জনা পর্যন্ত তুলে আনল। একটা লাভ অবশ্য হল। বহুদিন নদীর তলা সাফ হয়নি—এই হিড়িকে তা হয়ে গেল। কিন্তু ভৃত্যসহ বেলুনিস্ট দুজন নিপাত্তাই রয়ে গেলেন।

এরপর শরণ নেওয়া হল খবরের কাগজের। যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের দাপট প্রচণ্ড। বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য অনেক। তাই সবশ্রেণীর কাগজেই ফলাও করে ছাপা হল বিজ্ঞাপন, নিবন্ধ এবং বিজ্ঞপ্তি। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের নিজস্ব দৈনিক 'ডেলী নিগ্রো' কাগজে ফ্রাইকোলিনের প্রকাণ্ড ছবি ছাপা হল। পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হল। তিনজনের এতটুকু হদিশ বা সূত্র পুলিশকে যে দেবে—পাঁচ হাজার ডলার সে পাবে। মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে গেল—পাঁচ হাজার ডলার! পাঁচ হাজার ডলার!

কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের তহবিলেই জমা রইল—নেবার মত লোক কেউ এল না!

নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ! ফিলাডেলফিয়া-নিবাসী আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের ছায়ার সন্ধান পর্যন্ত আবিষ্কার করার সাধ্য কারো নেই!

মুস্কিল হল ক্লাব মেম্বারদের। ক্লাবের মোড়ল হাজির না থাকলে ক্লাব চলবে কি করে? অধিবেশন তো স্থগিত রইলই—গো-অ্যাহেড বেলুনের প্রস্তুতিপর্বও ধামা চাপা পড়ল। যাঁর অর্থবল এবং বুদ্ধিবলে বেলুন নিয়ে এত মাতামাতি, তিনিই যদি টুপ করে অদৃশ্য হয়ে যান—তাঁর কাজ করবে কে? থাক সব শিকেয় তোলা!

এর ঠিক পরেই খবর এল—আকাশ রহস্যকে আবার দেখা গিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে আকাশের বিস্ময় নিয়ে কম হই-চই হয়নি। কিছুদিন সব চুপচাপ ছিল। আবার নানান অঞ্চল থেকে শোনা গেল তার শব্দ, দেখা গেল তার

পিলে চমকানো কিম্ভূত চেহারা। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারল না আকাশের রহস্যের সঙ্গে নিরুদ্দেশ তিনজনের একটা কিছু সম্পর্ক আছে। কল্পনা করবে কি করে? কড়া ডোজের উদ্ভট কল্পনা শক্তি না থাকলে ছুটো পৃথক ঘটনার মধ্যে কি যোগসূত্র রচনা সম্ভব?

গ্রহাণু হোক কি, শূন্যে ভাসমান মেশিন হোক, কি আকাশ দানব হোক —জিনিসটার আকার প্রকার নিয়ে তারিফ শোনা গেল লক্ষ লোকের মুখে। যেদিন তিনজন আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হলেন, সেইদিনই ভোরের দিকে সর্বপ্রথম আকাশের আতংক বিশাল চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হল ওটাবা আর কুইবেক-য়ের মাঝামাঝি অঞ্চলে, কানাডায়। তারপরেই দূর প্রতীচ্যের সমতল ভূমির ওপর ছুটন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়ে উধাও হল রহস্যজনক যন্ত্রযান।

সেইদিনই পণ্ডিতদের সব সন্দেহ দূর হল। আকাশরহস্য আসলে একটা ফ্লাইং মেশিন—প্রাকৃতিক বিস্ময় মোটেই নয়। বাতাসের চাইতে ভারী মেশিনে আকাশবিহার তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ন। উড়ুক্কুযানের আবিষ্কারক অজ্ঞাতনামা থাকতে চান, এ-কথাও তো বলা যায় না! অতই যদি আত্মগোপনের ইচ্ছে তো দূর প্রতীচ্যে ট্রেন ভর্তি লোকের সামনে উড়ন্ত মেশিনের সার্কাস দেখানোর কি দরকার ছিল? কিন্তু কোন্ যান্ত্রিক শক্তিবলে উড়ন্তযান আকাশে উড়ছে, অথবা কি ধরনের ইঞ্জিন তিনি যন্ত্রযানে লাগিয়েছেন—কিছুই জানা গেল না। জানা না গেলেও, যন্ত্রযানের অসাধারণ গতিবেগ সম্পর্কে দ্বিমত রইল না কারো। কেননা, মাত্র দিনকয়েক পরেই খবর এল চীন সাম্রাজ্যের ওপর টহল দিয়েছে ফ্লাইং মেশিন, তীব্রবেগে উড়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে, রাশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ওপরেও ভেসে গেছে তার বিশাল ছায়া।

আশ্চর্য যন্ত্রযানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারকটি তাহলে কে? যাঁর আবিষ্কৃত প্রচণ্ড ক্ষমতাবান মেশিন নক্ষত্রের মত উড়ে চলে, যাঁর আকাশবিহারকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের, মহাসাগরের বিশালতা দেখেও যিনি ডরান না, হাওয়ার সমুদ্রে যিনি একচ্ছত্র অধিপতিস্বরূপ বিজয়কেতন উড়িয়েছেন দিকে দিকে —কে তিনি? ইনিই কি সেই দুর্মুখ দুঃসাহসী রোবার যিনি ক'দিন আগে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে ঢুকে ক্লাবসদস্যদের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর ফ্লাইং মেশিনের তত্ত্ব, ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেছিলেন কলে চালিত বেলুনের অসম্ভব কল্পনাকে? কারও কারও মগজের কন্দরে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল সম্ভাবনাটা কিন্তু সেই রোবারই যে বেলুনিস্টদের গায়েব করে দেশ দেশান্তরের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—এই অসম্ভব সম্ভাবনাটি তাঁদের মগজেও এল না।

তেরোই জুলাই সকাল এগারোটা সাঁইত্রিশ মিনিট পর্যন্ত নিরেট রহস্যে ছুঁচ ফোটানোর ক্ষমতাও কারো হল না। ঐ দিন ঐ সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল ফ্রান্স থেকে। কি লেখা ছিল টেলিগ্রামে? হুবহু সেই লেখাটা যা আকাশে বসে লিখেছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, নস্যির ডিবেতে ভরে প্যারিসের রাস্তায় নিক্ষেপ করেছিলেন।

বটে! অপহারক তাহলে রোবার স্বয়ং! এই মতলব নিয়েই ভদ্রলোক ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে বেলুনিস্টদের হস্ত নস্যাৎ করেছিলেন বেলুন-ক্লাবে বসেই। বুকের পাটা তো তাঁর কম নয়? ইনিই ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের দুই কর্ণধারকে এবং পরিচায়ক ফ্রাইকোলিনকে নিয়ে আকাশচারী হয়েছেন! হয়ত আর কোনোদিনই ফিরিয়ে দেবেন না অপহৃত মানুষ ক'জনকে, অথবা হয়ত সেইদিনই তাঁদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে যেদিন রোবার-আবিষ্কৃত মেশিনের সমকক্ষ মেশিন নির্মাণ করবেন অন্য আবিষ্কারকরা।

সেকী উত্তেজনা! উদ্বেগ! উৎকণ্ঠা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যরা—টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের নামেই। দশ মিনিটও গেল না—সারা ফিলাডেলফিয়া খবরটা জেনে গেল টেলিফোন মারফৎ। এক ঘণ্টার মধ্যে মাকড়শার জালের মত অগুন্তি ইলেকট্রিক তারবার্তা মারফৎ সংবাদটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সারা আমেরিকায়।

খবর শুনেই তেড়ে উঠল একদল লোক—যত্তো সব বাজে কথা! ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পায়নি! তাল ঠুকে বললে আরেক দল—দেখুন দিকি কারবারটা! অতবড় একটা মেশিন ফেয়ারমণ্ট পার্কে নামল, অথচ কেউ দেখতে পেল না? আরে মশাই, ওরকম আকাশদানো আকাশে দেখা দিলে শুধু ফিলাডেলফিয়া কেন, গোটা পেনসিলভানিয়ার টনক নড়ে উঠত। সংক্ষেপে, খবরটা কারো বিশ্বাস হল না।

না হোক। অবিশ্বাসী লোকরা সন্দেহ তো করবেই। কিন্তু তার্কিকদের মুখ আমসি হল অচিরে। সাতদিন পরে ফরাসি ডাক-জাহাজ নরম্যাণ্ড নিউইয়র্কে পৌঁছে দিল বিখ্যাত সেই নস্যির ডিবে। দ্রুতগামী ট্রেন ঐতিহাসিক নস্যাধারকে নিয়ে এল ফিলাডেলফিয়ায়।

আঙ্কল প্রুডেন্টের নস্যির ডিবেই বটে। সেদিন কিন্তু ডিবের নস্যি খুব উপকারে লাগত জেম চিপ-য়ের—কেননা ডিবে দেখেই ভদ্রলোক মূর্চ্ছা গেলেন। শক্ তো লাগবেই! অতীতে কতবার এই ডিবের নস্যিই চাঙা করেছে তাঁকে গরম-গরম কথা কাটাকাটির সময়ে। নস্যি নিয়েছেন বদ্যাতার নিদর্শনে! এক পলকে ডিবে দেখে বিহ্বল হল মিস ডল, মিস ম্যাট; অভিভূত

হলেন ফোবর্স, মিলনর, ফিল এবং আরো অনেকে। শুধু নশ্বির ভিবে নয়,. চিরকুটের লেখা হস্তাক্ষরটিও যে প্রেসিডেন্টের !

হতাশ হয়ে বিলাপ শুরু করলেন সদস্যরা। দুই হাত শূন্যে বাড়িয়ে এমন হা-হুতাশ আরম্ভ করলেন যে শুনলে পাথরের প্রাণ গলে যেত— রোবার তো কোন ছার !

নায়গারা গিরি প্রপাত কোম্পানীর মোটা অংশীদার ছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। কোম্পানীর অচলাবস্থা দেখা দিল তাঁর অবর্তমানে। মুলতুবী রইল ব্যবসা-বাণিজ্য ! ম্যানেজারকে হারিয়ে হুইলটন ওয়াচ কোম্পানিও সিদ্ধান্ত নিল কারখানায় তালা ঝোলানোর।

কিন্তু রোবারের আর কোনো খবর এল না। জুলাই গেল, আগস্ট গেল— কোনো খবর নেই। তবে কি ইকারাসের মত মেশিন সমেত ভেঙে পড়েছেন রোবার ?

সেপ্টেম্বরের প্রথম সাতাশটা দিন গেল এই রকম বর্ণনাতীত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে। আঠাশ তারিখে একটা অদ্ভুত গুজব ছড়িয়ে পড়ল গোটা ফিলাডেল-ফিয়ায়। বিকেল বেলা নাকি গজেন্দ্র গমনে প্রেসিডেন্টের গৃহে ফিরে এসেছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। অদ্ভুত গুজব সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত হল—গুজবটা সত্যি। মানে, সত্যি সত্যিই গুটি গুটি বাড়ী ফিরেছেন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার ! কেউ তা বিশ্বাস করল না ! গুজবে কান দিল না !

শেষ পর্যন্ত অবশ্য করতেই হল। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রমাণকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে—বিখ্যাত বেলুনিস্টদের—এমন কি ভৃত্য ফ্রাইকোলিনকেও—ছায়া নয় ! নিরেট কায়া—রক্তমাংসের দেহ ! প্রথমে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে গেলেন ক্লাব সদস্যরা, তারপর এলেন বন্ধু-বান্ধবরা, সবশেষে পিলপিল করে জনতা ঢুকে পড়ল প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে। লেটুস সেদ্ধ খেতে বসেছিলেন জেম চিপ—খাবার ফেলে দৌড়ে এলেন। এলেন দুই কন্যাকে দুই পাশে নিয়ে ফোবর্স। একী রহস্য ! একী তাজ্জব ব্যাপার ! আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স যে, হাজার হাজার অনুরাগীর স্বাগতম গুঁতো খেয়েও আস্ত রইলেন—এটাও কম তাজ্জব ব্যাপার নয় !

সেইদিনই সন্ধ্যায় মিটিং বসল ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে। এসে পর্যন্ত মুখে চাবী এঁটে রয়েছেন দুই বেলুনিস্ট, এমন কি মুখ-আলগা ফ্রাইকোলিনও বোবা হয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! সবই অদ্ভুত ! কোথায় ছিলেন, কি করে ফিরলেন, ইত্যাদি বৃত্তান্ত শোনবার আগ্রহে সদস্যরা ছটফটিয়ে মরছেন—তাঁরা

কিন্তু নির্বিকল্প নির্বিকার নিশ্চিন্ত নীরব! কতক্ষণ আর চুপ করে থাকবেন? মিটিংয়ে নিশ্চয় মুখে তুবড়ি ছোটাবেন। তাই তিলধারণের জায়গা রইল না সভায়।

সতীর্থ দুজন মুখে কুলুপ দিলেই যে আমাদেরও দিতে হবে, তা কি হয়? সাতাশে আর আঠাশে জুলাই রাত দুপুরে, কি-কি ঘটেছিল, সবই আমরা জানি। আমরা জানি ভানপিটেরা কিভাবে দড়ি বেয়ে দ্বীপে নেমেছিলেন, কিভাবে ফিল ইভান্স গুলিবিদ্ধ হতে হতে বেঁচে গিয়েছিলেন, দড়ি কাটতেই কিভাবে আলোক-উজ্জ্বল অ্যালবেট্রস ভেসে গিয়েছিল উত্তর পূর্ব দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলো, তারপর অন্ধকার গ্রাস করেছে সব কিছু।

আর ভয় কিসের? নির্ভর হলেন পলাতকরা। অ্যালবেট্রসের প্রপেলার এখনো ভেকে পড়ে। সুতরাং ঘণ্টা তিন চারের মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব নয়। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে ঘটবে বিস্ফোরণ। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কতকগুলো লাশ ছিটকে পড়বে সমুদ্রবক্ষে। ভাঙাচোরা অ্যালবেট্রস ভাসবে সাগরে, ভাসবে আটজনের প্রাণহীন দেহ। শেষ হবে প্রতিহিংসা নেওয়া।

অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা গেল না বেলুনিস্টদের অন্তরে। আইনগতভাবে প্রতিহিংসা নিচ্ছেন যখন, পরিতাপ হবে কেন? ফিল ইভান্সের কাঁধের ছাল উঠে গেছে—গুলি যদি বুকে লাগত?

কাজ হাসিল করে তিনজনে দ্বীপের ভেতরে গেলেন বাসিন্দাদের খোঁজে। জনা পঞ্চাশ দ্বীপবাসী দেখতে পাওয়া গেল পাহাড়ের আনাচে কানাচে। এদের জীবিকা মাছ ধরা। আকাশ থেকে দানবকে নামতে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে ছিল পাহাড়ে। বেলুনিস্টদের দেখে তারা দেবতার সম্মান জানাল। আকাশ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয় দেবলোক থেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন। সুতরাং বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়ে সেরা গৃহে আশ্রয় দেওয়া হল তাঁদের।

এরোনফ আর ফিরে আসেনি। নিশ্চয় ফুটিফাটা হয়ে উড়ে গিয়েছে মেঘলোকের মধ্যে। এখন থেকে রোবার আর তাঁর ভয়ংকর মেশিনকে আর ভয় পেতে হবে না। নিশ্চিন্ত হলেন প্রুডেন্ট এবং ইভান্স।

কিন্তু আমেরিকা ফেরার চিন্তা শুরু হল তখন থেকে। চ্যাথাম দ্বীপের ধার কাছ দিয়ে জাহাজ যায় কালেভদ্রে। পুরো আগস্ট হা-পিত্যেশ করে কাটল। মনে মনে ভেঙে পড়লেন সতীর্থ দুজন। এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচার বন্দী হলেন না তো?

তারপর একদিন জাহাজ এল চ্যাথাম দ্বীপে। পাঠকপাঠিকার মনে আছে নিশ্চয়, তাড়া-তাড়া নোট সব সময়ে পকেটে রাখতেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। সেই

টাকার জোরেই জায়গা করে নিলেন জাহাজে। পঞ্চাশজন ধীবর বিপুল বিদায় সম্বর্ধনা জানালো তাঁদের। দু সপ্তাহ পরে আঙ্কল প্রুডেন্ট ফিল ইভান্স এবং ফ্রাইকোলিন এসে পৌঁছলেন নিউজিল্যাণ্ড। অকল্যাণ্ড থেকে চেপে বসলেন ডাক জাহাজে। আবার টাকার ভেল্কি দেখিয়ে নামলেন সানফ্রান্সিসকোর মাটিতে। আমেরিকান ক্যাপ্টেন নোটের তাড়া হাতে পেয়েই খুশী হলেন—যাত্রীদের নামধাম নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তাই কাকপক্ষীকেও না জানিয়ে তিনজনে দ্রুতগামী ট্রেনে চেপে সাতাশে সেপ্টেম্বর পৌঁছোলেন ফিলাডেলফিয়ায়। পলাতকরা পলাতক হবার পর যা-যা ঘটেছিল এই হল তার সারাংশ এবং এই কাহিনীই শোনার জন্যে জরুরী মিটিং বসেছে ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটে—মঞ্চে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী।'

অথচ এঁদের এরকম প্রশান্ত বদন কস্মিনকালেও দেখা যায় নি। ধীর স্থির অবিচল অচঞ্চলভাবে বসে আছেন ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী—এ যে ভাবাও যায় না। মুখ দেখে মনেই হচ্ছে না বারোই জুন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তাঁরা—কল্পনাতীত অ্যাডভেঞ্চারে গা ভাসিয়ে ছিলেন এবং অসম্ভব আকাশযানে চেপে পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। সাড়ে তিন মাস পরে ফিরে এলেন—অথচ মুখচ্ছবি অতিশয় প্রশান্ত। যেন কিছুই হয় নি। যা ঘটেছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হর্ষধ্বনির প্রথম ঢেউটাও যেন স্রেফ মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল—দুজনের কেউই গায়ে মাখলেন না। আবেগে অভিভূত হলেন না। উচ্ছ্বাস স্তিমিত হতেই উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। টুপী হাতে নিয়ে বললেন :

'মাননীয় নাগরিকগণ! অধিবেশন শুরু হল।'

দারুণ হাততালি! মিটিং শুরু হওয়াটা অসাধারণ কিছু নয়, অসাধারণ হল আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সকে দিয়ে মিটিং শুরু করানো। সুতরাং লক্ষ বজ্রনির্ঘোষের মত করতালি নির্ঘোষ শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে।

উল্লাস না থামা পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। তারপর বললেন—"গত মিটিংয়ে আমাদের মধ্যে দারুণ প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল (হ্যাঁ…হ্যাঁ…তা তো হবেই!…খাঁটি কথা বলেছেন!)—মতানৈক্য হয়েছিল যে বিষয় নিয়ে তা হল প্রপেলারটা গো-অ্যাহেড বেলুনের সামনে থাকবে না, পেছনে থাকবে (চোখ কপালে উঠল সদস্যদের…[illegible] আবার কী!…বিস্ময় ধ্বনি!) সমস্যাটার মীমাংসা করে এনেছি আমরা। দু দলই খুশী হবেন সমাধান শুনে। দুটো প্রপেলার থাকবে বেলুনের দোলনায়—একটা সামনে, আরেকটা পেছনে! (নৈঃশব্দ!…হতবাক…ভ্যাবাচাকা…কিংকর্তব্যবিমূঢ়!)

বাস, আর কিছু না।

না, আর কোন কথা নয়, কোনো বক্তৃতা নয়, কোনো ইঙ্গিত নয়, কিভাবে গায়েব হলেন রোবার লোকটা কি রকম—অ্যালবেট্রস মেশিনটা আদতে কী—আকাশযাত্রা লাগল কেন—কিভাবে চম্পট দেওয়া হল শূন্য থেকে—এরোনফ এখন কোন চুলোয়—এখনো আকাশে উড়ছে কিনা—একে-একে অন্যান্য সদস্যদেরও জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা—কোন কথা নয়! গুণে গুণে কটি কথা ওজন করে করে বললেন—ফুরিয়ে গেল বক্তৃতা। যা শোনবার জন্যে ছুটে আসা, তা নিয়ে একটা অক্ষরও উচ্চারণ করলেন না।

এতকাণ্ড সম্পর্কে গুছিয়ে প্রশ্ন করবার মত প্রশ্নমালাও অবশ্য ভাঁড়ারে ছিল না বেলুন ভক্তদের। প্রেসিডেন্ট যখন কথা বলতে নারাজ, তখন না হয় নাই বললেন। মানুষ মাত্রের কিছু না কিছু গোপন কথা থাকে। তা নিয়ে কৌতূহল দেখানো সমীচীন নয় মোটেই। সুতরাং কেউ এতটুকু ঔৎসুক্যও দেখাল না।

নিথর নীরবতার মাঝে ফের মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট। বক্তৃতার মাঝে এরকম শব্দহীন অখণ্ড নীরবতা ক্লাবকক্ষে ককখনো দেখা যায় নি।

প্রেসিডেন্ট বললেন—'জেন্টেলমেন, আমাদের সামনে এখন একটাই কাজ রয়েছে—গো-অ্যাহেড বেলুনকে সম্পূর্ণ করা। তারপর তাই দিয়ে আকাশ জয় করা!' মিটিং শেষ হল।

(২২) গোঅ্যাহেড আকাশে উঠল

উনিশে এপ্রিল। আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের পর সাত মাস অতিবাহিত হয়েছে। সারা ফিলাডেলফিয়া জুড়ে আজ দারুণ উত্তেজনা। উত্তেজনা নির্বাচন বা মিটিং উপলক্ষ্যে নয়। ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের বহু বিজ্ঞাপিত গ্যাস-বেলুন আজ শূন্যে উঠবে।

এ কাহিনীর প্রারম্ভেই হ্যারি টিণ্ডারের কথা লেখা হয়েছে। তিনিই চালিয়ে নিয়ে যাবেন গ্যাস-বেলুনকে, সঙ্গে অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট থাকছে না, অন্য কোন যাত্রীও থাকছেন [illegible] কছেন স্বনামধন্য দুই পুরুষ—প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী। এতবড় [illegible] যোগ্য ব্যক্তি তাঁরা ছাড়া আর কেউ আছেন কি?—হাওয়ার চাইতে ভারী [illegible]—এই তত্ত্বের উল্টো তত্ত্ব হাতেনাতে প্রমাণ করার যোগ্যতর ব্যক্তি বলতে তো এই দু'জনই আছেন! বেলুন বিরোধী অন্য যে কোনো

তত্ত্বকে বিদ্রুপ করবার এতবড় সুযোগ পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তাঁরাই—তাই নয় কী ?

সুদীর্ঘ সাত মাসেও অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে একটা কথাও বের করা যায় নি এঁদের পেট থেকে। এমনকি বাচাল ক্রাইকোলিনও রোবার আর তাঁর ওয়াওার ফুল 'মেঘকাটা কাঁচি' সম্পর্কে ফিসফাস পর্যন্ত করেনি নিতান্ত আপন জনের কাছেও। আঙ্কল প্রুডেণ্ট আর ফিল ইভান্সের মনোগত অভিপ্রায় আঁচ করা যায় বই কি। তাঁরা চান না গো-অ্যাহেডের চাইতে ভালো মেশিনের নাম কেউ জানুক। তাতে গো-অ্যাহেডের গৌরব ম্লান হবে, তাই নয় কি ? গো-অ্যাহেড। পথিকৃৎ হবে না ঠিকই—কেননা বেলুন এর আগেও আকাশে উড়েছে—কিন্তু ফ্লাইং মেশিনের গুণগান তো গাইতে হবে। বাতাসের চাইতে ভারী যন্ত্রযান দিয়ে আকাশ বিজয় সম্পর্কেও বক্তৃতা দিতে হবে না। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতে আকাশ বিজয় সম্ভব হবে কলে-চালিত গ্যাস-বেলুন দিয়ে। উল্টো গীত গাওয়া কি এখন সম্ভব ? তাই স্রেফ বোবা হয়ে রইলেন তাঁরা আকাশ রাজা রেবোরের অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযান সম্পর্কে।

তা ছাড়া এতবড় আবিষ্কারের কৃতিত্ব যাঁর প্রাপ্য, তিনি তো আর বেঁচে নেই। তাঁর আবিষ্কারও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে সমাধিস্থ হয়েছে। সাঙ্গপাঙ্গসহ আকাশ রাজাকে নিশ্চিহ্ন করেছেন দুই বেলুনিস্ট। প্রাপ্য সাজাই দেওয়া হয়েছে যদিও—যেমন কুকুর তেমন মুগুর—প্রতিহিংসার মত প্রতিহিংসা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ নিয়ে আর কোনো কথা নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত অঞ্চলে রোবারের গোপন ঘাঁটি আছে কিনা, তা পরে যাচাই করা যাবেখন। আপাততঃ তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আর দরকার নেই।

তাই ওয়েলডন ইনস্টিটিউট আয়োজিত বহু প্রতীক্ষিত গ্র্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্ট আজ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বেলুন-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ-রকম বেলুন আর কখনো আকাশে ওঠে নি। হাওয়া সমুদ্রের আতংক বললেই চলে গো-অ্যাহেড বেলুনকে।

উত্তম এরোস্ট্যাট অর্থাৎ গ্যাস-বেলুন বলতে যা বোঝায়—গো-অ্যাহেড তাই। সব গুণই আছে এ-বেলুনের। আয়তন বিপুল—তাই আজ পর্যন্ত কোনো বেলুনের পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, গো-অ্যাহেড তা পারবে—স্বচ্ছন্দে উঠে যাবে আকাশের ঊর্দ্ধতম অঞ্চলে। বেলুনের আবরণ দিয়ে গ্যাস বেরোনো সম্ভব নয়—সুতরাং যতক্ষণ খুশী আকাশে ভেসে থাকা যাবে। গ্যাস বেলুন হলেও তলতলে নয়, বেশ কঠিন—তার মানে ফেঁপে উঠে ভেতর থেকে চাপ মারলেও

বেলুন ফাটবে না—ঝড়বৃষ্টির দাপটেও চুপসে যাবে না। ঊর্দ্ধে আরোহণের শক্তি এত বেশী যে পুরো গ্যাস বেলুনের ওজন তো বটেই, সেই সঙ্গে অত্যন্ত মজবুত একটা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনকেও টেনে নিয়ে যাবে আকাশে—এই ইঞ্জিনের শক্তিতেই প্রপেলার ঘুরবে—বেলুন সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে ছুটবে—যা ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। যাতে ছুটোছুটি করতে অসুবিধে না হয়, তাই লম্বাটে ধাঁচে গড়া হয়েছে গো-অ্যাহেডকে—যাতে বাতাস কাটতে সুবিধে হয়। ক্রেবস এবং রেনার্ড যে-ধরনের দোলনা ব্যবহার করেছিলেন—গো-অ্যাহেডের দোলনাও অবিকল সেই রকম ; দোলনার মধ্যেই থাকছে জামা কাপড়, যন্ত্রপাতি, দড়িদাড়া, ছোট নোঙর ইত্যাদি—সেই সঙ্গে ইঞ্জিন চালানোর জন্যে ব্যাটারী আর অ্যাকুমুলেটর, দুটো প্রপেলার রয়েছে দোলনায়—সামনে আর পেছনে। দুঠো পাখা ঘুরিয়েও গো-অ্যাহেডের কেরদানি অ্যালবেট্রসের ধারে কাছে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

গো-অ্যাহেড খাড়া রয়েছে ফেয়ার মণ্ট পার্কের সেই চত্বরে যেখানে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে নেমে সমস্ত ঘাস চেপটে দিয়েছিল অ্যালবেট্রস।

গো-অ্যাহেডের মধ্যে ঠাসা হয়েছে সব চাইতে হাল্কা গ্যাস—তাই বিপুল ওজন নিয়েও প্রচণ্ড বেগে ওপরে ওঠা তার কাছে কিছুই নয়। মামুলী হাল্কা গ্যাসের ওজন তোলার ক্ষমতা হল এক ঘন মিটারে ৭০০ গ্রাম। সে তুলনায় হাইড্রোজেনের শক্তি অনেক বেশী – এক ঘন মিটারে ১,১০০ গ্রাম। স্বনাম ধন্য হেনরী গ্রিফোর্ডের প্রণালী অনুসারে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন বানিয়ে ভরা হয়েছে বেলুনে। গো-অ্যাহেডের আয়তন ৪০,০০০ ঘনমিটার। ১,১০০ দিয়ে ৪০,০০০ গ্রামকে গুণ করলে দাঁড়াচ্ছে ৪৪,০০০ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ ৪৪,০০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন নিয়ে তরতর করে আকাশ বিহার করতে আপত্তি নেই গো-অ্যাহেডের।

ঊনত্রিশে এপ্রিল সম্পূর্ণ হল প্রস্তুতি-পর্ব। সকাল এগারোটা থেকে অতিকায় গো-অ্যাহেড সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে—ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন আর তর সইছে না তার—ছেড়ে দিলেই তেড়ে উঠে যাবে নীল গগনে। আবহাওয়া অতীব চমৎকার। হাওয়ার ছিটে ফোঁটাও নেই। এক্সপেরিমেন্টের সুবিধের জন্যেই যেন ফরমাস মত হাজির হয়েছে পরিষ্কার আবহাওয়া। জোর হাওয়া থাকলে অবশ্য গো-অ্যাহেডের কেরামতি ফুটিয়ে দেখানো যেত। শান্ত আবহাওয়ায় সব বেলুনই ওড়ে—সবাই তা জানে। কিন্তু জোর হাওয়ায় খুশী মত বেলুন চালানো সোজা কথা নয়। গো-অ্যাহেড সেই ক্ষমতা নিয়েই আকাশে উঠবে—অথচ হাওয়ার টান একেবারেই নেই।

এ-রকম সুবোধ আবহাওয়া এ সময়ে তো দেখা যায় না। একী অদ্ভুত কাণ্ড? হাওয়া একদম বন্ধ—বইবে বলেও মনে হচ্ছে না। হল কি নর্থ আমেরিকার? বছরের এই সময়ে ইউরোপের বুকে যখন-তখন কার্টক্লাস ঝড় চালান দেওয়াই তো তার কাজ। উনত্রিশে এপ্রিলকে ধার্য করা হয়েছে গো-অ্যাহেডের সার্কাস দেখানোর জন্যে। কিন্তু একি বিটলেমি শুরু করেছে হাওয়ার রাজা?

ফেয়ার মন্ট পার্ক আজ লোকে লোকারণ্য। চতুর্দিক থেকে ট্রেন বোঝাই লোক এসে নেমেছে পেনসিলভানিয়ার রাজধানীতে—এসেছে প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে, বাণিজ্য মহল থেকে, কলকারখানা থেকে। ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, স্কুল আদালত, কলকারখানা—সমস্ত আজ বন্ধ। নইলে সবাই আসবে কি করে অতিকায় বেলুনের আকাশ বিহার দেখতে? তাই পিল পিল করে লোক আসছে তো আসছেই। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, মজুর মালিক, কংগ্রেস মেম্বার সার্কাসওলা সৈনিক ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, কালা আদমি, ফর্সা আদমি—সব্বাই পিঁপড়ের মত সার বেঁধে ঢুকছে ফিলাডেলফিয়ায়। হেঁটে, গাড়ীতে ট্রেনে। দুলেদুলে উঠছে জনসমুদ্র, হিল্লোলিত হচ্ছে সমুদ্র তরঙ্গের মত; সমুদ্র সমান জনসাধারণের ছটফটানিকে নাই বা বর্ণনা করলাম। আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স মঞ্চে উঠে মার্কিন পতাকা উড়িয়ে দিতেই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে যে তুমুল হর্ষধ্বনি চতুর্দিক থেকে আতস বাজীর মত যেন ধেয়ে গেল সুনীল গগন অভিমুখে—অবর্ণনীয় সেই দৃশ্যকেও লিখে বোঝানোর চেষ্টা করব না। না লিখলেও পাঠক পাঠিকা নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এসেছে শুধু বেলুন দেখতে নয়—অসাধারণ এই দুই ব্যক্তিকে এক ঝলক দেখে জন্ম সার্থক করতে।

কিন্তু শুধু দুজন কেন? তিনজন নয় কেন? ফ্রাইকোলিন কই? ফ্রাইকোলিনের আর খাতিরের দরকার নেই। অ্যালবেট্রস তাকে যা খ্যাতি দিয়েছে, তার পক্ষে তা যথেষ্ট। তাই মালিকের সঙ্গে বেলুনে ওঠার সম্মান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে। দাঁড়িয়ে আছে জন সমুদ্রের মধ্যে। প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীকে তুমুল জয়ধ্বনি জানানোর সময়ে সে-ও চেঁচিয়েছে গলা ফাটিয়ে।

দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গায় বসে রয়েছেন সব ক'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি। মিলনর, ফিন, ফোবর্স—কেউ বাদ নেই। ফোবর্সের দুই মেয়ে বসে দুপাশে। হাওয়ার চেয়ে হাল্কা তত্ত্ব হাতেকলমে প্রমাণ করার মহোৎসবে তাঁরাও যে অংশীদার—এইটাই সবাইকে দেখাতে চান।

এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে তোপ দাগা হল। তার মানে, সব প্রস্তুত। এবার রওনা হলেই হয়। এগারোটা পঁচিশে শোনা গেল দ্বিতীয় তোপের গম্ভীর গর্জন।

চত্বর থেকে একশ পঞ্চাশ ফুট ওপরে দড়ি বাঁধা গো-অ্যাহেড অহংকারী মাথা তুলে রয়েছে নীল আকাশের দিকে। উঁচু মঞ্চ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হিল্লোলিত জন সমুদ্র। আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স দাঁড়িয়ে আছেন বুক চিতিয়ে। দুজনেই এক সাথে বাঁ হাত ঠেকালেন বুকে—জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন যে তাঁদের অন্তর স্পর্শ করেছে—ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করলেন। তারপর ডান হাত তুলে দেখালেন খ-বিন্দু—মাথার ঠিক ওপরকার গগন মণ্ডল—হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বিশালতম বেলুন এইবার নভোচারী হতে চলেছে—দখল নিতে চলেছে হাওয়ার রাজ্যের।

লক্ষ লক্ষ হাত তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করল লক্ষ লক্ষ বক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ হাত একই সঙ্গে উত্থিত হল আকাশপানে।

সাড়ে এগারোটার সময়ে দিক্‌বিদিক্ কেঁপে উঠল তৃতীয় তোপ ধ্বনির গুরু-গুরু নিনাদে।

'চলুন!' হেঁকে বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট। রাজার মতই হেলে দুলে উঠে গেল গো-অ্যাহেড। রাজকীয় চলে মহা আড়ম্বরে শুরু হল আকাশ জয়ের অভিযান।

সত্যিই দেখবার মত দৃশ্য বটে! ঠিক যেন জাহাজ কারখানা থেকে জাহাজ নামল অগাধ জলে। শূন্য রাজ্যও তো এক রকমের সমুদ্র—হাওয়ার সমুদ্র! আকাশ দানবের মতই বিপুল বিক্রমে সেই সাগরে ঝাঁপ দিল গো-অ্যাহেড।

বাতাসের টান নেই—তাই সটান উঠে গেল ওপরে—স্থির হল আটশ ফুট উচ্চতায়।

এরপর শুরু হল সামনে-পেছনে-ডাইনে-বাঁয়ে ছুটোছুটির কেরদানি। প্রপেলার ঘুরতে লাগল বন্‌বন্ করে। সেকেণ্ডে বারোশ গজ গতিবেগে পুব দিকে ধেয়ে গেল গ্যাস-বেলুন; এ-স্পীড তিমির গতিবেগ। তুলনাটা অসঙ্গত কী? গো-অ্যাহেডও তো তিমি-বিশেষ—অন্ততঃ চেহারার দিক দিয়ে।

আবার বজ্রগর্জনের মত তুমুল হর্ষধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে গেল ব্যোমচারীদের পানে।

তারপর শুরু হল অন্যান্য কেরামতি। কলে চালানো বেলুনের অসাধ্য যে কিছু নেই, তা প্রমাণ করার জন্যে ধাঁ করে মোড় নিল বেলুন, ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে প্যাক খেল বোঁ-বোঁ করে, সাঁ করে সামনে ছুটেই চক্ষের পলকে পেছিয়ে এল একই রেখায়! এত কাণ্ড দেখবার পরেও কেউ যদি মুখ বেঁকিয়ে বলত, কলে চালানো বেলুন মানেই একটা লক্কড় ব্যাপার—তাহলে তক্ষুনি তাকে যমালয়ের সিধে সড়ক দেখিয়ে ছাড়ত জনসাধারণ।

কিন্তু হাওয়ার হল কি ? বড়ই পরিতাপের বিষয়। ঝিরঝিরে হাওয়া রইলেও গো-অ্যাহেডের সার্কাস আরও দেখা যেত ; হাওয়ার পাল তুলে দিয়ে যেভাবে নৌকো যায়, সেই ভাবে না হলেও পাকা মাঝারি মতই গো-অ্যাহেডকে চালনা করতেন চালক। কিন্তু কপাল আর কাকে বলে ! ঠিক এই সময়ে উধাও হল হাওয়ার টান !

আচমকা বেশ কয়েক গজ ওপরে উঠে গো-অ্যাহেড।

কেন ওপরে ওঠা হল, তা চকিতে বুঝে নিল নীচের লোক। আঙ্কল প্রুডেন্ট হাওয়ার প্রত্যাশায় উর্ধ্ব গগনে উঠছেন। বহু খুপরি যুক্ত বেলুনের এক-একটা খুপরিতে বাতাস পাম্প করে ঢুকিয়ে দিতেই সোজা রেখায় ওপরে উঠছে বেলুন। বালির বস্তা ফেলার দরকার হচ্ছে না, গ্যাস বের করে দেবার প্রয়োজনও নেই। শুধু বাতাস ঢুকিয়ে দিলেই হল বহু কোষের এক-একটা কোষে। দরকার মত ভালভ খুলে দিয়ে টুপ করে নেমে আসাও কঠিন নয়। নতুন কিছুই নয়— তবে পুরোনো ব্যবস্থাগুলোই উন্নতভাবে গো-অ্যাহেডে সংস্থাপন করেছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

ওপরে উঠছে গো-অ্যাহেড···সটান উঠছে···ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে তার বিশাল বপু···তিমি হল কচ্ছপ কচ্ছপ হল মাছ। তবুও উঠছে গো-অ্যাহেড। চোদ্দ-হাজার ফুট ওপরে গিয়ে স্থির হল বেলুন। বাতাসে কুয়াশার লেশমাত্র না থাকায় অত ওপরেও স্পষ্ট দেখা গেল গো-অ্যাহেডকে। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে গিয়ে কত জনের যে ঘাড়ের শির খেঁচে ধরল, হাড় মট করে উঠল, কাঁধ ব্যথা হয়ে গেল, তার ইয়ত্তা নেই।

ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত নিথর নিষ্কম্পভাবে দাঁড়িয়ে রইল অতিকায় বেলুনের ক্ষুদ্রকায় আদল। পবনদেব ফোঁস করে একবার নিঃশ্বেস ফেললেও গো-অ্যাহেড ধেয়ে যেত অনেক দূর। কিন্তু বুঝি দমবন্ধ করে রেখেছেন পবনদেব—তাই অত উঁচুতেও স্রেফ দাঁড়িয়ে রইল গো-অ্যাহেড। এ কী জ্বালা ! ফোঁসফোঁস হাওয়া না থাকুক, ফুরফুরে হাওয়াতে তো থাকবে ? কিছুই নেই ! ভেল্কী দেখানোর সুযোগও নেই ! ঠিক যেন টেলিস্কোপের উল্টো মুখ দিয়ে দেখা বিন্দুবৎ বেলুন ভাসতে লাগল ঝকমকে নীলের মাঝে কালো কৌটার মত।

আচম্বিতে একটা চীৎকার শোনা গেল ভীড়ের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ চীৎকার শোনা গেল পরক্ষণেই। একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ হাত উঠল শূন্যে—লক্ষ লক্ষ তর্জনী স্থির হয়ে রইল উত্তর পশ্চিম দিগন্তের বিশেষ একটি দিকে।

গাঢ় নীল পটভূমিকায় একটা দ্রুত সঞ্চারমান বিন্দু দেখা যাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে

একটা উড়ন্ত. বস্তু এগিয়ে আসছে···আসছে···আসছে ··ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে ফুটকির আয়তন। উড়ন্ত পাখী? উচ্চ আকাশের বিরল অঞ্চলে ডানা মেলে এগিয়ে আছে কল্পনাতীত বেগে? নাকি নতুন ধরনের কোনো বেলুন? তেরচাভাবে আকাশ পরিক্রমার ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছে লক্ষ লোকের সামনে? বস্তুটা যাই হোক না কেন, গতি তার প্রচণ্ড···টেরিফিক স্পীড জনতার মাথার ওপর এসে পড়ল বলে!

সন্দেহ···একটিমাত্র সন্দেহ·· ঘোর সন্দেহ···নিমেষ মধ্যে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশের মত সঞ্চারিত লক্ষ লোকের ব্রেনে।

গো-অ্যাহেড দেখতে পেয়েছে আগুয়ান আগন্তুককে! ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে। গতিবেগ বেড়ে গেল হঠাৎ। প্রাণপণে ছুটে চলেছে পূবদিকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই আন্দাজ করেছেন জনগণ! ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অনেক সদস্যের মুখ ফস্কে নামটা বেরিয়ে পড়েই লক্ষ লক্ষ লোকের কণ্ঠে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই নাম:

'অ্যালবেট্রস! অ্যালবেট্রস!'

(২৩) ব্রাজকীয় পতন

হ্যাঁ, অ্যালবেট্রস বটে! উঁচু আকাশে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং রোবার! প্রকাণ্ড শিকারী পাখীর মত ছোঁ মারতে ছুটে আসছেন গো-অ্যাহেডের দিকে!

অথচ মাত্র ন'মাস আগেই বিধ্বস্ত যন্ত্রযান সমেত সমুদ্রে আছাড় খেয়েছিলেন রোবার আর তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল তাঁর সাধের অ্যালবেট্রস—খান খান হয়ে গিয়েছিল প্রপেলারের সারি।

দ্রুত পতনের ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেদিনই মারা যেতেন আটজনে। কিন্তু অতি মানবিক সংযম শক্তি দিয়ে নিজেকে শান্ত রেখেছিলেন রোবার—ঘূরন্ত প্রপেলারকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পতনের গতিবেগ কমিয়ে এনেছিলেন। দমবন্ধ হয়নি ঠিকই, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েও বেঁচে উঠলেন কি করে?

আধখানা ডেক, প্রপেলারের পাখা, কেবিনে—সব মিলিয়ে যেন একটা ভেলা ভাসতে লাগল জলের ওপর। পাখী জলে পড়লে ও ডানার সাহায্যে ভেসে থাকে। অ্যালবেট্রসও ভেসে রইল জলের ওপর। ডেক থেকে রবারের বোটে উঠে বসলেন আটজনে। ভোর হল। একটা জাহাজ যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। নৌকো নামিয়ে তুলে নেওয়া হল দুর্গতদের।

বেঁচে গেলেন স-পারিষদ আকাশরাজা। যন্ত্রযানের আধখানাও রক্ষে পেল। জাহাজের লোকদের বলা হল, জাহাজ ডুবি হওয়ায় ক্যাসাদে পড়েছেন রোবার। এরপর আর কোনো প্রশ্ন শোনা গেল না।

উদ্ধারকারী জাহাজটা তিন মাস্তুলওয়ালা ইংরেজ জাহাজ, 'টু ফ্রেণ্ডস।' গন্তব্যস্থান—মেলবোর্ন।

দিনকয়েক পরেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গেলেন রোবার। কিন্তু এক্স-আয়ল্যাণ্ড সেখান থেকে অনেক দূর। ঝটপট সেখানে ফিরতে হবে রোবারকে।

ভাঙা অ্যালবেট্রসের কেবিন থেকে অনেক টাকা বের করে আনলেন রোবার। এখন আর টাকার জন্তে হাত পাততে হবে না পাঁচজনের কাছে। দিনকয়েক পরে মেলবোর্নেই একটা একশ টন ব্রাইগানটাইন জলপোত কিনলেন এবং দলবল নিয়ে রওনা হলেন এক্স আয়ল্যাণ্ড অভিমুখে।

মাথায় তখন একটাই চিন্তা—প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু বদলা নিতে গেলে আর একটা অ্যালবেট্রস তৈরী করা দরকার। ভাঙা অ্যালবেট্রসের মধ্যে ইঞ্জিন আর প্রপেলার ছিল। ব্রাইগানটাইনে চাপিয়ে এক্স-আয়ল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছেন রোবার—এখন বানিয়ে নিলেন ব্যাটারী আর অ্যাকুমুলেটর। আটমাস পরে হুবহু আর একটা অ্যালবেট্রস তৈরী হয়ে গেল লোকজন যা ছিল, তাই রইল।

এক্স-আয়ল্যাণ্ড থেকে আকাশে উঠলেন রোবার—কিন্তু মেঘলোক থেকে নীচে নামলেন না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে পৌঁছোলেন নর্থ আমেরিকায়, চুপিসারে নামলেন দূর প্রতীচ্যের পাণ্ডববর্জিত একটা জায়গায়। সেখান থেকে অতিসংগোপনে খোঁজখবর নিয়ে যখন জানলেন গো-অ্যাহেড বেলুনের আসন্ন আকাশ-অভিযানের বৃত্তান্ত—আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না তাঁর।

সুবর্ণ সুযোগ! দীর্ঘদিন প্রতিশোধের প্রতীক্ষায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এসেছেন সাঙ্গপাঙ্গসহ রোবার—প্রতিশোধের সেই সুযোগ আসছে উনত্রিশে এপ্রিল—বেলুন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী দুজনেই উঠছেন বেলুনে। এই তো সুযোগ! এই সুযোগেই লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে অ্যালবেট্রসকে হাজির করা হবে হবে শূন্য পথে—পালাবার পথ পাবেন না দুই বেলুনিস্ট! সেইসঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে—কে বড়? বেলুন? না, উড়োজাহাজ?

প্রতিশোধ শুধু দুই বেলুনিস্টের ওপর নয়—এ প্রতিশোধ পাবলিক প্রতিশোধ—অন্ধবিশ্বাসী জনগণের চক্ষু খুলে দেওয়া হবে প্রখর দিবালোকে। দেখুক তারা! বেলুনের যুগ চলে গেছে—এসেছে উড়ন্ত যন্ত্রযানের যুগ!

এই কারণেই সহসা শকুনির মত মেঘের আড়াল থেকে ফেয়ারমন্ট পার্কের ওপর আবির্ভূত হল অ্যালবেট্রস।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যালবেট্রস! এর আগে যারা দেখেনি, তারাও চিনল অ্যালবেট্রসকে।

সটান ছুটছে গো-অ্যাহেড। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য চালক বুঝলেন, বৃথা চেষ্টা। পেছনের বিভীষিকা গো-অ্যাহেডকে ধরে ফেলল বলে। তাই সটান ওপরে উঠতে লাগল বেলুন। নীচে নামতে গেলে অ্যালবেট্রস ধরে ফেলবে—কিন্তু উঁচুতে উঠতে সাহস পাবেনা যন্ত্রযান। মতলবটা বিপজ্জনক হলেও যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু এ কী! অ্যালবেট্রসও যে তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছে!

গো-অ্যাহেডের চাইতে আকারে যদিও অনেক ছোট—তিমি মাছের পাশে যেন তরোয়াল মাছ—কিন্তু তেজ তো কম নয়!

নিঃসীম উদ্বেগে চেয়ে রইল জনসাধারণ। দেখতে দেখতে ষোল হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠে গেল গো-অ্যাহেড।

অ্যালবেট্রসও পেছন পেছন উঠছে। এবার উড়ছে চারপাশে। ঠিক যেন শিকার পাখী শিকারকে মাঝে রেখে চক্কি পাক দিচ্ছে—বৃত্তাকার পথে। ঘুরতে ঘুরতে কমিয়ে আনছে ব্যাসাধ—ছোট হচ্ছে বৃত্ত। শুধু একটা ধাক্কার মামলা—সঙ্গী সাথী সমেত আছড়ে পড়ে স্রেফ পাউডার হয়ে যাবেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

নীচের লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থা তখন শোচনীয়। বিষম আতংকে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, নিঃশ্বেস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছে না। ওপর থেকে নীচে পড়বার সময়ে ভয়ের চোটে মনে হয় যেন বুকের ওপর পাথর চেপে বসেছে, পায়ের শির পর্যন্ত টেনে ধরে। লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থাও দাঁড়িয়েছে তাই। প্রত্যেকেই যেন শূন্য থেকে আছড়ে পড়লেন বলে। ইতিহাসে যা কখনো ঘটেনি। তাই ঘটতে চলেছে দূর গগনে—বেলুন বনাম উড়োজাহাজ যুদ্ধ শুরু হল বলে। এ-লড়াইয়ে হারলে মৃত্যু অবধারিত। সমুদ্র নয় যে জলে ভাসবেন। এ জাতীয় লড়াই এই প্রথম হলেও শেষ নয়—কেননা প্রগতি নিয়তির মতই নিষ্ঠুর। চলার পথে কোনো বাধা মানে না। গো-অ্যাহেড আমেরিকান পতাকা উড়িয়েছে—অ্যালবেট্রস উড়িয়েছে আকাশরাজা রোবারের নিজস্ব পতাকা—তারকার মাঝে সোনালী সূর্য!

আরো ওপরে উঠেছে গো-অ্যাহেড। বিপদ আপদের জন্যে রাখা বালির বস্তা নিক্ষেপ করছে দোলনা থেকে—হাল্কা বেলুন সাঁ-সাঁ করে উঠে গেল আরো তিন হাজার ফুট ওপরে। তীব্রবেগে চক্কিপাক দিতে দিতে পুরোদমে ওপরে উঠে গেল অ্যালবেট্রস। গো-অ্যাহেডকে যাও বা দেখা যাচ্ছে কালির ফোঁটার মত, চক্রব্যূহ যন্ত্রযানকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আচমকা মহা আতংকে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। দ্রুত বড় হচ্ছে গো-অ্যাহেড অর্থাৎ নীচের দিকে নামছে সাঁ-সাঁ করে। অদৃশ্য অ্যালবেট্রসও ফের দৃশ্যমান হয়েছে—এখনো চক্রাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে পড়ন্ত গো-অ্যাহেডকে।

সর্বনাশ হয়েছে! ঊর্ধ্বগগনে হাওয়ার চাপ কম—তাই বেলুনের গ্যাস বেড়ে গিয়ে আবরণ ফাটিয়ে দিয়েছে! চুপসে আধখানা হয়ে গিয়েছে দর্পিত গো-অ্যাহেড—তীরের মত পড়ছে নীচের দিকে।

কিন্তু সমান গতিতে নেমে এল অ্যালবেট্রস। খাড়াই প্রপেলারের গতিবেগ কমিয়ে পড়ন্ত বেলুনের আশে-পাশে অবলীলাক্রমে নামছে উড়ুক্কু যন্ত্রযান। দেখতে দেখতে অনেকটা নেমে এল দুই প্রতিপক্ষ—মাটি আর মাত্র চার হাজার ফুট নীচে।

মতলব কি রোবারের? ধ্বংস করবেন গো-অ্যাহেডকে?

মোটেই না! বেলুন-যাত্রীদের তিনি পুনর্জীবন দেবেন!

তাই বেলুনের দোলনার গায়ে ভিড়িয়ে দিলেন অ্যালবেট্রসের ডেক। লাফিয়ে চলে এলেন বেলুন চালক।

কিন্তু আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স? তাঁরা কি আসবেন? শত্রুর আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটবেন? মোটেই না। কিন্তু নাছোড়বান্দা অ্যালবেট্রস-কর্মচারীরা তাঁদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল দোলনা থেকে ডেকে।

সরে এল এরোনফ, দাঁড়িয়ে রইল স্থিরভাবে। বেলুনের সব গ্যাস তখন বেরিয়ে গিয়েছে। দোলনাসমেত আছড়ে পড়ল গাছের মাথায়—ঝুলতে লাগল অতিকায় ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত।

থমথমে স্তব্ধতা বিরাজ করছে অতবড় মাঠে। লক্ষ লক্ষ বুকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হৃদপিণ্ড যেন থেমে গিয়েছে অপরিসীম উৎকণ্ঠায়। অনেকে তো ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে—এরপর যা ঘটবে, তা দেখবার সাহস তাদের নেই।

ফের রোবারের খপ্পরে পড়েছেন আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। কি করবেন এবার কয়েদীদের নিয়ে? ফের ধরে নিয়ে যাবেন মানুষের অগম্য মহাশূন্যে?

মনে তো হল তাই।

কিন্তু এ-আবার কী? শূন্যে বিলীন না হয়ে উল্কাবেগে সহসা নেমে এল অ্যালবেট্রস—মাটি থেকে মাত্র ছ ফুট ওপরে দাঁড়াল স্থির হয়ে। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে শোনা গেল ইঞ্জিনীয়ার রোবারের ভরাট কণ্ঠস্বর, 'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ!

ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারী আবার আমার কব্জায় এসেছেন। তাঁদের আটকে রাখার অধিকার আমার আছে। কিন্তু অ্যালবেট্রসের জয়যাত্রা দেখে তাঁদের মনে যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আমি দেখেছি, তা থেকে বুঝেছি

এখনো তাঁদের মন তৈরী হয়নি। অকাশ বিজয় সাঙ্গ হবে বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে,...সেদিন আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই বিপ্লবের উপযুক্ত মনোভাব এখনো জাগ্রত হয়নি ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারীর মধ্যে। আঙ্কল প্রুডেন্ট। ফিল ইভান্স—আপনারা মুক্ত!' লাফ দিয়ে নীচে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং বেলুন-চালক।

ফের বললেন রোবার:

'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা, আমার এক্সপেরিমেণ্ট শেষ হয়েছে। কিন্তু উপদেশ দিতে চাইনা আপনাদের—কেননা উপদেশ গ্রহণ করার মত অবস্থা এখনো আসেনি এ-সমাজে। প্রগতিকে সমাদর করার মত লোক জন্মায়নি। বিপ্লব নয়—বিবর্তন, রাতারাতি পরিবর্তন নয়—ধীরগতি পরিবর্তন—এই হল মানুষের মনস্কামনা। এককথায় সময় হাওয়ার আগে এসে পড়লে চলবে না। বসে থাকতে হবে। আমি বড্ড আগে এসেছিলাম, তাকে ঠেকে শিখলাম এই মহা সত্য। দেখলাম, আপনারা যা ভাবেন—তার উল্টোটা ভাবতে চান না। বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারকে সহ্য করতে পারেন না। আপনাদের স্বার্থে ঘা লাগলে আপনারা প্রগতিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করতে দ্বিধা করেন না। বিশ্বঐক্যর উপযুক্ত হয়নি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র!

'তাই আমি যাচ্ছি। আমার গুপ্ত রহস্য আমার সঙ্গেই যাচ্ছে। কিন্তু মানব একদিন এই গুহ্যতত্ত্ব ফিরে পাবে। এ-আবিষ্কার সেইদিনই আপনাদের হাতে যাবে যেদিন এর উপকারকে গ্রহণ করতে শিখবেন—গালাগাল দেওয়ার মত মনোবৃত্তি মন থেকে দূর হবে আরো একটু জ্ঞানের আলোয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকারা! বিদায়!'

চুয়াত্তরটা প্রপেলার দিয়ে বাতাস কেটে নিমিষে শূন্যে লাফ দিল অ্যালবেট্রস—উল্কার মত ছিটকে গেল পূর্বদিকে তুফান-সমান জয়ধ্বনিকে উপেক্ষা করে।

চূড়ান্ত অপমানিত হলেন দুই সতীর্থ—মাথা হেঁট হল ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের। কিছু আর করার ছিল না এরপর—তাই সোজা বাড়ী ফিরে গেলেন দুজনে।

নিমেষ মধ্যে চেহারা পাল্টে গেল জনতার। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-টিটকিরি-তামাসায় আধমরা করে ছাড়ল বেলুনবাজদের!

প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীও রেহাই পেলেন না!

কিন্তু কে এই রোবার? কোনদিনও কি তা জানা যাবে?

নিশ্চয়! এখনই তা বলা যায়।

রোবার হলেন ভবিষ্যৎ-বিজ্ঞান। আগামীকালেরও বলতে পারেন! এ-বিজ্ঞান একদিন না একদিন আসবেই আমাদের মাঝে!

মানুষের অগম্য শূন্যে পথে অ্যালবেট্রস এখনো কি বিচরণ করছে—নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মত ? কোনো সন্দেহই নেই তাতে। রোবার কথা দিয়েছেন ভাবীকালে আবার তিনি আবির্ভূত হবেন। সত্যিই কি আসবেন ? নিশ্চয় আসবেন ! তিনি আসবেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবেন তার আশ্চর্য আবিষ্কারের গুপ্ত-রহস্য···ফলে পাল্টে যাবে বিশ্বের সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা।

আকাশ-যাত্রার ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে এরোনফ-বিজ্ঞানে—এরোস্ট্যাট (বেলুন) বিজ্ঞানে নয়।

একমাত্র অ্যালবেট্রসরাই জয় করবে হাওয়ার সমুদ্রকে—আর কেউ না !

———

ঃ সম্পাদকীয় পুনশ্চ ঃ

[পাদটীকা অনেক সময়ে বিরক্ত করে পাঠক-পাঠিকাকে—মূল কাহিনীতে মন ভেসে গেলে পাদটীকা পড়তে ইচ্ছে হয় না। তাই অন্তটীকার সাহায্যে বেশ কিছু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে]

জুল ভের্ন 'রোবার দি কনকারার' (ক্লিপার অফ দি ক্লাউডস) লেখেন ১৮৮৬ সালে ! আকাশ পথে আটলান্টিক পার হবার স্বপ্নও তখন কেউ দেখেননি। তেত্রিশ বছর পরে এরোপ্লেনে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিলেন অ্যালকক আর ব্রাউন (জুন, ১৯১৯) । ১৯০০ মাইল সমুদ্র পেরোতে কুইন মেরীর মত জাহাজের লাগল সাড়ে তিন দিন, এঁদের লাগল মোটে ষোল ঘণ্টা।

* * *

এরোপ্লেনে প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ হল ১৯৩১ সালে। আমেরিকার ওয়াইলি পোস্ট এবং হ্যারল্ড গ্যাটি সাড়ে আট দিনে ১০৩ ঘণ্টা উড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এলেন।

* * *

রোবার নির্মিত অ্যালবেট্রসে-এর প্রপেলার-তত্ত্ব নিয়েই যেন তৈরী হয়েছে এ-যুগের হেলিকপ্টার আর অটোজাইরো। হেলিকপ্টার খাড়াভাবে ওঠে, খাড়াভাবে নামে—তাই তার মাথায় চিৎ-করা পাখা মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ঘোরে—একে বলে রোটর। এরোপ্লেনের পাখা থাকে আগায়—সামনে ছোটার জন্যে ; এ পাখা ঘোরে ওপর থেকে নীচে—এর নাম প্রপেলার।

অটোজাইরোতে রোটর আর প্রপেলার দুই-ই থাকে। কাজেই এ-জিনিস হাঁসজারুর মত এরোপ্লেন আর হেলিকপ্টারের জগাখিচুড়ি।

* * *

একটা ছাগল। একটা মোরগে আর একটা ভেড়া—এই তিনটে মর্ত্যের জীব সর্বপ্রথম বেলুনে চড়ে ঘুরে আসে মঁগলফিয়ের ভাইদের চেষ্টায়।

* * *

যেহেতু বেলুনে চাপলে মানুষ জ্যান্ত ফিরবে না, তাই ফ্রান্সের এক রাজা দুজন ফাঁসির আসামীকে বেলুনে চড়াতে হুকুম দিলেন। বেলুনে মানুষ চড়ানোর চেষ্টা সেই হল প্রথম। শেষকালে অবশ্য রোজীর নামে এক বিজ্ঞানী বদমাস্-দের বদলে নিজেই বেলুনে চড়ার অনুমতি নিয়েছিলেন।

প্রায় একশ বছরেরও বেশী হল, রামচন্দ্র দত্ত নামে এক বাঙালি বেলুনবাজ কলকাতায় গড়ের মাঠে অনেক লোকের সামনে বেলুন চড়ে আকাশে বেড়িয়ে ছিলেন।

*　　　*　　　*

জুল ভের্ণের যন্ত্রচালিত বেলুন গো-অ্যাহেড কল্পনায় আকাশে উড়েছিল ১৮৮৬ সালে—বাস্তবে তা সার্থকভাবে উড়ল ১৯০৯ সালে। জার্মানীর কাউন্ট ফার্ডিনাণ্ড জেপলিন বানালেন। হাল্কা অ্যালুমুনিয়ামে তৈরী, লম্বা সিগারের মত গড়ন, খোপে খোপে হাল্কা গ্যাস ভরা। এর আর একটা নাম ছিল—হাওয়াই জাহাজ অর্থাৎ এয়ারশিপ : প্রকাণ্ড চেহারা—প্রায় ৮০০ ফুট লম্বা ; অথচ যাত্রী নিতে পারত মোটে ২০ জন। জার্মানীর গ্রাফ জেপেলিন ১৯২৯ সালে ২২ দিনে পৃথিবী চক্কর দিয়ে এসেছিল। জেপেলিন উত্তর মেরু ঘুরে এসেছে ১৯২৬ সালে।

*　　　*　　　*

সমুদ্রের জলের মধ্যে দিয়েই বিশাল বিশাল নদী বয়ে যাচ্ছে। একে সমুদ্র-স্রোতও বলা যায়। এক সেকেণ্ডে ১০ কোটি টন পর্যন্ত জল টেনে নিয়ে যায় এই স্রোত গালফ স্ট্রিম এমনি এমনি একটা সমুদ্র স্রোত উৎপত্তি মেক্সিকো উপসাগর।

*　　　*　　　*

প্লাঙ্কটন জিনিসটা এত ছোট যে খালি চোখে সচরাচর দেখা যায় না। প্লাঙ্কটন মানে হল অনেক রকম গাছ আর প্রাণীর সমাবেশ। গভীর রাতে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসতে থাকে সমুদ্রে, ঢেউয়ের মাথায় জোনাকির মত দ্যুতি ছড়ায়।

*　　　*　　　*

হাওয়ার মহাসাগর জলের মহাসাগরের চাইতে পঞ্চাশ গুণ বেশী গভীর! এরই নাম বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডল। একজন মানুষের শরীরের ওপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ পড়ে, তা চার পাঁচটা হাতির ওজনের সমান।

*　　　*　　　*

বায়ুমণ্ডলের ছ'টি স্তর। পৃথিবী পৃষ্ঠের ৫০ মাইল ওপর থেকে ৩৫০ মাইল পর্যন্ত—৩০০ মাইল জুড়ে আয়নমণ্ডল। সূর্যের তাপে আয়নমণ্ডলের হাওয়ার অক্সিজেন ভেঙে যায়। আর সেই কণাগুলো বিদ্যুতে ভরে গিয়ে তেতে ওঠে। এই বিদ্যুৎ কণাগুলো নানা কারণ জলে ওঠে। তখন আশ্চর্য সুন্দর আলো ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। এ-আলো দেখা যায় কেবল মেরু অঞ্চলে—আমাদের দেশে নয়। এর নাম মেরুজ্যোতিঃ বা আরোরা! উত্তর দেশে এই আলোর

নাম আরো বোরিয়ালিস, দক্ষিণদেশে অরোরা অস্ট্রালিস। এ-আলো শুধু রাতেই দেখা যায়।

*　　　*　　　*

সূর্যের তেজ ছাড়াও আরো একটা কারণে আয়নমণ্ডলে একার বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে। চুম্বকের দু'প্রান্তের মাঝখানে আর্মেচার বলে একটা তামার তারের কুণ্ডলী ঘুরলে ঐ তারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আয়নমণ্ডলটা ঐ রকম একটা আর্মেচারের মত। আয়নকণাগুলো তামার তারের মতই বিদ্যুৎ-পরিচালক এবং ছুটছে প্রচণ্ড বেগে। হাওয়া ছুটবে, এ আর আশ্চর্য কী। আয়নকণাও তো হাওয়া। তবে এদের ছোটার বেগ সাংঘাতিক রকমের। পৃথিবীটাও একটা চুম্বক। তার মানে, চুম্বকের শক্তির মধ্যে বিদ্যুৎ-পরিচালক জিনিসে গড়া একটা হাওয়া দারুণ জোরে ধেয়ে চলেছে। ফলে, প্রচুর বিদ্যুৎ তৈরী হয়ে চলেছে সেই হাওয়ায়।

অফুরন্ত এই বিদ্যুৎ-খনি থেকে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ নিয়ে আসবার কোন পন্থা যদি বিজ্ঞানীরা বের করতে পারতেন, আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি আর থাকত না এবং আর একটা সায়ান্স-ফিকসনের বাস্তব রূপায়ণ ঘটত।

*　　　*　　　*

আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে আয়নমণ্ডলের বিদ্যুতের কোনো সম্পর্ক নেই। আকাশের বিদ্যুৎ হল মেঘের বিদ্যুৎ আর মেঘ থাকে ঠিক আমাদের মাথার ওপর ঘনমণ্ডলে।

*　　　*　　　*

নানারকমের মেঘ দেখা যায়। তাদের নানান নাম। আবর্ত মেঘ (বৃষ্টি হয় না), পুষ্কর মেঘ (বৃষ্টি হলেও হতে পারে) দ্রোণ মেঘ (ক্ষেতে ভাল শস্য দেয়), সংবর্ত মেঘ (প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়), সিঁদুরে মেঘ (সন্ধ্যেবেলায়), ধুলো মেঘ (ঝড় ওঠার আগে), হেঁড়ে মেঘ। বাদল মেঘ। নীরদ মেঘ (ঘন কালো), স্তর মেঘ (দুহাজার ফুট ওপরে—শরতের রাতে)। স্তূপ মেঘ (পাঁচ হাজার ফুট ওপরে—গ্রীষ্মকালে), অলক মেঘ। ঘন মেঘ (পাঁচ ছ মাইল ওপরে—পালকের মত)।

*　　　*　　　*

বাতাস যখন জোরে ছুটে আসে, তখন তার মধ্যে উৎক্ষেপ হাওয়া থাকে। এই হাওয়া থেকে মেঘের ওপরের অংশে পজিটিভ বিদ্যুৎ আর তলার অংশে নেগেটিভ বিদ্যুৎ জমতে থাকে। বিদ্যুতে ভরা দুখানা মেঘ কাছাকাছি এলেই একটার পজিটিভ বিদ্যুৎ আর অন্যটার নেগেটিভ বিদ্যুৎ লাফ দিয়ে এসে মিলে

যায়। তখন যে আলোক ঝলক দেখা যায়, তার নাম বিজলী বা মেঘের বিদ্যুৎ পজিটিভ আর নেগেটিভ এক হয়ে গেলেই বিদ্যুৎ মিলিয়ে যায়। বাজপড়া মানে এই বিদ্যুৎ গাছ বা বাড়ির মধ্যে দিয়ে আসা যাওয়া করে।

বিদ্যুতের এই ছুটোছুটির মধ্যে অ্যালবেট্রসের সন্তরণের বর্ণনা সত্যিই ফ্যানটাসটিক।

*　　　*　　　*

হঠাৎ বিদ্যুতের প্রচণ্ড তাপে হাওয়া গরম হয়ে ফেটে যায়, আবার তক্ষুণি ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে আসে। হাওয়ায় হাওয়ায় এইভাবে ভীষণ সংঘর্ষ লাগলে দারুণ আওয়াজ হয়। আমরা বলি মেঘ ডাকছে।

*　　　*　　　*

ব্যারোমিটার হল একা u-এর আকারে বাঁকানো কাঁচের নল। তার এক মুখ খোলা থাকে, আর ভেতরে খানিকটা পারা ভরা থাকে। হাওয়ার চাপ বাড়লে তা নলের খোলা মুখ দিয়ে পারার ওপর চাপ দেয় তখন পারার এ-মাথাট নেমে গিয়ে ও মাথাটা ঠেলে ওঠে। আবার চাপ কমলে এ-মাথাটা নেমে আসে।

*　　　*　　　*

দুটো বাতাস উল্টোদিক থেকে এসে মুখোমুখি ধাক্কা খেলেই ঘূর্ণিঝড় হয়। তখন দুটো বাতাসই একসঙ্গে ঘুরতে থাকে। সমুদ্রে এটা হলে সমুদ্রের জল সেই ঘূর্ণির টানে থামের মত উঁচু হয়ে অনেকদূর উঠে যায়। এর নাম জলস্তম্ভ, মনে হয় যেন আকাশ একটা শুঁড় বাড়িয়ে সমুদ্র থেকে জল শুষে নিচ্ছে।

জলস্তম্ভের সঙ্গে অ্যালবেট্রসের লড়াই ভোলবার নয়।

*　　　*　　　*

ঘূর্ণিঝড় ডাঙায় হলে তার নাম টর্নেডো।

*　　　*　　　*

নায়েগারা কথাটির মানে হচ্ছে 'জলের বজ্রনাদ'। উচ্চতায় মোটে ৫০ মিটার হলে কি হবে (ভারতের সবচেয়ে বড় প্রপাত মহীশূরের যোগ বা গারসোপ্পা প্রপাত—উচ্চতা ২৬০ মিটার) নায়গারা জল প্রপাতের মত চওড়া জলপ্রপাত আর নেই। চওড়ায় ১২০০ মিটার। এককথায় জায়গাটা ভয়ংকর সুন্দর। বিরামবিহীনভাবে বজ্রপাতের মত শব্দ করে আছড়ে পড়ছে নদীর জল।

*　　　*　　　*

ক্যাস্পিয়ান সাগর আসলে সাগর নয়, নোনা জলের হ্রদ। আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মিলিত আয়তনের দ্বিগুণ।

কৃষ্ণ সাগরও একটা হ্রদ। আকারে বড় বলে খাতির করে সাগর বলা হয়।

পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু হ্রদ হল তিব্বতের মানসসরোবর (৪৬০০ মিটার উঁচু)।

*　　*　　*

গরম জল থেকে থেকে ছিটকে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসে এমন অনেক ফোয়ারা আছে, এদের নাম গেজার। গেজারের মুখটা সরু। অনেক নীচে জল এসে খানিকক্ষণ ধরে জমতে জমতে গরম হয়ে উঠলে বাষ্পের ঠেলা খেয়ে সরু মুখ দিয়ে তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। এরকম গেজার আছে আইসল্যাণ্ডে, নিউজিল্যাণ্ডে, এবং সবচেয়ে বেশী আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে। এখানকার 'ওল্ড ফেথফুল', গেজার ৬৫।৭০ মিনিট অন্তর গরমজল পিচকিরি দিয়ে বের করে দেয়। প্রায় ৫৩½ মিটার উঁচু হয়ে সেই ফোয়ারা কিছুক্ষণ ধরে জল ছড়াতে থাকে। 'জায়ান্ট' গেজারের ফোয়ারা ঠেলে ওঠে ৮০ মিটার উঁচুতে।

*　　*　　*

ইয়েলোস্টোন পার্ক একটা আশ্চর্য জায়গা। সেখানে গেজার আছে শ'খানেক। ৫০।৬০ মিটার উঁচু একটা কাঁচের পাহাড় আছে। 'রঙের ভাঁড়' (পেন্ট পট্স) নামে কতকগুলো রঙীন কাদার অদ্ভুত কুণ্ড আছে—তা থেকে সাদা হলদে, লাল ইত্যাদি নানান রঙের মজাদার কাদা ছিটকে বেরোয়। আর আছে কাদার ফুটন্ত কুণ্ড—আগ্নেয়গিরি দিয়ে গলিত লাভার বদলে দেদার কাদা বেরোচ্ছে। অনেক পাহাড়ের মাথা এমনভাবে ফেটে গেছে যে কয়েক্শ রেলগাড়ীর মত হুইসল্ দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছে ফাটল থেকে—ছেয়ে ফেলছে সারা আকাশ।

*　　*　　*

ধবলগিরি হিমালয়ের দ্বিতীয় উঁচু চূড়ো নয়—পঞ্চম। এভারেস্ট প্রথম—কে২ (গডউইন অস্টেন) দ্বিতীয়। তৎকালীন তথ্যের ভিত্তিতে ধবলগিরিকে দ্বিতীয় উচ্চ শৃঙ্গের সম্মান দিয়ে ফেলেছেন ভের্ণ।

*　　*　　*

সলোমন আগস্ট আন্দ্রে বলে এক সুইস ভদ্রলোক বেলুনে চেপে উত্তর মেরু উড়ে গিয়েছিলেন—আর ফিরে আসেন নি।

*　　*　　*

দক্ষিণমেরু বা কুমেরু একহাজার থেকে দুহাজার ফুট বরফের স্তরের তলায় ঢাকা। চির শীতের রাজ্যে বিরাট বিরাট পর্বতের মধ্যে রয়েছে দুটো জীবন্ত আগ্নেয়গিরি—এরেবাস আর টেরর। এদের ভেতরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু ওপরটা তুষার আর বরফে ঢাকা। বিরাট এই অঞ্চলকে মহাদেশও বলা চলে—ইওরোপ আর অস্ট্রেলিয়া জুড়লে তবে এর সমান হতে পারে। এককালে এখানে

প্রচুর রোদ উঠত। তাই প্রচুর গাছপালা জন্মেছিল। উদ্ভিদরাজ্য মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। এই কয়লার জন্যে দলে দলে লোক ছুটত সেদিকে। সেইসঙ্গে সীল আর তিমি মেরে তেল সংগ্রহ করত।

* * *

স্যার জেমস ক্লার্ক রস ১৮৩৯ সালে দক্ষিণ মেরুবিন্দু আবিষ্কারে বেরিয়েছিলেন এরেবাস আর টেরর নামে দুখানা জাহাজ নিয়ে। আগ্নেয়গিরিদুটো এঁরই আবিষ্কার—নাম দিয়েছিলেন দুই জাহাজের নামে।

* * *

রোয়াল্ড আমানসেন ১৯১১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণমেরু পৌঁছেছিলেন। কাপ্টেন স্কট পরে সেখানে গিয়ে, আমানসেনের চিঠি পান। মন ভেঙে যায় তাঁর।

১৮৮৬ সালে রোবারের গল্প লেখবার সময়ে কুমেরু অনাবিষ্কৃত ছিল বলেই জুল ভের্ণ ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধকারের কল্পনা করেছিলেন ইচ্ছে করেই।

* * *

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাস। নর্থ ক্যারোলিনার—ছোট একটা মাঠ থেকে আকাশে প্রথম উড়োজাহাজ ওড়ালেন আমেরিকান দুভাই—উইলবার রাইট আর অলভিল রাইট প্রায় বারো সেকেণ্ড ওপরে ভেসে রইল বিমান।

১৯০৫ সালে-মারা গেলেন জুলভের্ণ।

১৯০৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, রাইট দু'ভাইয়ের উড়োজাহাজ দুঘণ্টা ধরে আকাশে রইল এবং তিনশ ফুট ওপরে উঠে গেল। ফ্রান্স গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপার দেখে অবাক হলেন। বিমান তৈরীর কারখানা খোলা হল। প্রচুর টাকা দিয়ে রাইট দু'ভাইয়ের কাছ থেকে গভর্ণমেণ্ট পেটেণ্টটা কিনে নিলেন।

ভের্ণের উড়োজাহাজ শেষ বিদায় নিয়েছিল উত্তর আমেরিকায়, রাইট দুভাইয়ের উড়োজাহাজ প্রথম আকাশে উড়ল দক্ষিণ আমেরিকায়। উড়ো-জাহাজের যুগ আসছে—এই ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন্ ফ্রান্সের সাহিত্যিক জুল ভের্ণ; উড়োজাহাজের যুগকে সাদর সমাদর জানালেন তাঁরই দেশের গভর্ণমেণ্ট।

এখন তো শব্দের চেয়েও জোরে যাচ্ছে উড়োজাহাজ। ১৯৬২ সালে মেজর হোয়াইট বিশেষ একখানা প্লেনকে অল্পক্ষণের জন্যে ঘণ্টায় ৪১০৫ মাইল বেগে (শব্দের গতি কিন্তু ঘণ্টায় মাত্র ৭৫০ মাইল) চালিয়েছিলেন। যাত্রীবাহী বিমানের যাত্রীসংখ্যা আজকাল ৫০০, গতিবেগও ৫০০।

এখন মানুষ আর শুধু আকাশরাজা নয়, মহাকাশরাজাও বটে। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিকে, এমনকি সৌরজগৎ ছাড়িয়েও ছুটে চলেছে মহাকাশযান। সার্থক হয়েছে ভের্ণের স্বপ্ন।

—ঃ শেষ ঃ—